রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ

শ্রীরমাপতি দত্ত প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্ত।
১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

মুদ্রাকর—শ্রীকালিদাস মুন্সী ও শ্রীবিশ্বনাথ মুন্সী,
পুরাণ প্রেস,
২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা

কবি গাহিয়াছেন—

"দেহ পট সঙ্গে নট সকলি হারায়।"

জানি না, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পর্কে এ উক্তির সার্থকতা কতখানি! অবশ্য তিনি যে কেবল নট ছিলেন, তাহা নহে। নট, কবি, নাট্যকার, প্রযোজক, স্বত্বাধিকারী, অধ্যক্ষ, শিক্ষক—কত নাম করিব—ইত্যাদি বিবিধরূপেই তিনি জনসাধারণের সহিত সুপরিচিত ছিলেন; কিন্তু তবুও লোকে তাঁহাকে চিনিত প্রধানতঃ নটরূপে। নাট্যরসপিপাসু দর্শকের মনের মধ্যে তাঁহার যে অসম্ভব প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহার মূলে ছিল তাঁহার অসাধারণ অভিনয় চাতুর্য্য। সুতরাং নটের প্রাপ্য যে বিস্মৃতি, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন কেন?

আজ পঁচিশ বৎসরাধিক কাল হইল, অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের যে যুগ গিয়াছে, তাহাতে নট হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দী নট হিসাবে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কিন্তু তবু এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের প্রথমার্দ্ধে একা অমরেন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে অমরেন্দ্রনাথ ও দানিবাবু ব্যতীত যে অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান রঙ্গদর্শনেচ্ছু কয়জন লোক সে সকল অভিনেতার নাম জানেন? হিসাব করিলে হয়ত আমরা দেখিব যে, শতকরা নব্বই জন লোক কখনও অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়,

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অঘোরনাথ পাঠক প্রভৃতির নামও শোনেন নাই। সেই হিসাবে, হয়ত অমরেন্দ্রনাথও বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত।

তাঁহার কীর্ত্তিকলাপের সহিত বর্ত্তমান নাট্যরস-রসিকদিগের পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য ও বঙ্গরঙ্গভূমি অমরেন্দ্রনাথের নিকট কতখানি ঋণী, তাহা দেখাইবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। তাহা ছাড়া, যাঁহারা অমরেন্দ্র-যুগের রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিখনে প্রবৃত্ত হইবেন, এ পুস্তক তাঁহাদেরও সাহায্য করিবে। "অমরেন্দ্রনাথের নামে পাগল হয়," এমন লোকের অভাব ছিল না, আশা করি বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত হইবে না।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই শিশির পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক অমরেন্দ্রনাথের একটী জীবনী প্রকাশিত হয়। ঐ জীবনী এত সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ যে উহার প্রকাশাবধি বর্ত্তমান লেখকের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অমরেন্দ্রনাথের একটী বিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করেন এবং তজ্জন্য আমরা তাহার যথোপযুক্ত উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় থাকি। কিন্তু এতদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়াও আমরা নিজেদের সন্তোষানু-যায়ী উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। আর বেশী দিন ফেলিয়া রাখিলে সমস্ত কাজটাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় আর দেরী না করিয়া বর্ত্তমান পুস্তক প্রকাশিত হইল। অমরেন্দ্রভক্ত বহু লোকের নিকট এখনও নিশ্চয়ই এমন বহু বস্তু আছে, যাহা তাঁহার জীবনীতে স্থান পাইবার যোগ্য। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ এই পুস্তক পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে এ বিষয়ে সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ বাধিত হইব। জানি না, পাঠকসমাজে এ পুস্তক কতখানি প্রসার লাভ করিবে; তবে যদি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ

কখনও মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রদত্ত উপাদানের যথাযোগ্য সঙ্কলন করিবার বিশেষ বাসনা রহিল।

অমরেন্দ্রনাথ মানুষ ছিলেন—অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ মনোরঞ্জন-শক্তি ছিল তাঁহার। কিন্তু তিনি দেবতা ছিলেন না,—বরঞ্চ নরজগতের প্রধান দুর্ব্বলতা তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রকট ছিল। নৈতিক চরিত্র হিসাবে তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন না। তিনি যেমন মানুষ ছিলেন, এই পুস্তকে তাঁহাকে সেই মতই আঁকিবার চেষ্টা হইয়াছে। নীতিবাগীশেরা তাহাতে নাক শিঁটকাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঢাকিয়া তাঁহাকে অতিমানবরূপে অঙ্কন করিবার প্রয়াস কখনও লেখকের ছিল না। লেখক অমরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতেন—তাঁহার নৈতিক অধঃপতন সত্ত্বেও তাঁহার নানাবিধ সদ্‌গুণের জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ, অমরেন্দ্রনাথের দোষগুণ সমস্ত বিচার করিয়া, তাঁহাকে লেখকের মত ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারেন, তাহা হইলেই লেখকের শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলনোদ্দেশ্যে ও বিবিধ তারিখ সংগ্রহের জন্য বহু পুরাতন সংবাদপত্র দেখিবার প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, "ইণ্ডিয়ান্ মিরার" পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহামতি রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ভট্টাচার্য্য আমাদের ঐ তিন পত্রিকা দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়া, আমাদের অসীম ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এ জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। "জন্মভূমি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ

দত্ত তাঁহার রক্ষিত "রঙ্গালয়ে"র ফাইল আমাদের দিয়া, আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ পরিশোধের অতীত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের বিবিধ উপাদান সংগ্রহে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের সাহায্যের কথা উল্লেখ না করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করা চলে না।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ

—:০:—

অবতরণিকা

বিভিন্ন ও বিশিষ্ট লেখকবর্গ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্ত পুস্তকাকারে বা সাময়িকপত্রে-ক্রমশঃ-প্রকাশ্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় প্রত্যেকখানিরই রঙ্গালয়ের পত্তন হইতে সুরু হইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের সহিত সমাপ্তি। সুতরাং আমরা যদি রঙ্গালয়ের যুগ বিভাগ করিতে বসি, তাহা হইলে দেখিব যে, বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে আদি যুগ বলা চলে। এ যুগ সম্পর্কে বহু বাদানুবাদ আছে,—সাধারণ নাট্যশালা (Public Theatre) স্থাপনে গিরিশচন্দ্র বা অর্দ্ধেন্দুশেখর—কাঁহার কৃতিত্ব অধিক, এ বিষয় লইয়া মতদ্বৈত আছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের সহিত সে বাদানুবাদের কোন সংশ্রব নাই। তবে এ কথা বলিলে বোধ হয় অবান্তর হইবে না যে, অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের ভক্তদলভুক্ত ছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের যে দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হয়, সেই যুগের প্রারম্ভেই অর্থাৎ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম, এবং তাঁহার বড় সাধের ক্লাসিক থিয়েটারের অভ্যুদয়েই সেই যুগের পরিসমাপ্তি। এই যুগে এক সময়ে ষ্টার

থিয়েটারের এত প্রতিপত্তি ছিল, গিরিশচন্দ্রের বিবিধরসাত্মক নানাবিধ নাটকের (যথা, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, নসীরাম, চৈতন্যলীলা, দক্ষযজ্ঞ, নল-দময়ন্তী) অভিনয়ে তাহারা এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, যে সে সময়কে "ষ্টার যুগ" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অমৃতলাল বসু-বিরচিত বিবিধ প্রহসন ও সমাজচিত্র এবং তাঁহার নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ", ও "সরলা", সে প্রতিষ্ঠা রক্ষণে কম সাহায্য করে নাই। লোকে বলিত যে, ষ্টার থিয়েটার কোম্পানী যদি ধারাপাতের অভিনয়েও প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও দর্শকের অভাব হইবে না। চন্দ্রশেখরের অভিনয় তৎকালীন দর্শক-সমাজে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, লোকে বলিত—চন্দ্রশেখর ষ্টারের 'কোম্পানীর কাগজ'। শোনা যায়, কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রতি মাসে অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গের বেতন দিবার ঠিক পূর্ব্বেই এই পুস্তকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে স্বচ্ছন্দে প্রত্যেকের পাওনা মিটাইয়া দিতেন। অমৃতলাল মিত্র ছিলেন ষ্টারের হিরো অ্যাক্টর।

ষ্টার ব্যতীত এই যুগে এমারেল্ড থিয়েটারেরও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সুনাম হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে প্রতিষ্ঠা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। এমারেল্ডের হিরো অ্যাক্টর মহেন্দ্রলাল বসুর এই সময়কার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া জনসাধারণ তাঁহাকে "The Tragedian" উপাধি প্রদান করেন। এমারেল্ডের পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ-রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় যুগের অবসান ও "ক্লাসিকের" অভ্যুদয়। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের এই তৃতীয় যুগকে "ক্লাসিক" বা অমরেন্দ্র-যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই তৃতীয় যুগের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং আমরা ইহাতে যথাসাধ্য এই যুগের ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের মহাসন্ধিক্ষণে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের মহাসন্ধিক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের উত্থান। ১৮৯৭ হইতে ১৯০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের এই তৃতীয় যুগে, অন্যান্য বহু খ্যাতনামা অভিনেতা, এমন কি গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, নট হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ অবিসম্বাদী সম্রাট্ ছিলেন। এটা যে শুধু আমাদের নিজেদের উক্তি, তাহা নহে। 'অমরেন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ) লিখিয়াছেন ঃ—"ক্লাসিকে পলাশীর যুদ্ধে, হারানিধি ও হরিরাজ নাটকে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অমরেন্দ্র যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে **তাঁহাকে সেই সময়কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা বলিলেও চলে।**"

"জননীর জঠর হইতে যেদিন অমরেন্দ্রনাথ প্রথম ধরার আলো দেখিতে পান, সেদিন কে ভাবিয়াছিল যে, এক দিন এই শিশুর নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইবে। যিনি একদিনের জন্যও থিয়েটার দেখিয়াছেন, এমন কি যিনি শুধু থিয়েটারের নামটুকু মাত্র শুনিয়াছেন, তিনিও জানেন অমরেন্দ্রনাথ কে। বঙ্গ-নাট্যশালার জন্য অমরেন্দ্রনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ভবিষ্যতেও যাঁহারা বঙ্গ-রঙ্গশালার অতীত ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা কেবলমাত্র একবার উল্টাইবেন, তাঁহারাও দেখিবেন তথায় অমরেন্দ্রনাথের নাম গগনপৃষ্ঠে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া দিব্য প্রতিভালোকে পূর্ণপ্রদীপ্ত। ভগবানের করুণা ব্যতীত মানুষের কীর্ত্তি চিরদিনের মত বিশ্বের বুকের উপর অঙ্কিত হইয়া থাকে না। এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায়

নাই যে অমরেন্দ্রনাথের উপর ভগবানের বিশেষ করুণা ছিল, তাই অমরেন্দ্রনাথের নাম বিশ্বের বুকের উপর এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যত দিন বঙ্গ-নাট্যশালার অস্তিত্ব লুপ্ত না হইবে, যত দিন বঙ্গ-নাট্যশালাকে সহৃদয় সাহিত্যসেবীগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন, ততদিন অমরেন্দ্রনাথের নাম বঙ্গবাসী কখনও ভুলিবেন না!"*

যাবদ্বাতোবিততগগনে চন্দ্রসূর্য্যৌ মহাত্মন্
তাবৎ কীর্ত্তিস্তবকরমুখৈঃ শ্রেয়সীং গায়তস্তৌ।
শ্রীনাথাভ্যাং সহিত বিদিতং চামরেন্দ্রাভিধেয়ম্
দত্তোপাধিং সততমবতাদ রাজরাজেশ্বরীত্বাম্॥ †

---

* উদ্ধারচিহ্ন-মধ্যস্থ অংশ শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "অমরেন্দ্র-নাথ" হইতে উদ্ধৃত।

† অমরেন্দ্রনাথের প্রতি এই আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোক শ্যামবাজার রাজরাজেশ্বরী পাঠশালাস্থ কুমারীবৃন্দের দ্বারা পঠিত হইয়াছিল।

প্রথম খণ্ড

সাধনা

বংশ-বিন্যাস ঃ

দুর্গাচরণ দত্ত
মদনমোহন
লক্ষ্মীনারায়ণ
রাজচন্দ্র
ভোলানাথ
দ্বারকানাথ
কেদারনাথ
দশ পুত্র
চণ্ডীচরণ
নিবারণ
নির্ম্মল
ধীরেন্দ্রনাথ
হীরেন্দ্রনাথ
অমরেন্দ্রনাথ
বিজয়েন্দ্রনাথ
কালীচরণ
শ্যামাচরণ
নলিন
পুলিন
পরিমল
শচীন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনাথ
কন্যা
সুধীন্দ্র
হরীন্দ্র
রণেন্দ্র
শৌরীন্দ্র
প্রবোধ
কিরণ
হিরণ
কনকেন্দ্র
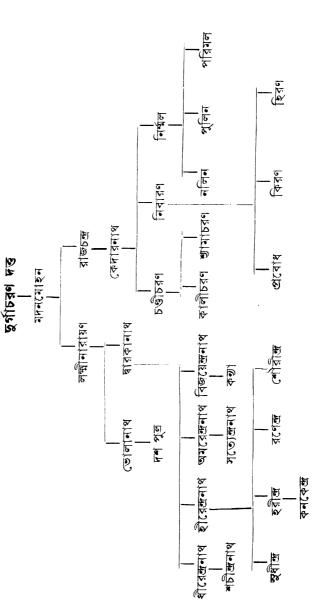
অমরেন্দ্রনাথের জন্ম-পত্রিকা

সন ১২৮২ সাল, ২০শে চৈত্র, শনিবার, অষ্টমী

ইং ১লা এপ্রিল, ১৮৭৬ খৃঃ জন্ম।
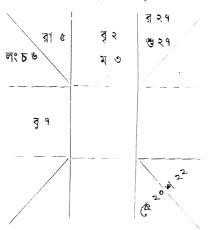
কোষ্ঠীতে লক্ষণীয় বিষয় :—

(১) লগ্নে চন্দ্র। (২) একাদশে বৃহস্পতি ও মঙ্গল—উভয়েই তুঙ্গী, তদুপরি মঙ্গল স্বক্ষেত্রী। (৩) দ্বাদশে রাহু। (৪) দশমে শুক্র তুঙ্গী। (৫) সপ্তমে শনি। (৬) রবি ও শুক্র সংযুক্ত। (৭) লগ্নপতি বুধ দ্বিতীয়ে ও দ্বিতীয়াধিপতি চন্দ্র লগ্নে—ফলে রাজযোগ। (৮) জাতকের রাশি মিথুন ও নক্ষত্র আর্দ্রা।

কোষ্ঠীর ফলাফল :—

(২) অসামান্য সাফল্য ও সুখ্যাতি এবং প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও রাজতুল্য সম্মান লাভ। (৩) বহু ব্যয় ও সময়ে সময়ে আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয়। (৪) কবি ও গ্রন্থকার। (৫) অকালে পত্নীবিয়োগ। (৬) নৃত্যগীতপ্রিয় ও রমণীমোহন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, শনিবার, বাংলা ১২৮২ সাল, ২০শে চৈত্র তারিখে, রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মাতুলালয়ে অমরেন্দ্রনাথ প্রথম পৃথিবীর আলোক দর্শন করেন। চোরবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ইঁহার জন্ম।

এই দত্ত বংশ অতি প্রাচীন ও বনিয়াদী বংশ। কলিকাতাতেই ইঁহাদের আদি বাস। কলিকাতা নামকরণ হইবার এবং ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে—বর্ত্তমানে যেখানে ফোর্ট-উইলিয়াম, তথায়—ইঁহারা বাস করিতেন। ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন ফোর্ট-উইলিয়াম নির্ম্মিত হয়, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইঁহাদের বাসস্থান দখল (acquire) করেন ও বসত বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তৎপরিবর্ত্তে চোরবাগানে এক খণ্ড নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। তদবধি ইঁহারা ৮৩নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটস্থ সেই ভূমিতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত এই বংশের এক জন কৃতী পুরুষ। তৎকালীন কায়স্থ সমাজে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল ও এক জন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া তিনি সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কলিকাতায় খুবই কম কায়স্থ বংশ ছিল, যাঁহারা না দত্ত বংশের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ইঁহারই চোরবাগানস্থ ভবনে "সধবার একাদশীর" সপ্তমাভিনয় হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথের সহিত বাগবাজারের সুবিখ্যাত বসু বংশের কন্যা রক্ষাকালীর বিবাহ হয়। তিনি প্রথম জীবনে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়েতে টাইম টেবল্ বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে কার্য্যে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা না দেখিয়া কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া, গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত সওদাগর রেলি ব্রাদার্সের মুৎসুদ্দির পদ শূন্য হইলে, ঐ পদের জন্য প্রার্থী হন। ঐ কোম্পানীর বড় সাহেব, অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থীদের মধ্যে দ্বারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে মনোনীত করেন। দ্বারকানাথ এক লক্ষ মুদ্রা জমা দিয়া, সেই পদ গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে ঐ প্রকার মুৎসুদ্দির পদ লোকের বিশেষ কাম্য ছিল এবং দ্বারকানাথও স্বীয় প্রতিভাবলে ও কর্ম্মশক্তিতে আপিসের সাহেবদের এরূপ মুগ্ধ করেন যে ফলে ঐ পদটী তাঁহার পরিবারের কায়েমী কাজে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া দ্বারকানাথও মুৎসুদ্দিগিরি হইতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শচীন্দ্রনাথ ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

দ্বারকানাথের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ, মধ্যম হীরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় অমরেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ বিজয়েন্দ্রনাথ।

মাতুলালয়ে অমরেন্দ্রনাথ যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়েন, সেদিন বাগবাজারের বোসেদের বাড়ীতে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী"র অভিনয় ছিল। অমরেন্দ্রনাথের জননী থিয়েটার দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন ও ঐ অভিনয় দেখিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সেখানে যাইবার কিছু পূর্ব্বেই হঠাৎ তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সেই জন্য অমরেন্দ্রনাথ নিজের জন্ম সম্বন্ধে স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট
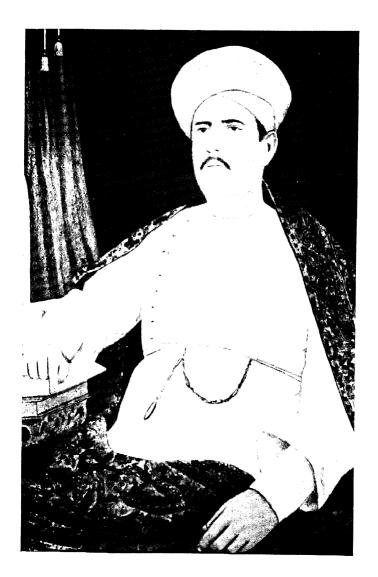
দ্বারকানাথ দত্ত।

প্রায়ই হাসিতে হাসিতে বলিতেন,—"বাড়ী শুদ্ধ লোক সবাই 'সধবার একাদশী' অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ ঠিক সেই সময়ই আমার মাতৃদেবীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। ঠিক যে সময়ে অভিনয় আরম্ভ হয়, সেই সময়েই আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার জন্ম থিয়েটার লগ্নে, আমি থিয়েটার করিব না তো থিয়েটার করিবে কে?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ পিতার তৃতীয় পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার জন্মের পর, ইঁহার জননী দুইটী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু তাঁহারা দুই জনেই অকস্মাৎ অকালে কালগ্রাসে পতিতা হন। এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পরেই অমরেন্দ্রনাথের জন্ম। সুতরাং তাঁহার জন্মে সদ্যঃকন্যাবিয়োগবিধুর পিতামাতার প্রাণে কতখানি শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এবং তাহার ফলে অমরেন্দ্রনাথ পিতামাতার বিশেষ "আদুরে" ছেলে হইয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাদের ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বিশেষ আদর-যত্নে লালিত পালিত হইয়া, দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

ইংরাজ কবি Wordsworth গাহিয়াছেন :—

The child is the father of the man.

অমরেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা এ উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখি যে, এমন বহু দেশপ্রাণ নেতা, বীর, বক্তা, রাজনৈতিক বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের শৈশবের ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে কি হইবেন, তাহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথেরও বাল্যে খেলা ছিল থিয়েটারী বা যাত্রার ঢংএ। একদিন তাঁহাদের চোরবাগানের বাড়ীতে যাত্রা হয়।

এই যাত্রার অভিনয় তাঁহার শিশু-মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে, তাহার অনুকরণে তীর ধনুক লইয়া খেলা করা ও যাত্রার নায়কদের অনুকরণে বীররসে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার শিশু জীবনের প্রধান কাম্য ও উপভোগ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। নিজের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন ঃ—

"আমার মনে পড়ে আমাদের বাড়ীতে তখন প্রায়ই সখের যাত্রা হইত। আমি নিবিষ্টমনে যাত্রা শুনিতাম। যাত্রার ভীম, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি মহারথিগণের অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিতাম। দেখিতে দেখিতে মনে ভাবিতাম কি সুন্দর! উপভোগ করিবার এমন মনোহর সামগ্রী বিশ্ব সংসারে আর কিছুই নাই! এইরূপ একদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। সেদিন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পালা হইতেছিল। আমি তখন আমার পিতার পার্শ্বে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিলাম। ক্রমে সেই দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে উঠিল না। আমি আর তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চীৎকার করিয়া পিতার উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'বাবা, বাবা, ইহাকে রক্ষা করুন!'

"এই দিনের যাত্রার অভিনয় আমার অন্তরের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাত্রার নায়কদের অনুকরণে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার বাসনা আমার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে আছে পূজার ভাসানের দিন মার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া লইয়া আমার নিজের জন্য ও বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের জন্য বাঁকারির তীর ধনুক কিনিতাম; উহা হইতে একখানি নিজে লইতাম

ও বাকিগুলি তাহাদের দিতাম। তারপর তাহাদের সকলকে লইয়া যাত্রার অনুকরণে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধের অভিনয় করিতাম। এই প্রকার যুদ্ধ ক্রীড়ায় একদিন বড়ই প্রমাদ ঘটিয়াছিল। আমার ধনুকের তীর একটী বালকের চক্ষুর একটু উপরে ললাটে গিয়া বিঁধিয়াছিল, আহত স্থান হইতে দরদরধারে রক্তস্রোত ছুটিয়াছিল, তাহার ফলে মা আমাকে এমন প্রহার দিয়াছিলেন যে, তাহার বেদনা আমাকে বহুদিন পর্য্যন্ত অনুভব করিতে হইয়াছিল।”

যাহা হউক, এই ভাবে খেলাধূলা করিয়া ও পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের অতি আদরে লালিত-পালিত হইয়া অমরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইল। ক্রমে পড়াশুনার বয়স আসিল, যথাসময়ে হাতে খড়ি হইল। স্কুলে যাইবার বয়স হইলে, পিতা দ্বারকানাথ অমরেন্দ্রনাথকে বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে কি হইবে, অমরেন্দ্রনাথের শিশু মন তখন নাট্যরসে ভরপূর। স্কুলে গিয়া, ক্লাসে দাঁড়াইয়া সহপাঠিগণের নিকট তিনি যাত্রার ভীমের অনুকরণে হাত পা ছুঁড়িয়া বক্তৃতা করেন, কখনও বা দুঃশাসনের রক্ত পান করেন,—আবার কখন কোন সহপাঠীর চুল টানিয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের অভিনয় দেখান। স্কুল হইতে ফিরিয়া বই ফেলিয়া, কোনক্রমে নাকে মুখে জলখাবার গুঁজিয়া ছাদের উপর গিয়া বাড়ীর সমবয়স্ক ছেলেদের লইয়া পুনরায় নাট্যচর্চ্চার ধূম দেখা যায়। পড়ার বইএর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু স্কুলে যাওয়া ও স্কুল হইতে আসার সময়টুকু মাত্র—তাও চাকরে বই বহিয়া লইয়া যায় আসে। বাড়ীর বয়স্ক পুরুষেরা কেহই দিনমানে বাড়ীতে থাকেন না, যে যাহার কাজে চলিয়া যান,—বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অমরেন্দ্রনাথের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

অবশ্য এ উদাসীনতার মূলে যথেষ্ট কারণও ছিল। একে পিতামাতার আদরের দুলাল,—তাহাকে অকস্মাৎ কটু কথা বলে বা কার্য্যের সমালোচনা করে, কাহার সাধ্য ; কাহারই বা মাথা ব্যথা পড়িয়াছে যে, "আব্দারে ছেলে"কে ভৎর্সনা করিয়া অনর্থক পিতামাতার বিরাগ-ভাজন হইবে! তাহার উপর, সুশ্রী, সুকুমার, প্রিয়দর্শন বালকের মিষ্ট কথায় ও ব্যবহারে সকলেরই মন মুগ্ধ ;—তাহা ছাড়া মিষ্ট স্বরে সে যখন আবৃত্তি সুরু করে, তখন সকলেরই কর্ণে মধু বর্ষিত হয় ; বারণ বা শাসন করা দূরে থাক্, তাঁহারা পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিয়া সকলকে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দর্শন করান। সকলেই তাহা দেখিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করেন, ভাবেন,—'আহা ছেলে মানুষ! হাসিয়া, খেলিয়া, আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে, বেড়াক্ না! এখন ত খেলিবারই বয়স! আবার লেখাপড়ার বয়স হইলে মন দিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করিলেই চলিবে।' সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের নাট্যচর্চ্চা অবাধে অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল।

কিন্তু স্নেহান্ধ হইলেও, অমরেন্দ্রনাথের জননী দেখিলেন যে, এই ভাবে ছেলেকে প্রশ্রয় দিলে, ছেলের আখেরের পথ একেবারে নষ্ট হইবে। আবার আপাতদৃষ্টিতে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রিয় পুত্রকে অযথা শাস্তি দেওয়াতেও পুত্রস্নেহাতুরা জননীর প্রাণে বিশেষ বাধিতে লাগিল। সুতরাং কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্র হীরেন্দ্রনাথের নিকট এ বিষয়ে সমস্ত গোচর করিয়া তাঁহাকেই ইহার যথোচিত বিহিত করিতে বলিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ সহোদর হইলেও দুইজনে একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত। একজন বাল্য হইতে আজীবন বিদ্যানুশীলনে,

ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনে ব্যস্ত,—অপরে বিদ্যাচর্চ্চার নামেই ভীত। হীরেন্দ্রনাথ সাংসারিক গণ্ডগোল হইতে দূরে থাকিয়া নিজের লেখা-পড়াতেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন, তাহা ছাড়া এই বয়সেই তিনি ধীর, স্থির, শান্ত, বিচক্ষণ, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষেত্রকর্ম্মসম্পাদনে অসাধারণ পটু। সেই জন্য তাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেই মানিয়া চলিত, ভয় করিত, কাহারও তাঁহার অবাধ্য হইবার শক্তি ছিল না। নৈতিক চরিত্রবলে যিনি বলীয়ান্, বিদ্যায় যিনি সবার অগ্রগণ্য (হীরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে দত্ত বংশে কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হয় নাই), পরিবারের মধ্যে তাঁহার এরূপ আধিপত্য বোধ হয় অসাধারণ নয়। তবে হীরেন্দ্রনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল- লোকের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ না করা। ভবিষ্যৎ জীবনে পারিবারিক জীবনে এরূপ অবস্থা বহু বার হইয়াছে, যে সময় হীরেন্দ্রনাথ অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অবস্থার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত ও হয়ত তাহার পরিণাম শুভই হইত, কিন্তু তিনি জীবনের আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই।

যাহা হউক, জননীর নিকট হইতে অমরেন্দ্রনাথের বিষয়ে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, হীরেন্দ্রনাথ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এ বিষয়ে পিতাকে জানান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ও তাঁহাকে লুকাইয়া ছিপাইয়া কিছু করা একান্ত অবিধেয়। সুতরাং তিনি জননীকে বলিলেন যে, "তুমি এ বিষয়ে সমস্ত কথা বাবাকে বল ; তাহার পর তিনি যদি আমাকেই এ বিষয়ে বিহিত করিতে বলেন, বেশ, তখন আমি আমার বিবেচনা মত যথোচিত করিব। কিন্তু বাবাকে না জানাইয়া, কিছু করা উচিত নহে। তাহা ছাড়া, বাবা যদি নিজেই

কালুকে বলিয়া কহিয়া শোধরাইতে পারেন, তাহা হইলে তো তাহার উপর কথাই নাই।”

অমরেন্দ্রনাথের বাল্যের ডাক নাম কালু।

দ্বারকাবাবু কিন্তু স্ত্রীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া হীরেন্দ্রনাথকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন,—বলিলেন, “হীরু, তোমার মার মুখে কালুর বিষয়ে যাহা শুনিলাম, এ ত চিন্তার কথা। এ বিষয়ে কি করা উচিত বলিয়া তোমার মনে হয়?”

হীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তাহাকে যেমন থিয়েটারের নেশায় পাইয়া বসিয়াছে ও সে যেমন লেখাপড়ায় অবহেলা করিতেছে বলিয়া শুনিতেছি, তাহা আমার নিকট ভাল বোধ হইতেছে না। এখন কাঁচা মন, এই বেলা ইহার বিহিত করিয়া, কালুর ঐ নেশা ছাড়ান উচিত—নচেৎ পরিণাম শুভ হইবে না। আমার মনে হয়, এখন বলিয়া কহিয়া ভাল কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক; কিন্তু তাহাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে আপনাকে কঠোর হইতে হইবে ও প্রয়োজন হইলে কঠিন শাস্তিরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

অমরেন্দ্রনাথ পিতার “আদুরে” ছেলে। পুত্র-বৎসল পিতৃপ্রাণ কঠোর হইবার কথায় শিহরিয়া উঠিল। দ্বারকাবাবু বলিলেন, “সে আমার দ্বারা কতদূর হইয়া উঠিবে, জানি না। তাহার চেয়ে এ’ বিষয়ে যাহা করিবার, তাহা তুমিই করিও।”

কিন্তু হীরেন্দ্রনাথ এ’ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। বলিলেন, “কালুকে আপনারা দুই জনেই বেশী আদর দিয়া নষ্ট করিতেছেন। সে যদি ভাল কথায় বা শুধু বকুনীতে না শোধরায়, তাহা হইলে কঠোর শাস্তি বিধান করার প্রয়োজন হইতে পারে। আপনি আমাকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু কালুকে

াস্তি দিতে দেখিলে, আপনিই হয়ত স্নেহান্ধ হইয়া সে শাস্তি রদ ৽রিবার হুকুম দিবেন। তেমন অবস্থা হইলে হিতে বিপরীত হইবার াম্ভাবনা। শোধরান দূরের কথা, সে আরও বিগড়াইয়া যাইবে।”

কিন্তু দ্বারকাবাবু বলিলেন, “না, তোমার বিবেচনা-শক্তির উপর মামার যথেষ্ট আস্থা আছে। তুমি যদি কালুর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দর বা তাহাকে মারধোর কর, তাহা হইলে আমি বুঝিব যে তাহা হাড়া তাহাকে শোধরাইবার অন্য কোন পন্থা নাই বলিয়াই তুমি সেই পথ অবলম্বন করিয়াছ। তোমাকে যখন এ বিষয়ের ভার দিতেছি, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার যে আমি আবার নিজে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না বা তোমার হুকুমের উপর নিজের হুকুম চালাইব না। তাহা ছাড়া, কালুর উপর সত্যই আমি যেমন স্নেহান্ধ, তাহাতে প্রয়োজন হইলে তাহাকে কঠোর শাসন করিতে আমি অক্ষম। এ ক্ষেত্রে তুমি যদি এ বিষয়ে অবহিত না হও, তাহা হইলে ছেলেটা একেবারে অধঃপাতে যাইবে। কালু তো আর তোমার পর নয়, সুতরাং সে অবস্থা যাহাতে না হয়, সে দিকে তো তোমার দৃষ্টি রাখা উচিত!”

পিতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথনের পর হীরেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—অমরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, বহু উপদেশ দিলেন। নয় বৎসর বয়স্ক অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ গম্ভীর-প্রকৃতি সংযতবাক্ মেজদাদার নিকট হইতে একসঙ্গে এত কথা শুনিয়া বেশ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল—মন দিয়া লেখাপড়া করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হীরেন্দ্রনাথও স্থির করিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে, অন্য কোন কঠোর আচরণের প্রয়োজন নাই।

২

কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। তাই সে সময়ে দ্বারকাবাবুর পারিবারিক জীবনে এমন গুটিকতক ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে অমরেন্দ্রনাথের উপর সতর্ক লক্ষ্য রাখার সঙ্কল্প হীরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত গৌণ কর্ম্মে পরিণত হইল। ঘটনাগুলি এই ঃ—

দ্বারকানাথের চোরবাগানস্থ পৈতৃক বাড়ী ও স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সমস্তই এতকাল যৌথ সম্পত্তিভুক্ত হইয়া অবিভক্ত অবস্থায় রক্ষিত ছিল এবং যদিও উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা নিজেরাই নিজেদের খরচ জোগাইতেন, তবুও সমগ্র পরিবার একরকম একান্নবর্ত্তী ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও দ্বারকানাথ পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক "রোজগেরে" পুরুষ ছিলেন, এবং যদিও সরকারী তহবিল তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে সর্ব্বাধিক পুষ্ট ছিল,—তবু সমগ্র পরিবারের বহু অযথা অত্যাচার ও অবিচার তাঁহারই উপর অবিরল ধারায় নিপতিত হইত। দ্বারকানাথ স্বীয় স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি বিনয় ও শ্রদ্ধাবশতঃ সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার নিজের বাসের জন্য ছিল তিনতলার ছাদে একটী কাঠের ঘর! পুত্রদের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর তাঁহার একটী ঘরে কুলায় না। তখন বহু দরবার করিবার পর আর একখানি ঘর তাঁহার দখলে আসিল। সেই ঘর ও নিজের শুইবার কাঠের ঘরে একটী partition দিয়া, দুইখানি ঘর করিয়া লইয়া, এই তিনখানি ঘরে তিনি কোন রকমে কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহযোগ্য বয়স হইল ও দ্বারকাবাবু সিমলা নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট নিবাসী প্রসিদ্ধ উকিল উদয়চাঁদ বসুর কন্যা মুক্তামালার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। এখন ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহের পর আর কোন রকমেই ঘরে সঙ্কুলান হয় না। অন্য লোকের দখলে বহু অব্যবহৃত ঘর

পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা নিজের অধিকার একচুলও ছাড়িতে রাজী নন। বহু আর্‌জী করিয়াও যখন ঘরের কোন প্রকার ব্যবস্থা হইল না, তখন দ্বারকানাথ স্থির করিলেন যে,—না, আর এ বাড়ীতে থাকা চলিবে না। পত্নীরও সেই মত দেখিয়া অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সঙ্কল্পের ফলে তিনি হাতীবাগানে একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া, সেখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইতে শুরু করিলেন। তদ্দর্শনে, চোরবাগানস্থ তাঁহার অন্য শরীকেরা মনে করিলেন যে, দ্বারকানাথ এবার বিষয় ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। এইরূপ বিশ্বাসের ফলে তাঁহারা দ্বারকানাথের প্রতি এরূপ বক্রোক্তি প্রয়োগ ও এমন কটু ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং পারিবারিক অশান্তি সে সময় এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, অমরেন্দ্রনাথকে সংশোধন করা বিষয়ে কাহারও খেয়ালই রহিল না।

যাহা হউক, পৈতৃক ভিটা ভাগ করার সঙ্কল্প কখনও দ্বারকানাথের কল্পনাতেও ছিল না। তাই জ্ঞাতিকুটুম্বদিগের নানাবিধ বক্রোক্তি নীরবে সহ্য করিয়া. হাতীবাগানের বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইবামাত্রই তিনি সপরিবারে একবস্ত্রে চোরবাগান হইতে চলিয়া আসিলেন। তদবধি তিনি কখনও কোন পৈতৃক সম্পত্তি পানও নাই, গ্রহণও করেন নাই অথবা দাবীও করেন নাই। দ্বারকানাথের এইরূপ নিঃস্বার্থ ব্যবহারে ও নিজেদের পূর্ব্ব ব্যবহারে জ্ঞাতিরা এতই লজ্জিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পরে দ্বারকাবাবুর নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

কৈশোর

অমরেন্দ্রনাথকে লইয়া দ্বারকাবাবু ও তাঁহার মধ্যম পুত্র হীরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়, তাহার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। নবম-বর্ষীয় অমরেন্দ্রনাথ এখন দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালক। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে, তাঁহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, হাতীবাগানে সুবিশাল অট্টালিকা তৈয়ারী হইয়াছে, দ্বারকাবাবু পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অমরেন্দ্রনাথকে চোরবাগান পাড়ার স্কুল ছাড়াইয়া, হাতীবাগান বাটীর নিকটস্থ আনন্দ লেন-স্থিত কটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—এবম্বিধ বহু ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ফলে সকলের জীবনের গতির ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের নাট্যানুরাগ পূর্ব্ববৎ বলবতীই আছে। মধ্যে কয়েক মাস মেজদাদার ভয়ে অন্তরের পিপাসা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া সুবোধ বালকের মত স্কুলে যাওয়া আসা ও একবার করিয়া সকাল সন্ধ্যায় পাঠ্য-পুস্তক লইয়া পড়িতে বসা চলিতেছিল বটে, কিন্তু সাংসারিক গণ্ডগোলের ফলে যখন মেজদাদার দৃষ্টি অমরেন্দ্রনাথ হইতে দূরে অন্যত্র অপসারিত হইল, তখন হইতে পড়াশুনা বন্ধ হইল, নাট্যচর্চ্চা পুনরায় পূর্ব্বের মত প্রদীপ্ত গতিতে চলিতে লাগিল। তবে হীরেন্দ্রনাথ সময় পাইলে
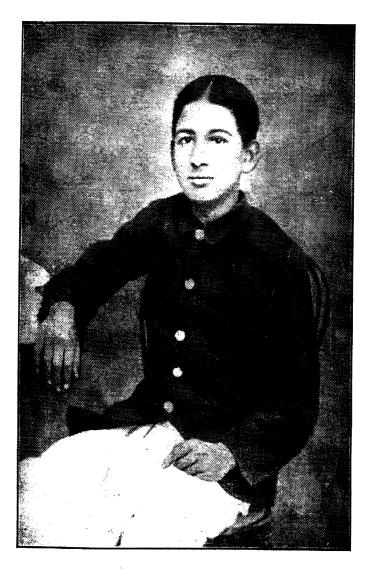
কৈশোরে অমরেন্দ্রনাথ।

মধ্যে মধ্যে লেখাপড়ায় অমরেন্দ্রনাথের কতখানি উন্নতি হইতেছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। কয়েকবার পরীক্ষার পর যখন তিনি দেখিলেন যে, বিদ্যার দৌড় পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে, একটুও অগ্রসর হয় নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন, হয়ত বা স্কুলের বদসঙ্গীর বা সেখানকার শিক্ষাপ্রণালীর দোষে অমরেন্দ্রনাথের কোন উন্নতি হইতেছে না। তাই কোন শাস্তি বিধানের পূর্ব্বে তিনি কটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে ছাড়াইয়া অমরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টি-টিউসনে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

কটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে পাঠকালে অমরেন্দ্রনাথের জীবনের দুই একটা বাল্যকথা, তাঁহার সহপাঠী রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় "নাট্যমন্দিরে" লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার রচনা হইতে সে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"অমরেন্দ্রনাথ আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। কটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের এক শ্রেণীতে আমরা উভয়ে পাঠ করিতাম। তখন উক্ত বিদ্যালয়টী হাতীবাগানে অমরেন্দ্রনাথের নূতন পৈতৃক বাটীর পশ্চাৎ ভাগে একটী ক্ষুদ্র গলির মধ্যে অবস্থিত ছিল। বাল্যকালের কথা, বহুদিন আমি ভাবি নাই এবং হঠাৎ যে তাহা এমন ভাবে ভাবিতে হইবে, তাহাও আমার কল্পনায় আদৌ উদয় হয় নাই।

"বাল্যস্মৃতি বড় মধুর। সম্মুখে শূন্যগর্ভে সে স্মৃতিচিত্র অঙ্কিত করিলে প্রাণ পুলকিত হয়; ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত একাগ্রচিত্তে সেই পুরাতন স্মৃতি স্মরণ করিলে, স্তবকে স্তবকে কত কথা ফুটিয়া উঠিয়া, হৃদয় ভরিয়া যায়; তখনকার হাসিকান্না, তখনকার সুখদুঃখ যেন সম্যক্ উপলব্ধ হয়।

"এই স্থানে আমাদের সেই বাল্যকালের দুই একটা কথা না বলিয়া

থাকিতে পারিলাম না। “মহেন্দ্র” নামে পূর্ব্ববঙ্গের একটী বালক আমাদের সহপাঠী ছিল। সে—“কালু তোমায় ভালবাসি, তাই তোমারে দেখতে আসি”, এই ছত্রটি অমরেন্দ্রনাথের মুখের কাছে নানারূপ ভাঙ্গাস্থরে রঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিত। মহেন্দ্রের এই রঙ্গভঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ তেলে বেগুনে জ্বলিয়া যাইত এবং “দূর হ, বাঙ্গাল, ছোট লোক” ঈদৃশ সাদর সম্ভাষণে তাহাকে আপ্যায়িত করিতে ছাড়িত না। অমরেন্দ্রনাথ আঙুল কামড়াইয়া রাগে ফুলিতে থাকিত। অবশেষে আমি মহেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া—“বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে, ল্যাজের নাই কিন্তু”, এই কথা বলিলে তাহার ক্রোধের উপশম হইত; মুহূর্ত্ত মধ্যে জল হইয়া গিয়া, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত। আহা—কি সে মধুর বাল্যলীলা!

“নাহি জানি ভাই রে লক্ষ্মণ! এই কি রে রাজ্য-স্থখ?” এই পংক্তিটি অমরেন্দ্রনাথের মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। তাহার তখনকার সেই বাল্যস্থলভ চপলতাবশতঃ নাটকীয় রসাস্বাদন, কালে কিরূপ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন, তাহার প্রতিভা যে নাট্যজগতে কতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরিচয় অনাবশ্যক।”

যাহা হউক, স্কুল পরিবর্ত্তনে অমরেন্দ্রনাথের নাট্যানুশীলনের কোন-প্রকার ব্যাঘাত ঘটিল না। বরঞ্চ একদিন তাঁহাদের চোরবাগানের পুরান বাটীতে “বেঙ্গল থিয়েটারে”র অভিনয় দেখিয়া কিশোর মনে এরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, যে তাহার বর্ণনা আমরা নিজের ভাষায় না করিয়া অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

“ক্রমে পড়াশুনার বয়স আসিল,—স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়াশুনা

চলিতে লাগিল। আমার আগ্রহ কিন্তু ঐ সকল নাটকীয় খেলাধূলার দিকে। সেই যাত্রার ভীম ও দুর্য্যোধনের অনুকরণে বীররসাত্মক আস্ফালন আমার বাল্য-জীবনের খেলাধূলার অকৃত্রিম নিদর্শন। অন্য কোন প্রকার খেলার দিকে আমার আদৌ আগ্রহ ছিল না। অবসর-কালে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের পড়াশুনার দিকে মন যাইত না। কিন্তু যদি নাটক পাইতাম, আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করিতাম এবং পাছে কেহ তাহা জানিতে পারিয়া তিরস্কার করে এই আশঙ্কায় ত্রিতলের ছাদের উপর গিয়া গোপনে তাহা পাঠ করিতাম। জলপানির পয়সা বাঁচাইয়া কেবল নাটক কিনিতাম ও এই ভাবে তাহা পাঠ করিতাম।

"ইহার পর হাতীবাগানে আমাদের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইল। আমরা নূতন বাটীতে আসিলাম। বাটীর অনতিদূরে ষ্টার থিয়েটারের নূতন বাটী তখন প্রস্তুত হইতেছিল। স্কুলের ছুটী হইলে বাড়ী আসিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়াই আমি গোপনে এই বাটীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতাম। প্রগাঢ় আগ্রহ সহকারে উক্ত থিয়েটার বাটী দেখিতাম—দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম, কত কি ভাবিতাম। তখন আমার মনে হইত এই বাটীর সহিত যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের—যুগ-যুগান্তরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। যখনই আমি ফাঁক পাইতাম, তখনই এই বাটীর নিকট পলাইয়া আসিতাম ও কত কি ভাবিতাম।

"ইহার অল্পদিন পরেই আমাদের চোরবাগানের বাটীতে একটী উৎসব উপলক্ষে "বেঙ্গল থিয়েটার" অভিনয়ার্থ আহূত হয়। আমরা সকলেই সেখানে গিয়াছিলাম। অভিনয়ের পালা ছিল—"দুর্ব্বাসার পারণ" ও "স্বাধীন জেনানা"। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও থিয়েটার দেখি নাই। মনে আছে যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘটক ভীম, মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদূষক, গণেশচন্দ্র ঘোষ দুর্য্যোধন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নেদারু গিরিশ)

শকুনি, বর্ত্তমান বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারীর মাতা সাজিয়াছিলেন—দ্রৌপদী, কালীকিঙ্কর মল্লিক—যুধিষ্ঠির ও চিত্ররথ, বেঙ্গল থিয়েটারের লেখক ও বিজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যক্ষ কুঞ্জবিহারী বসু দুর্ব্বাসার শিষ্য সাজিয়াছিলেন। শিষ্যরূপী কুঞ্জবিহারীর রসিকতা এখনও আমার স্মরণ আছে। একটী দৃশ্যে শিষ্য দুইটী বাহির হইলেন,—প্রথম শিষ্যটী বলিলেন, "ঠাকুরটীর সবই উল্টো।"

"দ্বিতীয় শিষ্য (কুঞ্জবাবু) উত্তর দিলেন, "পা'টা শুদ্ধ।"

"সেই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন। সে অভিনয় আমার কত মনোরম লাগিয়াছিল! যেন এখনও আমার চক্ষুর উপর বিরাজমান রহিয়াছে! যে সকল অভিনেতৃদের নাম করিলাম, ইঁহারা সকলেই তখনকার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

"দুর্ব্বাসার পারণ" অভিনয় দেখিবার পর হইতেই, উক্ত নাটকখানি পড়িবার ইচ্ছা আমার অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। আমার বয়স তখন ১৩ বৎসরের মধ্যে। আমি তখন মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে পড়িতেছিলাম। একদিন স্কুল হইতে ফিরিবার সময় গাড়ী থামাইয়া গুরুদাসবাবুর দোকানের ভিতর ঢুকিয়া উক্ত নাটকখানির কত মূল্য তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম উক্ত পুস্তকখানা স্বতন্ত্র পাওয়া যায় না। উহা রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। যে খণ্ডে ঐ গ্রন্থখানি আছে, সেই খণ্ডের মূল্য দুই টাকা। সেই সময় দুইটী টাকা একত্রে সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ আমাদের হাতে যাহাতে পয়সাকড়ি না পড়ে, সেদিকে পিতার ও মেজদাদার (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং মেজদাদার শাসনও অত্যন্ত কঠোর ছিল। দৈনিক চারিটী পয়সা করিয়া আমার হাত খরচের জন্য বরাদ্দ ছিল। তাহাতে চানাচুরই খাও

আর জীবে গজাই খাও, কারণ এই দুইটী জিনিষ সে সময় আমার অত্যন্ত মুখরোচক ছিল।

"দুই টাকার কমে পুস্তক পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়ই বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কেমন করিয়া দুইটী টাকা সংগ্রহ করিব সেই চিন্তায় অধীর হইলাম। বহুক্ষণ চিন্তার পর একটী উপায়ও স্থির হইল। আমার মাতাঠাকুরাণীর বিছানার নীচে টাকাকড়ি গুঁজিয়া রাখা অভ্যাস ছিল। বাজার করিয়া বা নোট ভাঙ্গাইয়া ভৃত্যেরা যে টাকা তাঁহার হাতে ফেরৎ দিত, তিনি অমনি তাহা বাক্স পেঁটরায় না রাখিয়া বিছানায় তোষকের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া দিতেন। আমি তাহা জানিতাম, সময়ে সময়ে লক্ষ্যও করিতাম। চিন্তার ফলে এই উপায়টী এক্ষণে আমার মনে উদিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ মাতার বিছানা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিছানার তলদেশ হইতে পাঁচটী টাকা খুঁজিয়া পাইলাম। আমি সেই টাকা হইতে দুইটী টাকা লইয়া অতি সন্তর্পণে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরদিন স্কুলের ছুটীর পর গুরুদাসবাবুর দোকান হইতে দুই টাকা দিয়া একখানা "দুর্ব্বাসার পারণ" ক্রয় করিয়া মহোল্লাসে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিনই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।"

সেই হইতে অমরেন্দ্রনাথের লেখাপড়া করা বা স্কুলের পাঠ্য পুস্তক পাঠ একেবারে ঘুচিয়া গেল। নিজের জলপানির পয়সা বাঁচাইয়া, কখনও বা মার কাছ হইতে আবদার করিয়া পয়সা আদায় করিয়া তিনি ঘন ঘন নাটক কিনিতে লাগিলেন ও তৎপাঠে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চোরবাগানে এক বৃহৎ সংসার ছিল—এত বৃহৎ যে সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়াই দুর্ঘট দাঁড়াইয়াছিল;

ফলে সেখানে নির্জ্জনতার আশা করা বাতুলতা মাত্র, সকলের চোখ এড়াইয়া কিছু কাজ করার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু হাতী-বাগানে বৃহৎ বাটী, অথচ ক্ষুদ্র পরিবার—তিন তলার ছাদ হইতে আস্তাবল বাড়ী পর্য্যন্ত কোথাও নির্জ্জন স্থানের অভাব নাই। অমরেন্দ্রনাথ কি করিতেছেন, না করিতেছেন, তাহা তদারক করিবার কেহ নাই। ভয় বা সমীহ করিয়া চলিবার মধ্যে একমাত্র মেজদাদাকে। তা, তখন তিনি পরীক্ষার পড়া লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। তাহা ছাড়া, হাতীবাগানে আসিবার কয়েক মাস পরেই পটলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশের বংশধর প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতীর সহিত হীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। অমরেন্দ্রনাথ এ সুযোগের অপব্যবহার করিলেন না,—লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, যাহা খুসী তাহাই করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিন্তু "চোরের দশ দিন, সাধুর একদিন!" অমরেন্দ্রনাথের পাঠে এত অবহেলা, ক্রমশঃ সমস্ত পরিজনবর্গের নজরে আসিতে লাগিল। প্রথমেই তাঁহার জননী এ বিষয়ে জানিতে পারিলেন। অমরেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তি ছিল অপরিসীম। তাই মাতা যখন তাঁহাকে ডাকাইয়া পড়াশুনার কথা পাড়িলেন, অমরেন্দ্রনাথ মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেন না, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মাতার নিকট সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। জননী অনেক ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—"বড় ঘরের ছেলে, দিন রাত থিয়েটারের বই লইয়া হৈ হৈ করিলে ত চলিবে না; লেখাপড়া শিখিতে হইবে, রোজগার করিতে হইবে, মানুষ হইতে হইবে। হাভাতের ঘরের ছেলের মত শেষে কি তুমি একটা কেলেঙ্কারী করিবে, বংশের নাম ডুবাইবে! এখন আর তুমি কচি খোকাটী নও, বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করা উচিত। যাহা হউক,

এইবার আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি; কিন্তু আবার যদি তোমার লেখাপড়ায় গাফিলতি দেখি, তাহা হইলে তোমার মেজদাদাকে এ বিষয় জানাইতে দ্বিধা করিব না।”

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ মাতাকে ভালই বাসিতেন, ভক্তিই করিতেন, ভয় করিতেন না। ফলে মাতার উপদেশ ও ভৎর্সনায় কোন ফল হইল না। তখন সমস্ত ব্যাপার হীরেন্দ্রনাথের গোচর করা হইল। তিনিও অনুজকে “রুলের” আঘাতে রীতিমত উত্তম মধ্যম দিয়া শাসন করিলেন, কিন্তু “চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী”। ভ্রাতার কঠোর শাসনেও অমরেন্দ্রনাথের চৈতন্যের উদয় হইল না বা স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না—যথাপূর্ব্ব নাটক পাঠ ও আলোচনা চলিতে লাগিল। এই ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন, স্বর্গীয় চুণিলাল দেব ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীনিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। ইঁহারা মামার বাড়ীর সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় হইতেন।

প্রহারের ফলে যদিও অমরেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া করিবেন বলিয়া মেজদাদার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কার্য্যতঃ কিন্তু তাঁহাকে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষণে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া হীরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিরক্ত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে খুব চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শেষে একদিন তিনি অমরেন্দ্রনাথের বক্ষের শোণিততুল্য প্রিয় সেই নাটকের রাশি, যাহা অমরেন্দ্রনাথ কখনও বা জলপানির পয়সা বাঁচাইয়া, কখনও বা,—সৎ বা অসৎ,—অন্য উপায়ে বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বাটীর উঠানে একত্র স্তূপীকৃত করিয়া, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। অমরেন্দ্রনাথের নিজের চক্ষের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় সাধের নাটকাবলী ভস্মীভূত হইয়া গেল। ইহাতে তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন

যে, সে রাত্রে তিনি কিছুই না খাইয়া সারারাত নয়নের জলে উপাধান সিক্ত করেন। উত্তরকালে অমরেন্দ্রনাথ বলিতেন,—"মেজদাদা যে আমাকে একদিন 'রুলের' আঘাতে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়াছিলেন, তাহাতে আমার তত কষ্ট হয় নাই বা তাহাতে প্রাণে তত ব্যথা পাই নাই; কিন্তু যেদিন তিনি আমার বড় সাধের বইগুলি পুড়াইয়া দিলেন, সেই দিন দৈহিক আঘাত না পাইলেও আমার মানসিক যন্ত্রণা এত প্রবল হইয়াছিল, যে তাহা বর্ণনাতীত। সারারাত বালিস আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমি কেবল কাঁদিয়াছিলাম।"

যাহা হউক, পড়াশুনার প্রতি মনঃসংযোগ করাইতে মেজদাদাকে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ নাট্যচর্চ্চায় খানিকটা ক্ষান্তি দিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। তাঁহার বিধান—অমরেন্দ্রনাথ নট হইবেন; সুতরাং মানুষের শত চেষ্টাতেও তাহার অন্যথা হইবে কেন? তাই দেখি, যখনই অমরেন্দ্রনাথের নাট্যসাধনায় একটু ভাঁটা পড়ে, যখনই অমরেন্দ্রনাথ সুশীল সুবোধ বালকের মত লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করেন, তখনই তাঁহার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে তাঁহার নাট্যসাধনা পুনরায় প্রদীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না।

এ বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিতেছেন ঃ—

"ইহার কিছুদিন পরে ষ্টার থিয়েটার খোলা হইল। প্রথম রজনীতে গিরিশচন্দ্রের নসীরামের অভিনয়। বাটীর নিকটেই নূতন থিয়েটার নূতন উৎসবে খোলা হইবে, সুতরাং আমাদের বাড়ীর অনেকেই সেদিন থিয়েটার দেখিবার জন্য উৎসাহান্বিত। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বক্স রিজার্ভ করিতে পাঠাইলেন। আনন্দ ও উৎসাহে

আমার অন্তর নাচিয়া উঠিল। আমি আমার পিতার 'আবদারে ছেলে' ছিলাম, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আমি তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া বসিলাম, বলিলাম,—'মেজদাদাকে বলিয়া দিন আমি আজিকার মত থিয়েটার দেখিতে যাইব।'

"পিতাঠাকুরের নিকট একবার দরবার করিলাম, তাহার পর মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া তাঁহাকেও ধরিলাম। মেজদাদা ত' কিছুতেই সম্মত নন—আমি থিয়েটার দেখিতে যাই, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয়। অনেক কান্নাকাটি সুপারিস ইত্যাদির পর তিনি অনুমতি দিলেন।

"সেদিন শুক্রবার, মনে আছে সেদিন ফুলদোল। হাতীবাগানের বাড়ীতে ষ্টারের প্রথম অভিনয় রজনী। আমরা অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। রঙ্গালয়ের সাজ সজ্জা ইন্দ্রালয় তুল্য। নয়ন-মন-বিভ্রমকারী সুরম্য ভবন, অসংখ্য অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকমালা ও সুপরিচ্ছদধারী নানা শ্রেণীর সহস্র সহস্র শ্রোতার সমাগম প্রভৃতি দেখিয়া আমি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইলাম। ভাবিলাম আমি কোথায় আসিয়াছি! এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, নয়নাভিরাম এমন উজ্জ্বল দৃশ্য এই প্রথম আমার চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হইল। ভাবিলাম যবনিকার বাহিরে রঙ্গপীঠেই যখন এত মাধুরী, না জানি যবনিকার অভ্যন্তরে—রঙ্গমঞ্চে আরও কত অপার্থিব দৃশ্য-লহরী প্রচ্ছন্ন আছে।

"আমার মনে আছে এই দিন অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বনাম-খ্যাত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টেজের উপর দর্শন দিলেন। একটী শাদা পাঞ্জাবী তাঁহার গায়ে ছিল। সহস্র সহস্র দর্শকের কৌতূহলোদ্দীপক লোচন তাঁহার উপর নিপতিত হইল। অমৃত বাবু একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এই কবিতাটী মদ্রিত

হইয়া সমাগত দর্শকগণের মধ্যেও বিতরিত হইয়াছিল। যদিও এখন তাহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রথম কয়েকটী ছত্র আমার বেশ স্মরণ আছে। কবিতাটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উক্ত কবিতাটী এখন আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এমন সুন্দর কবিতার যতটুকু অংশ সংরক্ষিত করা যায় তাহাই লাভ বলিয়া মনে করি। যে কয় ছত্র আমার স্মরণ আছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

হে সজ্জন! পদে নিবেদন,
নির্ব্বাসিত মনোদুঃখে,
বঞ্চিলাম অধোমুখে,
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব যুগল চরণ;
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ,
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন। *

---

* উত্তরকালে সমগ্র কবিতাটী অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "গিরিশচন্দ্র" পুস্তকে উদ্ধৃত হয়। কৌতূহলী পাঠকবর্গের জন্য আমরা কবিতাটীর বাকী অংশ নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

স্বাগত সুজন!
করে দাস—করুণা প্রয়াস,
রসবশে গুণাকর, ভুল' দোষ, গুণ ধর'—
তব পূজা আশৈশব উচ্চ অভিলাষ!
পারি হারি না বুঝি আভাষ,
হয় সনে দ্বন্দ্ব করে ত্রাস
পূরিবে কি আশ?
অভিনয় ইতিহাস কয়—
দেশ ভেদে নানা মত, যে জাতি যে রসে রত,
আদি, হাস্য, বীভৎস, শোণিত কোথা বয়,
হিন্দুপ্রাণ কোমলতাময়,
ধর্ম্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়,—
ধর্ম্ম-রঙ্গালয়!

"ইহার পরবর্ত্তী ছত্রগুলি আর আমার মনে নাই। অতঃপর অভিনয় আরম্ভ হইল। এক বটবৃক্ষমূলে—নানা রঙের পোষাক পরিয়া কুর্দ্দো কুর্দ্দো মর্দ্দ মত—তাড়ীর ঝারা লইয়া

'রুপিয়া লুকিয়ে রেখেছ কোথা পা;
তুমি অমন করে শুঁড়ীর ঘরে
পায়ে ধরি আর যেও না।'

বলিয়া বিকট স্বরে গান ধরিল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—নসীরাম, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র—অনাথনাথ, ৺অঘোরনাথ পাঠক—কাপালিক, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)—শম্ভু, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—ভূতনাথ, উপেন্দ্রনাথ মিত্র—রাজা, ৺মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী—মন্ত্রী এবং অভিনেত্রীদিগের মধ্যে ৺গঙ্গামণি—সোনা, ৺কাদম্বিনী—বিরজা এবং ৺হরিমতী—মাধুরীর (এই অভিনেত্রী জীবিতা থাকিলে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সুগায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইতেন) ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"নসীরাম নাটকখানি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা বটে, কিন্তু সে সময় তিনি ৺গোপাললাল শীলের "এমারেল্ড" থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং অন্য রঙ্গালয়ে প্রকাশ্যভাবে কোন বই দেওয়া তাঁহার সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু শিষ্য ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ গিরিশচন্দ্র খালধারে খোলার ঘর ভাড়া করিয়া লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া অতি গোপনে এই নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাছে গোপাললাল শীল জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীলোক সাজিয়া গভীর রাত্রে এই বই লিখিতেন। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আসিয়া এই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন।"

নসীরাম খোলা হয়—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে; অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে

পড়িয়াছেন। কিন্তু এই দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে নসীরামের অভিন
কেমন যেন বিভ্রান্ত করিয়া দিল, কি এক নেশায় যেন মাতাল করিয়
তুলিল; অমরেন্দ্রনাথ কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন; তি
চারি দিন কেমন যেন ঘোরের ভাবে কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ ধীরে
ধীরে অমরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল—নট হইবার এ
অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এ প্রবল বাসনা আত্মীয়-স্বজন কাহাকে
জানাইবার উপায় নাই; এ কামনা চরিতার্থ করিবার কোন আ
নাই। কে তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিবে—কে তাঁহার এম
ভাবে অধঃপাতে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে! তখনকার দি
সমাজে অভিনেতার স্থান ছিল না, অভিনেতার নামে সকলে নাসি
কুঞ্চিত করিতেন, অভিনেতারা সমাজের সর্ব্ব নিম্ন স্তরের জীব ছিলে
অমরেন্দ্রনাথ উচ্চ বংশের সন্তান, কেমন করিয়া তিনি এমন
জীবিকা অবলম্বন করিবেন! এ অবস্থায় তাঁহার মনের কথা জানি
পারিলে, না জানি কি বিপত্তিই না হইবে! সকলে না জানি
ভর্ৎসনাই না করিবে—কত প্রকার মন্তব্যই না প্রকাশিত হই
উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, এমন কুকাজ হইতে বিরত করিবার ব
সকলে তৎপর হইবে। তাহা ছাড়া, সংসারে পূজ্যপাদ জনক জ
রহিয়াছেন, অপরিসীম স্নেহে ও যত্নে এতকাল তাঁহারা তাঁহ
লালন পালন করিলেন, মর জগতে সাক্ষাৎ দেবদেবীতুল্য তাঁহা
না জানি এমন কথা শুনিলে তাঁহাদের প্রাণে কত ব্যথাই না বা
এমন কাজ করিলে না জানি তাঁহাদের মাথা কতখানিই না
হইবে!

শুধু তাই নয়, একজন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালককে কেই বা ন
রঙ্গালয়ে নিযুক্ত করিবে? পিতৃমুখাপেক্ষী বালকের সে ক্ষমত

স্বাধীন সত্তাই বা কোথায়, যে সে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ঘৃণা ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদের সকলের আপত্তি সত্ত্বেও থিয়েটারে প্রবেশ করে! এইরূপ বহু ভাবিয়া চিন্তিয়া, কয়েকদিন ধরিয়া দুস্তর চিন্তা-সমুদ্রে নাকানি চোবানি খাইয়া, অমরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে,—'নাঃ! এখন যে ধারায় জীবন চলিতেছে, চলুক—যদি ভগবান্ দিন দেন, তাহা হইলে দেখিব মনের এ অদম্য বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি কি না?'—প্রদীপ্ত পাবক সম নাট্যসাধনার আকুল আকাঙ্ক্ষা কোন রকমে ছাই চাপা দিয়া আবার তিনি লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ করিলেন; ইচ্ছা,—যত শীঘ্র সম্ভব ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া দশজনের একজন হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা। তখন দেখিবেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়!

কিন্তু মন সে কথা বোঝে কৈ? প্রবল নাট্যতৃষা থাকিয়া থাকিয়া মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তখন কিছুদিনের জন্য আবার তিনি উন্মনা হইয়া যান। তেমন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার মনের কথা তাঁহার এক পার্শ্বচরকে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পার্শ্বচরের মুখে নট হইবার যে উপায় শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মন বিলক্ষণ খারাপ হইয়া গেল।

অমরেন্দ্রনাথের মুখে অভিনেতা হইবার বলবতী ইচ্ছার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বন্ধু আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—"এ আর এমন কি শক্ত কাজ! তুমি বড়লোকের ছেলে, একটা থিয়েটার খোল, তাহা হইলেই 'অ্যাক্টর' হইতে পারিবে।"

বালক হইলেও অমরেন্দ্রনাথ ভাবিয়া দেখিলেন,—বন্ধু যতই আস্ফালন করিয়া অতি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন না কেন, কাজে থিয়েটার খোলা অত সহজ ব্যাপার নহে। থিয়েটার কেমন করিয়া খুলিতে হয়, কেমন করিয়া চালাইতে হয়, তাহার জন্য কি কি

প্রয়োজন, এ সমস্ত তাঁহার ধারণাতীত। আর যাহা কিছু লাগুব না লাগুক—অন্ততঃ তাহার জন্য অর্থের যে প্রয়োজন, এ বিষয়ে কো সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতা বিদ্যমান, অমরেন্দ্রনাথ বালক, সুতরাং তি অর্থ সংগ্রহই বা করিবেন কোথা হইতে ?

সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ একেবারে "মুষ্‌ড়াইয় পড়িলেন। বর্ত্তমানে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন উপ খুঁজিয়া না পাইয়া, অগত্যা তিনি যথাসাধ্য মন দিয়া লেখাপড়া করি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মনে মনে পণ করিলেন,—'যেমন করি হউক্, ভবিষ্যৎ জীবনে একজন অভিনেতা হইবই হইব, অভিনয়-কা জীবনের ব্রত করিবই করিব!'

তখন তিনি মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের চতুর্থ শ্রেণীর ছা যথাসময়ে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বাংলায় তাঁহাদের পাঠ্যপু ছিল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাস। প্রতিষ্ঠিত প্র+স্থা+তঃ, শাসনগুণে=অধি ৭মী, সমৃদ্ধি=সং+ঋধ+ যাদৃশ=যদ্+দৃশ্+টক্, ক্রিয়া=কৃ+শ, বিনোদন=বি+বনুজ+ ধুরন্ধর=ধুর+ধৃ+খ, উৎসব=উৎ+সু+অল, বিরক্ত=বি+রন্‌জ+ ইত্যাদি বিবিধ পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া, ভাল ছেলের লেখাপড়ায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।*

---

* অমরেন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত ঐ সমস্ত নোট-সহ সেই পাঠ্যপুস্তক "সীতার বন এখনও তাঁহাদের বাটীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—————:*:—————

পিতৃবিয়োগ, নৈতিক অধঃপতন ও বিবাহ

গত দুই অধ্যায়ে, অমরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর আলোচনা করিতে করিতে আমরা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এই সাল অমরেন্দ্রনাথের জীবনে একটী সঙ্কটময় বৎসর।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, অমরেন্দ্রনাথকে নাট্যসাধনায় নিযুক্ত করা। অমরেন্দ্রনাথেরও দৃঢ় পণ—অভিনয়কার্য্য জীবনের ব্রত করিবেন। তাই বোধ হয় বিধাতা যখন দেখিলেন যে, নানা বাধাবিপত্তির জন্য অমরেন্দ্রনাথ নাট্যানুশীলনে পরাঙ্মুখ, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, সে সমস্ত বিঘ্ন চিরতরে দূর করিয়া দিয়া অমরেন্দ্রনাথের আবাল্য বাসনা চরিতার্থ করাইবেন। তাই বোধ হয় তিনি পিতা দ্বারকানাথকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া, অমরেন্দ্রনাথের অভিনেতা হইবার পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। তখন দ্বারকানাথের মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়স। সুতরাং সাধারণ মানুষের আয়ুঃ বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, ওপারের ডাক আসিবার সময় তখনও তাঁহার হয় নাই। কিন্তু বিধির বিধানে মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে অমরেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হইলেন।

দ্বারকাবাবু কিছুদিন হইতে উদরী রোগে ভুগিতেছিলেন। তাই তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্রনাথকে রেলির বাড়ীর মুৎসুদ্দির পদে বসাইয়া

দিয়া, স্বয়ং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র হীরেন্দ্রনাথ তখন বি, এ, পরীক্ষার পাঠ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অমরেন্দ্র-নাথের স্কুলের 'সেশন্' সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, সুতরাং পড়াশুনার বিশেষ চাপ নাই।

এমন সময়ে দ্বারকাবাবুর অসুখ হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। হীরেন্দ্রনাথ পিতৃভক্ত পুত্র—পিতার রোগ-বৃদ্ধিতে চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। একে আসন্ন পরীক্ষার পড়া, তায় মুমূর্ষু পিতার রোগের সেবা—তিনি কলেজ যাইবার সময়টুকু ছাড়া, বাকী সমস্তক্ষণ পিতার নিকট বসিয়াই যাপন করেন, সেইখানে বসিয়া পড়িতে পড়িতেই বাবাকে ঔষধপত্র খাওয়ান। স্নানাহারের পর্য্যন্ত সময়ের অভাব—সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের বিষয়ে খোঁজ লইবেন কখন, তাঁহাকে শাসন করিবেনই বা কখন? এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অমরেন্দ্রনাথও পড়াশুনা ত্যাগ করিলেন,—এমন কি স্কুলে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। শুধু তাই নয়, কুসঙ্গীর সংসর্গে পড়িয়া নানাবিধ কু-অভ্যাসে রত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ হীরেন্দ্রনাথের কানে আসিয়া পহুঁছিল। মেট্রো পলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষ, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অমরেন্দ্রনাথে স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার অভিভাবক হিসাে হীরেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন। হীরেন্দ্রনাথ তো আকাশ হইে পড়িলেন! পরদিন কলেজ যাইবার পথে স্কুলে গিয়া সমস্ত খব লইলেন। শুনিয়া বুঝিলেন, অমরেন্দ্রনাথের নাট্যরোগ প্রায় দুশ্চিকিৎ ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। একে পিতার দুরারোগ্য রোগ, ত ভ্রাতার এই কুকীর্ত্তির ইতিহাস! হীরেন্দ্রনাথের মেজাজ একেবা সপ্তমে চড়িয়া গেল। ভীষণ বিরক্ত অন্তঃকরণ লইয়া বৈকালে বাড়ীে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি অমরেন্দ্রনাথের সংবাদ লইলেন। শুনিলে

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,

এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস, বেদান্তরত্ন।

তখন আস্তাবল বাড়ীতে তাঁহার নাট্যচর্চ্চার ধূম চলিতেছে। রুদ্র-মূর্ত্তিতে মেজদাদাকে আস্তাবলে সমাগত দেখিয়া, বন্ধুবান্ধব যত ছিল, যে যেখানে পারিল, পলাইল,—কেহ বা গাড়ীর মধ্যে বা পশ্চাতে গিয়া লুকাইল। হীরেন্দ্রনাথ আজ দুষ্ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর। অমরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া আনিয়া বাড়ীর উঠানে লোহার থামের সহিত বাঁধিয়া দিলেন, গায়েও যে দুই এক ঘা চড় চাপড় না পড়িল, তাহা নহে। শাস্তিটা হয়ত একটু বেশী কঠোরই হইল। রাত্রে খাবার বন্ধ করিবার অনুজ্ঞা দিয়া, তিনি হাত মুখ ধুইতে উপরে চলিয়া গেলেন।

কথাটা দ্বারকাবাবুর কানে উঠিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। হীরেন্দ্রনাথ যখন যথারীতি পিতার নিকট আসিয়া বসিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। পিতার রোগের অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন নাই। এ রুগ্ন শরীরে অমরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তিকলাপের বিষয় তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করার ইচ্ছা হীরেন্দ্রনাথের আদৌ ছিল না। কিন্তু পিতা যখন স্বয়ং সে কথা পাড়িলেন, তখন তিনি অমরেন্দ্রনাথের বিষয়ে যে সমস্ত কথা স্কুলে বা লোকপরম্পরা মুখে শুনিয়াছিলেন, সমস্তই নিবেদন করিলেন। দ্বারকাবাবু সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন,—"হীরু, যে ছেলে উচ্ছন্নে যাইবে, তাহাকে তুমি শত শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলেও, ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। অনর্থক মারধোর করিয়া ফল কি? আমি কিছুদিন হইতে কালুর যে হাবভাব লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে যে সে বাগ মানিবে, এরূপ আমার মনে হয় না।"

হীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি আমাকে কি করিতে উপদেশ দেন? আমি কি চক্ষের সম্মুখে ভাইকে অধঃপাতে যাইতে

দেখিব, অথচ কিছু বলিব না—মৌনতার দ্বারা তাহার অপকীর্ত্তির প্রশ্রয় দিব ?”

পিতা বলিলেন, “উপায় কি ? কালু ত' এখন কচি নয় ! সে যদি নিজের ভুল নিজে না বুঝিতে পারে, কেবলমাত্র তাড়নাতেই কি তাহার সংশোধন হইতে পারে ? তুমিও তো এতদিন ধরিয়া তাহাকে শোধরাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলে, কৃতকার্য্য হইলে কি ? তাহা ছাড়া বুঝিয়া দেখ, বর্ত্তমান তাড়নার ফলে কালুর মন ভায়েদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতে পারে। তাই একটা কথা চিন্তা করিয়া আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের শরীরের অবস্থা যেমন দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যে আমি বেশীদিন টেঁকিতে পারিব, তাহা আমার মনে হয় না। আমার আশঙ্কা হয়, পাছে আমার অবর্ত্তমানে ভায়েদের প্রতি কালুর সে বিরূপ ভাব ভ্রাতৃবিরোধের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়।”

কথাটা শুনিয়া হীরেন্দ্রনাথ গুম্ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, ‘চুলায় যাউক্, আমার এ সবে প্রয়োজন কি ? পিতার বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধেই, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি কালুকে সংশোধনের ভার লইয়াছিলাম। হয়ত বা হাল না ছাড়িলে, এখনও তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারি। কিন্তু পিতারই যখন এখন এ বিষয়ে অনিচ্ছা, তখ দরকার কি আমার এ সব ঝঞ্ঝাটে !’ প্রকাশ্যে বলিলেন, “তাহা হইলে কালুর বিষয়ে এখন আপনার আদেশ কি ?”

দ্বারকাবাবু বলিলেন, “ক্ষুণ্ণ হইও না। তুমি বিচক্ষণ, বিচার করিয় দেখিলে, আমার উক্তির সত্যতা তোমার উপলব্ধি হইবে। কা যদি উচ্ছন্নে যায়, পরিণামে সে-ই নিজে কষ্ট পাইবে। তুমি কি নিমিত্তের ভাগী হইয়া, ভ্রাতৃবিরোধের কারণ হও কেন ? সুতরাং আমা

এই উপদেশ—তাহাকে আর তাড়না করিও না। যদি সে নিজের ভুল বুঝিয়া, আপনা হইতেই সৎপথে চলে ভাল; নচেৎ পরিণামে তাহার অদৃষ্টে বহু দুঃখ আছে। তুমি তাহার বড় ভাই, পিতৃতুল্য—দেখিও, আমার অবর্ত্তমানে যেন তাহাকে দুই মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া অন্যের দ্বারস্থ হইতে না হয়। আর, বর্ত্তমানের কথা—আমার মতে এখন যেমন চলিতেছে, চলুক; দেখা যাউক, অন্যকার তাড়নার ফলে কালুর মতি-গতির কিছু পরিবর্ত্তন হয় কি না, লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয় কি না! যদি পুনরায় পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কোন কাজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া উচিত। তোমার দাদার সহিত কথা কহিয়া, তাহাকেও রেলের বাড়ীতে ঢুকাইয়া দিও। হয়ত অর্থ উপার্জ্জনের মোহে, সে অসৎ পথ ত্যাগও করিতে পারে।"

পিতৃভক্ত হীরেন্দ্রনাথের নিকট পিতার অনুরোধ আদেশতুল্য। তাই সেই হইতে তিনি অমরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার বা তাড়না, উভয়ই বন্ধ করিয়া দিলেন। পিতামাতার স্নেহের সন্তান বলিয়া, বাড়ীর অপর কেহই অমরেন্দ্রনাথকে কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার একমাত্র শাসনকর্ত্তা মেজদাদাও যখন এ বিষয়ে উদাসীন হইলেন, তখন আর তাঁহাকে পায় কে? তিনি লেখাপড়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিলেন, দল সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া দিনরাত হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে দ্বারকাবাবুর রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের সহস্র চেষ্টা, পত্নী-পুত্র আত্মীয়স্বজনের আপ্রাণ সেবা বিন্দুমাত্র ফলপ্রসূ হইল না—দ্বারকাবাবু ওপারের আকুল আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পুত্রপরিবার, আত্মীয়-বন্ধু সকলকে

অসীম শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, বৈকাল ৪টার সময় (ইং জুলাই, ১৮৮৯) দ্বারকানাথের পূত আত্মা ইষ্টদেবের চরণে লীন হইল। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যসাধনার প্রধান বিঘ্ন অপসারিত হইল।

অমন স্নেহময় পুত্রবৎসল পিতাকে হারাইয়া প্রথমে অমরেন্দ্রনাথ শোকে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সময়ে সকলই লয় পায়। দিন কাটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃশোকের মমতাও কমিয়া আসিল। শোকের প্রথম বেগ সামলাইয়া উঠিলে, মনের জড়তা কাটিয়া গেলে, অমরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, বাঃ! তিনি ত' দিব্য স্বাধীন! পিতার প্রতি সহজাত ভক্তি ও শ্রদ্ধাবশতঃ এবং পিতৃরোষের আশঙ্কা-বশতঃ যে সমস্ত কাজ তিনি মন খুলিয়া করিতে পারিতেন না, এখন তো সে সমস্ত কার্য্যে বাধা দিবার কেহ নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আছেন, থাকুন,—কিন্তু তিনিও তো পিতার পুত্র, পৈতৃক সম্পত্তিতে তুল্য অধিকারী। তবে তাঁহাদের সহিত অমরেন্দ্রনাথের অবস্থার পার্থক্য কোথায়! সুতরাং—

সুতরাং কি করিবেন, বাড়িয়া লইতেও তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। লেখাপড়া ছাড়িলেন, স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল, ক্রমশঃ অভিনেত্রীবর্গের সহিত পরিচিত হইবার আশায় কুস্থানে গমন সুরু করিলেন। বিপুল পৈতৃক সম্পত্তিতে সদ্যঃ-অধিকারপ্রাপ্ত, অপরিণতবুদ্ধি বালকের শুভাকাঙ্ক্ষী (?) বন্ধু জুটিতে বিলম্ব হইল না—অধঃপতনের পঙ্কিল সোপানে একবার পা দিবার পর, পা হড়্‌কাইয়া গভীর জলে গিয়া পড়িতেও বেশী সময় লাগিল না।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন। পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই ত' আর সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় নাই! পিতার অবর্ত্তমানে

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ এখন সংসার পরিচালনা করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ দিনে-অদিনে, ক্ষণে-অক্ষণে, অর্থের জন্য তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। আপিস যাইবার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে পা বাড়াইতেছেন, এমন সময় অমরেন্দ্রনাথ ছুটিতে ছুটিতে গিয়া বলিলেন, "আমার এখনই তিন শত টাকার প্রয়োজন। না হইলে চলিবে না।" আপিস হইতে ফিরিয়া টাকা দিবার প্রস্তাবে তিনি পরিতুষ্ট নন, এই দণ্ডেই তাঁহাকে টাকা দিতে হইবে। এইরূপে আজ পাঁচশ', কাল তিনশ', পরশু আটশ',—ঘন ঘন ভ্রাতার টাকার তাগাদায় ধীরেন্দ্রনাথ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। যতটা পারেন, ভ্রাতার প্রার্থনা পূরণ করেন, কিন্তু কোন দিন টাকা না পাইলে অমরেন্দ্রনাথ কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধান। ধীরেন্দ্রনাথ ভাবেন,—১৩।১৪ বর্ষ বয়স্ক বালকের এত অর্থেরই বা প্রয়োজন কি?

ক্রমশঃ অমরেন্দ্রনাথের পদস্খলনের কাহিনী ধীরে ধীরে ভ্রাতাদের কানে আসিয়া পঁহুছিতে লাগিল। তাঁহারা মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অমরেন্দ্রনাথের আর বিদ্যাশিক্ষার আশা করা বাতুলতা মাত্র। সুতরাং পিতার পূর্ব্ব উপদেশানুযায়ী তাঁহাকে আপিসে ঢুকাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। যদি অর্থের অপব্যবহারই সে করে, তাহা হইলে স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতেই তাহা করুক,—পৈতৃক সম্পত্তি নষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

মাতাঠাকুরাণীর উপর অমরেন্দ্রনাথের মত জানিবার ভার পড়িল। তিনি অমরেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার অপকীর্ত্তির বিষয়েও তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সমস্ত উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—"রামচন্দ্র! লোকেদের

কথা শোনেন কেন? মিথ্যা কথা বলিয়া আমার উপর দাদাদের মন চটাইয়া দিবার জন্য পাঁচ বেটাবেটী এরূপ করিয়া তাঁহাদের নিকট লাগাইয়াছে। আপনি ঐ সমস্ত কথা বিশ্বাস করিবেন না। তবে লেখাপড়া সত্যই আমার দ্বারা হইবে না—তদপেক্ষা আপনারা যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাই ভাল—আমাকে চাকুরীতে ঢুকাইয়া দিন। তাহা হইলে মাহিয়ানার টাকা হইতে আমি আমার সমস্ত খরচ চালাইয়া লইব, বাড়ী হইতে অর্থ লইবার প্রয়োজন হইবে না।” তাহাই স্থির হইল, অমরেন্দ্রনাথ রেলির বাড়ীতে ‘হেড কেশিয়ারের’ পদে নিযুক্ত হইলেন।

চাকুরী পাইবার পর অমরেন্দ্রনাথের আর্থিক অস্বচ্ছলতা কমিল বটে, কিন্তু কাঁচা পয়সার গরমে তাঁহার ঔদ্ধত্য বহু পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইল। কুচক্রী বন্ধুবান্ধবদিগের কুপরামর্শে তিনি নিজের অধিকার সম্বন্ধে বেশ সচেতন হইয়া উঠিলেন—তাই সুযোগ পাইলেই দাদাদের কর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করেন, সাংসারিক সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটান। স্বভাব চরিত্রের তো বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইলই না—বরঞ্চ বিলাসিতা ষোল আনা বাড়িল। তাই ৫।৭ মাস যাইতে না যাইতেই অর্থের অনাটন সুরু হইল, মাহিয়ানার টাকায় আর খরচ কুলায় না। কিন্তু বড় দাদার কাছে টাকা চাইবার আর মুখ নাই; অমরেন্দ্রনাথ কি করিবেন, না করিবেন, বেশ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অত শুভানুধ্যায়ী বন্ধু থাকিতে উপায়ের ভাবনা কি? সুহৃদ্‌বর্গের প্ররোচনায় তিনি প্রাণ ভরিয়া ‘হ্যাণ্ডনোট’ কাটিতে লাগিলেন—অর্থের অস্বচ্ছলতা দূর হইল।

পাঠকবর্গ হয়ত মনে করিতেছেন যে, যাক্, থিয়েটারের নেশা তাহা হইলে এতদিনে অমরেন্দ্রনাথকে ছাড়িল। পিতৃবিয়োগে তাঁহার নাট্যসাধনার প্রধান বিঘ্ন অপনোদিত হইল, কিন্তু কৈ, তাহার পর

তাঁহার নাট্যানুশীলন তো কিছুই বাড়িল না! কিন্তু সেরূপ মনে করিলে, তাঁহারা বিশেষ ভ্রমে পতিত হইবেন। কেন না, পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অমরেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে ও চাকুরী লাভের পর হইতে অতি ঘন ঘন থিয়েটারে যাওয়া সুরু করিলেন। তখন ষ্টার থিয়েটারের খুব প্রতাপ প্রতিপত্তি। তাই বেশীর ভাগই তিনি নিজের দলবল লইয়া ঐ থিয়েটারে যাইতেন। যতই থিয়েটারে যাওয়া বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার মন থিয়েটারী রসে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। থিয়েটারের ভিতরের ব্যাপারটা কি, থিয়েটার কেমন করিয়া চলিতেছে, এ সমস্ত জানিবার জন্য তিনি নিতান্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। নূতন থিয়েটার খুলিয়া তাহার স্বত্বাধিকারীরূপেই হউক বা সামান্য নটরূপেই হউক, অভিনয়কার্যে তিনি রতী হইবেনই হইবেন। তাই থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট অভিনেতৃবর্গ কি করিয়া জীবন যাপন করে, তাহা জানিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অভিনেতাদের মধ্যে ৺অঘোরনাথ পাঠক তখন সিটি থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। তিনি রেলির আপিসে চাকুরীতেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ আপনা হইতেই হইয়া গেল; তাঁহার মুখে থিয়েটারের ভিতরকার নানাবিধ গল্প শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথের মন মুগ্ধ হইল। তাঁহার সহিত থিয়েটারের ভিতরে যাইতে চাহিলে, পাঠক মহাশয় সভয়ে বলিলেন, "ওরে বাবা! বলিস্ কি রে কালু! তুই বড়বাবুর ভাই—আর তোকে আমি থিয়েটারের ভেতরে নিয়ে যাব! শেষে বড়বাবু ভাবুক, পাঠকই আমার ভাইয়ের মাথা খেলে, আর আমার চাকরীর দফাও গয়া হোক! না, বাবা, সে সব কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

অমরেন্দ্রনাথ বিফলমনোরথ হইবার পাত্র নন। তখন থিয়েটারের ভিতরে যাইবার কোন উপায় করিতে না পারিলেও, তিনি গিরিশচন্দ্রের সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিলেন। গিরিশচন্দ্র দূর সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় হইতেন। অমরেন্দ্রনাথের মাতুল দেবেন্দ্রনাথ বসু গিরিশচন্দ্রের পিতৃস্বস্রেয়। সেই সম্বন্ধের সূত্রে গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের হাতীবাগানের বাটীতে আসিতেন। একজন স্বনামধন্য নট ও নাট্যকার, অপরে ঐ পথের পথিক হইবার জন্য আবাল্য কৃতসঙ্কল্প! সুতরাং আলাপ জমিতে কষ্ট হইবে কেন?

এতদ্ব্যতীত সমবৃত্তিসম্পন্ন আরও কতিপয় যুবকের সহিত অমরেন্দ্রনাথের পরিচয় হইল। সকলেরই নট হইবার জন্য আজন্ম বাসনা ও অনেকেই উত্তরকালে ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চুণিলাল দেব ও নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইজনের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নাট্যসম্রাট্, অভিনেতা ও ভাবী অভিনেতার সহিত আলাপ করিয়াই অমরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইলেন না। মোসাহেবদের পাল্লায় পড়িয়া, রাশি রাশি অর্থ নষ্ট করিয়া, নৈতিক চরিত্রে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তিনি অখ্যাত কুখ্যাত নানা অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত হইবার আশায় তাহাদের গৃহে গমন সুরু করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পানদোষও দেখা দিল।

অমরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কেমন অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে নামিয়া যাইতেছেন, তাহা তাঁহার আত্মীয়-স্বজনবর্গের দৃষ্টি এড়াইল না। তাঁহাদের তখন একমাত্র চিন্তা হইল—কেমন করিয়া অমরেন্দ্র-

নাথের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়! নানা মন্ত্রণাসভা বসিল—নানাজনে নানা পরামর্শ দিল। শেষে সকলের মনে হইল যে, ছেলের বিবাহ দিয়া একটী সুন্দরী বৌ ঘরে আনিলেই বোধ হয় তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। দ্বারকানাথ দত্তের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য ভাল সম্বন্ধের অভাব হইল না। বহু ঘটক ঘটকী আনাগোনা করিতে লাগিল, বহু কন্যার অভিভাবক বাড়ী চষিয়া ফেলিল, বহু পাত্রীর মাতা আসিয়া অমরেন্দ্রনাথের জননীর নিকট ধর্ণা দিল। শেষে নানা সম্বন্ধ বিচার করিয়া, কয়েকটী পাত্রী দেখিয়া, একটী পাত্রী সকলে মনোনীত করিলেন। তিনি বহুবাজার নিবাসী, কলিকাতার স্বনামখ্যাত ধনী জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পৌত্রী, ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের কন্যা হেমনলিনী। ১২৯৮ সাল, ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক অমরেন্দ্রনাথের সহিত মহাসমারোহে হেমনলিনীর উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন করা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

——:০:——

"স্বার্থ ও সংসার"

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা পিতৃবিয়োগের কিছু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত যথাযথ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও পাঠক-বর্গের গোচর করা হইয়াছে যে, তিনি এখন নিজের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, সুবিধা পাইলেই দাদাদের কর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করেন। শুধু তাই নয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের হস্তে পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত থাকায়, তাঁহার যথেচ্ছাচারের সুবিধা হইতেছে না। ফলে অগ্রজের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরক্তিতে তখন তাঁহার মন পূর্ণ। কুচক্রী তথা-কথিত বন্ধুদের কুমন্ত্রণায় তিনি দাদাদের প্রত্যেক কাজটী বিকৃত দৃষ্টিতে দেখেন, দাদাদের সদুপদেশে অপমান বোধ করেন। এমন কি, সহচরবর্গের প্ররোচনায় তিনি ভায়েদের সহিত বিবাদ করিতেও কুণ্ঠিত নন। তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের পরিচয় দিবার জন্য, ১৩০২ সালের ভাদ্রের "সৌরভ" নামক স্বীয় পরিচালিত মাসিক পত্রে, "স্বার্থ ও সংসার" শীর্ষক প্রবন্ধে, তিনি স্বয়ং নিজের জীবনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অমরেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :—

"শৈশবে স্নেহময়ী জননীর অঞ্চল ধরিয়া খেলিতাম, মাতৃদুগ্ধ পান, মাতৃক্রোড়ে শয়ন, মাতৃমুখ চুম্বন, জীবনের অবলম্বন ছিল। পিতৃস্নেহের

পবিত্রতা তখন উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, সহৃদয় সহোদরের প্রীতির উপর নির্ভর ছিল না, আত্মীয়স্বজনের অকৃত্রিম প্রেম বুঝিতাম না, প্রাণের কথা বলিবার জন্য, দুফোঁটা চোখের জল বিনিময় লইবার জন্য, অন্তরের আন্তরিক একটু সহানুভূতি পাইবার জন্য, বন্ধুবর্গের আবশ্যক হইত না, সংসারে অভিমান কাহাকে বলে, জানিতাম না, যত কিছু আদর অপেক্ষা, যত কিছু অত্যাচার, যত কিছু অভিমান, সব মাতার উপর ছিল।

"শৈশবের প্রান্ত ছাড়িয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলাম, ধূলা খেলা, মাতৃঅঙ্ক, সাধারণের সরল স্নেহ, ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। বুঝিতে লাগিলাম, সংসার কার্য্যক্ষেত্র! পিতার মুখে শুনিলাম, সংসারে দশ জনের একজন না হইলে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, কাহারও ভালবাসার পাত্র হওয়া যায় না, পিতার মুখোজ্জ্বল হয় না, পরম আরাধ্যা জননীরও আনন্দবর্দ্ধন হয় না। দশ জনের একজন হইতে হইলে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন, তিনি অবসর পাইলেই আমায় বুঝাইতেন, "বাপু! মাতৃভাষা লইয়া, বেশী নাড়াচাড়া করিও না। যাহাদের রাজ্যে বাস করিতেছ, তাহাদের ভাষা শিখিবার জন্য প্রাণপণ কর, তাহা হইলে দুই পয়সার মুখ দেখিতে পাইবে।" আমি কোনও উত্তর করিলাম না, মনে মনে বুঝিলাম, সংসারে যদি কিছু সৎকার্য্য থাকে, তাহা অর্থ উপার্জ্জন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনের প্রধান অঙ্গ রাজভাষা শিক্ষা। বিদ্যার্জ্জন, সহপাঠীর প্রণয়, শিক্ষকের শিক্ষা, এই লইয়া কৈশোর কাটিল। যৌবনের প্রারম্ভে সংসারের উপর আর একবার দৃষ্টিপাত করিলাম, বুঝিলাম, এখনও শিখিবার অনেক আছে। মনে করিতাম, জননী জীবনের প্রধান আরাধ্যা দেবী।

দশ মাস দশ দিন কঠোর জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সংসারের উপর প্রথম চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া, প্রাণের প্রিয় করিয়া, বুকে বুকে রাখিয়াছেন। মা বলিয়া ডাকিলে, মন ভরিয়া যায়। অশ্রুজলে পাদপদ্ম ধৌত করিবার জন্য, অন্তরের অনন্ত ভক্তি ঢালিয়া দিবার জন্য, বহুশ্রমের অর্জ্জিত যশ বিসর্জ্জন দিবার জন্য, যদি কেহ থাকে তবে সে মাতা। ক্রমে সে ভ্রম ঘুচিল, দেখিলাম. পিতা উপার্জ্জন করিয়া আনিতেছেন. তবে আমাদের জীবন বর্দ্ধিত হইতেছে। বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, তবে আমরা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকিত পথ কল্পনা করিতেছি। জীবনের প্রতি কার্য্যে, প্রতি আচারে, প্রতি বিচারে. পিতার সহানুভূতি মিশ্রিত। সংসারের প্রকৃতির উপর আত্মসমর্পণ করিয়া বুঝিলাম. জননী অপেক্ষা পরম পূজনীয় জনক শ্রেষ্ঠ।

"প্রাণে প্রাণে গাথিলাম, নিতান্ত নির্গুণ হইয়া, ঐশ্বরিক বন্ধনের উপর নির্ভর করিলে. পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের মন উঠিবে না। দশ জনের একজন হইয়া, অর্থ উপার্জ্জন করা চাই।

"দুর্ভাগ্যক্রমে, পূজ্যপাদ পিতা, ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন পূর্ণ যৌবন! এ আঘাত জীবনে কখনও পাই নাই, এ অন্তর্দ্দাহ কল্পনায় কখনও অনুভব করি নাই, এ মর্ম্মপীড়া কখনও ধারণায় আসে নাই। সংসার পরীক্ষার স্থল! জন্ম, জরা, মৃত্যু, জীবগত অবস্থা, কর্ম্মক্ষেত্রের কীটানুকীট মানব,—বুঝিয়া, প্রবোধ মানিলাম।

"দিন কাটিতে লাগিল, সময়ে সকলই লয় পায়; পিতৃশোকের সমতা ক্রমে কমিয়া আসিল। বিষাদিনী জননী একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা! তোমার মাথার উপর এখন কেহ নাই: তুমি সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের বড় আদরের পাত্র ছিলে, তোমার অবস্থান্তর হইলে. আমি প্রাণে বাঁচিব না। বেশ করিয়া বোঝ,—

'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,' বলিয়া একটা কথা আছে। যত দিন না, আপনার দিন কিনিতে পার, জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া চলিও, কাহারও উপর মান অভিমান করিও না, সকলকে আপনার মত করিয়া রাখিও। মনে করিও না, তোমার বিপদে কেহ বুক দিবে। আপনার সহোদরের উপরও বড় নির্ভর করিও না। এ সংসারে আপনার স্বার্থ ছাড়িয়া দেয়, এমন কেহ নাই। তোমার আবদার সহিবার যে ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে। তোমায় বিশেষ করিয়া বলিতেছি, তোমার জ্যেষ্ঠের মনোমত হইয়া থাকিও। মধ্যম আপনার লেখাপড়া লইয়া থাকে, উহার প্রতি ততটা লক্ষ্য রাখিও না, কারণ তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংসারে সকলে আপনার কাজ করে। উহাদের প্রতিকূলাচরণ করিলে, তোমার হেনস্তার শেষ থাকিবে না।"

"আমি বলিলাম, "হ্যাঁ মা! তবে কি মন যোগাইয়া চলিতে হইবে? সংসার কি তবে তোমামোদের বশ? আপনার রক্ত হইলেও, কি কেহ উপযাচক হইয়া উপকার করে না?"

"আঁচলে চোখ মুছিয়া, জননী উত্তর করিলেন, "বাবা, তোমার কি আর সে দিন আছে! তিনিও একজনের ভাই ছিলেন, যথাসাধ্য সহোদরের মনস্তুষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। আর জানত' তিনি কিরূপ সহ্যশীল পুরুষ ছিলেন। মাথার উপর পাহাড় পড়িলেও কথা কহিতেন না। যখন একান্নে ছিলেন, তেলে ভাজা লুচি খাইয়া দিন গিয়াছে। দেখ, সময়ে তাঁহাকেও ভ্রাতৃপ্রেম বিচ্ছিন্ন করিয়া, পৃথক্ হইতে হইয়াছে। যদি কখনও ভগবান্ দিন দেন, আপনার সুসার করিতে পার, মন যোগান'র মুখে ছাই দিয়া, আপনার অবস্থার উপর অটল হইয়া বসিবে। আপাততঃ আর উপায় কি?"

"কোন উত্তর না দিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, ভিন্নান্নে

জীবন যাপন করিব, প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিব, পরের মুখাপেক্ষী হইয়া সংসারে উন্নতি আকিঞ্চন করিব না। বিবাহ হইল, বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িল। সম্মুখে নারায়ণ রাখিয়া, ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া, আপনার বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করিলাম, সে আমার চিরজীবনের সঙ্গিনী হইতে চলিল। আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, আমি হাসিলে হাসিবে, আমি কাঁদিলে কাঁদিবে। ছল মনে করিলাম! আপনার সহোদর আপনার হয় না,—অজানিত কুলশীলা,—সে আমার সর্ব্বস্ব হইবে? তাহার জীবন আমার সহানুভূতি লইয়া বর্দ্ধিত হইবে? কে জানে সত্য কি মিথ্যা! কল্পনা কি প্রকৃতি! মা বলিলেন, "বাবা! দাসী আনিয়া দিয়াছি, অযত্ন করিও না। এ স্বার্থের সংসারে যদি কোন রত্ন থাকে, সে স্ত্রী। উপবাসী থাকিয়া, তোমার আহার যোগাইবে। মলিন বসন পরিয়া, তোমায় রাজবেশে সজ্জিত করিবে। আপনার শরীর পাত করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় তোমার সেবা করিবে। তুমি গাছতলায় রাখিলে গাছতলায় থাকিবে। মরিতে বলিলে, তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া হাসি মুখে মরিবে।"

"আমি উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ মা, যা বলিলে, সম্ভব কি? আপনার রক্ত যদি ভাসিয়া যায়,—অপরিচিত ঘর হইতে পর আনিলাম, সে আমার এত করিবে?"

"মা বলিলেন, "বাবা! তোমায় আমি গর্ভে ধরিয়াছি; তোমার দরদ আমার মত কেহ জানে কি? সকলের সব ছল হয়, মার প্রাণ ছল জানে না।"

"আমি আর কোন কথা কহিলাম না, মনে মনে বুঝিলাম, সংসার পরীক্ষার স্থল বটে! যে পরীক্ষা লইবার জন্য সংসারের বন্ধন দৃঢ়

হইল, তাহার পরিণাম কি দাঁড়ায় দেখা যাক্। সম্পদে সহচরের অভাব নাই, জ্যেষ্ঠের অসংখ্য অনুচর বা মোসাহেব জুটিয়াছিল। কোনও দরিদ্র আসিয়া দুঃখ জানাইবে,—কোন কর্ম্মপ্রার্থী আসিয়া, কর্ম্ম প্রার্থনা করিবে, কোনও আত্মীয় আসিয়া, দুট' সাংসারিক কথা কহিবে, অনুচরবর্গের বেষ্টন প্রভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। কেহ বাড়ী করিয়া লইল, কেহ ধার বলিয়া, অজস্র অর্থ লুটিল, কেহ বৃথা দায় জানাইয়া, বৃহৎ সাহায্য লভিল। যথার্থ পিতৃদায়গ্রস্থ ব্যক্তি কপর্দ্দক মাত্র ভিক্ষা না পাইয়া, কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়। পরিবারবর্গ অনাহারে মরিতেছে, সামান্য বেতনের পদপ্রার্থী হইয়া আসিয়া, মাথা কুটিলেও, তাহার লাঞ্ছনা মাত্র সার হয়। দুট' ভাল কথা কহিলে, বুঝিয়া চলিতে বলিলে, মধুরতার উপর বচন বিন্যাস শুনিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া আসে।

"আমি তখন লেখাপড়া ছাড়িয়া, কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি। বলিতে লজ্জা করে, আমার প্রয়োজনীয় আমি পাইতাম না, আমার দুঃখ কেহ কানে তুলিত না, আমার সামান্য প্রার্থনাও পূর্ণ হইত না। নিতান্ত অনাথের মত ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম। মধ্যে মধ্যে মধ্যমকে সকল কথা জানাইতাম; তিনি যে ভাবে উত্তর করিতেন, তাহাতে বুঝিতাম, আমার কথা লইয়া, তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিতে তিনি নিতান্ত নারাজ। কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা, স্নেহময়ী জননীকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, "বাবা! এ সকল কথা লইয়া আমি কি কথা কহিব বল? উহারা উপযুক্ত হইয়াছে, আমি উপরপড়া হইয়া কিছু বলিলে, উহারা মনে করিবে, আমি তোমার হইয়া কথা কহিতেছি। দেখ, যে যা বলে, যে যা করে, সব সহিয়া যাও। তুমি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া, আপনার কাজ বজায় করিয়া যাও, তোমার গায়ে একটী আঁচড়ও পড়িবে না।"

"আমার প্রাণে বড় বাজিল, চক্ষে জল আসিল, বলিলাম, "কেন মা, যে যা করে, যে যা বলে, সব সহিব কেন? সত্যই কি আমি ভাসিয়া আসিয়াছি? আমায় কি পিতা তেজ্য করিয়া গিয়াছেন? সম্পত্তির উপর আমার কি কোনও স্বত্ব নাই? আমি আর সহিব না মা! আমিও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব!"

"মা উত্তর করিলেন, "তিনি যা সহ্য করিয়াছেন, সে লাঞ্ছনার তিলও তোমার কল্পনায় আসিবে না। এমন দিন গিয়াছে, বুঝি আমার মাথার সিঁদুর থাকে না? হাতে ধরিয়া, পায়ে ধরিয়া, কত করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলাম। সে তুলনায় তুমি ত' স্বর্গে আছ।"

"আমি কোন উত্তর করিলাম না, বুঝিলাম, আমাদের গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হয়,—জননীর অভিপ্রেত নহে। সঙ্কল্প বদ্ধমূল করিলাম, —আর কিছুদিন দেখিয়া, পিতৃসম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া, এ স্থান পরিত্যাগ করিব। আবার ভাবিলাম, সম্পত্তির কোথায় কি আছে, কিছুই জানি না। অনেকাংশে যে বঞ্চিত না হইব, তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু আমার মধ্যম শিক্ষিত, বঙ্গের মুখোজ্জ্বল, তিনি থাকিতে বোধ হয় অবিচার হইবে না। সম্পত্তি বিভাগ স্থির করিয়া, অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:০:—

"ঊষা"

নাট্যসাধনায় সিদ্ধিলাভোদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রনাথ যে পন্থা অবলম্বন করিলেন ও তদবলম্বন জনিত অনিবার্য্য বিষময় পরিণামের চিত্র আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে যথাযথ বর্ণন করিয়াছি। অবশ্য এ কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, নৈতিক অধঃপতন নটব্যবসায়ীদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু শুধু সেই কথার আলোচনাতেই যদি আমরা ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে অমরেন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা দেখাইতে আমরা সক্ষম হইব না। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যটুকু দেখানই ত' এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। তাই এ অধ্যায়ে আমরা রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পে অমরেন্দ্রনাথের যাহা স্থায়ী দান, তাহার আদি পর্য্যায় আলোচনা করিবার প্রয়াসী হইব।

"ঊষা" অমরেন্দ্রনাথের বাল্য রচনা। নাট্যসাহিত্য পুষ্টিকল্পে তাঁহার লেখনী ধারণের প্রথম অবদান—এই ত্র্যঙ্ক গীতিনাট্য। অপরিণত বয়সের রচনা—ইহার প্রণয়ন কালে অমরেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর ছিল,—সুতরাং ইহাতে দোষ ছিল অনেক। তাই বোধ হয়, যদিও ইহা অভিনয়ের জন্য রচিত, তবু ইহা কখনও রঙ্গমঞ্চের আলোক দর্শন করে নাই। অমরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, স্বয়ং থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক হইয়াও কখন ইহা অভিনয় করিবার প্রয়াস পান নাই।

অমরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের পর যখন তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিলেন, তখন শুধু নট নয়, নাট্যকার হইবার বলবতী বাসনাও তাঁহার মনে উদিত হইল। সে প্রচেষ্টার প্রথম ফল—"ঊষা"। তাঁহার পারিবারিক জীবনের ঘটনার পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে গিয়া, আমরা পূর্ব্বে কোথাও এই গ্রন্থের উল্লেখ করিবার সুযোগ পাই নাই।

বাংলা ১২৯৬ সালে "ঊষা" রচিত হয় ও আমাদের অনুমান তাহার ২।৩ বৎসরের মধ্যে ইহা মুদ্রিত হয়। আমরা ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের যে খণ্ড দেখিয়াছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার মলাট বা টাইটেল পৃষ্ঠা নাই, তাই কোন্ সালে এবং কোথায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদ দিতে আমরা অক্ষম। বর্ত্তমানে এই পুস্তকের চিহ্ন আছে কিনা জানি না। উত্তরকালে যখন অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত সমস্ত গ্রন্থ লইয়া "অমর গ্রন্থাবলী" ছাপা হয়, তখন তাহাতেও ইহা স্থান পায় নাই। তাই আমরা পাঠকবর্গের নিকট এ গ্রন্থের যতটা পারি, ততটা পরিচয় দিবার অভিলাষী। কাঁচা বয়সের লেখা হইলেও, পাঠককে আমরা ইহার রচনা কৌশল ও ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থের মুখবন্ধে অমরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

কথা !

বুঝি পর্ব্বত বক্ষে পদ্ম ফুটাইতে, ফুৎকারে বিশাল প্রস্তর খণ্ড উড়াইতে, আঁধারে লক্ষ্য ভেদ করিতে, নির্ব্বাত ভূধরকন্দরে দীপ জ্বালাইতে, জলবিম্বকে সমভাবে অনন্তকাল স্থায়ী করিতে বাসনা, তাই এই বিড়ম্বনা।

এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের একটি ক্ষুদ্র রেণু আমি, এক পাশে পড়িয়া আছি—সংসার সাগর বেলার এক কণা বালুকা আমি, অনন্তের সহিত মিশিয়া রহিয়াছি, কত ক্ষুদ্র কত ক্ষুদ্র আমি, এই বৃহৎ জগৎ ব্যাপারের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া, মাথা তুলিতে সাধ! বহু কম কণ্ঠের মধুর তানের মধ্য হইতে, এই ক্ষীণ কণ্ঠের বেসুরা আরব তুলিতে বাসনা। বুঝি বাসনাই বাতুলতা!

জানি না, কি উৎসাহে, কিসের কুহকে ভুলিয়া, এই ক্ষীণ, তুচ্ছ মস্তিষ্ক হইতে কল্পনার সৃষ্টি করিয়া, তৃপ্তিকর ডালি সাজাইয়া, সাধারণের চক্ষের উপর ধরিতে মানস!

স্পষ্টই দেখিতেছি, মাথার উপর বিদ্রূপের, গঞ্জনার উচ্চ পর্ব্বত হেলিয়া রহিয়াছে, সামান্য নাড়া পাইলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, জানিয়া শুনিয়া, দেখিয়া, বুঝিয়াও কি জানি কি মন্ত্র প্রভাবে মুগ্ধ মন, সে আঘাত, সে গুরুত্ব ধরিবার জন্য যেন বুক পাতিয়া রহিয়াছে।

সকল মানুষ আত্মবশ নহে, অনেকেই মনের আবেগে কাজ করে; এস্থলে আমিও ঐ দলভুক্ত।

এ বিড়ম্বনা আমার দোষে নহে, মনের আবেগ মাত্র!

শ্রীঅ—

গীতি-নাট্য সম্বন্ধে!

নাট্য জগতের দৃশ্য এক অভিনব সুন্দর! এ জগতে প্রবেশ করা, ইহার আভ্যন্তরীণ বস্তুনিচয়ের মধুরতা অনুভব করা, এ জগতের বিশাল বিস্তৃত অতলস্পর্শ রম্য ভাবের মধ্যে, আপনার হৃদয়কে মগ্ন করিয়া, ইহার সুধার আস্বাদন করা, যার পর নাই তৃপ্তিকর!

নাট্য-জগতের প্রবেশের পথ বড়ই দুর্গম! সহজে প্রবেশ করিয়া আপনার উদ্দেশ্য কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসা বিষম দুষ্কর।

ইহার সকল চরিত্রগুলির পূর্ণ বিকাশ, দৃশ্যাবলীর পারিপাট্য, ভাষার মধুরতা, এই সকল বজায় রাখা, বড় সাধারণ নিপুণতার কার্য্য নহে।

এ স্থলে ও সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োজন নাই; উপস্থিত এই ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

দৃশ্যাবলীর পারিপাট্যে, ভাষার মধুরতায় কৃতকার্য্য হইয়াছি কিনা জানি না, জানিবার প্রয়োজনও নাই, তবে ইহার চরিত্রবৃন্দের উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

উক্তিগুলি গীতি-নাট্যের পক্ষে একটু দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘ উক্তিগুলি আমি দোষ বুঝিয়াই লিখিয়াছি।

এই গীতি-নাট্যখানি, অভিনয়ের নিমিত্ত লিখিত। যখন সাধারণের চক্ষের উপর প্রদর্শিত হইবে, তখন যিনি মনে করিবেন, "আমি (Drama) নাটক অভিনয় দেখিতেছি", তখন তাঁহার মনে সেই ভাবই প্রতীয়মান হইবে; আর যিনি মনে করিবেন, "আমি (Opera) গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখিতেছি", তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই ছবিই ধরিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্যে "ঊষা" রচিত।

(SUBJECT) বিষয় সম্বন্ধে!

প্রকৃত প্রণয়, কপট বন্ধুত্বের বিষময় ফল, নিরাশ প্রেমিকার করুণ আত্মবিসর্জ্জন, প্রধানতঃ এই কয়েকটী চিত্র, যথাযথ ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীঅ—

* * * *

উষার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ অতি অল্প। পুরুষগণের মধ্যে শুধু মদন, প্রদোষ (রাজকুমার) ও বিমল (প্রদোষের সখা) এবং স্ত্রীগণের মধ্যে রতি, উষা (রাজকুমারী), মাধুরী (উষার প্রধানা সহচরী) ও সখীগণ ইত্যাদি।

নাটিকার ঘটনাবলী এই ঃ—

রাজকুমারী উষা প্রত্যহ সখীগণসহ পুষ্পচয়নার্থ কাননে আসেন। একদিন রাজকুমার প্রদোষ, স্বীয় অনুচর বিমল সহ সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিলেন। মদন ও রতি যুক্তি করিলেন যে, উষা ও প্রদোষের মিলন সংঘটন করিয়া বহুদিন পরে "প্রেমের খেলা" খেলিবেন। তাঁহাদের কৌশলে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। উষার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রদোষ ও বিমল উভয়েই মুগ্ধ হইয়া গেল। উষা কিন্তু প্রদোষের প্রতি অনুরক্তা হইল আর তাহার সহচরী মাধুরী বিমলকে প্রাণ সমর্পণ করিল। এদিকে উষার পিতা কন্যার মনের ভাব না জানিয়া, অন্য এক রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিয়া, পাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনাইয়াছেন। আগামী পূর্ণিমার দিন বিবাহ। উষা তো কাঁদিতে বসিল, মাধুরীকে বলিল, "আমি যাই, বাবার পায়ে ধরে সব কথা খুলে বলিগে।" শেষে সখীর পরামর্শে, তাহাকেই প্রদোষের কাছে পাঠাইয়া দিল— তিনি যদি ইহার উপায় করিতে পারেন।

প্রদোষ রাজকুমার, রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাই সে দূতরূপে বিমলকে উষার নিকট পাঠাইয়াছে। মাধুরী গিয়া তাহাকেই সমস্ত কথা বলিল ও বিমলের মুখে সংবাদ পাইয়া প্রদোষ আসিয়া উপবনে উষার সহিত সাক্ষাৎ করিল। নায়ক নায়িকার মিলনোপায় উদ্ভাবনে কেহই সক্ষম নয়, শেষে বিমল বলিল,—"দেখ,

আমার একটা পরামর্শ শোন, আপাততঃ ঊষাকে নিয়ে তোমাদের কেলীকাননে রাখ, জনপ্রাণীও জানবে না! দিনকতক চাপাচুপি রেখে, তারপর বিয়েটা ক'রে ফেল। তোমার সঙ্গে ঊষার বিবাহ হয়েছে শুনলে, রাজা কত আদর ক'রে, মেয়ে জামাই ঘরে নিয়ে যাবে।"

প্রদোষ কিছুতেই এমন হীন প্রস্তাবে রাজী নয়, শেষে কপট বন্ধুর প্ররোচনায় তাহাতেই সম্মত হইল ও বিমলকেই ঊষাকে লইয়া যাইবার ভার দিয়া, কেলীকাননে চলিয়া গেল। যাইবার পথে, নদীতীরে, বিমল ঊষাকে প্রেম নিবেদন করিল; ঊষা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায়, প্রথমে সে আত্মহত্যার ভয় দেখাইল, শেষে ঊষার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে, ঊষা নদীজলে ঝম্প প্রদান করিয়া সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিল।

প্রণয়ের পাত্রীর এই পরিণাম দেখিয়া, বিমল জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মন বলিতেছে, ঊষা মরে নাই, তাই একবার তাহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য ব্রহ্মচারী বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু একদিন গঙ্গাতীরে শ্মশানে তাহার দেখা হইল মাধুরীর সঙ্গে। হতাশ প্রণয়ের বোঝা বহিতে বহিতে মাধুরী প্রায় উন্মাদিনী হইয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া পাষণ্ড বিমলেরও করুণা উপজিল। উভয়েই একসঙ্গে গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা জুড়াইল। এদিকে অপ্সরারা নদীজল হইতে ঊষাকে উদ্ধার করিয়া শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে বাঁচাইল ও যথাসময়ে প্রদোষের সহিত তাহার মিলন ঘটাইয়া মদন-রতির প্রেমের খেলা সাঙ্গ হইল।

এই ত' গেল মোটমাট "ঊষা"র আখ্যানভাগ। গ্রন্থখানি ত্র্যাঙ্ক—মোট ৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রথম অঙ্ক তিনটি দৃশ্যে, দ্বিতীয়াঙ্ক পাঁচটি দৃশ্যে ও তৃতীয় অঙ্ক তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত। গীতিনাট্যের প্রধান অঙ্গ যে

গাত—ইহাতে তাহার প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়, কারণ গানের মোট সংখ্যা হইল ৩৩টী। পুস্তকের অধিকাংশই গদ্যে রচিত, শুধু প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মদন ও রতির কথোপকথন গৈরিশী ছন্দে। শেষ দৃশ্যে প্রদোষের Soliloquy বা আত্মোক্তি চতুর্দ্দশপদী অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থান পয়ারে রচিত।

অপরিপক্ক বয়সের রচনা হইলেও, নাটকের গতি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই বা ঘটনার পারম্পর্য্য কোথাও ব্যাহত হয় নাই। ক্ষুদ্র নাটিকায় চরিত্রের বিকাশ ও উপপাদ্য বস্তুর পরিণতি যতখানি প্রদর্শন করা সম্ভব, তাহা দেখান হইয়াছে।

বিমল

প্রদোষ গ্রন্থের নায়ক হইলেও, ইহার প্রধান চরিত্র বিমল। সে সুদর্শন, বন্ধুবৎসল, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অথচ পরিহাসপ্রিয়, বাক্‌পটু, অযথা বাক্যবিন্যাসের আশ্রয় না লইয়া চটুল বাক্যালাপে দক্ষ। কিন্তু তবু সে তরলমতি, সেই জন্য প্রদোষের পবিত্র প্রেমের গভীরতা সে বুঝিতে পারে না, নিজে উষাকে লাভের আশায়, বন্ধুকে এ প্রেম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম প্রেমের উদ্দামতায় প্রদোষ যখন নিজের কি হইয়াছে বুঝিতে পারে না, সে বলে—

"প্রেমের তরঙ্গে, আর কিসের তরঙ্গে? রঙ্গে ভঙ্গে সাঁতার দিচ্ছ। এখন থই পেলে বুঝি! বেশ তো প্রাণ দিয়েছ! আপাততঃ প্রাণের চাপ প্রাণে ধ'রে, ঘরে ফিরে চল! বনে রাত কাটাবার মতলব করেছ নাকি? যাই কর ভাই, সে তো আর তোমার কাছে ছুটে এসে বলবে

না, প্রাণেশ্বর! আমি আর থাকতে পাল্লুম না, তোমার কাছে উধাও হ'য়ে এলুম! সে রাজার মেয়ে, তাতে অমন সুন্দরী, তোমার মত কত রাজকুমার পায়ে লুটোপুটী খায়! সে তো আর প্রাণ দেবার লোক পায় নি, তাই একবার তোমার চারু চন্দ্রানন দেখে, তোমায় প্রাণ মন সমর্পণ ক'রে, প্রেমের বন্ধন পরবে?"

কিন্তু যখন সে বোঝে প্রদোষের প্রেম ক্ষণস্থায়ী মোহ নয়, তখন সে সরল বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হয়; মনে মনে বলে, "যতই হাঁক্‌পাঁক্ কর, মুখের গ্রাস কাড়্‌বোই চাঁদ!" তাহার মত ব্যক্তি রমণীর রূপের মোহে—বন্ধুর প্রণয়িনীর প্রতি অযথা আসক্তিতে—আবাল্য সহচরের সহিত কপট আচরণে রত হইলে, তাহার পক্ষে পরিহাসের আচ্ছাদনে নিজের মনের যথার্থ ভাব লুক্কায়িত করা কষ্টসাধ্য হয় না।

কিন্তু বিবেকের তাড়না হইতে সেও নিষ্কৃতি পায় না,—মনে মনে ভাবে, "ঊষা! ঊষা! ও ছুঁড়ী আমায় পাগল করেছে। যে অবধি সেই মুখখানি দেখেছি, সেই দিন হ'তে আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে! বুকের ভিতর দিবানিশি পাঁজার আগুন জ্বলছে। নারীর প্রণয়! রূপলালসা! তুমি সৎকে অসৎ করতে পার, নিস্তব্ধ হৃদয়ে কোলাহলের তরঙ্গ তুলে, প্রাণকে আকুলি ব্যাকুলি করতে পার, সুখের নিলয় শ্মশানে পরিণত করতে পার. বন্ধুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, গৃহবিবাদ, হত্যা, অপহরণ তোমার দ্বারাই সাধিত হয়, জগতে তোমার ন্যায় বিষময় পদার্থ আর কি আছে? প্রদোষ আমায় কত ভালবাসে, তার গভীর বিশ্বাসের কখন কোনও ব্যতিক্রম দেখিনি! কিন্তু আমি তার প্রতি কি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত হয়েছি!"

কিন্তু হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি যে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, বিবেকের ক্ষণিক

কশাঘাত তাহাকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে কি? বরঞ্চ, মাধুরীকে নিজের প্রতি অনুরাগিণী বুঝিয়া, সে তাহাকেই তাহার অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। কপট প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া, তাহার নিকট হইতে সকল তথ্য জানিয়া লয়। উষার অন্যত্র বিবাহ হইলে, একা প্রদোষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে সেও উষা-লাভে বঞ্চিত হইবে বুঝিয়া, নিজেই আবার সংবাদ দিয়া প্রদোষকে উষার নিকট উপস্থিত করে। মিলনের কোন উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া, প্রদোষ যখন এক মুহূর্ত্তে বিবাগী হইয়া যাইতে চায়, আবার পরমুহূর্ত্তে প্রেয়সীর সহিত প্রেমালাপে নিযুক্ত হয়, বিমলের বুকে তখন তুষের আগুন জ্বলিয়া উঠে, ভাবে—"শুনেছিলেম পিরীত ক'রে বিবাগী হয়ে যায়, চোখে ত কখনও দেখিনি। আজ বাবা প্রত্যক্ষ দেখলেম। আমি মনে কল্লেম বুঝি বা সরে, তা হ'লে ত আমারি নিস্তারেয়া হ'ত। ও ছোঁড়া যেই কাছে গিয়ে হাত দুটো ধ'রে, দুবার প্রাণেশ্বরী, প্রাণেশ্বরী, করলে, অমনি ছুঁড়ী যেন গ'লে গেল! এরেই বলি বাবা পিরীত; কেবল মুখে "ভালবাসি"—"ভালবাসি" ক'রে, একটু মুচকি হেসে গায়ে ঢ'লে প'ড়ে, গায়ে পড়া দেখালেই প্রেম হয় না; প্রাণের টান দরকার করে।"

শেষে স্বকার্য্যসাধনের জন্য, সে প্রদোষকে উষাহরণে পরামর্শ দেয়; বলে, "তুমি আপাততঃ উষাকে নিয়ে, হেথা হ'তে স'রে পড! কোথাও গিয়ে, লুকিয়ে বিবাহ ক'রে ফেল! অপাত্রে ত আর ন্যস্ত হবে না; আর সব কথা শুনলে, রাজাও বিশেষ অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনা আপনি বাগড়া পড়লো দেখে, নাচার অবস্থা বুঝে, নিমন্ত্রিত রাজপুত্র বেচারিও পেছ কাটাবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া উষা লাফাইয়া উঠে, কিন্তু প্রদোষ কিছুতেই সম্মত

হয় না। তখন তাহাকে কুপ্রবৃত্তিতে উত্তেজিত করিতে বিমল ঠাট্টা করিয়া বলে, "মেয়েমানুষ সাহস ক'রে অকূলে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছে, আর তুমি পুরুষ হ'য়ে ভয়ে পেছ কাটাচ্ছ! ছি ছি ধিক্ তোমার পুরুষত্বে!" "যদি এত ভয়, তবে প্রেম করতে এসেছিলে কেন ভাই? পিরীত করতে গেলে কলঙ্ক, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অঙ্গের ভূষণ করতে হয়, কথায় বলে—

পিরীতি ফুলের মধু, কলঙ্ক কণ্টকময়;
যে জানে সে মরে আছে, মুখের কথা পিরীত নয়॥"

শেষে প্রদোষ যখন তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকেই উষাকে লইয়া যাইবার ভার দেয়, সে তখন পরম পুলকিত হয়;—সে ত' তাহাই চায়। "ভেবেছিলেম ছুঁড়ীটাকে হাত করতে দু'চার দিন কষ্ট পেতে হবে, এ বাবা আপনা আপনিই হাত হ'য়ে গেল। আমার যে মিষ্টি বুলি আছে, পথেই কাজ গুচুবো।" স্থির করিয়া, যাইবার পথে, নদীতীরে, নির্জ্জনতার সুযোগে সে উষাকে প্রেম নিবেদন করে. ব্যর্থ প্রেমিকের অভিনয় করিয়া নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হয়। উষা বাধা দিলে বলে,—"আমি যে পাগল হয়েছি। কে বলে বুক চিরে দেখান যায় না; আমি তোমায় দেখাব। আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্থানময় কি আছে তোমায় দেখাব, তা হ'লে আর আমার বলতে হবে না; তোমায় কি বলব উষা! এই তোমার পা জড়িয়ে ধল্লুম, তুমি পায়ে রাখ, তুমি পায়ে ঠেললে আমি বাঁচবো না, আমার প্রাণ যায়।

উষা। তুমি কি পাগল?

বিমল। আমি ত তোমায় বল্লুম আমি পাগল, আমি যদি পাগল না হ'ব, তা হ'লে কি এতক্ষণ এ পাপ প্রাণ খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটতে বাকী রাখতেম? আমার অমন বন্ধু, আমার নিজের সহোদরের অপেক্ষাও ভালবাসে, তার সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত

হয়েছি। বন্ধুরমণী মাতৃস্বরূপিণী, তাকে পাপমুখে এই সকল কথা বলছি; যথার্থই আমি পাগল! আমি কিছুই বুঝি না; পাগল—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, তাই তোমার পায়ে ধরছি, আমায় পায়ে রাখ, আমায় দয়া কর।"

ঊষা এমন ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে, প্রথমে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখায়। তাহাতেও ঊষা ভীতা নহে দেখিয়া, তাহার উপর বল প্রয়োগে উদ্যত হয়। ঊষা জলে ঝাঁপ দিলে, সে-ই তাহার আত্মহত্যার কারণ বুঝিয়া, তাহার সদ্‌বৃত্তি জাগরিত হয়, অনু-তাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু তাহার মন বলে ঊষা মরে নাই, তাই তাহার সন্ধানে ব্রহ্মচারীবেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভাবে—"কে জানে, কেন আমি এই স্থানে এলে প্রাণে পরম শান্তি পাই। মনে হয়, জড় জগতের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি যেন এ পৃথিবীর কেউ নই; হৃদয় অমনি বিমল আনন্দে ভ'রে যায়। ঊষা! ঊষা! এত ক'রেও তোকে পেলেম না? এত আয়াস, এত পরিশ্রম, সকলই বিফল হ'ল? হায়রে! তোর জন্যে না কল্লেম কি? অনুতাপে প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে, জীবনের বাঁধন আপনা আপনিই শিথিল হচ্ছে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি এত প্রবল, সমস্ত অভ্যন্তর এত ঘন সমাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে যে, এত ক'রে মনকে বুঝিয়েও পূর্ব্ব পাপ-স্মৃতি দূর করতে পাচ্ছি না। জগদীশ্বর! শুনেছি, তুমি যত বস্তু জগতে সৃজন ক'রেছ, সকলই তোমার সৃষ্ট জীবের উপকারের নিমিত্ত, কিন্তু প্রভু! এ পাপ লালসা' কি জন্যে সৃজন করলে? এতে জগতের কি উপকার হচ্ছে? প্রত্যেক মানব হৃদয়ে তুমি যে লালসারাশি ঢেলে দিয়েছ, তাই নিয়ে সকলেই অস্থির হৃদয়ে কালযাপন কচ্ছে! যদিই সৃজন করেছিলে প্রভু!

তবে 'সৎ অসৎ' এ দুটো করলে কেন? সকলেরই মনে কেন সৎ-লালসা দিলে না? তোমার এ কি পরীক্ষার লীলা, বুঝবো না লীলাময়! এই ভীষণ লালসা-রাক্ষসীর হাতে আমরা যেন ক্রীড়ার পুতুল। তারই ইঙ্গিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত, আমি অমন সরল বন্ধুর সহিত ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেম। মাতৃস্বরূপিণী বন্ধুরমণীর প্রতি পাপ মতি হ'ল, সমাজের একটা ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করলেম। জানছি "যথা ধর্ম্ম তথা জয়," তবু এ অধর্ম্ম হ'তে পাপ মতি ফিরছে না! যেখানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাচ্ছি, ভালবাসি না বাসি, যে আমায় প্রাণঢালা ভালবাসা দিচ্ছে, সেদিকে মন অগ্রসর হ'তে চায় না! যেখানে ভালবাসার পরিবর্ত্তে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা পাবে, সেই দিকেই যায়। ছি ছি, আমার এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করাই উচিত। এতদিন কি এ প্রাণ পরিত্যাগ করতেম না! এ পাপ পরিপূর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে এতদিন কি সম্বন্ধ উঠাতেম না! সে কথা মনেই থাক। কিন্তু কি জানি. কেন প্রাণ বলছে, ঊষা বেঁচে আছে; প্রাণের ছলনায় ভুলেই মরতে পাচ্ছি নি। তাই ত এ বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ কচ্ছি; একবার, বেশী নয়, আর একবার সেই মুখখানি দেখে, কেবল দেখে গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব। এ পাপ প্রাণ পূত-প্রবাহিনীর অঙ্কে মিশাব। কোথায় যাব? কোথায় গেলে আর একবার ঊষাকে দেখতে পাব। (মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) প্রকৃতি! তোমার এ উলঙ্গিনী ভৈরবী মূর্ত্তি আমার চক্ষে ভীষণা নয়; আমার প্রাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে, যদি হৃদয়ের উন্মাদিনী গর্জ্জন শুনতে, তা হ'লে আর ঐ তুচ্ছ রব তুলতে না। তুমি কি সামান্য অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন করেছ, আমার প্রাণের ঘোর তমঃ যদি দেখতে, তা হ'লে তোমার ক্ষীণ আবরণ এখনই মোচন কত্তে। আহা! আমার প্রাণ জুড়াবার এই স্থানই উপযুক্ত।"

শেষে সেইখানেই তাহার উন্মাদিনী-সমা মাধুরীর সহিত দেখা হয়, তাহার অবস্থা দর্শনে, বিমলের পাষাণ প্রাণও বিদীর্ণ হয়, বোঝে তাহারই কপটতায় প্রণয়ে হতাশ হইয়া পাগলিনী-প্রায় অভাগিনী মাধুরীর এই অবস্থা ; বলে,—"মাধুরি ! আমি তোমার নিকট শত সহস্র অপরাধে অপরাধী ! আমায় মার্জ্জনা কর, তুমি মার্জ্জনা করলে, আমি অশান্ত-হৃদয়ে অনেকটা শান্তি পাব।" পরিশেষে মাধুরীর পবিত্র সরল প্রেমের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হয় ও মাধুরী আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা শুনিয়া, নিজেও সেই সঙ্গে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লয় ; মাধুরীকে ডাকিয়া বলে,—

"আয় মাধুরি আয়, আমার বুকে আয় ! ঐ সম্মুখে তরতরবাহী বিপুলকায়া ভাগীরথী ভীম প্রকৃতির সহিত মিলিত হ'য়ে আরও ভীমা মূর্ত্তি ধরেছেন, আয় দুজনে হেসে হেসে ওর ভিতরে যাই। তোতে আমাতে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে, প্রণয়ের অতুল কীর্ত্তি রেখে যাই। আয়, দুজনে এ পাপ পৃথিবী হ'তে চলে যাই। যেখানে শোক তাপ পাপ নাই, যেখানে বিচ্ছেদ নাই, যেখানে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, যথায় চিরশান্তি বিরাজিত, আয় মাধুরি ! সেইখানে যাই।"

গ্রন্থকার বিমলের মুখ দিয়া লালসার যে তত্ত্ব বলাইয়াছেন, আমরা তৎপ্রতি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

* * * *

প্রদোষ

"ঊষার" নায়ক প্রদোষ রাজপুত্র। রাজার তনয়ের যে যে সদ্‌গুণ থাকা উচিত, তাহার কোনটারই তাহাতে অভাব নাই। সে সুশ্রী, ধীমান, সুগায়ক, কবি, সরলবিশ্বাসী, বন্ধুবৎসল, অথচ কর্ত্তব্যপরায়ণ,

নিঃস্বার্থপ্রণয়াকাঙ্ক্ষী। উষাকে দেখিয়াই তাহার কবিতার উৎস খুলিয়া যায়, সে বলে—

বিমল রূপের ছটা, জ্যোছনা জিনিয়া ঘটা,
মুখশশী হেরি যার, সলাজে বদন
নীলাম্বরে পূর্ণশশী করে আচ্ছাদন!
মানস মোহন!
সুন্দর নয়ন যার, হেরিয়া মানসতার,
মৃদুল নিক্কণে বাজে হ'য়ে আত্মহারা!
প্রশান্ত অন্তর হয় পাগলের পারা!
বহে প্রেমধারা!
হেরিয়া যাহার বেণী, লুকায়ে বিষাদে ফণী,
বিম্বাধর নিরখিয়া অনুরাগে মরি
লতাচ্যুত হয় বিম্ব আপনা পাশরি!
অপূর্ব্ব সুন্দরী!
কত সুখ পাই মনে, মৃদু হাসি দরশনে,
বাহু যুগ হেরি যার, হেন মনে হয়,
মৃণাল কমল ত্যজি লয়েছে আশ্রয়!
সত্য কি তা নয়?
সুকোমল বক্ষ'পরি, জগতসৌন্দর্য্য হরি,
বিরাজিছে কুচগিরি গরবের ভরে!
শোভা দেখি গিরিধারী, হ'তে চায় নরে!
প্রাণ তুচ্ছ করে!

সে সরল, তাই সে উষাকে দেখিয়া নিজের মানসিক বিকারের কা বুঝিতে পারে না, বন্ধুকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করে। সে যে বন্ধুবৎ

তাহা আমরা বিমলের চরিত্রালোচনায় তাহারই উক্তি হইতে একাধিকবার দেখাইয়াছি। সে কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাই সে রাজকার্য্য ফেলিয়া প্রিয়তমার নিকট ছুটিয়া যাইতে পারে না, হৃদয়ের ব্যাকুলতা দমন করিয়া বিমলকে দূতরূপে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, ঊষার পিতা অন্যত্র তাহার বিবাহ স্থির করিয়াছেন জানিয়া, সে বলে,— "পিতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, তোমার অবশ্য প্রতিপাল্য। আমি অনেক ক'রে প্রাণ বেঁধেছি, চোখের জলে বুক ভেসে গেছে, নীরবে সয়েছি। তুমি আমায় ভুলতে চেষ্টা কর, আমিও তোমায় ভুলতে চেষ্টা করি। প্রাণপণ যত্ন ক'রে দেখবো, না পারি স্মৃতিভস্ম মেখে, তোমার প্রেমে যোগী হ'য়ে, তোমার চন্দ্রবদন ধ্যান ক'রে, জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত কোর্কো।" সে বরঞ্চ বিবাগী হইয়া যাইবে, তবুও ঊষাকে পিতার অবাধ্য হইতে উপদেশ দিবে না। ভালবাসিয়াই সে সুখী, প্রতিদানের অপেক্ষা সে রাখে না। সে কিছুতেই ঊষাহরণ প্রস্তাবে সম্মত নয়, শেষে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেও, স্বয়ং সে কার্য্যসাধনে অপারগ, তাহার অন্তরাত্মা এমন কুকার্য্যে শিহরিয়া উঠে, তাই সে বিমলের উপর সে কাজের ভার দেয়। সে সরলবিশ্বাসী, তাই সে ধূর্ত্ত বন্ধুর কূট চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। অবশেষে অনুচরের কপটতার পরিচয় পাইয়া, স্তম্ভিত হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ঊষা-বিয়োগে বিহ্বল হইয়া, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, মনে মনে ভাবে—

লালসায় তুচ্ছ কীট মানবনিকর!
বিমল প্রাণের সখা! প্রাণের বিমল,
ওহো! অবিশ্বাস কালকূট জগতের
পথে; ছি ছি মরীচিকা! ভ্রম-ভ্রম তুমি,

তুমিই এখানে। আয় ঊষা! দেখে যারে,
উদ্দেশ্য-উদ্যমহীন জীবন মাঝারে,
মিশাইয়ে হতাশ হুতাশ, পড়ে আছি;
সঙ্গী নাই, সুধু অশান্তির কোলাহল,
পিশাচের ভূতদ্বন্দ, বুকে ধরি, হায়!
পড়ে আছি। যেন এ জগতের নয়। যেন
নিরাশার অন্ধকূপে, আশার ছলারে
প্রহরী রাখিয়া, কল্পনার সুখ-ছবি
হৃদয়ে আঁকিয়া, স্ব-ইচ্ছায় বন্দী হ'য়ে
আছি। যবে তোর সেই মধুর কাহিনী,
একে একে স্মৃতি দ্বার খুলে, বিস্মৃতির
রাজ্য হ'তে টেনে নিয়ে এসে, শূন্য প্রাণ
পূর্ণ করি, সুখস্বপ্ন ধীরে ভেসে আসে
মানস নয়নে; ভবিষ্য কালের দ্বার
করি উন্মোচন, বিমোহন কত ছবি
ধরে দেয়। পাখী ডেকে ওঠে; সমীরণ
সকরুণে চুপি চুপি কত কথা কয়।
ফুটে ওঠে সোহাগে কুসুমরাশি। হায়!
মুছে গেছে আশার নিশানা। সে ঊষার
ঊষা আর না আসিবে। সুধু অন্ধকার!

এমন সরল, পবিত্র, নিঃস্বার্থ প্রেম বিফলে যায় না। তাই গ্রন্থকার পরিণামে ঊষার সহিত প্রদোষের মিলন ঘটাইয়া, অকৃত্রিম প্রণয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

* * * *

ঊষা

নাটিকার নায়িকা ঊষা। সে অপূর্ব্ব রূপসম্পদশালিনী। মদন সে রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া রতিকে বলিতেছে—

কি কহিব রূপের মাধুরী তার?
ছার স্থির সৌদামিনী!
দেখেছ কি বিনোদিনী,
শশাঙ্ক কৌমুদী সনে চপলা খেলিতে?
সে রূপের নাহিক তুলনা,
অতুলনা সে ললনা ধরামাঝে।

প্রদোষ ও বিমল উভয়েই ঊষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। কিন্তু হৃদয়ে অমল প্রেমের আবির্ভাবে সে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না, তাই প্রকৃত প্রেমিককে বাছিয়া লইতে তাহার কষ্ট হয় না,—প্রদোষকেই সে আত্মদান করে। প্রথম প্রণয়ের বেগে ও আশু অন্যত্র বিবাহের সংবাদে সে বিহ্বলা, সখী মাধুরী যে মনে মনে বিমলের প্রতি অনুরাগিণী, তাহা তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় না; তাহার প্রতি স্নেহের আতিশয্যে সে মাধুরীর পরিণাম চিন্তায় আকুলা হয়, ভাবে,—"মাধুরীও স্বইচ্ছেয় বুকের ভিতর আগুন জ্বেলেছে! সাধ ক'রে হলাহল পান করেছে, কে জানে র অদৃষ্টে হলাহল কি সুধা, কি হবে?"

প্রিয়তমের সহিত প্রথম মিলনে ও ভাবী চির-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আত্মহারা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা, অপর পুরুষকে আত্মদানের চিন্তাও াহার কাছে অসহ্য, তাই সে সাগ্রহে গৃহত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি য়। সেই জন্যই সে বিমলের প্রেম ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে, বলে,—

"ছি ছি ছি তুমি এমন! তোমায় যে আমি সরল বলে মনে

করতুম। তোমার মন এমন শঠতা পরিপূর্ণ, তোমার মন এত নীচাশয়, তা আমি জানতেম না। লৌহ পরশমণির স্পর্শে আরও কুৎসিত মূর্ত্তি হয়, মলয় হাওয়া লেগে এ যে চন্দন বৃক্ষের পরিবর্ত্তে বিষবৃক্ষ হয়েছে। হায়! হায়! তবে আর জগতের কাকে বিশ্বাস করবো?" "তুমি কেমন ক'রে ও সব কথা মুখে আনছ, তুমি কি রমণীর প্রাণ জান না? প্রাণ পেলে আমরা তার প্রতিদান দিই। প্রদোষ আমায় ভালবেসেছে, আমিও তাকে ভালবেসেছি, আমি যে এখন তার। যদি তুমি ঐ ছুরি দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন কর, যদি বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়, যদি দাবানলে পুড়ে মরি, তবু তোমার ও পাপ প্রস্তাবে সম্মত হব না। আহা! মাধুরী না বুঝে পাষাণে প্রাণ দিয়েছে! পাথরে কেমন ক'রে জল পাবে? ছি ছি তুমি এমন শঠ! এমন প্রতারক! একজন অবলার সর্ব্বনাশ ক'রে তাকে অকূলে ভাসিয়ে এলে? স্ত্রীলোকের সতীত্বই ভূষণ, অসতী নারী আর নরকের কীট এ দুয়ে কিছুই প্রভেদ নাই। তুমি আমায় সেই রতনহারা করতে চাও? ছি ছি ধিক্ তোমায়! তোমার নীচ মতিকে সহস্র ধিক্! আর আমি তোমার সঙ্গে যাব না, তোমার ছায়া স্পর্শ করবো না, আমি কুমারকে গিয়ে সব কথা বলবো, যেন তোমার মত দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যাগ করেন।"

অথচ সে করুণাময়ী, তাই বিমলকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে, কিন্তু শেষে সেই বিমল কর্ত্তৃক নিপীড়িতা হইবার ভয়ে, "দ্যাখ, কি করে সতী নারী সতীত্ব রক্ষা করে" বলিয়া, নদী-নীরে আত্ম-বিসর্জ্জন করে। পরিশেষে প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইয়া, অনন্ত সুখে সুখী হয়।

* * * *

উত্তরকালে অমরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। "ঊষা"তেও এই বিষয়ে তাঁহার পারদর্শিতা অতি সহজেই লক্ষিত হয়। আমরা নমুনা স্বরূপ "ঊষা" হইতে কয়েকখানি গান উদ্ধৃত করিয়া এইবার এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। গানগুলির রচনাচাতুর্য্য, ছন্দমাধুর্য্য, ভাষালালিত্য ও ভাবসম্পদ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পাঠক এইগুলি হইতে গীত-রচয়িতা হিসাবে অমরেন্দ্র-নাথের কৃতিত্ব কতকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মাধুরীর গীত—

বঁধু যেও না ভুলে।
পরাণে পরাণ আছে মধু উথলে॥
ফুটিয়াছে ফুল, গোলাপ বকুল,
বঁধু তুমি মধুপান কর কুতূহলে
গোলাপ বকুলে॥
যদি বঁধু ভুলে যাও, অমনি পরাণে দাও
অধিনী জীবন আগে বধিয়ে ছলে।
তবে যেও তো ভুলে॥

ঊষার গীত—

সেধে পর হ'তে চায় পাগলিনী প্রাণ।
কে জানে কেন সে হৃদি করেরে শ্মশান॥
পলকে আপন হারা, চিরসাথী আঁখিধারা,
হতাশ হুতাশে সারা, বিনা প্রতিদান॥
পেলে তার অযতন, চায় লো নিলাজ মন,
খুলে দিতে মন্ম বাঁধা বুকে চেপে সে বয়ান॥

অপ্সরাগণের গীত—

প্রাণের ব্যথা মুছে যাবে, শুকাবে তোর আঁখিজল।
ফুল্লপ্রাণে ফুটবে ওলো ছিন্ন হৃদি শতদল ॥
নাগরে আদর ভরে, রেখলো বুকে ধ'রে,
পলক হারা হওনাক, চোখে রেখ অবিরল ॥

মাধুরীর গীত—

চোখের দেখা দেখবো তারে, তাও কিরে পাব না ?
দেখবো সুধু মুখের হাসি আর ত কিছু চাব না ॥
সঁপেছি প্রাণ আপন জেনে, বাসে বা না বাসে মনে,
জীবনে মরণে প্রাণে ভাবিব তার ভাবনা ॥
আমারে ঠেলেছে পায়, ক্ষতি কিবা আছে তায়,
যার প্রাণ তার পায় মিশায়ে যাবে যাতনা ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:০:—

"মানকুঞ্জ" রচনা ও গৃহত্যাগ

গত তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে, অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার নৈতিক অধঃপতনে বিশেষ চিন্তিত হইয়া, অবশেষে তাঁহার চরিত্র সংশোধন মানসে হেমনলিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বিবাহের ফলে সত্যই তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। কুসঙ্গী, কু-অভ্যাস সমস্ত বর্জ্জন করিয়া, এখন তিনি ভাল ছেলের মত খান-দান, থাকেন অফিসে যাওয়া ছাড়া বাকী সমস্ত সময়ই গৃহে অতিবাহিত করেন। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর গত হইল। আত্মীয় স্বজন সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন,—ভাবিলেন, যাক্, ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

বিবাহের পর এই ন্যূনাধিক দুই বৎসরের মধ্যে একটী ব্যঙ্গ কবিতা রচনা ছাড়া, অমরেন্দ্রনাথের জীবনীতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় ১নং ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইবার জন্য নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন, তখন অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভোট সংগ্রহে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। মতিবাবু অমরেন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একজন খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে তাঁহার সহিত অমরেন্দ্রনাথেরও

খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মতিবাবুর প্রতিদ্বন্দীরূপে দ্বন্দে অবতীর্ণ হন—রায় পশুপতিনাথ বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। উভয়েই স্বনামধন্য ব্যক্তি, পরিচয় নিষ্প্রয়োজন এবং ভোটাধিক্যে তাঁহারা মতিবাবুকে পরাজিত করেন। ফলাফল যাহাই হউক, সেই নির্ব্বাচনদ্বন্দ তখনকার দিনে কলিকাতায় একটা বিরাট্ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রতিবাদী দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার "খিস্তিখেউড়" গাহিয়া সহর সরগরম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সব ব্যাপার উপলক্ষে অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত নিম্নলিখিত কবিতাটী মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হওয়াতে, সহরবাসীদের মনে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল।

১৮৯২ খৃঃ অব্দের ১নং ওয়ার্ডের ভাবী কমিশনার

টাকু

or

The False Prospective Commissioner.

যোগ্যজনে কার্য্যক্ষেত্রে হয় অগ্রসর।
মূর্খজনে করে সুধু মুখে আড়ম্বর॥

শুন্‌চি নাকি টাকু! তুমি কমিশনার হবে?
পাহাড় কোলে ফুট্‌বে হেলা; ভাব্‌না কি আর তবে!!
বানরেতে গাইবে গান—ভাস্‌বে শিলা জলে।
আকাশ কুসুম ফুট্‌বে বাপু! তোমার পুণ্যফলে॥
দাদার হাল—তোমার হাল—জানতে বাকি নাই।
(এখন) 'হঠাৎ নবাব' হ'য়ে পড়ে, এত বড়াই তাই॥
সূক্ষ্ম নাকে সা'সী দিয়ে—উঁচু চালে চাওয়া।
চেন ঝুলিয়ে—বুক ফুলিয়ে—কমিশনার হওয়া॥

(তুমি) 'মেনীর' সনে, প্রমোদ মনে ক'রবে মধুর কেলী!
(সে) আওয়াজ দেবে 'মিউ মিউ'—ব'ল্‌বে মিঠে বুলি!!
(তার) মুখের পানে চেয়ে চেয়ে, শুন্‌বে প্রেমের কথা!
মার্‌বে ঝাঁটা মাগের মুখে,—বুকে দেবে ব্যথা॥
'মেনী' নিয়ে—গাড়ী ক'রে বাগানেতে যাবে।
ফ্রেণ্ড জুটিয়ে—ফিষ্ট দিয়ে, খোস্‌-খোস্‌ নাম পাবে॥
দিন ক'রবে ভোর তুমি ঘুরে বাজে কাজে।
এ সব কাজ আড়ৎদারের—কখন কি হে সাজে!
(তোমার) লজ্জা সরম আবাগের পো! এতটুকু আছে?
না হ'লে কি খুড়ো-ভাইপোয় লাগ একের পাছে!
যেমন আছ তেমনি থাক,—বাড়াবাড়ি ক'রে!
লোক হাসাবে, জন চলাবে, বল কিসের তরে!!!

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণীর সন্তান সম্ভাবনা হওয়ায়, তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ১২৯৯ সালে, ১৫ই ফাল্গুন তারিখে (ইং ১৮৯৩ খৃঃ) তিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন—মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে অমরেন্দ্রনাথ পুত্রের পিতা হইলেন। আদর করিয়া পুত্রের নামকরণ হইল—নসীরাম। অবশ্য এটা তাহার আটপৌরে নাম—পোষাকী নাম রাখা হইল, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, তখনও থিয়েটারী চিন্তায় অমরেন্দ্রনাথের মন কতখানি সমাচ্ছন্ন, তাই প্রিয় পুত্রের ডাকনাম হইল গিরিশচন্দ্রের "নসীরাম" নাটকের অনুকরণে—নসীরাম বা নসু।)

এদিকে বাড়ীতে স্ত্রী নাই। কুসংসর্গ অমরেন্দ্রনাথ ছাড়িয়া দিয়াছেন, সুতরাং কি করিয়া সময় কাটাইবেন, তাহা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সমস্যাপূরণ করিবার জন্য আবার তিনি কলম

ধরিলেন। থিয়েটারের দিকেই তাঁহার ঝোঁক, সুতরাং এবারও লেখনী ধারণের ফলে একটী গীতিনাট্য রচিত হইল। শ্রীরাধার মানের ফলে শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার কুঞ্জ ত্যাগ ও চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হইবার পর রাধার সহিত পুনর্মিলন, এই ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ "মানকুঞ্জ" নামে, দুই অঙ্কে বা চারিটী গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ, একটী গীতিনাট্য লিখিলেন। গ্রন্থখানি বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে, "কলিকাতা, ২নং হরিমোহন বসুর লেন, 'নূতন কলিকাতা যন্ত্রে' শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত" হইয়া, স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। মুদ্রিত পুস্তক মাত্র ২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; সুতরাং ইহার স্বল্পায়তন সহজেই অনুমেয়। উত্তর-কালে, এই গীতিনাট্যখানি "শ্রীরাধা" নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয় ও ঐ নামে "অমর গ্রন্থাবলী"ভুক্ত হইয়া ছাপা হয়। তাই আমরা আর ঐ গ্রন্থের সমালোচনায় ব্যাপৃত হইলাম না।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিতে অমরেন্দ্রনাথের বেশী সময় লাগিল না, সুতরাং শীঘ্রই আবার কালক্ষেপনের উপায় উদ্ভাবন এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। গীতিনাট্য রচনার ফলে থিয়েটারী চিন্তায় মাথা একটু বেশী "মস্‌গুল" হইয়াছিল, তাই ঘন ঘন থিয়েটার দেখা সুরু করিলেন। ক্রমশঃ আবার কুসঙ্গী আসিয়া জুটিল ও তিনি আবার কু-অভ্যাসে রত হইলেন। ফলে,—বাড়ী আসাও কমিতে লাগিল।

ব্যাপারটা অমরেন্দ্রনাথের জননীর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি বিপদ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বধূ হেমনলিনীকে পিতৃগৃহ হইতে হাতীবাগানে আনাইলেন। কিন্তু এবার আর পত্নীর আগমনে অমরেন্দ্রনাথের চরিত্রের কোন সংশোধন হইল না। হেমনলিনী কিশোরী, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, অসীম ধৈর্য্যশালিনী। পতির মতির পরিবর্ত্তন বুঝিতে তাঁহার দেরী হইল না; কিন্তু সে জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা হাজার ব্যথায় ব্যথিত

হইলেও, তাঁহার বাহ্যিক প্রফুল্লতার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না,—মুখের হাসিটী মুখে লাগিয়াই রহিল। তাহা ছাড়া, পতির অসচ্চরিত্র সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলা, তিনি অতি গর্হিত কাজ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাই বধূর নিকটে পুত্রের সংবাদ জানিতে চাহিলে, হেমনলিনীর উত্তরে, অমরেন্দ্রনাথের জননী যথার্থ ব্যাপারের কণামাত্রও জানিতে পারিতেন না।

পত্নী আসার পর, অমরেন্দ্রনাথ কিছু দিন ভয়ে ভয়ে কাটাইতেছিলেন ও তাঁহার যথেচ্ছাচারের বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া, হেমনলিনীকে পুনরায় পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার ছল খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে স্ত্রীকে কোন উচ্চবাচ্য না করিতে দেখিয়া, তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল, যথাপূর্ব্ব থিয়েটার দেখিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। শেষে একদিন ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়া, তাঁহার জীবনে এক মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল; এই দিন থিয়েটারে যাওয়ার ফলে তাঁহার জীবনের ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিল। হয় ত এই দিন থিয়েটারে না যাইলে, এই গ্রন্থের বাকী অংশ অন্যভাবে লিখিবার প্রয়োজন হইত।*

---

* অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই দিন হইতে সুরু করিয়া নটজীবনের সূচনা পর্য্যন্ত তাঁহার সাংসারিক জীবনের ইতিবৃত্ত, গল্পচ্ছলে "অভিনেত্রীর রূপ" নামক উপন্যাসে, লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, অমরেন্দ্রনাথের জীবনে সেগুলি যথাযথভাবে ঘটিয়াছিল। আমরা এখানে তন্মধ্যস্থ প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব মাত্র। কৌতূহলী পাঠক "অভিনেত্রীর রূপ" পড়িয়া দেখিলে এই সব ব্যাপারের বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবেন। তবে পাঠকালে তাঁহার এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, জীবিত ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করিয়া অমরেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ রচনা করেন। সেই জন্য উপন্যাসের পরিসমাপ্তি করিবার জন্য তিনি যে সমস্ত

সেদিন ষ্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখরের প্রথম অভিনয় রজনী,—তারিখ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্য দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার দেখিতে গেলেন। শৈবলিনী-রূপী তারাসুন্দরীর অপূর্ব্ব অভিনয় তাঁহার প্রাণে এক অননুভূত সাড়া জাগাইয়া দিল। এরূপ জাগরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যাহা, তাহা ঘটিতেও বিলম্ব হইল না। অমরেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ রাত্রে বাড়ী আসা বন্ধ করিলেন।

ব্যাপারটা বেশী দিন চাপা রহিল না। অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর ধীরেন্দ্রনাথ, ভ্রাতার কীর্ত্তিকলাপ জানিতে পারিয়া, একদিন তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথের আত্মাভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল; তিনি স্থির করিলেন যে, বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া পৃথক্ হইবেন। জ্যেষ্ঠকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিয়া, তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর নাগাদ (বাংলা ১৩০১ সালে), হাতীবাগান বাড়ী ত্যাগ করিলেন। স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, সহোদর-দিগের সহিত একপ্রকার সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়া, বৃদ্ধা মাতার বুকে বজ্রাঘাত করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ মাণিকতলা বাগমারী রোড-স্থিত পৈতৃক বাগান বাটীতে বাসা বাঁধিলেন। তিনি যে কত বড় সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অগ্রজেরা যে সমাজের কিরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, এ সকল কথা একবারও তাঁহার মনে হইল না। তিনি পাপের মুখে গা ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এতদিনে তাঁহার নাট্যসাধনার সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত হইল

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার কল্পনাপ্রসূত। একবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থে যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা বাস্তবিক জীবনে ঘটে নাই

বাগানে বন্ধুবর্গসহ অমরেন্দ্রনাথ।

দক্ষিণ হইতে—গিরিধারী (অমরেন্দ্রনাথের প্রিয় ভৃত্য), অমরেন্দ্রনাথ, দানিবাবু, নেপেনবাবু, নন্তুবাবু, নিখিলবাবু। নিম্নে উপবিষ্ট—সতীশবাবু (গালে হাত দিয়া) প্রভৃতি।

বাগানে আসিয়া তিনি নাট্যচর্চ্চার ধূম লাগাইয়া দিলেন; নূতন থিয়েটারের দল বসাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। প্রধান সঙ্গী—দানি বাবু, চুণি বাবু, নেপেন বাবু, নিখিল বাবু ও সতীশ বাবু। তাঁহারা তাঁহাকে নানাবিধরূপে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, ভরসা দিলেন—রঙ্গমঞ্চের নায়িকার উপযোগী তৈয়ারী অভিনেত্রী তো হাতেই রহিয়াছে, তাহা ছাড়া তাঁহারাও তো আছেন! নেপেন বাবু নাচ শিখিতে লাগিয়া গেলেন।* দলের নাম ঠিক হইল—ইণ্ডিয়ান্ ড্রামাটিক্ ক্লাব। হৈ চৈ করিয়া থিয়েটারের মহলা চলিতে লাগিল।

এদিকে বাড়ীতে সম্পত্তি বিভাগের ব্যবস্থা যথারীতি চলিতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথেরা চারি ভ্রাতায় মিলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়, প্রসিদ্ধ এটর্ণী নিমাইচরণ বসুকে এ ব্যাপারে সালিসী নিযুক্ত করিলেন। ঠাকুরাণী প্রথমে ব্যাপারটা অত তলাইয়া বোঝেন নাই, শেষে সমস্ত অবগত হইয়া, অমরেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, ভ্রাতৃবিবাদের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ নিরীহ ভাল মানুষ সাজিয়া গেলেন, বলিলেন,—"কিছু না, আমি মাত্র আমার আপিসের পুরা মাহিনাটা আমার নিজের খরচের জন্য চাহিয়াছিলাম, তাহাতে দাদারা রাজী নন। সুতরাং এ অবস্থায় সম্পত্তি বিভাগ ছাড়া উপায় কি?"

অমরেন্দ্রনাথের জননী তো আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন,—

---

* "রঙ্গালয়ে নেপেন" শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'অমর দত্তের সুযোগ্য অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) সহিত তাহার কুটুম্বিতা আছে চুণি, নিখিল, দানি—অমরের বাগানে যায়। আমরা সব যেন ভাই ভাই। * * (নৃত্য সম্বন্ধে) নেপেন উত্তর করিল—"হাঁ, তিনের পা, পাঁচের পা, সাতের পা সব জানি আমি "তারার" নিকট বাগানে শিখিয়াছি।" (তারা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী)।

"বল কি? এ কি কখন হইতে পারে? বেশ, তাহাই যদি তোমাদের মনোমালিন্যের হেতু হয়, তাহা হইলে আমি তোমার বড় দাদার সহিত এ বিষয়ে কথা কহিয়া, তোমাদের বিবাদের কারণ দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তুমিও তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বল।"

২।৪ দিন পরে অমরেন্দ্রনাথ গিয়া জ্যেষ্ঠাগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইতিমধ্যে মাতাঠাকুরাণী আসিয়া ধীরেন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতাকে দেখিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কালু, শুনিলাম, তুমি তোমার আপিসের পুরা মাহিনা পাও না ও সেই জন্যই তুমি গৃহত্যাগী এবং সম্পত্তি বিভাগে উদ্যত। এ কথার অর্থ কি? কাহাকেও তো তুমি তোমার মাহিনার কোন অংশ দাও নাই, অথবা কেহ তাহা চাহেও নাই; সুতরাং তোমার এরূপ কথা বলিবার কারণ কি? তাহা ছাড়া তুমি কাহাকেও এরূপ অংশ দিবেই বা কেন? সত্য বলিতে কি, তুমি তোমার মাহিনার সমস্ত টাকাই লইতে পার, উহার উপর আমাদের কাহারও কোন লোভ নাই।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"না, কথাটা ঠিক তাহা নহে। জানেন কি না জানি না, যত দিন আমার স্ত্রী এখানে ছিল, তত দিন তাহার ও আমার ছেলের জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের খরচ যোগাইতে গেলে, মাহিনার টাকায় আমার নিজের খরচ কুলায় না। তাই আমি আমার মাহিয়ানার পুরা টাকাটা আমার নিজের খরচের জন্য চাই।"

ধীরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তোমার এ কথার অর্থ কি? তোমার নিজের স্ত্রীপুত্রের জন্য স্ব-ইচ্ছায় তুমি খরচ করিয়াছ, অথচ তুমি সে ব্যয় করিতে রাজী নও। তুমি ইহার দ্বারা

কি এই কথা বলিতে চাও যে, তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনে অসম্মত ?"

অমরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,—"অর্থ আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের ব্যয় বহনে আমি অসমর্থ।"

ধীরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"তুমি যে মাহিয়ানা পাইতেছ. তাহাতে একটা বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করা চলে। অথচ তুমি তাহা হইতে তোমার স্ত্রীপুত্রের জন্য সামান্য ব্যয়েও কুণ্ঠিত ? কেন ? তাহারা কি বানের জলে' ভাসিয়া আসিয়াছে নাকি ? তুমি না দেখিলে, তাহাদের দেখিবেই বা কে ?"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনারা আমার বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং আমার স্ত্রীর ভরণপোষণ, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদির যাবতীয় ব্যয় আপনারাই করিবেন। না পারেন, তাহাকে এখানে আনিবার প্রয়োজনই বা কি ? বেশ তো বাপের বাড়ীতে আছে, সেইখানেই থাকুক।"

ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলিলেন,—"হ্যাঁ, সে এখানে থাকিলে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতায় বিশেষ ব্যাঘাত হয়, সুতরাং সে বাপের বাড়ী থাকিলে, তোমার খুব ভাল হইবেই ত'! না, আমি তোমার ঐরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। তোমার মাহিয়ানার বিষয় আমার কিছু বক্তব্য নাই, অবশ্যই তুমি তাহার সম্পূর্ণ ভাগই পাইবে। তবে তোমার স্ত্রীপুত্রকে অন্যত্র ফেলিয়া রাখা হইবে না অথবা তাহাদের প্রতিপালনে তুমি অসম্মত হইলেও চলিবে না।"

দাদার কথায়, মনে মনে খুবই চটিয়া গিয়া, অমরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলেন ও মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা না করিয়া স্থানে চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথের জননী বিশেষ চিন্তিতা হইয়া

পড়িলেন ; পুত্রকে যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলায়, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন :—

মা !

আপনি দেখা করিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি কোন মুখ লইয়া দেখা করিব ? কোনও কিছুই করিতে পারিলাম না, কি করিব—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনার নিকট যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে কেবলমাত্র আমার আপিসের মাহিনাটা আমি লইব, তাহা হইলে আর আমার বখরা টকরা চাই না। এবং আপনার পরামর্শমত দাদাদের কাছে এ প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাব শুনিয়া কেমন করিয়া হইতে পারে বলিয়া অসম্মত হইয়াছেন।

তবে আর আমি কি করিব বলুন ? এক্ষণে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াছি, দেখি আমার কি হয়—

যাহা হউক, কাল সন্ধ্যার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনি যেরূপ ভাল বোঝেন, করিবেন।

স্নেহাবনত

শ্রীঅঃ—

কার্য্যতঃ কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মাতার সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠি না। কেমন করিয়াই বা হইবে ? তিনি তখন বাগানে দিবারা নানাবিধ আমোদ প্রমোদে মত্ত, নূতন থিয়েটারের দল গঠনে ব্য সুতরাং জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার অবসরই বা কোথা মাতাঠাকুরাণী তখন পুত্রের অনুপস্থিতির কারণ জানিবার জন্য, সঠি সংবাদ আনিতে বাগানে লোক পাঠাইলেন। বার্ত্তাবহের মুখে

বিবরণ শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মন যুগপৎ দুঃখ, ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। নিতান্ত খেদে তিনি অমরেন্দ্রনাথকে একখানি কড়া চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাহার জবাবে লিখিলেন,—

মা!

আপনার পত্রে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার উত্তর চিঠিতে লিখিয়া হয় না!—তবে এ কথা আমি বলিতে পারি,—বখ্‌রা করিয়া, আলাদা হইয়া, লোক হাসান আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি যে কত দুঃখে বাড়ী ছাড়িয়াছি, ঈশ্বর জানেন।—

অনেক কথা আপনার অজানিত আছে; সে সকল কথা শুনিলে হয়ত' আপনি কতক বুঝিবেন; এক মুখে শুনিয়া, কোনও পক্ষকে দোষী করা যায় না।

আমি জানি, মার চক্ষে জল ফেলাইয়া, কখনও উন্নতি করা যাইতে পারে না!—কিন্তু মা যদি একটা ভুল বুঝিয়া, চোখের জল ফেলেন, তার জন্য কে কতদূর দোষী বলিতে পারি না। তবে আগামী রবিবারে যদি আপনার সুবিধা হয়, বলিয়া পাঠাইবেন, আমি গিয়া সকল কথা বলিব। তারপর যদি ইচ্ছা করিয়া,—সকল কথা আপনাকে শুনাইয়া, আপনার মতানুসারে কাজ না করি, তাহা হইলে বটে, ভগবানের কাছে দোষী হইব। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাকে কোনও মতে দুষিতে পারা যায় না।

আমি জানি, আমার ভায়েদের মধ্যে, মেজদা খুব ভাল। অবিচার নাই। বড়দারও মন খুব ভাল। কিন্তু পাঁচ ব্যাটা পাজী বাইরের লোক,—আমার কাছে এক রকম, ওঁর কাছে এক রকম করিয়া,—ওঁর মন আমার উপর এত চটাইয়া দিয়াছে, যে আমার উপর হইতে স্নেহ একেবারে গিয়া এখন সম্পূর্ণ বৈরীভাব দাঁড়াইয়াছে; যাহা হউক, পর পরই রহিবে, ভাই কখনও পর হইবে না, যতই মুখ বেঁকাবেঁকি থাকুক, একবার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে, আর সে ভাব থাকিবে না।

কিন্তু ব্যবহারগুলো অসহ্য হইলেই, প্রাণের জ্বালায় একটা করিতে হয়।—

সব কথা সাক্ষাতে বলিব। আর আমার কুপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, আমি স্বীকার করিতেছি, আমি দোষী কিন্তু কি করিব—যে দোষে অতি শৈশব হইতে অভ্যস্ত একেবারে ছাড়ি কি করিয়া?

আপনার কাছে, মুখে এক কথা, পেটে অন্য কথা বলা আমার অভিপ্রায় নহে।

আর ও সব একটু দোষ, আজ কাল নাই কার? [illegible] বলিয়া আমিও কাজ ভাল করিতেছি, তা নয়। তবে এই অবধি বলিতে পারি, ক্রমে ক্রমে ছাড়িব। আর যত শোনেন, ততটা নহে। কারণ কথার দস্তর একটার জায়গায় দশটা হয়।

কিন্তু এ কথা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, আগেকার [illegible] অনেক কমিয়াছে। আপনি বিশ্বাস না করেন কি করিব?

১টা আংটী ভাল পছন্দ হয় নাই। বড় মেড়্মেড়ে, একটু ওরি মধ্যে ভাল দেখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়—

হতভাগ্য

শ্রীঅঃ—

(১৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।)

পরের রবিবারে আর অমরেন্দ্রনাথ মাতার সহিত দেখা করিতে ভুলিলেন না। মাতা জানাইলেন যে, চিরজীবনের মত বৌমাকে পিতৃগৃহে রাখিয়া দিবার মত নীচ প্রস্তাবে দাদারা ত' দূরের কথা, কেহই সম্মত হইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাপার লইয়া যদি অমরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃকলহে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সকলে নাচার। উত্তরে, অমরেন্দ্রনাথ মাহিনার টাকায় তাঁহার সমস্ত খরচ সঙ্কুলান করিতে না পারার কথা জানাইলেন। মাতাপুত্রে নানা আলোচনা হইল—অবশেষে অমরেন্দ্রনাথ কাল তাঁহার শেষ কথা জানাইবেন বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় লইলেন। পরদিন নিম্নলিখিত পত্রখানি অমরেন্দ্রনাথের জননীর হস্তগত হইল ঃ—

মা!

কাল যে সকল কথা আমি বলিয়া আসিয়াছিলাম, বোধ হয় আপনার বিবেচনায় অসঙ্গত ঠেকে নাই।

আসিবার সময় বলিয়া আসি, যে আজ কোন কথা কওয়ায় কাজ নাই; আমি আমার সমস্ত খরচ খতাইয়া, অর্থাৎ আমার নিজের, গাড়ী ঘোড়ার, ঝি চাকরের, বামুন, ধোপা, নাপ্তের, সকলের খাওয়া দাওয়া, কাপড়

চোপড়, ডাক্তার, ওষুধ ইত্যাদি সমস্ত খতাইয়া, তবে বলিয়া পাঠাইব।

কাল আমি বিশেষ করিয়া সব খতাইলাম।

যখন একটা রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তখন আজ এক রকম, কাল আবার টানাটানি পড়ার দরুণ আর এক রকম,—এরূপ কথাবার্ত্তা কওয়া হইতে পারে না, আর আমি কহিবও না। আর এ ত' এক রকম ভারি বাঁধাবাঁধি ব্যাপার হইতেছে।

আমি সকল খতাইয়া দেখিলাম, আমার যা মাহিনাটা, সেটা চাই, আর কাল—যে দুই বিষয়ের পরিবর্ত্তে ১০০৲ টাকার কথা বলিয়াছিলাম, তার উপর আর ২০৲ টী টাকা চাই।

এই হইলেই আমার সংসার, বা আমার যা কিছু খরচ হইবে, আমি ঠিক চালাইয়া লইব। বক্‌রার আমার দরকার নাই। তবে আমার যা দেনা আছে, সেইগুলি প্রথমে আমার বক্‌রা হইতে শুধিয়া দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা হইলে, যদি কখনও একটু বেচাল দেখেন, তখন এক কথা বলিলে, সওয়া যায়।

আর সেই আংটী বদলাইয়া আর একটা পাঠাইয়া দিবেন। একটু দেখিতে ভাল।—আর যদি সুবিধা হয়, ৩।৪ জনের মত পিঠে পাঠাইয়া দিবেন। বোধ হয়, একদিনের জন্য এ কষ্টটুকু লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীঅঃ—

১৮ই জানু, (১৮৯৫)

উত্তরে মাতাঠাকুরাণী অমরেন্দ্রনাথকে বাড়ীতে আসিয়া দাদা
সহিত এ সকল ব্যাপারের যথারীতি আলোচনা করিতে বলিলে
তাঁহার পত্রে অন্য যে সকল ব্যাপারের উল্লেখ রহিল, অমরেন্দ্রনাথ
সমস্ত কথারও উত্তর দিয়া মাতাকে লিখিলেন ঃ—

মা !

আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, সেই অনুসা
ব্যবস্থা হইলে, আমি বাড়ী একেবারে ছাড়িবার কে
প্রয়োজন বুঝি না।

আপনি লিখিয়াছেন, "বাড়ীতে আসিয়া বন্দোবস্ত ঠি
করিবার জন্য; কিন্তু ওই টুকুতে আমায় অবাধ্য হইতে হইবে
কারণ যে উদ্দেশ্য বদ্ধমূল করিয়া, আমি বাড়ী ছাড়িয়াছি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সুবন্দোবস্ত না হয়, আমি ছা
পর্য্যন্ত স্পর্শ করিব না। আমার এইরূপ পণ। বে
হয়, আপনার অবিদিত নাই, আমার এ ক্ষুদ্র জীবন প
চলিতেছে। আশৈশব কেবল পণের বশেই ফিরিয়াছি
যদি বন্দোবস্তই স্থির হয়, তবে দুদিন আগু পাছুতে ক্ষতি কি

যাহা হউক, আজ খবর দিবেন লিখিয়াছেন,—
খবর হয় বলিয়া পাঠাইবেন।

তারপর মাগী নিয়ে ঘর করা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে
কথাটার মূলে কতটা সত্য, প্রথম দেখা উচিত। যতা
শুনিয়াছেন, ততটা নয় বটে, তবে কিছুই যে নহে, এম
নয়। আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমি মা! এসক

কথা তোমার সহিত কওয়া যায় না! তবে নেহাৎ প্রাণের দায়ে!"

কিন্তু ও ধারণাটা আপনার সম্পূর্ণ ভুল। ছেলেকে বাপ বুঝায় না কি? আবার ছেলেও বাপের বেচাল দেখিলে বুঝায়! ইহাতে দোষ নাই। বাপ, মা সমান বটে ত'। এখন আমাদের বাপ নাই, বাপের যা কাজ, যা কিছু বোঝান, আপনার করা উচিত। সে স্থলে আমার বিবেচনায় 'প্রাণের দায়' কথাটা না লিখিলে ছিল ভাল।

আর আমারও ও কথার উত্তর দেওয়া উচিত। কারণ, বাপ বুঝাইলে ছেলে তো উত্তর দেয়! আপনি লিখিয়াছেন, —"আমি আর এক বৎসর এখানে থাকিব,—তার পর যা করিতে হয় করিও।"

আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ও কথাগুলো বলা কি ভাল হইয়াছে? আজ আগুনে পুড়িও না, এক মাস বাদে পুড়িয়া মরিও!—এ যে সেইরূপ কথা।

হয়ত' বলা যায় না, এক বৎসর মধ্যে আমার প্রকৃতি স্বতন্ত্রের দাঁড়াইতে পারে।

তবে আপাততের কথা, আপনি মা, আপনার কাছে একটা কথা কঁহিয়া, শেষ মিথ্যা দাঁড়াইবে, এ ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে আমি নারাজ। যা বলিব, সত্য কথাই বলিব।

এমন মানুষ নাই, যে আত্মবশ নহে। সকলেরই আত্মার তৃপ্তি করিতে হয়। তবে সু—কু—দুই আছে। কুটাকে যত চাপিতে পারা যায়, ততই ভাল। আমার বর্ত্তমান অবস্থা অনুকরণ করিয়া বলিতেছি,—আমি যে একেবারে নিষ্কলঙ্ক

চাঁদ হইব, এ আশা করি না। তবে যতদূর পারা য
তবে এ কথা বলিতে পারি, পরিবেষ্টিত স্বভাব, (
নির্জ্জন সঙ্গমের দিকে ফিরিয়াছে। অনেক পরিবর্ত্তন!

শ্রীঅঃ—

বাড়ীতে আসিয়া বন্দোবস্ত ঠিক করিবার প্রস্তাবে অমরেন্দ্রনা
আপত্তির মূলে কিন্তু অন্য একটী বিশেষ কারণ ছিল। ইতিমধ্যে বা
তিনি খরচপত্র বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি স্থরু করিয়াছিলেন যে, মা
চার পাঁচ হাজার টাকার কমে তাঁহার খরচ কুলাইত না। সং
অন্ততঃ দুই দিন বড় রকমের ভোজের আয়োজন হইত;—"পেলি
খানা যোগাইত, "পমারি শ্যাম্পেনে"র স্রোত বহিতে থাকিত—কে
পান করিবে কর! নূতন থিয়েটার খুলিবার অভিপ্রায়ে দল ব
হইয়াছিল বটে, অভিনয়ের জন্য পুস্তকও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল—'পল
যুদ্ধ': কিন্তু নাটকের মহলা যত চলুক বা না চলুক—চব্বিশ ঘণ্টাই
বর্গের আমোদ প্রমোদের তুফান বহিতেছিল। এ অবস্থায় মাহিয়
টাকায় তাঁহার কুলাইবে কোথা হইতে? হাণ্ডনোটে টাকা সংগ্র
কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও সেই উপায়ে
সংগ্রহ চলিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ঋণের পরিমাণও
অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইল
হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাই (
টাকার অভাব হওয়ায়, অমরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের
হইতে দশ হাজার টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ উ
জানাইলেন যে, 'এষ্টেটে এমন কিছু নগদ টাকা মজুত নাই যে, অম
নাথ চাহিবামাত্রই তিনি তহবিল হইতে এক কথায় দশ হাজার

বাহির করিয়া দেন। এ অবস্থায় অমরেন্দ্রনাথ টাকার জন্য যদি একান্ত পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া ছাড়া টাকা সংগ্রহের অন্য কোন উপায় নাই।'—অপব্যয়ের জন্য অমরেন্দ্রনাথ এই রকম করিয়া টাকা চাওয়াতে ধীরেন্দ্রনাথ যে কতখানি বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এ হেন সময়ে অমরেন্দ্রনাথের শেষ চিঠিখানি পাইয়া, তাঁহার জননী ধীরেন্দ্রনাথের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে অমরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপত্রোক্ত প্রস্তাব জানাইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা সম্পত্তিবিভাগ শ্রেয়স্কর। মাতাকে সমস্ত ব্যাপার ভালরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি বলিলেন,—"ঢাখ মা, তুমি জিনিষটাকে যত সহজ ব্যাপার মনে করিতেছ, আসলে কিন্তু ইহা তত সহজ নয়। কালুর এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা বিষয় ভাগ হইয়া যাওয়া ঢের ভাল। কেন, বুঝাইয়া বলিতেছি শোন।—যত দিন না বিষয় ভাগবাঁটোয়ারা হয়, তত দিন চার ভাইয়েরই পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির উপর তুল্য অধিকার। সেই অধিকারের বলেই কালু আজ বলিতেছে যে, তাহাকে মাসিক ১২০৲ করিয়া দেওয়া হউক ও তাহার দেনা তাহার অংশ হইতে শোধ করিয়া দেওয়া হউক। শুধু তাই নয়, সে কাল আবার আমার নিকট হইতে দশ হাজার টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছে। ব্যাপারটা যদি এখানেও শেষ হইত, তাহা হইলেও না হয় কথা থাকিত। কিন্তু তুমি কি এমন কোন অঙ্গীকার করিতে পার যে; এইখানেই তাহার খাঁইয়ের নিবৃত্তি হইবে? বিষয় যদি অবিভক্ত অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সম্পত্তির উপর অধিকারবলে সে যে পুনরায় দেনা করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সে যেরূপ কাপ্তেনী করিতেছে শুনিতেছি, তাহাতে আবার তাহার এরূপ

দেনা না হওয়াই আশ্চর্য্য। তা' ছাড়া, সে যে পুনরায় তিন মাস
আমার নিকট হইতেও বিশ হাজার টাকা চাহিবে না, এমনই বা
ভাবিলে কেন? সুতরাং এই ভাবে যদি আমি তাহার যথেচ্ছাচা
খোরাক যোগাইয়া যাই, তাহা হইলে সে একা নয়, আমরা স
ভ্রাতাই সর্ব্বস্বান্ত হইব। তাহার চেয়ে সম্পত্তি বিভাগ হইয়া যাউক
নিজের অংশ লইয়া যাহা খুসী করুক। আমাদের কাহারই সে ব
থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

সমস্ত শুনিয়া, পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অমরেন্দ্রনাথের জননী ব্যা
হইয়া পড়িলেন ও তাঁহাকে সৎপথে আনয়নোদ্দেশ্যে উপদেশপূর্ণ
দীর্ঘ পত্র লিখিয়া, অমরেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু "
না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী!" ভাল ফল হওয়া দূরে থাক্, অমরেন্
তাহার উত্তরে উদ্ধতভাবে মাতাকে লিখিলেন :—

মা!

আপনি যে লিখিয়াছেন, আমি সুন্দরী স্ত্রী যে
এখানে একটা বাঁদর মাগী নিয়ে আছি! অবস্থা
বুঝিতেছি না। এটা আপনি বড়ই ভুল বুঝিতে
প্রথমতঃ মাগী নিয়ে পড়ে আছি, এ কথাটা যতদূর
হইতে পারে। তবে একেবারে যে নির্দ্দোষ, তা বলি
না। আপনি মা, আপনার কাছে মিছা বলিতেছি
তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। কেন যে
বাপের বাড়ী রাখিয়াছি, তাহা বোধ হয় জানে
আমার আপাততঃ আপিসের মাহিনা ভরসা। বি
মাহিনায়, স্ত্রীপুত্র আনিয়া, রীতিমত দাসদাসী রে

গাড়ীঘোড়া রাখিয়া কোনও মতেই চলে না। ভাগ হইলে দুই আয় মিশাইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া চালাইব। এ কথা বলিতে পারেন, আপাততঃ বাড়ী ছাড়িলে কেন? না ছাড়িলে তো আর এ ঝক্কি বোধ করিতে হইত না! স্ত্রীপুত্র লইয়া যেমন ছিলে তেমন থাকিতে!

কিন্তু বাড়ী ছাড়িবার সব কারণ আপনাকে বলিয়াছি। আপনি একটু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন, সে পক্ষে কতটা দোষ করিয়াছি? তবু আমি আবার বাড়ীতে যাইতে রাজী ছিলাম; এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা আপনাকে বলিয়াছিলাম। ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি, আমি কি বড় মন্দ ব্যবস্থা বলিয়াছিলাম? আপনিই বলিয়াছিলেন, "ইহাতে দাদাদের আপত্তি করিবার কোনও কারণ নাই।" এবং যে যে লোক ও ব্যবস্থার কথা শুনিয়াছিল, সকলেই একবাক্যে, যুক্তিপূর্ণ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছে।

কিন্তু স্নেহময় দাদারা আমার, সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আপনি কি বুঝেন নাই, আমার দোষ কতটা? আপনার প্রাণ কি আমি বুঝিতেছি না?

আপনি কি করিবেন, হাত পা বাঁধা! খাতিরে কিছু বলিবার যো নাই!—যাহা হউক, আমার শেষ কথা, আপনাকে তো সকল কথা বলিয়াছি, আমার পণও আমি আপনার কাছে জানাইয়াছি। সকল দিক বজায় করিয়া, বেশ বিবেচনাপূর্ব্বক, যা ভাল ব্যবস্থা হয়, আমাকে বলিবেন, আমি মাথা পাতিয়া করিব।

আর চাকরী তাল্‌পাতার ছায়া, ইত্যাদি যুক্তিপূর্ণ কথা

বলিয়া ভবিষ্যতের কথা বলিয়াছেন, আপনি কি মনে কে
আমি ও সকল কথা ভাবি না? কি করিব? আপাত
উপায় নাই। তবে যতদূর চাপিয়া পারিতেছি, চলিতে
যতটা খরচের কথা শোনেন, সমস্তই মিথ্যা। আমা
বিশ্বাস করুন। যা ধার—সব আগেকার।

আর অদৃষ্টবৈগুণ্যে যদিই আমি সর্ব্বস্বান্ত হই, সে ভ
আমি বড় রাখি না। কারণ আমার জন্ম লইয়া
বর্ত্তমান অবস্থা হইতে এক পা যেদিন নাবিব, আ
আত্মহত্যা কেউ ঘোচায় না। যখন বুক চিঁড়িয়া,
ভাই, স্ত্রী, সদ্যজাত স্নেহময় ছেলে, ইজ্জত ও অভিমা
জন্য ত্যাগ করিয়াছি, তখন আমি না পারি কি?

শ্রীঅ—

পত্রে কোন ফল হইল না দেখিয়া, মাতাঠাকুরাণী অমরেন্দ্রনাথ
ডাকাইয়া আনাইয়া, তাঁহাকে বহু উপদেশ দিলেন, বহু সৎ
বলিলেন। অমরেন্দ্রনাথ জননীর কথার বিশেষ কিছু জবাব দিলেন
কিন্তু তাহার পরই টাকার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঘন ঘন তাগাদা হই
বেশ বুঝা গেল যে, মাতার উপদেশে কোন ফল হয় না
অবশেষে সম্পত্তি বন্ধক দিয়া অমরেন্দ্রনাথের জন্য অর্থ সংগৃহীত হই
কাজটা যে বিশেষ ভাল হইল না, তাহা বোধ হয় অমরেন্দ্রনাথ নি
বেশ বুঝিলেন; তাই টাকা পাইবার পরই জননীকে লিখিলেন ঃ—

পরম পূজনীয়া

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণেষু—

সে দিন সকালে তোমার সহিত যে সকল

হইয়াছিল, আমি সকল কথার উত্তর দিই নাই,—আজ সব বলিব।

তুমি জননী, স্বর্গের অপেক্ষাও মহীয়সী. আমি অবোধ সন্তান,—সংসার সাগরের সকল কূলই হারাইয়াছি! অকূলে একমাত্র তোমার লক্ষ্য ধরিয়া, ক্ষীণ আশার আশ্রয় লইয়া ভাসিতেছি। জগদীশ্বর জানেন, আমার কেহ নাই! দরদ করিয়া দুটো কথা বলে, দুঃখে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে, —বিপদে বুক দেয়, এমন কে আছে? যদি কারুর মুখ চাহিবার প্রত্যাশা রাখি, নিরাশায় আশার কল্পনা সার করি, বড় কান্নার সময়, যদি কারুর স্নেহের উজ্জ্বল জ্যোতি ভবিষ্যৎ সুখের আধার বলিয়া চোখের উপর ধরি, তবে সে তোমার!

কেমন করিয়া জানাইব, তোমায় ভক্তি করি কি না? তবে এ কথা স্বীকার করি, কখনও ভক্তির কোন উপলক্ষ দেখাইতে পারি নাই। কেন পারি নাই, ভরসা করি, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তোমায় বুঝাইব। সকলের মুখে শুনিয়াছি, তুমি সত্যের দেবী, করুণার প্রতিমা, ন্যায়ের আদর্শ, আমি যাহা বলিব নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিও।

তুমি কথায় কথায় বল, মন্দ প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দাও। আমার মন্দ প্রবৃত্তি কি? না—আমি বাগানে মেয়েমানুষ লইয়া রহিয়াছি। বোধ হয়, তোমার মনে আছে, তুমি প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলে. "আজ পয়সা বন্ধ কর; কাল কেমন থাকে!"

বোধ হয় শুনিয়াছ, কারণ শুনিবার বড় বিশেষ কিছু

অভাব নাই,—মধ্যে যে যে ঘটনা হয়!* দেখিয়া শুনিয়
কি ছল বোধ হয়? এ যদি ছল হয়, জীবনে বড় একটা
উচ্চ শিক্ষা পাইব। স্বর্গের সুখ চোখের উপর আসিলে
তখন তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিব। যার সব গেল, মু
চাহিবার কেহ রহিল না, রোগে পড়িলে মুখে জল দেয়, এম
কেহ নাই। এমন সময় যদি তাকে পথে দাঁড় করা
ধর্ম্মে সহিবে কি? সত্যের প্রতিকৃতি তুমি, মিথ্যা বিচ
করিও না। যদি বল, উহাদের ভাবনা কি? আজ এখ
থেকে গেলে, কাল আর একজনের পেয়ারের জিনিষ হইবে
আমি বলি যে,—বিষে জ্বরিয়া, কখনও যদি সে বি
ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, আর কি সে বিষে ডুবিতে চায়?

ধর্ম্মের ভয়ে লোকে মন্দ প্রবৃত্তি ছাড়ে, কিন্তু এ ম
প্রবৃত্তি ছাড়িলে অধর্ম্মের সঞ্চয় হইবে।

যাহা হয় হউক, আমার যে ভক্তি তোমার উপর আ
মনে করিও না জীবনে কখনও হ্রাস হইবে। সুখ দুঃখে
বিধাতৃ তুমি, উন্নতি অধোগতির মূল তুমি, আমার প
পুণ্যের দেবী তুমি, মনের পাপপুণ্য অকপটে তোম
বলিলাম, যাহা ইচ্ছা করিও। আমার কথা, যদি তোমাকে
কৌশলে, কিম্বা আমার মনের ফেরে, এমন কি ভগবানে
কুটিল চক্রে, এ বন্ধন ছেঁড়ে, তুমি মা তোমায় বলিতে
আমার উপর যে কণা আশা আছে, তাও থাকিবে না।

তবে এটা স্থির জানিও, স্ত্রীপুত্রের কর্ত্তব্য, জীব

---

* কোন কৌতূহলী পাঠক কি ঘটনা জানিতে চাহিলে, "অভিনেত্রীর রূপে" পরিচ্ছেদ পড়িয়া দেখিতে পারেন।

কখনও হারা হইব না। বিশ্বাস কর আর না কর—তোমার হাত।

বড় দুঃখ কি জান, মনের ফেরে না হয় একটা কাজ করিয়াছি, কিছু টাকা ধার হইয়া গিয়াছে, ভায়েদের কথা ছাড়িয়া দাও,—তুমি থাকিতে একটা বন্দোবস্ত হইল না। বিষয় বাঁধা দিতে হইল! সত্যই কি তোমার কোন হাত নাই!

শ্রীঅঃ—

হায়, অভিনেত্রীর রূপ! হায় সেই রূপমুগ্ধ অন্ধ মানব!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

——:০:——

"সৌরভ"

বিষয় বন্ধকের ফলে নগদ দশ হাজার টাকা পাইয়া, অমরেন্দ্রনাথে
ার্থিক অস্বচ্ছলতা দূর হইলে, তিনি আপিস যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন
তগুলি টাকা একসঙ্গে হাতে পাইয়া, বোধ হয় তিনি মনে করিতে
া, ইহার তুলনায় আপিসের মাহিয়ানা সমুদ্রে গোষ্পদতুল্য। ত
াপিস ছাড়িয়া দিয়া, তিনি একান্ত মনে নাট্যসাধনায় আত্মনিয়ো
রিলেন। এবার কিন্তু শুধু নাট্যানুশীলন করিয়া ও থিয়েটারের মহ
িয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সাধনাতেও নিবিষ্টচি
ইলেন। বাগানে আসিবার পর, অবসরকালে তিনি কবিতা রচ
রিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ২।১টা কবিতা মাসি
পত্রিকায় আত্মপ্রকাশও করিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৩০১ সালের মাঘ মা
জন্মভূমি'তে প্রকাশিত "সংশয়" ও ঐ পত্রিকারই ১৩০২ সালের বৈ
ংখ্যায় প্রকাশিত "তারা" শীর্ষক দুইটী কবিতা উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সাহিত্য সাধনার পথে একবার অগ্রসর হইয়া, সামান্য
চারিটা কবিতা লিখিয়া, অমরেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইল না। এখন তি
স্থির করিলেন যে, নাট্যসাহিত্যের পুষ্টিকল্পে, তিনি রঙ্গালয়ের মুখপ
স্বরূপ এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিবেন। তাহা হইলে তাঁহ
নাট্যসাধনা ও সাহিত্য সাধনা, উভয় সাধনারই উৎকর্ষ সাধিত হইবে
এইরূপ সঙ্কল্পের ফলে, তিনি গিরিশচন্দ্রের বাটীতে গিয়া, তাঁহার সা

সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার পরিকল্পিত মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা-ভার লইবার জন্য গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। গিরিশচন্দ্র আগ্রহ-সহকারে অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গিরিশচন্দ্রের এই আগ্রহাতিশয্যের মূলে একটী বিশেষ কারণ ছিল। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে এমন একটী ঘটনা ঘটে, যাহার ফলে অমরেন্দ্রনাথের সহিত পুরাতন আলাপ সঞ্জীবিত করিবার জন্য, গিরিশচন্দ্র বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন।

ঘটনাটী এই ঃ—অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথেরও থিয়েটার দেখার সখ ছিল। আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে জানাইয়াছি যে, গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের হাতীবাগানের বাটীতে আসিতেন। অমরেন্দ্রনাথ বালক বলিয়া, তাঁহার সহিত পরিচয়ের পরও, গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ আমল দিতেন না। ধীরেন্দ্রনাথের সহিতই তাঁহার বেশী আলাপ ছিল। এইরূপ আলাপ ও ধীরেন্দ্রনাথের অভিনয়দর্শন-স্পৃহার ফলে, গিরিশচন্দ্র একদিন তাঁহাকে স্বত্বাধিকারীরূপে একটী থিয়েটার খুলিতে পরামর্শ দেন। ধীরেন্দ্রনাথ নিমরাজী হন—মনে মনে ভাবেন,—"না হয় হাজার ত্রিশেক টাকা অপব্যয় করিয়া জন কয়েক ভদ্রসন্তানের প্রতিপালনের ব্যবস্থাই করিলাম!" গিরিশচন্দ্র তখন থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার দেখাইবার জন্য, একদিন ধীরেন্দ্রনাথকে ষ্টার থিয়েটারের ভিতরে লইয়া যান। কিন্তু সেখানকার কাণ্ড দেখিয়া, বিশেষ করিয়া জনকয়েক সুরাপানোন্মত্তা অভিনেত্রীর গায়ে-পড়া ব্যবহারে, ধীরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিরক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করেন ও পরদিন গিরিশচন্দ্র দেখা করিতে আসিলে, স্বয়ং তাঁহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া, তাঁহাকে বলিয়া পাঠান যে, তিনি গিরিশচন্দ্রের পরামর্শ মত কার্য্য সাধনে অক্ষম। ধীরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে গিরিশচন্দ্র বিষম চটিয়া

যান ও চলিয়া আসিবার কালে শাসাইয়া আসেন যে,—"আমাকে এ
অপমান করা হইল, ইহার জবাবে আমি ধীরেনবাবুর বংশের কাহা
দিয়া যদি থিয়েটার না খোলাই, তাহা হইলে আমার নামই 'গি
ঘোষ' নহে।"* অমরেন্দ্রনাথের মতিগতির বিষয় গিরিশচন্দ্র অ
ছিলেন এবং বোধ হয়, তাঁহার কথা ভাবিয়াই তিনি ধীরেন্দ্রনাথের
ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হন। সুতরাং ইহার কয়েক মাস
যখন অমরেন্দ্রনাথই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার মাসিক পত্রিকার সম্প
হইবার জন্য গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন, তিনি তাহাতে স
চিত্তে সম্মতি দিলেন। পত্রিকার নামকরণ হইল—"সৌরভ"।

বাগানে কার্য্যালয় করিলে, দূরত্ববশতঃ নানা বিষয়ে অসুবি
বাড়ীর সহিত অমরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ছিন্ন; তাই তিনি ২।৭
শোভাবাজার রাজবাটীতে "সৌরভের" কার্য্যালয় খুলিলেন। ৭" ×
সাইজের ক্রাউন ৮ পেজী ফর্ম্মায় মুদ্রিত হইয়া, ১৩০২ সালের
মাসে, "সৌরভের" প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। সম্পাদক—গিরি
ঘোষ; সহকারী সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ—স্বয়ং অমরেন্দ্র
মুদ্রাকর—১২নং ম্যাঙ্গো লেনস্থ, এচ, সি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং। ব
মূল্য ধার্য্য হইল আড়াই টাকা, প্রতি সংখ্যা চার আনা।

"সৌরভের" প্রথম পৃষ্ঠায়, "সৌরভ" শীর্ষক প্রবন্ধে, ইহার উ
নির্দ্দেশ মানসে অমরেন্দ্রনাথ লিখিলেন :—

"এ সংসার তোমার আমার সমান নয়; হয়ত,—তুমি এমন বে
মধুরত্ব বুঝিয়াছ, এমন কোন নূতনত্ব দেখিয়াছ, এমন কোনও
পাইয়াছ,—যে কারণে এ সংসার তোমার সুখের আলয়, শ
আবাস, পবিত্রতার আধার বোধ হইয়াছে।

---

* ঘটনাটী আমাদের স্বয়ং ধীরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে শোনা।

"আমার হয়ত, কোনও একটা ঘা লাগিয়া বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হয়ত নিরাশ কল্পনা ধরিয়া, মর্ম্মের করুণ তন্ত্রীখানি বেসুরা হইয়া গিয়াছে, আশার সুসারে ছাই পড়িয়া, হয়ত সংসারের স্বর্গীয় শোভা পিশাচের রাজ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসার তোমার আমার সমান নয়।

"আবার রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ, সকলের দৃষ্টি স্বতন্ত্রভাবে সংসারের উপর সজ্জিত আছে। ক্ষমতা, পদমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য, লোকবল, এ সকল বুঝিয়া—সেই অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের সংসারের উপর অধিকার।

"এ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মেদিনীর বক্ষে, (সাধারণের কথা বলিতেছি), এমন কিছু নাই, যাহা সাধারণে সমভাবে সোহাগের সামগ্রী করিয়া লইতে পারে? মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের পর, একবার বুকে ধরিয়া প্রাণ জুড়ায়? জীবনের ক্লান্তি দূরে ফেলিবার জন্য, অযাচিত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিয়া স্রোতের তৃণ হয়?—

"আছে! খুঁজিয়া লও, এ তাপদগ্ধময় মরুভূমিতে রম্য উপবন পাইবে, সাগর গর্জ্জনের ন্যায় কোলাহলের মধ্যে শান্তির উজ্জ্বল রশ্মি, দূর সুখস্মৃতির মত মনোহর দেখিবে, নির্ম্মম বিশ্বগ্রাসী অভিশাপের মধ্যে, সকরুণ আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিবে! ঘোর অপবিত্রতায় অজস্র পবিত্রতা, নিবিড় অন্ধকারে—অপরিমাণ আলো, পিশাচের নৃত্যভূমি নরকে—দেবালয় অমরাবতী, বর্ত্তমান যুগের প্রতিকৃতি মন্দে, প্রাণভরা ভাল আছে—"সৌরভ"।

"সৌরভে তোমার আমার, রাজা প্রজার, ধনী নির্ধনের, উচ্চ নীচের সমান অধিকার। সৌরভ ক্ষমতা মানিবে না, পদমর্য্যাদা বুঝিবে না, যে যত চায়—প্রাণ ভরিয়া অকাতরে আপন বিলাইবে।

"সৌরভ"

"সময়ে, অসময়ে, সম্পদে, বিপদে সুখে দুঃখে, যখন যে সৌরভের আকিঞ্চন, সৌরভের আরাধনা করিবে, সৌরভ তে নিতান্ত আপনার হইয়া, তোমার প্রাণে লুটাইয়া থাকিবে।

"সংসারের কর্ত্তব্য মাত্রেরই সৌরভ আছে। নিষ্কামতা, নিঃস্বা পবিত্রতা, বদান্যতা, তিতিক্ষা, দয়া, আরও যা কিছু ধর্ম্মের অন্তর্গত, সকলেরই স্তরে স্তরে সৌরভ জড়িত।

"তুমি সাধনায় স্বার্থ বিসর্জ্জন কর, অযাচিত পরোপকার অনাচার ঘৃণা কর, অবস্থাহীনকে সমভাব কর, অপরাধীর সহস্র মার্জ্জনা কর, দরিদ্রের প্রতি দয়া কর, সৌরভ তোমার আশ্রয় ল লক্ষ লক্ষ লোকের মুখ দিয়া বাহির হইবে।

"কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম,—স্রষ্টার লিপি কৌশল, সংসারে কিছু যতই সুন্দর হউক,—সাধারণের আগ্রহ সমভাবে চিরদিন থ না। সব সাময়িক। কিন্তু সৌরভের স্মৃতির বিনাশ নাই। কা অক্ষয় গর্ভে, সৌরভ অবিনশ্বর হইয়া চিরস্থিতি লাভ করে। আমরা মায়ার মোহিনী মন্ত্রে মোহিত,—আসক্তির জঞ্জালে জ প্রলোভনের মধুর আবাহনে লালায়িত, বাসনার মোহে পী আমাদের আর উপায় নাই। ও সকলের সৌরভ উপভোগ করি সাধ্য কই? তবে কি একেবারেই গতিহীন? তা কখনও হ পারে না।

"কাঁটায় কাঁটা উঠে, বিষে বিষক্ষয় হয়, শত বর্ষ বিচ্ছেদের প্রাণ, একদিনের মিলনে বাচে, যেরূপ দুরূহ অবস্থাই হউক, তদ ব্যবস্থা করিয়া, ধাতা সৃষ্টির পূর্ণতা রক্ষা করিয়াছেন। জড় চক্ষে অন্ধকার! তাই অনেকে সৃষ্টি অপূর্ণ বলিয়া দোষ দেয়। যদি সং থাকিয়া সকল সুখ চাও, অপূর্ণ প্রাণের পূর্ণতা আকিঞ্চন কর, একা

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দেখিতে সাধ থাকে, তবে সাহিত্যের "সৌরভ" সেবন কর। সেই উদ্দেশ্যেই সৌরভের বিকাশ।

"সৌরভ যাহাতে দিগন্ত প্রসারিত হয়, যথাসাধ্য ক্রটি হইবে না। এক্ষণে সাধারণের সহানুভূতির সংযোগ প্রার্থনীয়।"

মোট ১১টি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতায় সৌরভের প্রথম সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হইল। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার সূচিপত্র দিলাম :—

১। সৌরভ (প্রবন্ধ)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। সমাজচিত্র (সামাজিক উপন্যাস)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩। সুখ কৈ (প্রবন্ধ)—প্রমথনাথ বসু।

৪। কে তুমি ? (ঐ)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫। সত্য (কবিতা)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৬। কলঙ্ক (ঐ)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭। গ্রহফল (প্রবন্ধ)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৮। নক্সা (গল্প)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৯। ঝালোয়ার দুহিতা (ঐতিহাসিক উপন্যাস)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১০। হৃদয়রত্ন (পদ্য)—বিনোদিনী দাসী।

১১। প্রবাহের রূপান্তর (পদ্য)—তারাসুন্দরী দাসী।

শেষোক্ত কবিতা দুইটীর মুখবন্ধস্বরূপ গিরিশচন্দ্র লিখিলেন *—

---

* এই রচনা উদ্দেশ করিয়া গিরিশচন্দ্র উত্তরজীবনে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে লিখিয়াছিলেন,—"তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, অমর দত্তর "সৌরভে" লিখিয়াছিলাম, —"সাহিত্যে কতদূর আমার স্থান জানি না।" তুমি ঐ কথা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলে।" (অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'গিরিশচন্দ্র', ৬৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন—অমর দত্তর 'সৌরভ।'

"সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা, জানি না, জানি
চাহি না, কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে, রঙ্গভূমির উ
উদ্দেশ্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আ
সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্র-কন্যার
সন্দেহ নাই! তাহাদের গুণগ্রাম, অপ্রকাশিত থাকে, আমার
নয়! সেই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত কবিতা দুইটী পত্রিকায় প্র
করিলাম।"

আশা করি, পাঠকগণ ইহা পাঠে সৌরভের উদ্দেশ্যের স
পরিচয় পাইলেন ও তৎসঙ্গে তৎকালীন সমাজে অভিনেতাগ
স্থান কোথায় ছিল, তাহারও যথোচিত আভাস পাইলেন।

১৩০২ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে "সৌরভ"র ৭০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী দ্বি
সংখ্যা প্রকাশিত হইল। নিম্নে আমরা তাহার সূচিপত্র দিলাম :—

---

* এই প্রবন্ধই আমরা এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদরূপে মুদ্রিত করিয়াছি।

আশ্বিনে প্রকাশিত "সৌরভে"র ৬২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী তৃতীয় সংখ্যার সূচিপত্র এই :—

১। গ্রহফলের প্রতিবাদ—(লেখকের নাম অপ্রকাশিত)

২। সংশয় ও বিশ্বাস (প্রবন্ধ)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩। আভা (কবিতা)—বিনোদিনী দাসী।

৪। ঝালোয়ার দুহিতা (উপন্যাস)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৫। সমাজচিত্র (উপন্যাস)—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬। সৌরভ (কবিতা)—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

৭। স্বরলিপি—যাদুমণি দাসী।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ তিন মাসের মধ্যে ১টী উপন্যাস, ১টী নক্সা, ১টী ব্যক্তিগত জীবনী, ৩টী প্রবন্ধ ও ২টী কবিতা রচনা করিয়া ফেলিলেন। ইহার মধ্যে উপন্যাসটী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, "আদর" নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ও "অমর গ্রন্থাবলী"তে পুনর্মুদ্রিত হয়। নক্সাটী ৬ই বৈশাখ, ১৩০৮ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা রঙ্গালয়ের ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় পুনরায় ছাপা হয়। বাকী প্রবন্ধ ও কবিতাগুলির পুনর্মুদ্রণের সংবাদ আমরা জানি না।

এই তিনটী সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর, "সৌরভ" বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কারণ আমরা আগামী পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:০:—

ভাগ্যবিপর্য্যয়

অমরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের পর প্রায় বৎসর খানেক কাটিয়া
ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রায় লক্ষ টাকার কাছাকাছি দেনা দাঁড়াই
সম্পত্তি বিভাগ এখনও শেষ হয় নাই; আত্মীয় নিমাইবাবুর সম
অল্প, নিজের কাজ লইয়া ব্যস্ত, কাজেই সালিসীর ব্যাপার ধী
বিক্ষেপে চলিতেছিল। সম্পত্তি বন্ধক বাবদ প্রাপ্ত দশ হাজার ট
অমরেন্দ্রনাথের বেশী দিন কুলায় নাই, তাই তিনি পুনরায়
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন অমরেন্দ্রনাথ নিমাইবাবুর সহিত দেখা করিয়া, সা
কার্য্য যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিবার জন্য, তাঁহাকে খুব তা
দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জানাইলেন যে, পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এব
বাগানবাটী ব্যতীত অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির অংশ গ্রহণে
অনিচ্ছুক। সুতরাং সমুদয় সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া,
অংশে যাহা প্রাপ্য হয়, তাহা হইতে বাগানের দাম বাদ দিয়া, ব
অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্ত্তে যেন তাঁহাকে নগদ টাকায়
হয়। অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবিয়া, নিমাইবাবু এরূপ
বণ্টনে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের নির্ব্বন্ধাতি
তাঁহার সম্মত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ নিমাইবাবুর অ্যাওয়ার্ড (Award) প্রকাশিত হইল। কিন্তু তাহার দুই চারিটা সর্ত্তে অমরেন্দ্রনাথ একেবারেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি নিমাইবাবুর সঙ্গে রীতিমত বচসা লাগাইয়া দিলেন, ২।১টা কড়া কথাও মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। নিমাইবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আইনানুযায়ী যাহা ন্যায্য বলিয়া আমার মনে হইয়াছে, আমি তদনুসারে রায় দিয়াছি। তোমার যদি মনঃপূত না হইয়া থাকে, আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।" অমরেন্দ্রনাথ, "ভাল—তাহাই হইবে". বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

এদিকে দুই তিনজন পাওনাদার অমরেন্দ্রনাথের নামে নালিশ রুজু করিল; তাহার মধ্যে একজন ডিক্রী করিয়া তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিল। সম্পত্তি দুইবার মর্টগেজ হইয়াছে, আর কেহ টাকা দিতে চাহে না। অমরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেখানে কি হইল, তাহা আমরা অমরেন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলিতেছি*—

"সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দুর্গা আপনার ঘরে বসিয়া মহাভারতের বনপর্ব্ব পাঠ করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সংবাদ দিল যে, "জামাইবাবু আসিয়াছেন।" দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল, অসংযত কেশরাশি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল, বক্ষের শোণিত অপেক্ষা প্রিয় নিদ্রিত পুত্রটীকে শয্যার উপর শোয়াইল। যুক্তকরে মধুসূদনকে ডাকিয়া বলিল, "আজ যদি কোন বিপদে পড়িয়া তিনি আমার কাছে আসিয়া থাকেন,—তাঁহার পায়ে একটী কাঁটাও যেন না বিঁধে!"

"মহা অপরাধীর ন্যায় নলিনী গৃহে প্রবেশ করিল। বহুকালের

* অভিনেত্রীর রূপ, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধনার পর অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে পাইলে ভক্তের প্রাণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, অনেক দিনের পর নলিনী দেখিয়া দুর্গার সন্তপ্ত চিত্ত সেইরূপ উল্লাস ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ উঠিল। কিন্তু কেমন কিসের একটা অজানিত আতঙ্কের ছায়া তা সম্পূর্ণ সুখ ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি উপভোগের পথে বিষম কণ্টক হ দাঁড়াইল।

"নলিনী অনন্যোপায় হইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, তাহার বিপ কথা দুর্গাকে জানাইল। দুর্গা কোনও কথা না কহিয়া কোন প্রতিবাদ না করিয়া, নলিনীর নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা কোনরূপ উ না করিয়া, তাহার গহনার বাক্সটী স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া কণ্ঠে বলিল, "এই আমার সর্ব্বস্ব! তোমারই সামগ্রী তোমারই ক উৎসর্গ করিলাম। আমার একটীমাত্র অনুরোধ, ভ্রাতৃবিরোধ ক না, তিনি হাতে তুলিয়া যাহা দেন—তাই লইয়াই সুখী হও। আর বিলম্ব করিও না, আজ রাত্রের মধ্যেই এই সমস্ত গহনা বন্ধক টাকার যোগাড় কর। কাল বেলা বারটার মধ্যে টাকা জমা না দি বিপদের অবধি থাকিবে না। আমার দুর্ভাগ্য, এতদিন পরে তোম পাইলাম, প্রাণ ভরিয়া দুটো কথা কহিতে পারিলাম না তোমার সেবা করিয়া, পরকালের কাজও করিতে পারিলাম না! যাক- দুঃখ করিবার সময় আজ নয়, জগদীশ্বর যদি দিন দেন,—অনেক কহিব; কথা তখন আর ফুরাইবে না"—এই বলিয়া নলিনীর প উপর লুটাইয়া পড়িয়া দুর্গা ভক্তিভরে প্রণাম করিল।" বলা বাহু নলিনী স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ ও দুর্গা হেমনলিনী।

স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া, খরচা সমেত ডিক্রীর আদালতে জমা দিয়া, অমরেন্দ্রনাথ সে যাত্রা ওয়ারেণ্টের হাত হ

নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি! দুর্ভাগ্য একবার আসিয়া দেখা দিলে সহজে সে কাহাকেও ছাড়ে না। অমরেন্দ্রনাথের অদৃষ্টেও ঠিক তাহাই ঘটিল। বাজারে তাহার অনেক টাকা দেনা, আর ধার পাওয়া যায় না; অথচ টাকার দারুণ অভাব; মান সম্ভ্রম আর থাকে না। একজন পাওনাদার ডিক্রী করিয়া কড়ায় গণ্ডায় টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে, এ সংবাদ অন্যান্য মহাজনদের কানে পহুঁছিল। তাহারা আর স্থির থাকিতে পারিল না, একে একে সকলেই উকীলের চিঠি দিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি নালিশ হইল। অমরেন্দ্রনাথ বেশ বুঝিলেন যে, কাল মেঘ তাঁহার মাথার উপর বেশ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার পরিণাম বড় ভয়ানক—বড় মর্ম্মান্তিক। যখন একখানির পর একখানি করিয়া আদালতের মোহরযুক্ত সমন আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িতে লাগিল, তখন তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন,—দিন দিন বুকের রক্ত ঝলকে ঝলকে শুকাইতে আরম্ভ হইল। সহায় নাই—সম্বলও ফুরাইয়া আসিয়াছে, যে সকল বন্ধুবান্ধব বাগানে আসিয়া "পেলিটী"র খানা ও "পমারি শ্যাম্পেনে"র আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া যাইতেন, পরামর্শের জন্য তাঁহাদের খবর দিলে, "অসুস্থ" ও "সময়াভাব" জানাইয়া কেহ আর এদিকে বড় ঘেঁসিতে চাহিতেন না। এমন অবস্থায় "সৌরভে"র অকালমৃত্যু স্বাভাবিক নহে কি?

অকূলে কূল না পাইয়া, অমরেন্দ্রনাথ পত্নীর পরামর্শ গ্রহণ শ্রেয় মনে করিলেন। হেমনলিনী বলিয়াছিলেন,—"ভ্রাতৃবিরোধ করিও না।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন,—"আমি মিট্‌মাট্ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার চারিদিকে বিপদ, আপনি রক্ষা না করিলে কে করিবে? আমার আপনার লোক আর কে আছে?"

জ্যেষ্ঠের আহ্বানে অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহার সহিত সা
করিলেন। দুই ভ্রাতায় নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল। শেষে ব্য
এই হইল যে,—ধীরেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রনাথের হাত নাগাদ সমস্ত
চুকাইয়া দিবেন এবং নগদ পঁচিশ হাজার টাকা অমরেন্দ্রনাথ পাইবে
বসতবাড়ী, বাগান, ভাড়াটিয়া বাটী ও অন্যান্য সম্পত্তির উপর অমরে
নাথের আর কোনরূপ দাবী দাওয়া রহিল না। অমরেন্দ্রনাথ তদনু
লেখাপড়া করিয়া দিলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিলেন। এব
তাঁহার পৈতৃক ভিটার পানে তাকাইয়া দেখিলেন, মনে
ভাবিলেন—"কাল আমি এ বাড়ীর মালিক ছিলাম, আজ প
ভিখারীর সহিত উহার যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও তাই। এত
সর্ব্বস্বান্ত হইলাম।" কৃতকর্ম্মের অনুশোচনায় তাঁহার হৃদয় ত
হইয়া উঠিল। অশ্রুধারায় বুকের ভার অনেকটা লঘু করিবে
কিন্তু বিবেক ছাড়িবার পাত্র নয়! সে ঠিক সময়ে তাঁহার বু
ভিতর বসিয়া প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিল, "পদা
সতী স্ত্রীকে বিনা দোষে কষ্ট দিতেছ; দিবারাত্র তাহার চোখের
পড়িতেছে, বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় প্রাণের বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিবে
তাহার সাজা তুমি পাইবে না? তাহার ফল তুমি ভুগিবে
এখনও সাবধান হও, এখনও কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লও, এখনও আ
পর চিনিয়া লইবার চেষ্টা কর, তোমার মঙ্গল হইবে!"

বড় দুঃখে অমরেন্দ্রনাথ নিজের জননীর নিকট লিখিলেন :—

মা!

মনে করিয়াছিলাম, আর এ দগ্ধ মুখ লইয়া
দাঁড়াইব না,—আর এ ক্ষীণ চঞ্চল, অপদার্থ প্রাণে

পূর্ণ, সুধীর, সুসার ও পবিত্র হৃদয়ের মর্ম্মানুভব করিতে প্রয়াসী হইব না; আপনার ক্ষুদ্র, অশান্ত, যমযাতনাভোগী চিত্তটুকু লইয়া, চিরদিনই হাহাকারে কাটাইব, নীরবে অনন্ত হুতাশ অনন্ত কালই সহিব, কাহাকেও জানিতে দিব না, কেহ জানিবে না, আপনার সর্ব্বে আপনি ভোর হইয়া থাকিব, নিজের অহংকার বজায় রাখিব;—এ সকল ভাবিয়া নহে, পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অনুশোচনায়। স্ব-ইচ্ছায় যে তীব্র মর্ম্মভেদী হলাহল না বুঝিয়া সুঝিয়া, গ্রহ বৈগুণ্যে গলায় ঢালিলাম, তাহারই জ্বালায়! অবোধ প্রাণের করুণ হাহাকারের উচ্চৈঃ চীৎকারে!—কিন্তু আর যায় না, আর থাকে না; বালির বাঁধ,—এইবার যন্ত্রণার প্রবল স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তাই এই উৎস!! আমি অপরাধী! শত সহস্রবার অপরাধী!! কিন্তু তা বলিয়া মা,—"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়!" এ সংসারে ক্রোধের বশীভূত নয়, এমন লোক কেহই নাই! আমি যদি ক্রোধের বশে, একটা কাজ করিয়া থাকি, তবে কি তার ক্ষমা নাই? চিরদিনই কি, স্নেহময়ী জননী হইয়া অবোধ সন্তানের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ তপ্ত শেল ফুটাইয়া, তাহাকে জীবন্তে নরক যন্ত্রণা ভোগ করান উচিত।

জগদীশ্বর জানেন, সত্য বলিতেছি, আপনার মুখ ভার, ওরূপ অপ্রসন্ন ভাব, ওরূপ মুখে বিরক্তি ভ্রূকুটীর চিহ্ন, বোধ হয় জগতে এমন কোনও ভয়ানক বীভৎস দৃশ্য নাই, যা দেখিয়া প্রাণে স্বতঃই বিভীষিকার উদয় হয়! আমার কি অবস্থায়, কেমন সুখে, কেমন করিয়া দিন যায়, তা ত'

আপনার অবিদিত নাই ;—যে ক্ষুদ্র অথচ জগৎ ব্যাপা
তুল্য বৃহৎ,—সংসারের চক্ষে, যাহার উপর বালির চড়া,
অভ্যন্তরে ফল্গু নদী, এমন অতুল, অকৃত্রিম, অনির্ব্বচ
স্নেহ,—যে স্নেহ জুড়িয়া, এ শূন্য প্রাণ পূর্ণ করিয়া রাখিয়
সে স্নেহ, সে সুখ হইতে যদি বঞ্চিত হই, তবে কি ল
বাঁচিব !

শ্রীঅঃ—

শেষ কালে আমার নিজের কথা একটু বলিব !—

মা ! এই অল্প বয়সে, আমি সংসারের অনেক দেখিয়
অনেক ঠেকিয়াছি, অনেক শিখিয়াছি ! আমি আপন প্র
স্রোতে যদি চালিত না হই,—তবে এমন কেহ
আমাকে কোন কাজে লওয়ায় !! আর আমিও যা
নিজের দিকে বিশেষ নজর করিয়া করি ! মূলে অ
না পায়, আমার স্থূল দৃষ্টি সেই দিকে ! এই জন্য অ
কিছু ভাবিবেন না !

শ্রীঅঃ—

এদিকে অমরেন্দ্রনাথের পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্তির সংবাদ
মহলে প্রচারিত হইতে বড় দেরী হইল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহ
'অসুস্থতা' ও 'সময়াভাব' ঘুচিয়া গেল। আবার বাগানে স্ব
ফোয়ারা ছুটিল, "পেলিটী" খানা যোগাইল, "পমারি শ্যাম্পেনের"
বহিল। দুঃখের পাঠশালায় সদ্যঃ পড়িয়া আসিয়াও, অমরে
'সেয়ানা' হইতে পারিলেন না। পারিবেনই বা কোথা হই

ভগবান্ যে তাঁহাকে সে ধাতু দিয়া গঠনই করেন নাই। যত বড় শত্রুই হউক না কেন, একবার অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি তাহাকে বুকে টানিয়া না লইয়া থাকিতে পারিতেন না। শুধু তাই নয়, প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিলে তাঁহার সংস্কারে বাধিত, অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করিতে না পারিলে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিত! এরূপ অকাতরে দানের ফলে কাল নিজের কি অবস্থা হইবে, সে কথা ভাবিবার তাঁহার অবকাশ থাকিত না। সুতরাং বন্ধুবান্ধবদের পুনরাগমনে তিনি তাহাদের পূর্ব্ব ব্যবহার ভুলিয়া গিয়া, তাহাদের চিত্ত বিনোদনার্থ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এইরূপে সৎ ও অসৎ কার্য্যে অপরিমিত খরচের ফলে দেখিতে দেখিতে ৪।৫ মাসের মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা উপিয়া গেল; অমরেন্দ্রনাথ আবার অর্থ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মাতা ও অগ্রজদ্বয়ের অনুরোধে তিনি বাগানের বাস উঠাইয়া দিয়া, বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহার আচরণে সকলের মনে ধারণা জন্মিল যে, এইবার তিনি শোধরাইয়া গেলেন, আর কখনও কুপথগামী হইবেন না। তিনি শান্ত শিষ্ট ছেলেটীর মত সময়ে খান, সময়ে শোন, বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না, বন্ধুবান্ধবদের আসা যাওয়াও একেবারে কম হইয়াছে কারণ অমরেন্দ্রনাথ এখন মধুশূন্য। হেমনলিনীও পিতৃগৃহ ছাড়িয় হাতীবাগানে আসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের প্রাণে শান্তি নাই, তাঁহার জীবন শূন্যময়, মনের ভিতর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রবল বহ্নি রাবণের চিতার ন্যায় জ্বলিতেছে। যৌবনের উদ্দা ও দুর্দ্দমনীয় স্রোতে গা ভাসান দিয়া মধ্যস্থলে আসিয়া, তিনি চড়া আটকাইয়া গিয়াছেন। সন্তরণের সাধ তাঁহার মেটে নাই। তিনি

পরিবারবর্গসহ যৌবনে অমরেন্দ্রনাথ।

এখনও এপার ওপার হইতে পারেন নাই! তাই তিনি আব
কোলাহলময় জীবন স্রোতে ঝাঁপ দিবার জন্য হাঁপাইয়া উঠিয়াছে
এদিকে টাকার দারুণ অভাব! যাহা কিছু ছিল, সমস্তই উড়াই
দিয়াছেন, এখন একরূপ কপর্দ্দকশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন
টাকা—টাকা—টাকা, কি করিয়া টাকা পাওয়া যায়, এখন এই চিন্ত
প্রবল হইল। চোখ কান বুজিয়া একদিন ধীরেন্দ্রনাথের কা
হাত পাতিয়া কিছু টাকা চাহিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,
"খাও, দাও, বাড়ীতে থাক, টাকা কড়ির নাম মুখে আনিও ন
বিশেষতঃ তোমার হাতে টাকা পড়িলেই আবার তুমি বিগড়াই
যাইবে।"

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের টাকা সংগ্রহ না করিলেই নয়। বাগ
অবস্থানকালীন তিনি এক মাড়োয়ারী জহুরীর নিকট হইতে দেড় হাজ
টাকার গহনা লইয়াছিলেন। যত দিন টাকা ছিল, "যবে হয় দিে
চলিবে" করিয়া, তাহার পাওনা মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই। এ
অর্থাভাব, অথচ সে তাগাদার জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াে
কাল তাহাকে টাকা দিবার শেষ দিন, না দিলে একটা কেলেঙ্ক
ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অনেক ভাবিয়াও, অমরেন্দ্রনাথ ে
কুল কিনারা করিতে পারিলেন না।

পরদিন সকালে সেই জহুরী আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্য
টাকা নাই, অথচ তাহার পাওনা মিটাইতে গিয়া, তিনি তাহ
এক post-dated চেক দিলেন। আবার সেই চেকের ট
যোগাড় করিতে গিয়া এমন এক বিভ্রাট বাধাইলেন যে, তা
ফলে তাঁহাকে ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইয়া পড়িতে হই
সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ নিমাইবাবুকে সঙ্গে ল

অমরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিমাইবাবু তাঁহাে বলিলেন,—"তোমার বিপদের কথা শুনিয়া, তোমার জ্যেষ্ঠ আমাে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তোমাকে বুঝাইবার বা উপদে দিবার আর কিছুই নাই; কারণ, তোমার মাথা একেবারে বিগড়াই গিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে জেলের হাত হইতে উদ্ধার করি হইলে ছয় হাজার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি ত' সব ফুঁকি দিয়াছ, তোমার একটী পয়সাও নাই। এখন একমাত্র উপায় আে টাকার যোগাড় করিতে হইলে, তোমায় এই মর্ম্মে লেখাপ করিয়া দিতে হইবে, তোমার মাতার মৃত্যুর পর তুমি যে সম্পি অধিকারী হইবে, তাহারই স্বত্ব তুমি ধীরেন্দ্রনাথকে বিক্রয় কওলা লিখি দিতেছ। ইহাতে জহুরী করমচাঁদের দেনা শোধ হইয়া তুমি আ চারি হাজার টাকা পাইবে। এ প্রস্তাবে সম্মত আছ কি ?"

যে অমরেন্দ্রনাথ আত্মহত্যা ব্যতীত এ বিপদ হইতে পরিত্রাে আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছিলেন না, তাঁহার পক্ষে এ প্রস ঈশ্বরপ্রেরিত শুভ আশীর্ব্বাদের ন্যায় আনন্দপ্রদ বলিয়া মনে হই তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। পরদিন নিমাইবাবুর আপিসে গি পাকা লেখাপড়ায় সহি দিয়া, অমরেন্দ্রনাথ চারি হাজার টাকার ে লইয়া ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করিলেন।

যে অমরেন্দ্রনাথ তিন বৎসরের মধ্যে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি ব বুদ্‌বুদের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া দিলেন, যিনি যৌবনের উদ্দাম প্রবৃ পরিচালনায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, সংসারসমুদ্রে ক্ষুদ্র ভে ন্যায় এতদিন হাবুডুবু খাইয়া বেড়াইলেন, যিনি স্বেচ্ছাচারে জী চালিত করিয়া, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—উভয় আশা ভরসার স্ হারাইলেন, যিনি অভিনেত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী,

সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে পর করিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তিনি আজ নাট্যসাধনায় সিদ্ধিলাভোদ্দেশ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আবার গৃহ-ত্যাগী হইলেন ; সঙ্গী,—মনের অদম্য সাহস, যৌবনের দৃপ্ত উৎসাহ, আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাস ও মাত্র চারি সহস্র মুদ্রা।

দ্বিতীয় খণ্ড

সিদ্ধি

যৌবনের প্রারম্ভে অমরেন্দ্রনাথ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:০:—
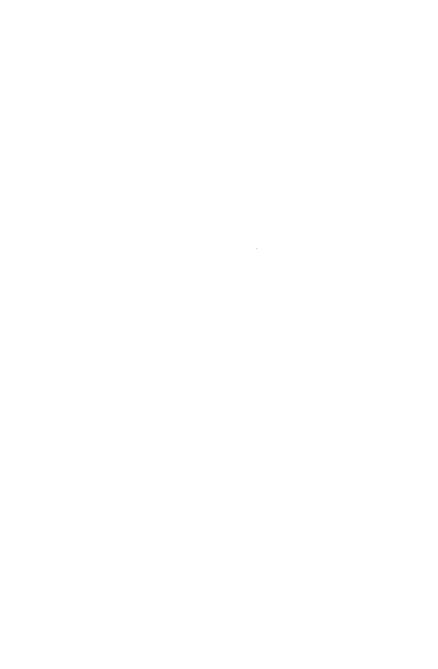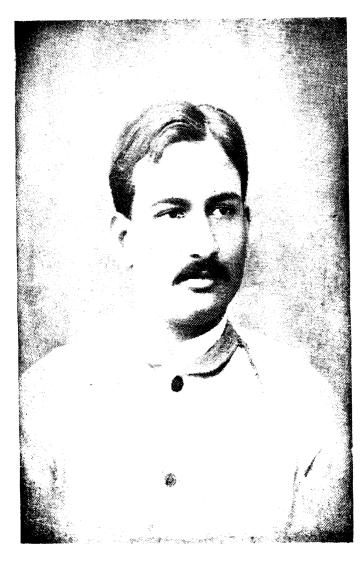
সিদ্ধির প্রথম সোপান

আমরা দেখিয়াছি, নাট্যানুরাগ অতি বাল্যকাল হইতেই অমরেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া, নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচনায় প্রমত্ত থাকিতেন। বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গীগণকে লইয়া কৃত্রিম অভিনয় করাই ছিল তাঁহার বাল্য ক্রীড়া। "কিসে নাট্যশালায় অভিনয় করিতে পারিব! কিসে বড় অভিনেতা হইব!" এই চিন্তায় তাঁহার মন সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকিত, কিন্তু তখন মনের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না বলিয়া মনে মনে বড় সন্তাপিত ছিলেন। বাল্যকালেই "ঊষা" ও "মানকুঞ্জ" নামক দুইখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার নাট্যপিপাসা তখনকার মত কথঞ্চিৎ মিটাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে পিপাসা শান্তির দিকে না গিয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার আজন্মের বাসনা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে সন্তাপিত করিতে লাগিল, তখন পিতার অকাল মৃত্যুতে অপ্রাপ্তবয়সে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তিনি নাট্যসাধনা হইতে কতকাংশে ভ্রষ্ট হইয়া বিলাসব্যসনে সে সম্পত্তির সমুদয় নষ্ট করিলেন। অবশেষে

চেতনা জাগিলে, নটের বৃত্তি অবলম্বনোদ্দেশ্যে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় দ্বিতীয় বার গৃহত্যাগ করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ তখন বিংশতিবর্ষীয় যুবক। সময়টা ১৩০৩ সালের গোড়া, ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে নাগাদ হইবে। কিছুদিন হইতে নটগুরু ও নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র, নাগেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া নাট্যাচার্য্য-রূপে ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ একদিন গিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া, তাঁহার মনের বাসনা গিরিশ-চন্দ্রকে খুলিয়া বলিলে, তিনি একটা থিয়েটার খুলিয়া বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি বিধান করিবার নিমিত্ত অমরেন্দ্রনাথকে উপদেশ দেন। অমরেন্দ্র-নাথ তাহার উত্তরে বলেন,—"থিয়েটার চালাইতে কি আমি সমর্থ হইব? তাহা অপেক্ষা আমায় কোন থিয়েটারে অভিনেতারূপে প্রবেশ করাইয়া দিন।"

গিরিশবাবু তাহাতে বলেন,—"তুমি বড়লোকের ছেলে,—তুমি অভিনেতার কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কেন? অভিনেতার কত কষ্ট, তা' জান? অভিনেতার সময়ে আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—দিনে দিনে তিল তিল করিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিতে হইবে।"

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অভিনেতাদের এত কষ্ট! আমরা বাহির হইতে মনে করিতাম যে, তাহারা কত সুখী, কত ভাগ্যবান্। আচ্ছা মহাশয়! আপনি অভিনেতাদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করিবার চেষ্টা করেন না কেন?"

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন,—"আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি, কিন্তু সমর্থ হই না, কারণ থিয়েটারের মালিক অর্থের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া বসিয়া থাকেন। অভিনেতার দুঃখে যদি তোমার প্রাণ কাঁদিয়া

থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার কথামত কার্য্য কর—একটী থিয়েটার খুলিয়া ফেল। তাহা হইলে তুমি নিজের থিয়েটারে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবে। অভিনেতাগণের কষ্টমোচন বা নাট্যজগতের উন্নতি বিধান সমস্তই তোমার দ্বারা সাধিত হইতে পারিবে।”

এইরূপ নানা কথোপকথন ও উপদেশ প্রদানান্তর গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন। অমরেন্দ্রনাথও থিয়েটার খুলিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া, কিসে নাট্যজগতের প্রাণস্বরূপ, মহা স্বার্থত্যাগী জীবনে-মমতা-হীন অভিনেতাগণের উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন, কিসে নাট্য-জগতের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন, এই চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। বাস্তবিকই তখনকার কালের অভিনেতারা যথার্থই মহাপুরুষ সদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। শাস্ত্রবাক্য যদি সত্য হয়, ত্যাগে যদি যথার্থ পুণ্য থাকে, ত্যাগী যদি যথার্থই মহাপুরুষ হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র ত্যাগের দিক দিয়া দেখিলে, তখনকার কালের অভিনেতাদের মহাপুরুষ বলা চলে। আর্থিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই, সংসারের দিকে দৃকপাত নাই, সমাজশাসনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, নিজের প্রাণের প্রতি মমতা নাই, এইরূপ ত্যাগী মহাপ্রাণেরাই তখনকার দিনে অভিনেতার ব্রত গ্রহণ করিতেন। তখনকার দিনে অভিনেতা হইতে হইলে, প্রতি পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হইত, প্রতিপদে দৈহিক অনিয়মকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে হইত। এতদ্ব্যতীত আরও একটী বিশেষ কঠিন নিয়ম ছিল এই যে, তখনকার দিনে অভিনেতা হইতে হইলে এক প্রকার সমাজচ্যুত হইতে হইত।* অভিনেতাদের নিন্দায় কান পাতা যাইত না। সমাজ অভিনয় দেখিতেন, অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতেন,

* পাঠকবর্গ! “সৌরভে” গিরিশচন্দ্রের উক্তি স্মরণ করুন।

কিন্তু অভিনেতাকে মহা ঘৃণা ও নিন্দা করিতেন। জাতীয় উন্নতি বিধান মানসে অভিনেতা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন, কিন্তু যাঁহার জন্য তাঁহার এই আত্মত্যাগ—অর্থাৎ সমগ্র জাতির নিকট হইতে এই অমানুষিক আত্মত্যাগের পুরস্কারস্বরূপ তিরস্কার লাভ করিতেন, অথচ যে নাট্য-শালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার নিমিত্ত অভিনেতারা সর্ব্ব সুখ, সুনাম ও প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতেন, সেই নাট্যশালার কর্ত্তারা পর্য্যন্ত অভিনেতার দুঃখ ও ত্যাগের মূল্য সম্যক্ বুঝিতেন না। নাট্যশালার অধিকারী রাত্রি জাগরণে পীড়া হইবার ভয়ে মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই থিয়েটারের বিক্রয়-লব্ধ অগাধ অর্থ হিসাব সমেত গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া সুকোমল শয্যায় শয়নকরতঃ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন আর যাহাদের দৈহিক সুস্থতা ও প্রাণের বিনিময়ে তিনি এই অগাধ অর্থ ঘরে লইয়া যাইতেন, তাহাদের বিষয় আদৌ চিন্তা করিতেন না। তাহাদের পরিশ্রম ও ত্যাগের তুলনায় নগণ্য, অতি নগণ্য যে বেতন, সেই বেতনের বিষয় একবারও ভাবিতেন না। তখনকার কালের বড় বড় অভিনেতারাও চল্লিশ হইতে আশী টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পাইতেন। নাট্যকার বা অধ্যক্ষ আরও কিছু বেশী পাইতেন। ছোট ছোট অভিনেতার কথা তুলিয়া আর কাজ নাই। অভিনেতাদের বেতন সম্বন্ধে, নাট্যশালার মালিক তাঁহার আয়ের অনুযায়ী ব্যয় কখনও করিতেন না। ছোট বা মধ্যম গোছের অভিনেতার কথা ছাড়িয়া দি—যাঁহারা বড় অভিনেতা ছিলেন, যাঁহাদের নামের প্রভাবে বিক্রয়াধিক্য ঘটিত, এমন অভিনেতাদিগের দিকে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সুদৃষ্টি ছিল না। বস্তুতঃ নাট্যশালায় প্রবেশ করিতে হইলে একমাত্র নটনাথ ও নাট্যসাহিত্যের সেবা করিবার লোভ ভিন্ন অভিনেতৃবর্গের

দ্বিতীয় লোভনীয় বস্তু তখনকার কালে কিছুই ছিল না। লোকে অভিনয় দেখিয়া অভিনেতার যা একটু সুখ্যাতি করিতেন, তাহার নিন্দায় তাহা সুদে আসলে শতগুণে পোষাইয়া লইতেন। বাস্তবিক তখনকার দিনে অভিনেতাকে যে নিন্দা ও অপবাদ সহ্য করিতে হইত, তাহা কল্পনা-শক্তির বহির্ভূত। অভিনেতাগণের নিন্দা শুনিতে শুনিতে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কর্ণ বধির হইয়া যাইত, মর্ম্মে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিত। অভিনেতারা ত' সমাজে মিশিতেন না, এমন কি তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত স্বজনের নিন্দা শ্রবণের ভয়ে কোনও সামাজিক সম্মিলনে যাওয়া ত্যাগ করিতেন। এমন অবধি দেখা গিয়াছে যে, অভিনেতাদের আত্মীয়স্বজনগণ তাহার সহিত সম্পর্ক অবধি তুলিয়া দিয়াছেন।

নাট্যজগতের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই কার্য্যে রত হইলেন। আত্মীয়-স্বজন, হিতৈষী বন্ধু প্রভৃতি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার বংশপরিচয় আমরা যথাস্থানে দিয়াছি। কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত ও পুরাতন কায়স্থ বংশের সহিত তিনি আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত। তিনি "থিয়েটার করিবেন" এই সংবাদে তাঁহার সমস্ত আত্মীয়স্বজন বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। মানসম্ভ্রমে নৃপতিতুল্য, সমাজে সমাজপতি তুল্য, ধনে যক্ষপতি তুল্য, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য ব্যক্তিবর্গ—যাঁহাদের মুখের কথা সমাজে আইনস্বরূপ গৃহীত হয়,—যখন আত্মীয়তার দাবী লইয়া অমরেন্দ্রনাথকে নানারূপে নিবারণ করিতে লাগিলেন, তখন অমরেন্দ্রনাথ সগর্ব্বে বলিলেন,—"আপনারা আমাকে ত্যাগ করুন বা আমার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে না চান, তাও স্বীকার, এবং এ কার্য্যে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাও ভাল, কিন্তু

তথাপি আমি এই কার্য্য হইতে নিরস্ত হইব না।” অমরেন্দ্রনাথের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনরায় সকলে নানারূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত শেষ চেষ্টা করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার পৈতৃক বাগানবাটীর অদূরে বাগমারী রোডেই অন্য একটী বাগান ভাড়া লইয়া, তথায় বাস করিতেছিলেন। একদিন তাঁহার জনকয়েক আত্মীয় সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, “তুমি কি দুঃখে এ কাজ করিতে যাইতেছ—তোমার কিসের অভাব যে, তাই পূরণ করিবার জন্য তুমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দের ক্রোধভাজন হইয়া, নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া থিয়েটার করিতে যাইতেছ? নিজাংশের পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট করিয়াছ সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তোমার খাওয়া পরার কি কোন অভাব আছে, না যতদিন তোমার মা-দাদারা জীবিত থাকিবেন, ততদিন তুমি তেমন কোন অভাব অনুভব করিবে? অলস নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনে যদি তুমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছ হয়, তাহা হইলে তুমি আবার চাকুরী কর। যদি তাহাতে সম্মত থাক, বল—তোমার একটীমাত্র কথায় তুমি তোমার পরিত্যক্ত চাকুরী ফিরাইয়া পাইবে। তোমার দাদার অবর্ত্তমানে তুমিই রেলির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দীর পদ পাইবে। এরূপ অবস্থায় এমন হেয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তোমার ইহকাল পরকালের পথ নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন?”

এ কথার উত্তরে অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—“আমাকে একজন অভিনেতা বলিয়াই জানি এবং নাট্যশালার দিকে চাহিলে কিম্বা ইহার কথা ভাবিলে আমার মনে হয়, যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধে আমি

ইহার সহিত বিজড়িত, তাই সেই নাট্যশালার উন্নতিবিধান করিবার নিমিত্ত আমি আমার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছি। আমার নিজের জন্য কোন অভাব বা দুঃখ নাই বটে, আমি স্ত্রীপুত্র লইয়া রাজার ন্যায় সুখে বাস করিতে পারি সত্য, কিন্তু যে অভিনেতা-ব্রত গ্রহণ করিতে আমি সমস্ত পণ করিতে প্রস্তুত, যে অভিনেতা বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, সেই অভিনেতাগণের মধ্যে অধিকাংশ দুঃখের ও অভাবের সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া মহা ক্লেশ পাইতেছে, অর্থের অভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রতিভা সম্যক বিকাশ পাইতেছে না,—আমি থিয়েটার করিয়া তাহাদের অভাব ও দুঃখ যে উপায়ে হউক, যে রকম করিয়া হউক, দূর করিব। সংসারের প্রতি উদাসীন, জীবনের প্রতি মমতাহীন, অভিনেতাগণ নাট্যশালায় যোগদান করিয়া ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে;—আমি অভিনেতা হইয়া এবং নাট্যশালার প্রতি অনুরাগী হইয়া, যদি ইহাদের দুঃখে উদাসীন হই, তাহা হইলে আমার জন্মই বৃথা!"

আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম, কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কের পর, অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয়েরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার কোন আশা নাই দেখিয়া, বিরক্তিভরে বাগানবাটী ত্যাগ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আত্মীয়-স্বজন সকলের স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলেন।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে পশ্চাদ্‌পদ হইবার পাত্র নন। তিনি উঠিয়া পড়িয়া থিয়েটার খুলিবার জন্য লাগিয়া গেলেন। অজস্র পিতৃধন নষ্ট করিয়া আর কিছু হউক, না হউক, তাঁহার একটী লাভ হইয়াছিল যে,—রঙ্গালয় সম্পর্কীয় খুব কমই অভিনেতা বা অভিনেত্রী

ছিলেন, যাঁহার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। আর সত্য বলিতে কি, তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও নবাবী মেজাজে সকলেই তাঁহাকে বেশ একটু প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাহাদের মধ্যে যাহারা তাঁহার দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাহাদের লইয়া বাগানে থিয়েটারের আখড়া বসাইয়া দিলেন—এবার সত্যই ঐকান্তিকতার সহিত মহলা চলিতে লাগিল। পরিচালক—স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ।

দল ত' বসিল; দলে যোগও দিলেন—দানিবাবু, চুণিবাবু, নেপেন-বাবু, নিখিলবাবু, সতীশবাবু, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, তারাসুন্দরী প্রভৃতি। কিন্তু থিয়েটার বাড়ী না হইলে ত' থিয়েটার খোলা চলে না; সব থিয়েটারই জোড়া। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পরম বন্ধু স্বর্গীয় শ্যামাধব রায়ের সহযোগিতায় মেছুয়াবাজারস্থিত বীণা থিয়েটার (বর্ত্তমানে যেখানে বায়স্কোপ হয়) লইবার জন্য ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকপরাম্পরামুখে এই সংবাদ শুনিয়া ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী আসিয়া অমরেন্দ্রনাথের দলে যোগ দিলেন,—ইচ্ছা, অমরেন্দ্রনাথকে কাপ্তেন ধরিয়া তাঁহার অধুনালুপ্ত সিটী থিয়েটারকে বীণা রঙ্গমঞ্চে পুনর্জীবিত করা। সিটী থিয়েটার সম্প্রদায়ভুক্ত দানিবাবু, প্রবোধবাবু, প্রমুখ ২।৪ জন অভিনেতা পূর্ব্ব হইতেই অমরেন্দ্রনাথের দলে ছিলেন, সুতরাং নীলমাধব বাবুর এখানে আসিয়া জমাইয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। অনতিবিলম্বে তিনি বীণা থিয়েটার 'লিজ' লইলেন। এ বিষয়ে "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"-গ্রন্থে নট ও নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"টাকার টানাটানি পড়িতে লাগিল, মনোমোহন বাবু মহাজন হইয়া টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, দলে মতবিরোধ ঘটিয়া নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এদিকে স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁহার

বন্ধুবর স্বর্গীয় শ্যামাধব রায় সহ

একজন বন্ধু সহসা থিয়েটার গগনে আবির্ভূত হইলেন। ইঁহারা ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছিলেন, আমাদের তুলিয়া দিয়া বীণা থিয়েটার ভাড়া লইবেন, অর্থাৎ সিটী থিয়েটারের সেক্রেটারী বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এই সময়ে সিটীকে পুনঃ প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যতদূর মনে হইতেছে, বোধ হয় এবার 'সিটী' নাম বদলাইয়া 'গেইটী' (Gaiety) থিয়েটার নাম গ্রহণ করে। ইতিপূর্ব্বে গিরিশ বাবু নেপথ্যে থাকিয়া সিটীকে সাহায্য করিতেন। দানীবাবু তখন সিটীতে, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তখন সিটীর 'হিরো'। এই দলকে লইয়াই গিরিশ বাবু প্রথম মিনার্ভার ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে নানা কারণে এই দলের সঙ্গে গিরিশ বাবুর বনিবনাও হয় নাই। মিনার্ভা থিয়েটারের বাড়ী যত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ইহাদের বিরোধও তত বাড়িতে লাগিল। শেষে মিনার্ভা যখন খোলা হইল, সিটীর অনেককে তখন আর সে দলে দেখা গেল না; সুতরাং সিটীর দল "ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট" হইয়া ঘরে গিয়া বসিল; তাই দলপতি নীলমাধব বাবুর এই দ্বিতীয় অভিযান। এখনও একজন বড়লোক ধরিয়া থিয়েটার করিবার প্রথা প্রচলিত; ব্যতিক্রম কেবল ষ্টারে ও বেঙ্গলে। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী তখন নাগেন্দ্র বাবু, ইনি ঠাকুর বাড়ীর দৌহিত্র। সুতরাং স্বত্বাধিকারী হারাইয়া আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িল; সুযোগ বুঝিয়া নীলমাধব বাবু অমর বাবুর বন্ধুকে সহায় করিয়া পুনরায় বীণা থিয়েটার 'লিজ' লইলেন, আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। আমাদের যে নূতন দল গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল।"

যাহা হউক, এইভাবে তো নীলমাধববাবু উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, বীণা থিয়েটার শুধু অপরেশবাবুদের নয়, অমরেন্দ্রনাথেরও হাতছাড়া হইয়া গেল। অগত্যা তিনি "ইণ্ডিয়ান্ ড্রামাটিক্ ক্লাব"কে পুনঃসঞ্জীবিত করিয়া, দুই এক রজনীর জন্য ষ্টেজ ভাড়া লইয়া মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিতে লাগিলেন। "ইণ্ডিয়ান্ ড্রামাটিক্ ক্লাবে"র পত্তন হইতেই "পলাশীর যুদ্ধ" রিহার্সালে পড়িয়াছিল—সে নাটক তৈয়ারীই ছিল। তাই তাহা লইয়াই সম্প্রদায় এমারেল্ড ষ্টেজে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিলেন।

ইঁহাদের দ্বিতীয় অভিনয় হইল—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। এবারও "পলাশীর যুদ্ধ" অভিনীত হইল, তবে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল —"বেল্লিক বাজার"। এই অভিনয় রজনীতে অমরেন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা-রূপে সর্ব্বপ্রথম নটরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করিলেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া এই তাঁহার প্রথম অভিনয়। ইতিপূর্ব্বে মহেন্দ্রলাল বসু এই ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজরূপী অমরেন্দ্রনাথ যখন—

> "কেন আজি মন মম এত উচাটন
> বোধ হয় বিষে মাখা সকল সংসার।
> কেন আজি চিন্তাকুল হৃদয় এমন
> কেমনে হইল এই চিন্তার সঞ্চার।"

বলিতে বলিতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন, দর্শকেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, বুঝি বা মহেন্দ্রলালের ছবি তাহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়াও গেল। এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে রঙ্গপীঠ যথার্থই উদ্ভাসিত করিয়া অমরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন :—

"দেখি বিভীষিকামূর্ত্তি ভয়াকুল মনে,
নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে।
প্রত্যেকে একটী পাপ চিত্রিয়া গগনে
দেখায় প্রত্যেক পাপ বিবিধ বিধানে।
যেই সব পাপকার্য্য করিতে সাধন
কোনদিন কেশাগ্রও কাঁপেনি আমার
আজি কেন তারি চিত্র করি দরশন,
শিহরিয়া উঠে অঙ্গ, কাঁপে বারম্বার ?"

তখন দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিতে শুনিতে বুঝি বা কোন অজ্ঞাত মায়ালোকে চলিয়া গেল, পটক্ষেপণের পর লুপ্ত সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। যে নাট্যানুরাগের জন্য অমরেন্দ্রনাথ কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন, যে অভিনয়স্পৃহার জন্য তিনি সমস্ত আত্মীয়স্বজনের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই, এত দিনে তাঁহার সেই কামনা ফলবতী হইল। ভগবান্‌দত্ত যে বিরাট্ শক্তি তাঁহার ভিতর লুক্কায়িত ছিল, যাহা, শত বাধা-বিপত্তিতেও, অদৃষ্টের সহস্র কশাঘাতেও লুপ্ত হয় নাই, সিরাজের ভূমিকায় প্রথম অভিনয়েই তাহা বিকশিত হইয়া উঠিল। দর্শকগণকে সানন্দ তুমুল করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া গেল। অভিনয় এত মর্ম্মস্পর্শী হইল যে, তাঁহার যে সমস্ত আত্মীয়বর্গ নটজীবন গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে কত গঞ্জনা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সে রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাও মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—"হ্যাঁ, কালু আমাদের অভিনয়টা করিয়াছে সত্য !"

এই অভিনয়ে অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মোহনলাল, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ক্লাইভ এবং তারাসুন্দরী বৃটেনিয়া ও সিরাজমহিষীর

অংশ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত "বেল্লিক বাজারে" তারাসুন্দরী নায়ক ললিতের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও নটগুরু গিরিশচন্দ্র অভিনয়কালে উপস্থিত থাকিয়া অভিনেতাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। এই দিনকার অভিনয় সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"সে আজ বহুদিনের কথা। আমি তখন বিংশ বর্ষীয় যুবক। নাট্য-শিল্পের প্রতি আমার আশৈশব অনুরাগ। নটের লাঞ্ছনা আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ, নাট্যশিল্পের উন্নতিসাধনে সকলেই উদাসীন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের পথ নিজেই ঠিক করিলাম। গতিপথে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অনেক প্রতিবাদ, অনেক গঞ্জনা আমাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু চিরপোষিত কর্ত্তব্য হইতে কিছুতেই বিচলিত হই নাই। নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে লাঞ্ছনার গুরুভার সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া—গিরিশবাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করি। আমি 'সিরাজের' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ওই চরিত্র লইয়া—রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া—আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ান্তে যখন ঐক্যতান বাদন হইতেছিল,—এমন সময় দেখিলাম পূজ্যপাদ গিরিশ-বাবু এক শান্ত সুন্দর সৌম্য পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। অনিমেষে সেই অনিন্দ্যসুন্দর—প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি আগন্তুকের পানে ক্ষণকাল দেখিলাম। অলক্ষ্যে অন্তরমধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বিনয় ও নম্রতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। সেই নবাগত—নবীন অপরিচিতের চরণপ্রান্তে প্রণত হইবার জন্য মস্তক নত হইয়া পড়িল

গিরিশবাবু আমায় ডাকিয়া বলিলেন,—"অমর, কে আসিয়াছেন—বল দেখি ?"

"আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন গিরিশবাবু কহিলেন,—"ইনিই কবি নবীনচন্দ্র !"

"পলাশীর যুদ্ধ প্রণেতা নবীনচন্দ্র—আমার সম্মুখে! আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের পদধূলি গ্রহণ করিলাম, তখনও 'পলাশীর যুদ্ধে'র সিরাজের ভূমিকার সকল কথাই কানে বাজিতেছিল—তখনও কবির রসময়ী লেখনী-ভঙ্গে অন্তরে বিবিধ রসের তরঙ্গ উঠিতেছিল—তখনও দর্শকবৃন্দের পুলকপূরিত করতালি-ধ্বনি রঙ্গালয় মুখরিত করিতেছিল—এই সকলের মধ্যে গিরিশবাবুর গুরুগম্ভীর বাণী—আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আবেগ আনিয়া দিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার কোমল হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে আমায় উঠাইলেন—মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল। দরিদ্রের রত্ন লাভের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ সামগ্রী আমি লাভ করিলাম। কবিবরের অকৃত্রিম স্নেহলাভে আমি ধন্য হইলাম। তিনি আমার অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার উল্লেখ করিলে আত্মপ্রশংসা করা হয়। আত্মপ্রশংসা—গুরুতর মহাপাপ।"

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ করিন্থিয়ান্ ষ্টেজ ভাড়া লইয়া আরও একবার "পলাশীর যুদ্ধ" অভিনয় করেন। এ রাত্রিতে অমরেন্দ্রনাথ সিরাজ, তারাসুন্দরী বৃটেনিয়া ও সিরাজমহিষী, চুণিলাল দেব মোহনলাল ও জগৎশেঠ এবং ক্লাইভের ভূমিকায় "ইয়ং জি, সি, ঘোষ" বলিয়া দানিবাবুর নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের "বিবাদ" রিহার্সালে ফেলিয়াছিলেন। ঐ নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইলে. বেঙ্গল থিয়েটার ষ্টেজে

এক রাত্রি 'বিষাদে'র অভিনয় হইল। অলর্ক—অমরেন্দ্রনাথ, ও সরস্বতী বা বিষাদ তারাসুন্দরী। নবীনচন্দ্রকে লইয়া গিরিশচন্দ্র এ রাত্রেও থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তারাসুন্দরীর অভিনয়কৌশল দেখিয়া, নবীনচন্দ্রের সম্মুখে তারাকে অতীব আদর করিয়া বলেন,—"আজ আমার 'বিষাদ' লেখা সার্থক হইল।"

কিন্তু এমন করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া থিয়েটার করিয়া বেড়াইতে অমরেন্দ্রনাথের আর ভাল লাগিতেছিল না। একটা স্থায়ী থিয়েটার খুলিয়া আয়ের পথ সুগম করিতে না পারিলে, সম্প্রদায় রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা ছিল। কেন না, তাঁহার পুঁজি অল্প, অথচ প্রতিদিন রিহার্সালের, মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের এবং অভিনেতাদের প্রতিদিন আহারাদি ও মাহিনার খরচ ইত্যাদিতে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইতেছিল। অমরেন্দ্রনাথের বাগানে তখন তাঁহার প্রায় সকল অভিনেতারা থাকিতেন, সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত প্রতি দিনের রাজভোগ-সদৃশ আহার এবং তাঁহাদিগের উত্তম উত্তম পরিচ্ছদাদি সমস্তই অমরেন্দ্রনাথ যোগাইতেন। মধ্যে মধ্যে ভোজও চলিত। বিংশতি বর্ষীয় যুবকের আবাহনে বহু গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি—আগমন করিয়া সান্ধ্যভোজে যোগদান করিতেন এবং অমরেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। সত্যই ত'! তাঁহার ন্যায় নবীন যুবকের এতাদৃশ সাহস বা প্রতিভা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই; কে এরূপ অল্প বয়সে তাঁহার ন্যায় নির্ভীকভাবে রাজা, মহারাজা প্রভৃতির সহিত নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করিয়াছে! সে যাহা হউক, এইরূপে তো বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আসল কাজ কিছু হইল না, অথচ এইরূপ ব্যয় হইতেছে দেখিয়া তিনি আর নিশ্চেষ্ট

বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সোদরোপম সুহৃদ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ ধনকুবের স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

গোপাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটার তখন বন্ধ ছিল। ৺নীলমাধব চক্রবর্ত্তী প্রমুখ সিটী থিয়েটার সম্প্রদায় অমরেন্দ্রনাথের গ্রাস হইতে বীণা রঙ্গমঞ্চ ছিনাইয়া লইলেও, সেখানে থিয়েটার জমাইতে পারেন নাই। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার সেইটা থিয়েটার উঠিয়া যায়। তখন তিনি এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইয়া সেখানে আবার সিটী থিয়েটার চালাইতে সুরু করেন। কিন্তু থিয়েটারে বিক্রয় নাই, ভাড়া বাকী পড়িতে লাগিল। তখন গোপাল বাবু সিটী থিয়েটারকে উঠাইয়া দিয়া, অন্য ভাড়াটিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অমরেন্দ্রনাথ গোপাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

গোপাল বাবু অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ধীরেন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, সেই সূত্রে অমরেন্দ্রনাথের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল। তাই অমরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার নিকট গিয়া, এমারেল্ড ষ্টেজ ভাড়া লইতে চাহিলেন, তিনি সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলিলেন,—"তুমি ত' ধীরেনের ছোট ভাই! আমি তোমার দাদার বন্ধু হইয়া কোন মতেই তোমাকে এইভাবে জীবন নষ্ট করিতে দিতে পারি না। তুমি থিয়েটার করিবার বাসনা পরিত্যাগ কর। যাও, আমি কিছুতেই তোমাকে থিয়েটার ভাড়া দিব না।"

অমরেন্দ্রনাথ সেদিনকার মত বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অবিলম্বে তিনি গিয়া গোপাল বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামাধব রায়কে ধরিয়া বসিলেন। শ্যামাধব বাবুর কথা আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি। তিনি অমরেন্দ্রনাথের একজন যথার্থ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তিনি গিয়া গোপাল বাবুকে অনেক অনুরোধ করাতে, গোপাল বাবু তাঁহার খাতিরে অমরেন্দ্রনাথকে এমারেল্ড ষ্টেজ ভাড়া দিলেন। রীতিমত 'লিজ' করিয়া অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার বাড়ীর "পজেসন" লইলেন, কিন্তু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া সেখানে গিয়া দেখেন যে, গৃহটী ধূলিসমাচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতিরেকে ব্যবহারের অযোগ্য। তবু ষ্টেজ ত' পাওয়া গেল; তিনি তাহার জীর্ণ অবস্থা দর্শনে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, পূর্ণ উদ্যমে তাহার সংস্কার-কার্য্যে লাগিয়া গেলেন।

কিন্তু কেবল থিয়েটার বাড়ী পাইলেই ত' হইল না! অভিনেতা ও অভিনেত্রী ত' চাই! অমরেন্দ্রনাথ তখন প্রায় কপর্দ্দকশূন্য,—শুধু মনের বলে ও রোখের বশে কাজ করিয়া চলিয়াছেন; "কিছুতেই হটিব না, থিয়েটার খুলিবই খুলিব," এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের ভরসায় নামিলেন, তাঁহারা একে একে গা ঢাকা দিতে সুরু করিয়াছেন। যাহা কিছু সামান্য পুঁজি ছিল, তাহা থিয়েটারের 'লিজে' ও তাহার জীর্ণসংস্কারে নিঃশেষিতপ্রায়। অর্থের অনাটনবশতঃ বাগানে অভিনেতাদের খরচের একটু কড়াকড়ি করিবার চেষ্টা করাতে, প্রায় সকলেই নিরুদ্দেশ; ইণ্ডিয়ান্ ড্রামাটিক্ ক্লাবের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। তিনি জনে জনে প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া ধর্ণা দিলেন; কিন্তু যদিও ষ্টেজ পাইবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁহার দলে যোগ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার টাকার টানাটানি দেখিয়া অনেকেই অস্বীকার করিলেন, কেহ কেহ বা এত টাকা দাবী করিয়া বসিলেন, যাহা তখন তাঁহার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। অবশেষে তিনি নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নিকট গিয়া তাঁহাকে

তাঁহার দলে যোগদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, বলিলেন,—"আপনার উপদেশ মত আমি নূতন থিয়েটার খুলিতে উদ্যত হইয়াছি। এখন আপনি আসুন, আমার দলে যোগ দিয়া থিয়েটারের ম্যানেজারী গ্রহণ করুন।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,—"না, এখনও তো তোমার থিয়েটার খোলাই হয় নাই। আগে থিয়েটার খুলিয়া ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া বস, তাহার পর আমার নিকট আসিও, তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহাদের সাহায্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়া, তিনি এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারা যে তাঁহাকে এরূপভাবে অকূলে ভাসাইয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই; তাহাদের নিকট হইতে এরূপ কাপট্যপূর্ণ ব্যবহার তিনি স্বপ্নেও আশা করিতে পারেন নাই। মাত্র বিংশতিবর্ষীয় সংসারানভিজ্ঞ, সরল যুবক তিনি—এতকাল অগাধ পিতৃধন নষ্ট করিয়া বিলাসব্যসনেই সময় কাটাইয়াছেন, আশে-পাশে তাকাইয়া দেখিবার অবসর পান নাই। যাহাদিগকে প্রকৃত বন্ধু ভাবিয়া ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন, টাকা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অনেকে পলাইল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা নূতন থিয়েটার খোলার প্রস্তাবে খুব উৎসাহ দেখাইলেও, এখন থিয়েটার বাড়ীর 'লিজ' ও সংস্কার-কার্য্য সমাধা হওয়ার পর, 'গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লইল।' এখন গাছ হইতে নামিবারও উপায় নাই। এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়াই, তিনি "নাট্য সাহিত্যে নবীনচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছিলেন,—"প্রথম যখন আমার নাট্যজীবন আরম্ভ হয়, তখন চারিদিক

হইতে বাধা ও বিপত্তির স্রোত আমাকে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল।” কিন্তু এত প্রতিকূল অবস্থাতেও অমরেন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ হইলেন না। আত্মশক্তিতে অসীম আস্থাবান্ তিনি—হয়ত কোন ঐশী প্রেরণায় নববলে বলীয়ান্ হইয়া,—নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থাতেও হাল ছাড়িলেন না, ‘একাই একশ’ হইয়া, নূতন দল সংগঠনোদ্দেশ্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই, নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু, তৎরচিত “নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মরণে শোকোচ্ছাস” শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছিলেন :—

কি উদ্যম কি প্রতিভা, পরিশ্রম নিশি দিবা,
বিজয় প্রতিজ্ঞা কিবা অসীম সাহস !
সদা মনে উচ্চ আশ, হটিলে না হতাশ্বাস,
দ্বিগুণ উৎসাহে করে কর্ম্মে নিজ বশ ॥

যাহা হউক, অমরেন্দ্রনাথের অসীম অধ্যবসায় ও দুই মাস ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, নূতন দল গঠিত হইল। পুরাতন বন্ধুগণের মধ্যে এই সঙ্কটকালেও তাঁহাকে ছাড়িলেন না মাত্র একজন—সতীশ-বাবু। তারাসুন্দরীও প্রথমে দলে যোগদান করিতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সুতরাং পুরাতনের মধ্যে মাত্র সতীশবাবু ও তারাসুন্দরী এবং নূতনের মধ্যে মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ দাস, ধর্ম্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎসুন্দরী, সরোজিনী প্রভৃতিকে লইয়া অমরেন্দ্রনাথ “ক্লাসিক থিয়েট্রিকাল কোম্পানী” নাম

দিয়া, নব সম্প্রদায় সংগঠন করিলেন ও সন ১৩০৩ সালের ২৭শে চৈত্র, —কেহ কেহ বলেন, ১৯শে ফাল্গুন,—এমারেল্ড ষ্টেজে হারানিধির প্রথম মহলা বসাইলেন। নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, ১৩০৪ সালের ৪ঠা বৈশাখ, ইংরাজী ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭, গুড ফ্রাইডের দিন, রাত্রি ৭টার সময়ে, নূতন উদ্যমে ও অভিনব উদ্যোগ আয়োজন সহকারে, মহাসমারোহে নূতন থিয়েটারের উদ্বোধন হইল।* বহু পরিশ্রম, অনন্ত ভাগ্যবিপর্য্যয়, অশেষ অধ্যবসায়ের পর, এতদিনে অমরেন্দ্রনাথের চিরপোষিত বাসনা সফলতা লাভ করিল।

আমরা বহু কষ্টে এই প্রথমাভিনয় রজনীর একখানি হ্যাণ্ডবিল সংগ্রহ করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* শিশির পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত অমরেন্দ্রনাথের জীবনীতে ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্বোধন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে অমরেন্দ্রনাথ, চুণীলাল দেব, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী প্রভৃতিকে লইয়া ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে "ক্লাসিক" থিয়েটারের উদ্বোধন করেন।" (কথাগুলি সতীন্দ্রনাথ সরকার-রচিত 'অমরেন্দ্রনাথের নাট্যজীবন" হইতে উদ্ধৃত।)

সালটা ত' ভুলই: ১৮৯৬ নয়, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটার খোলা হয়। তাহা ছাড়া, এখানে চুণীবাবুর যে উল্লেখ রহিয়াছে, সেটাও ভুল; কারণ, সমসাময়িক সংবাদপত্র, হ্যাণ্ডবিল বা অন্যান্য কিছুতেই আমরা চুণীবাবুর কোন নামগন্ধ খুঁজিয়া পাই নাই। বরঞ্চ যে সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যে সময় ক্লাসিকের উদ্বোধন হয়, সে সময় চুণীবাবু মিনার্ভা থিয়েটারে নিযুক্ত ছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে ক্লাসিক সম্প্রদায়ভুক্ত করা কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ নহে কি?

1897

OPENING NIGHT

EMERALD THEATRE

By

The Classic Theatrical Co.

মহাসমারোহে প্রথমাভিনয় !

ক্ল্যাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং।

Good Friday the 16th April 1897 at 7 P. M. sharp.

শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে ৪ঠা বৈশাখ সন ১৩০৪ সাল সন্ধ্যা ৭টা।

Under the distinguished patronage and in the immediate presence of

Rajah Boykuntha Nath De Bahadur of Balasore.

বালেশ্বরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুরের সম্মুখে

A medley of the cream of the staff of some of our Public Theatres, supplemented by infusion of new blood of Actors and Actresses of established reputation.

1. Mahendro Lal Bose—The Tragedian.
2. Aghore Nath Pattack—Musical Director and Actor.
3. Amorendra Nath Dutt.
4. Gobordhone Banerjee—(Late Dancing Master Minerva Theatre.)
5. Promotho Nath Dass—Proprietor & Actor Minerva Theatre.
6. Dharma Dass Sur—Renowned Stage Manager.

7. Tara Sundary—The Star of the Star Theatre.
8. Kusum Kumary—The Jewel of the Minerva Theatre.

Nayan Tara & Sarat Coomary—Roses of the City Theatre.

Sorejeenee—(Lily of the Emereld Theatre.)

Babu Girish Chandra Ghose's Musical Comedy.

NALA DAMAYANTI

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত মিলনান্ত নাটক

নল-দময়ন্তী

Splendid Lotus Scene !

একটী ক্ষুদ্র কমলকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরাগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে !

নল—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দময়ন্তী—শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।

কলি—শ্রীঅঘোরনাথ পাঠক।

Followed by

Babu G. C. Ghose's Evergreen Oriental Pantomime

BELLICK BAZAR.

তৎপরে

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নিত্য নূতন পঞ্চরং

বেল্লিক বাজার

সাধারণের চিরপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গ কর্ত্তৃক অতি সমারোহে বেল্লিকবাজার অভিনীত হইবে।

Note—Owing to the shortness of time, I have not been able to appear before the public with a New Drama, as I fully intended to do. I shall however do so soon. All that I now aspire to is to merit the sympathy of the public for appearing before them without waiting to be fully prepared for the honour.

AMORENDRA NATH DUTT,

Lessee & Manager.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠা

(১৮৯৭)

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল হইতে "এমারেল্ড থিয়েটারে ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং কর্তৃক" অভিনয় আরম্ভ হইল। নূতন নাটক লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অমরেন্দ্রনাথের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অবিলম্বের অভিপ্রায়ে সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইল না। হাতে টাকা অল্প, থিয়েটার খুলিতে দেরী করিলে, শেষে "ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাবের" মত এ দলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে! এত পরিশ্রম, এত আয়োজন, সমস্ত পণ্ড হইবে! তাই অমরেন্দ্রনাথ 'শুভস্য শীঘ্রং' ভাবিয়া, মাত্র কয়েক দিনের তোড়জোড়ের পর, অভিনয় সুরু করিয়া দিলেন। উদ্বোধনের দিন অভিনীত হইল— নল-দময়ন্তী ও বেল্লিকবাজার। পরদিন শনিবার, ১৭ই এপ্রিল— পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন। নূতন থিয়েটারে, নূতন সাজে, নূতন উদ্যমে অমরেন্দ্রনাথ আবার সিরাজের ভূমিকায় দেখা দিলেন এবং লক্ষ্মণ বর্জ্জনে তিনি লক্ষ্মণ, মহেন্দ্র বসু রাম ও অঘোর পাঠক কালপুরুষ সাজিলেন। ১৮ই এপ্রিল, রবিবার, দক্ষযজ্ঞ ও বেল্লিকবাজার অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। দক্ষযজ্ঞে—অমরেন্দ্রনাথ মহাদেব, অঘোরনাথ পাঠক দক্ষ, তারাসুন্দরী সতী ও কুসুমকুমারী তপস্বিনীর অংশ এবং বেল্লিকবাজারে

অমরেন্দ্রনাথ দোকড়ি দালাল ও তারাসুন্দরী ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। তিন দিনই অভিনয় হইল অত্যুৎকৃষ্ট, অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ একবাক্যে খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। নল-দময়ন্তী ত' তাঁহার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই জমিয়া উঠিল। নলরূপী অমরেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বীয় পরিচয়-প্রদানোদ্দেশ্যে দময়ন্তীকে বলিলেন,—

নল নাম—শুন সুলোচনে !
দেবরাজ আদেশে এসেছি,
দেব-বলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে ;
কেন রাজবালা উতলা আমারে হেরে ?
আমি দেবদূত—দাস তাঁর।

তখন তাঁহার আবৃত্তি-মাধুরীতে সকলের মুখে আপনা হইতেই সাধুবাদ উত্থিত হইল। সেই নলই যখন বলিলেন,—

শুন সুলোচনে !
যদি ভালবাস, ভালবাসা রবে চিরদিন।
সঁপি কায় পূজা কর দেবতায়,
আপনায় দেহ বলি।
দেবকার্য্যে নরে ধরে দেহ।
দেবকার্য্যে আসিয়াছি সুবদনি,
দেবকার্য্যে যাচি জানু পাতি'—
দেবে কর দেহদান ;
তব আত্মবিসর্জ্জন জগজ্জন করিবে কীর্ত্তন।
শুন, বরাননে, সুখ তুচ্ছ গণি',
দু'খে সুখ শিখ মোর কাছে।

'নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের ভূমিকায়

অমরেন্দ্রনাথ।

দময়ন্তী—কুসুমকুমারী।

নল।—এই ত চোদ্দনু বাস।—

আমিও কেঁদেছি,

কাঁদিয়ে শিখেছি ; কেঁদে কেঁদে হব সুখী !

তখন সকলের মনেই স্বতঃ প্রশ্ন জাগিল,—"কে এ যুবক ?" আবার সেই নলই যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীকে বনে ফেলিয়া যাইবার কালে পরিধেয় বস্ত্র কাটিতে কাটিতে বলিলেন,—

এইত ছেদিনু বাস ;

হায় ! মম অদর্শনে

পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে ?

চন্দ্রাননে ! ক্ষমা কর অধমেরে,

সুদিন উদয় যদি কভু হয়—

প্রিয়তমে ! দেখা হবে ;

নহে, এই শেষ দেখা !

তখন দর্শকগণের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। অভিনয় দর্শন করিতেছে ভুলিয়া গিয়া মনে করিল, বুঝি যথার্থই নল রাজা শনির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া এইভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

দক্ষ-যজ্ঞেও সেইরূপ। দশমহাবিদ্যা দৃশ্যে ভীত চকিত ত্রস্ত মহাদেব-রূপী অমরেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন,—

ত্রাহি, ত্রাহি ! কে রে নব নীরদবরণী ?

উৰ্দ্ধজটা বিভূষিত ফণী,

লম্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা,

পঞ্চ অৰ্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে,

অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে,

নৃমুণ্ডমালিনী চতুর্ভুজা,

মুণ্ড খড়্গ খর্পর কমল সাজে !

রাখ পায় সভয় মহেশ !
কোথা যাব—কেমনে পলাব ?

তখন সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের চিত্তও শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল। আবার দক্ষযজ্ঞপণ্ডদৃশ্যে, রুদ্ররূপী মহাদেববেশে অমরেন্দ্রনাথের "কে রে, কে রে, সতী দে আমার," উক্তি শ্রবণে সকলের মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সে অপূর্ব্ব আবৃত্তিমাধুর্য্য ও অভিনয়ভঙ্গী লেখনীমুখে পাঠকবর্গের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা সাধারণ লেখকের সাধ্য নহে। তবে এইটুকু বলিলে সে অভিনয়ের কথঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইবে যে, স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র এই দুই ভূমিকা জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু যাঁহারাই নল ও মহাদেবরূপী অমরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "হ্যাঁ, একটা নূতন ছবি দেখিলাম বটে !"

অঘোরনাথ পাঠককে সঙ্গীত শিক্ষক, ধর্ম্মদাস সুরকে রঙ্গভূমি সজ্জাকর, আশুতোষ বড়ালকে কর্ম্মসচিব (বিজনেস্ ম্যানেজার ও প্রমথনাথ দাসকে বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত করিয় অমরেন্দ্রনাথ মহাসমারোহে থিয়েটার চালাইতে লাগিলেন। পরে সপ্তাহে শনিবার, ২৪শে এপ্রিল, দক্ষযজ্ঞ ও বিবাহ বিভ্রাট এবং রবিবা তরুবালা ও বেল্লিকবাজার অভিনয়ের আয়োজন হইল। তরুবালা অখিল স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। এ ভূমিকাও তিনি খুব সুখ্যাতির সহি বহুবার অভিনয় করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে যথাশীঘ্র মহলা শেষ করিয়া পরের শনিবার, ১লা গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' খোলা হইল। তাহাতে অঘোরের অ অমরেন্দ্রনাথ ও হরিশের অংশে মহেন্দ্রলাল বসু অবতীর্ণ হইতে

এতদ্ভিন্ন প্রমথ দাস নীলমাধব, তারাসুন্দরী সুশীলা ও কুসুমকুমারী কাদম্বিনী সাজিলেন। দেখাদেখি, ষ্টার থিয়েটারও 'হারানিধি'র পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। অঘোরের অংশে বেলবাবুর (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) অপূর্ব্ব অভিনয়ের পর, আর যে সে ভূমিকা যথোচিতভাবে অভিনীত হইতে পারে, ইহা কাহারও ধারণা ছিল না; তাই তাঁহার মৃত্যুর পর ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষেরা হারানিধির অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ক্লাসিককে সেই হারানিধির অভিনয়ে অগ্রসর দেখিয়া, তাঁহারাও প্রতিযোগিতায় হারানিধির পুনরভিনয় করিলেন। ষ্টার থিয়েটারের তখন খুব সুনাম, খুব পসার। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ফটুাই), নটবর চৌধুরী, জীবনকৃষ্ণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কালী কোঙার, প্রমদাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, গঙ্গামণি, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি সে সময়কার সমস্ত বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রী তখন ষ্টারে। কিন্তু ক্লাসিকে একা অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের অংশে অবতীর্ণ হইয়া, হারানিধি জমাইয়া ফেলিলেন। চোরবেশী, সাধুবেশী, অন্ধভিক্ষুকবেশী, কাপ্তেনবাবুবেশী, সাহেববেশী, বহুরূপী অঘোর-রূপে অমরেন্দ্রনাথের নানারসসমন্বিত সর্ব্বতোমুখী অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া শত্রু মিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে,—"এই ভূমিকার যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনাতীত।" অন্ধভিক্ষুকবেশী অমরেন্দ্রনাথ যখন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া, "অন্ধ নাচার বাবা" ও "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক," এই দুইটী উক্তি উচ্চারণ করিতেন, তখন দর্শকগণের মনে হইত, সত্যই বুঝি একজন অন্ধ নাচার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতেছে। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, অঘোরবেশে

অমরেন্দ্রনাথকে যাঁহারাই দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রাণের ভিতর সে অভিনয় একটা চিরস্থায়ী দাগ টানিয়া দিয়া অদ্যাবধি কানের ভিতর ঝঙ্কার তুলিতেছে এবং তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, অমরেন্দ্রনাথ যথার্থই একজন প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ নট।

অমরেন্দ্রনাথের এই ভূমিকাভিনয় দর্শনে উচ্ছ্বসিত হইয়া, তাঁহার গুণমুগ্ধ জনৈক কবি* লিখিয়াছিলেন :—

প্রথম প্রতিভা তব 'অঘোরে' বিকাশ,
'বেলবাবু' তুলনায় কভু নহে হ্রাস।
খনির কাঞ্চন তুমি,
চিনেছিল বঙ্গভূমি,
পে'য়ে তব মনীষার প্রথম আভাষ।

এ সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 'নাট্যমন্দিরে' এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"এইবার অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় নৈপুণ্য সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা আবশ্যক। না বলিলে তাঁহার স্বর্গগত আত্মার প্রতি অসম্মান করা হয়। অভিনয় কালে তিনি সহস্র সহস্র দর্শককে এক কথায় মাতাইয়া তুলিতেন; ইহা তাঁহার অল্প কৃতিত্বের কথা নহে। ষ্টার থিয়েটারে যখন প্রথম 'হারানিধি' খোলা হয়, তখন বেল দাদা (Captain Bell) অঘোরের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। তেমন স্বাভাবিক অভিনয় আর বোধ হয় কখনও দেখি নাই; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই অঘোরের ভূমিকায় যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত এবং সর্ব্বজনবিদিত। আমার বিশ্বাস কাপ্তেন বেল

* শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

ও অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকাভিনয়ে কেহই উনিশ-বিশ ছিলেন না। কি সে সুন্দর ছবি! আমি ইহজীবনে তাহা ভুলিব না।"

অভিনয় সাধনায় অমরেন্দ্রনাথের এই যে সিদ্ধি, ইহা কাহারও শিক্ষাগুণে হয় নাই। বস্তুতঃ জন্ম-অভিনেতা আখ্যা যদি কাহারও প্রাপ্য হয়, সে নামে যদি কাহারও দাবী থাকে, তো সে একমাত্র অমরেন্দ্রনাথের। কেননা, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অদ্যাবধি যত অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সকলেই কোন না কোন গুরুর কাছে শিক্ষানবিশী করিয়াছেন, প্রত্যেকেই কাহাকেও না কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ উত্তরকালে গিরিশচন্দ্রকে গুরুর তুল্য সম্মানের চক্ষে দেখিলেও, অভিনেতারূপে যখন তাঁহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তিনি কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ শিক্ষাগ্রহণ করেন নাই, স্বীয় অধ্যবসায়গুণে ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অসাধারণ প্রতিভাবলে এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদেই তিনি সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন।

হারানিধির অপ্রত্যাশিত অভিনয়-সাফল্যে অমরেন্দ্রনাথ চারি সপ্তাহ ধরিয়া প্রতি শনিবার হারানিধির অভিনয় চালাইলেন। আমরা নিম্নে এই সময়ের অভিনয়-লিপি দিলাম :—

১লা মে শনিবার হারানিধি ; পর দিন ভক্তবালা ও বিবাহ বিভ্রাট।
৮ই মে ,, ,, ,, ,, ও হীরার ফুল।
১৫ই মে ,, ,, ,, পলাশীর যুদ্ধ ও ঐ।
২২শে মে ,, , ,, বিল্বমঙ্গল ও ঐ।

বিল্বমঙ্গলে অমরেন্দ্রনাথ নায়কের অংশ গ্রহণ করেন এবং অঘোর পাঠক ভিক্ষুক ও তারাসুন্দরী চিন্তামণি সাজেন। বিল্বমঙ্গলের

ভূমিকাভিনয়েও অমরেন্দ্রনাথ নবার্জ্জিত যশ অক্ষুণ্ণ রাখেন। প্রত্যেক ভূমিকায় তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয়কৌশল ও সাফল্যের বর্ণনা করিতে গেলে, আমরা এ গ্রন্থে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না। তাই কপালকুণ্ডলার সংস্কৃত অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ কাব্যতীর্থ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এ আলোচনার উপসংহার করিব। তিনি বলেন :—

"অমরেন্দ্রনাথকে বিল্বমঙ্গলের অংশ গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাঁহাকে বৃন্দাবনের পথে পথে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, আমার হৃদয়ে শান্তিশতক প্রণেতা শিহ্লন মিশ্রের কথা সম্পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল বুঝি শিহ্লন মিশ্রই "আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনম্" এই উপদেশ জনসমাজে প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

হারানিধির অভিনয় খুব জমিয়া উঠিলেও, বিক্রয়ের দিক দিয়া অমরেন্দ্রনাথ তেমন সুবিধা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্থির করিলেন যে, 'দেবী চৌধুরাণী' চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ ষ্টেজেই সিটী থিয়েটার সম্প্রদায় বেশ সুখ্যাতির সহিত ঐ পুস্তক অভিনয় করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ নিজে কলম ধরিয়া, নূতন করিয়া 'দেবী চৌধুরাণী' নাটকাকারে পরিণত করিলেন ও তদুপযোগী এগারখানি গান রচনা করিয়া তাহাতে সংযুক্ত করিলেন।

২৯শে মে (১৮৯৭) শনিবার, এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং কর্ত্তৃক মহাসমারোহে দেবী চৌধুরাণীর প্রথম অভিনয় হইল। প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বিতরিত হইল :—

ব্রজেশ্বর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরবল্লভ—চণ্ডীচরণ দে, ভবানী পাঠক—হরিভূষণ

ভট্টাচার্য্য, রঙ্গরাজ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ব্রাহ্মণ—আশুতোষ বড়াল, প্রফুল্ল (দেবী রাণী)—তারাসুন্দরী, নিশি—কুসুমকুমারী (বিষাদ), দিবা—ক্ষুদি, সাগর বৌ নয়নতারা, নয়ান বৌ—লক্ষ্মীমণি।

নূতন নূতন দৃশ্যপটে রঙ্গমঞ্চের 'ভোল' বদলাইয়া গেল,—"নদীবক্ষে বৃহৎ বজরা, বজরাতে ভীষণ ডাকাতি" দেখিয়া, দর্শকবৃন্দের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। অমরেন্দ্রনাথ সাজসজ্জা, দৃশ্যপট বিষয়ে রঙ্গমঞ্চে যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিলেন, দেবী চৌধুরাণীতে তাহার প্রথম আভাস পরিলক্ষিত হইল।

অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল, তাহা লেখাই বাহুল্য। ব্রজেশ্বররূপী অমরেন্দ্রনাথের বজরার উপর বসিয়া, প্রফুল্লের প্রতি যে উক্তি—"কেন তুমি মরতে জান, আমি জানি না," প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি পরেও এখন আমাদের কানে বাজিতেছে। তাই অমরেন্দ্র-ভক্ত পূর্ব্বোল্লিখিত কবি লিখিয়াছিলেন :—

কে রাখিবে পিতৃপদে ভক্তি নিরন্তর ?
প্রফুল্লের হৃদিবক্ষে কোথা ব্রজেশ্বর ?
রাখি 'দেবী রাণী' মান,
প্রণয়ের অভিমান,
চরণে ধরাবে কারে প্রেমের 'সাগর' ?

দেবীর অংশে তারার অভিনয় দেখিয়া মহেন্দ্র বসু বলিয়াছিলেন,—"সাবাস বলিহারী যাই! একা তোমায় পাইলেই একটা দল অনায়াসেই চালাইতে পারি।"

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জুনের অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন :—

The Classic Theatrical Coy, successfully played this drama (Devi Choudhurany) on Saturday last at the above

place. The acting and other things do great credit to the new Company.

দেবী চৌধুরাণীর অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এক ক্লাসিক থিয়েটারেই যে উহার কত সহস্র রজনী অভিনয় হয়, তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না।

চারি সপ্তাহ ধরিয়া প্রতি শনিবার দেবী চৌধুরাণী ও প্রতি রবিবার হারানিধি চালাইয়া, অমরেন্দ্রনাথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর দিন ক্লাসিক থিয়েটারে নূতন নাটকের উদ্বোধন করেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের অনুসরণে হরিরাজ নামে এক পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রণয়ন করেন। শোনা যায়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথমে এই নাটকের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সেই নাটকের সমস্ত ও সর্ব্বপ্রকার স্বত্ব কিনিয়া লইয়া, রঙ্গমঞ্চোপযোগী করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া, নিজের থিয়েটারে উহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। *

* অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের সমস্ত স্বত্ব কিনিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি নিজের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের সহিত হরিরাজের প্রকাশ-স্বত্বও বসুমতীকে বিক্রয় করেন। বসুমতী হরিরাজকে "অমর-গ্রন্থাবলী"ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"-গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি অযথা ইঙ্গিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু গ্রন্থ রচনাকালে অপরেশ বাবু একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ জীবিত কালে হরিরাজকে কখনও তাঁহার নিজের লেখা বলিয়া চালান নাই ; স্বপ্রকাশিত কোন অমর গ্রন্থাবলীতে হরিরাজ স্থান পায় নাই ; বরঞ্চ বহুবার বহু হ্যাণ্ডবিলে, বহু বিজ্ঞাপনে তিনি "নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত সেই যুগযুগান্তকারী ঐতিহাসিক নাটক হরিরাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া, কে গ্রন্থকার তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

'হরিরাজ' নাটকে হরিরাজের ভূমিকায়—

অমরেন্দ্রনাথ

হরি।— অসি! সর্বনাশি শক্তিধর তুমি—

সোমবার, ২১শে জুন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, হীরক জুবিলীর দিন হরিরাজের প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি আমরা নিম্নে দিতেছি ঃ—

হরিরাজ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জয়াকর*—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কহ্লন—প্রমথনাথ দাস, কুলধ্বজ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, দধিমুখ—ভোলানাথ দাস, শ্রীলেখা—ছোট রাণী, অরুণা—তারাসুন্দরী, সুরমা—ক্ষুদিবালা, মলিনা—সরোজিনী।

হরিরাজের ভূমিকাভিনয় অমরেন্দ্রনাথের এক বিজয় বৈজয়ন্তী। ইহাতে তিনি যে অভিনয় চাতুর্য্যের পরিচয় দেন, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী মূক। যদি অমরেন্দ্রনাথ শুধু এই ভূমিকার অভিনয় করিয়াই নটজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। দর্শকের চিত্ত হইতে তাঁহার সে অভিনয়ের ছবি মুছিবার নয়, কখন মুছিবেও না। অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের অংশ এমনভাবে জ্বালাইয়া দেন যে, অদ্যাবধি কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা কখনও ঐ ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হন নাই।† তাঁহার সে অতুলনীয় আত্মোক্তি—

* পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে অপরেশ বাবু ও "গিরিশ প্রতিভা"য় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, মণ্টু বাবু জয়াকর সাজেন। অথচ আমরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত প্রথম অভিনয় রজনীর পরিচয়-লিপিতে দেখি যে, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য জয়াকরের অংশে অবতীর্ণ হন। পর পর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বিজ্ঞাপনে হরিভূষণ বাবুর নাম দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং অপরেশ বাবু ও হেমেন্দ্র বাবু যে ভুল ধারণাবশতঃ মণ্টু বাবুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

† উত্তরকালে মনোমোহন থিয়েটারে যখন এই নাটকের পুনরভিনয় হয়, তখন স্বয়ং দানিবাবু এ ভূমিকা গ্রহণে সাহসী না হইয়া, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়কে হরিরাজের অংশে নামান। অথচ দানি বাবুই ছিলেন মনোমোহন থিয়েটারের 'হিরো অ্যাক্টর'।

"জীবন ধারণ কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন"—"To be or not to be"; শ্রীলেখার সহিত কথোপকথনে তাঁহার সে অননুকরণীয় অভিনয়, সে অনুপম আবৃত্তিমাধুরী, সে অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী ভুলিবার নয়, একবার মনে করিলেই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। মাতার গমনে বাধা দিয়া, ঝটিতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিতার আলেখ্য বাহির করিয়া, তাঁহার হৃদয়োন্মত্তকারী সে তিরস্কার :—

কোথা যাও ? দেখ চিত্র অতীব সুন্দর !
কি বিশাল ঠাট, প্রশস্ত ললাট,
ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম।
পূর্ণজ্যোতি আকর্ণ নয়ন,
নাসিকাগঠন—খগরাজে দিয়ে লাজ।
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত,
শরাসন-করে—কার্ত্তিকেয় পরাজয়।
সুবিশাল হের বক্ষঃস্থল,
হেরি রিপুদল কাঁপিত সভয়ে,
ভীতমনে মানিত শাসন।
এই জন ছিল তব স্বামী !
জ্ঞানচক্ষু কর উন্মীলন,
হের অন্য জন ভিক্ষা-অন্নে পালিত কুক্কুরে।
হিংসাভরে কুঞ্চিত ললাট
ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাষে,
আঁখি পাশে নরকের ছায়া,
দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন !
হেন জন বিলাসের কীট তব !

মাতা! গজমতি দলি পদতলে
কাচখণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন!—
স্মরণে এখনও সর্ব্বাঙ্গ পুলকে শিহরিয়া উঠে!

শ্রীলেখার অংশে তারাসুন্দরীর অভিনয়ও কম উল্লেখযোগ্য নহে। প্রথমে এই ভূমিকা ছোট রাণীকে দেওয়া হয়, কিন্তু কয়েকরাত্রি অভিনয় করিবার পর, সে সহসা ক্লাসিকের সংস্রব পরিত্যাগ করে। তখন মাত্র দুই দিনের মধ্যে নিজে এই কঠিন ভূমিকা আয়ত্ত করিয়া, তারাসুন্দরী অভিনয় শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করান।

হরিরাজের অভিনয় তখনকার দিনে দর্শক সমাজে কিরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নায়ক সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে*—

"তখন ক্লাসিক থিয়েটারের আমল। নূতন বই 'হরিরাজ' খোলা হইবার কিছুদিন পরে, আমার একজন বন্ধু আমাকে বলিল,—"ওহে, একদিন ক্লাসিকে হরিরাজ দেখিয়া আসি চল; বাজারে ঐ বইএর খুব নাম বাহির হইয়াছে। অমর দত্ত নাকি খুব সুন্দর 'প্লে' করিতেছে।" আমি বন্ধুর কথা শুনিয়া কিছুদিন পরে এক দিবস 'হরিরাজ' দেখিতে গমন করিলাম। 'হরিরাজে'র অংশের অভিনয় দেখিয়া আমার বোধ হইল, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় বুঝি কখনও দেখি নাই।"

হরিরাজের অভিনয়ের পর অভিনেতারূপে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু অভিনয়ের এত সুখ্যাতি সত্ত্বেও, দর্শক সমাগম তেমন বেশী হইল না। অমরেন্দ্রনাথ মহা দুর্ভাবনায় পড়িলেন। হাতে পয়সার এমন কিছু স্বচ্ছলতা নাই

* অমরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

যে, তিনি বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া থিয়েটার চালাইয়া যাইবেন। অথচ থিয়েটার চালাইতে হইলে নিত্য নগদ টাকার প্রয়োজন। তাঁহার আশা ছিল যে, একবার থিয়েটার খুলিতে পারিলেই আর অর্থের কোন ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার সে ধারণার ভ্রমাত্মকতা উপলব্ধি করিয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আবার থিয়েটার জমিতেছে না দেখিয়া, দলের লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ উস্‌খুস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শূন্য বেঞ্চির সম্মুখে অভিনয় করিতে কাহারই বা তেমন ভাল লাগে! সুতরাং কি করিয়া দর্শক সংখ্যা বাড়ান যায়, ইহাই অমরেন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি একদিন দলের সকলকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"দ্যাখ, তোমরা নিরাশ হইও না—অন্যান্য থিয়েটারে বড় বড় নামজাদা অভিনেতারা আছেন, কিন্তু আমরা অধিকাংশই নাট্যজগতে অপরিচিত, সেই জন্য উপস্থিত আশানুরূপ অর্থাগম না হইলেও, আমাদিগকে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে আর এ বিষয়ে একটী উপায়ও করিতে হইবে। যদি লোকে জানিতে পারে আমাদের গুণ আছে, আমরা ভাল অভিনয় করিতে পারি, তাহা হইলে অতি অবশ্যই আমাদের থিয়েটারে দলে দলে লোক আসিবে। সেই জন্য আমি বলিতেছি যে, তোমরা সকলে প্রতি অভিনয় রজনীতে তোমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে আমাদের থিয়েটারের যত পার 'ফ্রি পাশ' দিও। তাই বলিয়া রাস্তার লোক ডাকিয়া যাহাকে তাহাকে বিলি করিও না, বুঝিয়া সুজিয়া দিও। আমাদের অভিনয় যদি ভাল হয়, তাহা হইলে ফ্রি পাশে আগত লোকদের মুখে আমাদের সুখ্যাতি বাহির হইয়া গেলে, তখন আর দর্শকের বা শ্রোতার জন্য ভাবিতে হইবে না।"

কিন্তু শুধু দলের লোককে ফ্রি পাশ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াই তিনি

'বুদ্ধদেব' নাটকে বুদ্ধদেবের ভূমিকায়

অমরেন্দ্রনাথ।

ক্ষান্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন না। নিত্য নব অভিনয়ের স্রোতে দর্শক-মণ্ডলীকে প্লাবিত করিয়া দিবার জন্য, তিনি ঘন ঘন নূতন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে আবার ৯ই জুন হইতে বুধবারের অভিনয় সুরু হইয়াছিল। ঐ দিনের অভিনয় জমাইবার জন্য, ৩০শে জুন হইতে বুদ্ধদেব অভিনয়ের বন্দোবস্ত হইল। বুদ্ধদেব-রূপে অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এক চমকপ্রদ অভিনয়-লীলা দেখাইলেন এবং সে অভিনয় চাতুর্য্যের ফলে তাঁহার যশ চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

নিত্য নূতন নাটক অভিনয় করে,—উপর্য্যুপরি পাঁচ সপ্তাহ হরিরাজ অভিনয় করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ সে নাটককে রবিবারের আসরে ঠেলিয়া দিয়া, ২৪শে জুলাই শনিবার, 'রাজা ও রাণী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গেরই হইল। তাহার মধ্যে অমরেন্দ্র-নাথের বিক্রমদেব, মহেন্দ্রলাল বসুর কুমারসেন ও হরিভূষণ ভট্টাচার্য্যের দেবদত্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবীণ বয়সেও কুমারসেনের অংশে মহেন্দ্রলালের পূর্ব্ব প্রতিভার স্ফুরণ দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময়ে চকিত হইয়া গেলেন। আর অমরেন্দ্রনাথ! বিক্রমদেবরূপে তিনি যখন সুমিত্রার পলায়ন সংবাদে বিহ্বল হইয়া গদগদস্বরে ত্রিবেদীকে বলিতেন :—

মিথ্যা করে বল! অতি ক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা! হে ব্রাহ্মণ!
বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণ দৃষ্টি, কি করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না? বেশী নয়,
এক বিন্দু জল! নহে ত নয়নপ্রান্তে
ছল ছল ভাব; কম্পিত কাতর কণ্ঠে

অশ্রুবদ্ধ বাণী! তাও নয়? সত্য বল

মিথ্যা বল! বোলো না, বোলো না, চলে যাও!

তখন অমরেন্দ্রনাথের সে শোকোন্মত্ত বিহ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। যবনিকা পতনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিক্রমদেবের সে মর্ম্মভেদী বাণী—'দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের', ইত্যাদি দর্শকদের মনে এমন বিষাদের সৃষ্টি করিত যে, তাঁহারা পটক্ষেপণের পর ম্রিয়মান চিত্তে, রুমালে চোখ মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিতেন। 'রাজা ও রাণী'র অভিনয়ের এত সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা শুনিয়া, নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় সমভিব্যাহারে স্বয়ং গ্রন্থকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১১ই সেপ্টেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে আসিয়া ঐ অভিনয় দর্শন করেন।

কিন্তু প্রত্যেক নাটক এত সুচারুরূপে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও, কোনটাতেই মনোমত অর্থাগম হইতেছিল না। ক্লাসিক থিয়েটারের মাত্র এই পাঁচ মাস অস্তিত্বের মধ্যে নূতন ঐতিহাসিক নাটক 'হরিরাজ', বঙ্কিমচন্দ্রের মিলনান্তক 'দেবী চৌধুরাণী', রবীন্দ্রনাথের বিয়োগান্তক 'রাজা ও রাণী', নবীনচন্দ্রের বীররসাত্মক 'পলাশীর যুদ্ধ', পৌরাণিক মিলনান্তক 'নল দময়ন্তী' ও বিয়োগান্তক 'দক্ষযজ্ঞ', সামাজিক 'হারানিধি' ও 'তরুবালা', ভক্তিমূলক 'বিল্বমঙ্গল', ধর্ম্মমূলক 'বুদ্ধদেব চরিত', এই মোট দশখানি এত বিবিধ রসাত্মক বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা সত্ত্বেও টিকিট-ক্রেতা দর্শকের তেমন ভিড় হইতেছিল না। এত নাটকের উপর আবার ৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, 'পূর্ণচন্দ্র' খোলা হইল। পূর্ণচন্দ্র স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ ও শালিবাহন মহেন্দ্রলাল।

ইতিমধ্যে আবার এক বিপত্তি ঘটিল। অমরেন্দ্রনাথের সহিত

মনোমালিন্যবশতঃ তারাসুন্দরী ক্লাসিক ছাড়িয়া ষ্টারে চলিয়া গেলেন; তাঁহার দেখাদেখি অঘোরনাথ পাঠকও সেই পথের পথিক হইলেন। অমরেন্দ্রনাথ নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। শেষে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, এত বিভিন্ন রসের নাটকেও যখন তেমন সুবিধা হইল না, তখন একবার একটা নূতন গীতিনাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেখিলে হয়, কিরূপ দাঁড়ায়! কিন্তু গীতিনাট্য পাওয়া যায় কোথা হইতে? তিনি নিজে রঙ্গালয়ের পরিচালনা, বিক্রয়াদিতে লইয়া এত ব্যস্ত ও চিন্তিত যে, নিজে যে কলম ধরিয়া বই লিখিতে পারিবেন, এরূপ আশা নাই। হাতে যে দু'একটা নূতন বহি আছে, সে সমস্তই নাটক; কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট নাটকগুলির অবস্থা দেখিয়া, নাটকাভিনয়ে তাঁহার আর তেমন প্রবৃত্তি নাই—তিনি গীতি-নাট্যের জন্যই উৎসুক।

এই সময়ে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'আলিবাবা' তাঁহার হাতে পড়িল। ইতিপূর্ব্বে ক্ষীরোদবাবুর 'ফুলশয্যা' নামে একখানি গীতিনাট্য এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। 'আলিবাবা' তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম। শোনা যায়, তিনি প্রথমে বইখানি ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ার্থে আনেন, কিন্তু ষ্টারের তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয় বইখানি অভিনয়ের অযোগ্য বলিয়া ক্ষীরোদ বাবুকে ফেরৎ দেন। তাহার পর বইখানি অমরেন্দ্রনাথের হাতে পড়ে। তিনি আলিবাবাকে অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বয়ং কয়েকখানি গান বাঁধিয়া তাহাতে সংযুক্ত করিয়া, সেই নবরূপ গিরিশচন্দ্রকে দেখান। গিরিশবাবু সেখানি প্রয়োজনমত সংশোধন করিয়া দিয়া, স্বয়ং প্রস্তাবনার গানটী লিখিয়া দেন।*

---

* 'রঙ্গালয়ে নেপেন' শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন:—"ইহার পূর্ব্বে

পূজার বন্ধের পর, যথারীতি মহলা দিয়া, শনিবার, ২০শে নভেম্বর (১৮৯৭) নূতন সাজে, নূতন ধাঁজে, আলিবাবার প্রথম অভিনয় হইল। আমরা নিম্নে প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের নাম দিলাম :—

কাসিম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবদালা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, মুস্তাফা—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, দস্যুসর্দ্দার—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাকিনা—ভূষণকুমারী, ফতিমা—রাণীসুন্দরী, মর্জ্জিনা—কুসুমকুমারী।

নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের নিকট আলিবাবার পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তৎকালীন বঙ্গদেশে এমন কোন লোক ছিলেন না, যিনি আলিবাবার নাম শোনেন নাই বা তাহার অভিনয় দর্শন করেন নাই। এই গীতিনাট্যের অভিনয় হইতে ক্লাসিক থিয়েটারের, তথা অমরেন্দ্রনাথের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এক আলিবাবা হইতে তিনি লক্ষাধিক মুদ্রায় লাভবান্ হইলেন। তাহা ছাড়া, হুসেনের অংশে তিনি যে ছবি দেখাইলেন, তাহা অকল্পনীয়। কেহ যদি ঐ পুস্তক পাঠ করেন, তাহা হইতে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, হুসেন গ্রন্থের একটী অতি গৌণ চরিত্র। কেহ যে সে অংশে অভিনয় করিয়া কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, ইহা কদাচ তাঁহার মনে হইবে না। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ নিজ ব্যক্তিত্ববলে ও প্রতিভাগুণে, এই সামান্য চরিত্রের যে অভিনয় করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। "আলিবাবা অভিনয় আজি পর্য্যন্ত সমস্ত থিয়েটারেই হইয়াছে। বহু অভিনেতা

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'আলিবাবার' পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাইয়াছিলেন। রঙ্গালয়ের অভিনয়োপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথও পরিবর্ত্তিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট আনেন ; আমার সামান্য সাহায্যও লন।"

পুনরায় এই হুসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মত তেমনটী কাহারও হয় নাই। যাঁহারা অমরেন্দ্রনাথের হুসেনের ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন ও অন্যান্য অভিনেতার ঐ ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব অননুকরণীয় ভাব উদ্ভাসিত।"*

আলিবাবার প্রথমাভিনয় রজনীতে মন্দ বিক্রয় হইল না। ইহার দ্বিতীয়াভিনয় রজনীতে (২৭শে নভেম্বর) মিনার্ভাও ক্লাসিকের প্রতিযোগিতায় 'আলিবাবা' অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ফলে এই রাত্রি হইতে বিক্রয় কমিয়া গিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ রজনীতে দুই শত আড়াই শত টাকায় গিয়া ঠেকিল। কিন্তু ক্রমে দর্শকগণ যখন বুঝিলেন যে, কোথাকার আলিবাবার অভিনয় শ্রেষ্ঠ, তখন হইতে আর দেখিতে হইল না; ক্লাসিকের বিক্রয় ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে পাঁচশ', সাতশ', হাজার, বারশ', পনরশ', আঠারশ', শেষে বাইশশ' পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল। আর এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার উঠিয়া গিয়া, শেষে ৩১শে মার্চ্চ (১৮৯৮) তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল।

আলিবাবার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ক্লাসিকের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। সকলের মুখে এক কথা—অমর দত্ত ও ক্লাসিক থিয়েটার। অমর দত্তের অভিনয় দেখিবার জন্য জনসাধারণ পাগল হইয়া উঠিল। নাট্যজগতে হুলুস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল; অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন,—রঙ্গমঞ্চের তদানীন্তন সমস্ত প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, নূতন প্রথা প্রচলিত

* শিশির পাবলিশিং হাউস-প্রকাশিত 'অমরেন্দ্রনাথ' হইতে উদ্ধৃত।

করিলেন। বিজ্ঞাপনী-পত্র, হ্যাণ্ডবিল, প্ল্যাকার্ড হইতে আরম্ভ করিয়া দৃশ্যপট, পোষাক, পরিচ্ছদ, নৃত্যগীত, অভিনয়ভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া,—নূতনত্বে, অভিনবত্বে পূর্ণ করিলেন। তাঁহার 'হরিরাজ' অভিনয়ে অভিনবত্ব প্রদান করিল, তাঁহার 'আলিবাবা' নৃত্যকে নূতনত্বে মণ্ডিত করিল।

আমরা এখানে এই পরিবর্ত্তনের একটা উদাহরণ দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তখনকার দিনে হ্যাণ্ডবিল ছাপা হইত—অতি নিকৃষ্ট রঙ্গীন কাগজে এক রঙ্গা কালীতে। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের পরিচালিত ক্লাসিক থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল উৎকৃষ্ট আইভরিফিনিস কাগজে, নানা রংএর কালীর সাহায্যে ছাপা হইতে লাগিল। আবার মধ্যে মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের ছবি হ্যাণ্ডবিলের শোভা বর্দ্ধন করিত। তাহার ভাষারও যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

মোটের উপর, অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের সমুদয় পুরাতন প্রথা ও তদানুষঙ্গিক বিষয় সমূলে অপসারিত করিয়া, সম্পূর্ণ নূতন নিয়মে, নূতন ভাবে, নূতন ছাঁচে থিয়েটার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ক্লাসিক থিয়েটার কলিকাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ থিয়েটার বলিয়া পরিগণিত হইল। যাঁহারা অমরেন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিলেন, তাঁহাদের অভিনয় দর্শকের তৃপ্তিকর বা রুচি অনুযায়ী হইল না, অচিরে তাঁহাদের থিয়েটার উঠিয়া গেল।

'আলিবাবা' গীতিনাট্যের একটী দৃশ্য।

আবদাল্লা —নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মর্জ্জিনা —কুসুমকুমারী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:o:—

অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার কারণ

নাট্যজগতে অমরেন্দ্রনাথের এই অসম্ভাবিত প্রতিপত্তির মূলে কি কারণ বর্ত্তমান ছিল, আমরা এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মাত্র এই সাত আট মাস কালের মধ্যে তিনি যে দর্শকসমাজে এত সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, তাহার হেতু বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"অর্থ এবং নানা কারণে আমরা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কিন্তু বাহির হইতে আর একজন প্রতিভাবান্ নট আসিয়া সব ওলটপালট করিয়া ফেলিলেন; ইনি স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। থিয়েটারে শিক্ষানবিশী না করিয়া, বাহির হইতে আসিয়া যে কেহ তখনকার থিয়েটারী চক্রের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন অমরবাবু। পাব্লিক থিয়েটারে 'হিরো' সাজার পথ তিনিই প্রথম প্রশস্ত করিয়া দেন, সুলভ করিয়া তুলেন। বীণা থিয়েটার ছাড়িয়া আমরা যখন আখড়া দিতেছি সেই সময়েই ক্লাসিকের সৃষ্টি হয়। সে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে।

"নূতন থিয়েটার খুলিয়া অমরবাবুকে প্রথম প্রথম বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল; তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল আলিবাবা খোলার পর হইতে। অবশ্য এই আলিবাবারও প্রথম তিন চারি

রজনীর অভিনয়ে একশত দেড়শত টাকার বেশী বিক্রয় হয় নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তারপর যত দিন গিয়াছে, ততই আলিবাবার বিক্রয় বাড়িয়াছে। তখন ৭।৮ শত টাকা বিক্রয় হইলেই 'ফুল হাউস' হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। ক্লাসিকের বিক্রয় ক্রমে বারশত আঠারশত টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ক্লাসিকের এই বিক্রয়াধিক্যের অন্যবিধ কারণও ছিল। নানা বিশৃঙ্খলায় মিনার্ভা তখন হতশ্রী হইয়া আসিতেছিল; বেঙ্গল থিয়েটার বিশেষ আড়ম্বর না করিয়া সাবেক চাল বজায় রাখিয়া চলিতেছিল বটে, কিন্তু কাপ্তেনী আক্রমণের পূর্ব্ব সূচনায় এই বৃদ্ধ জীর্ণ প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ যেন ক্রমেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। এদিকে প্রবীণ নাট্যনায়ক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পরিচালনে বয়স ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার যেন একটী সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছিল। ষ্টারের সব দিকেই ধরা বাঁধা নিয়ম, দর্শকগণকেও আসিতে হইত যেন ভয়ে ভয়ে—বহুদিনের প্রতিষ্ঠার উত্তাপে ষ্টারের ব্যবহার মাঝে মাঝে দর্শকবৃন্দকে একটু বিশেষরূপেই অনুভব করিতে হইত। অকুতোসাহস অমরেন্দ্রনাথ এই নিয়ম ও নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন; আলিবাবা প্রভৃতির অভিনয় দেখিতে দেখিতে বিডন ষ্ট্রীটের দর্শকবৃন্দ বোলচাল কাটিয়া, শিস্ দিয়া, দুই একটা অসঙ্গত ইয়ার্কি কপ্‌চাইয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারকে একটা সর্ব্বজাতীয় আমোদাগারে পরিণত করিলেন। থিয়েটার যেন বুরোক্রেসীর রাজত্ব ছিল, অমরবাবু থিয়েটারকে ডেমোক্রাট করিয়া তুলিলেন। ফলে দাঁড়াইল, ক্লাসিকে যখন "বাদুড় ঝোলে"—ষ্টারের বেঞ্চ তখন শূন্য! ষ্টারের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় "প্রতাপাদিত্য" খোলার পর। গিরিশচন্দ্রও এ সময়ে এক থিয়েটারে স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তিনি

কখনো মিনার্ভায়, কখনো ষ্টারে, কখনো ক্লাসিকে,—এইরূপ ভাবেই দিন কাটাইতেছিলেন।

"অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে থিয়েটার জগতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহার থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলের মাথায়ও লেখা হইতে লাগিল "হৈ হৈ কাণ্ড—রৈ রৈ ব্যাপার!" ষ্টার থিয়েটারের গাম্ভীর্য্য, মিতব্যয়িতা, সংযম, শৃঙ্খলা, এতদিন বাঙ্গলা থিয়েটার জগতের একটা আদর্শস্বরূপ ছিল, অমরবাবু সে সব উল্টাইয়া দিলেন। অন্য থিয়েটার মহলে অভিনেতা অভিনেত্রী ভাঙ্গাইবার একটা সাড়া পড়িয়া গেল; নিজের দল পুষ্ট করিবার জন্য তিনি দ্বিগুণ, চারিগুণ পর্য্যন্ত মাহিয়ানা দিয়া লোক ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। সাধারণতঃ সে সময় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার বেতনের হার ছিল মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা, অপেরা মাষ্টার পাইতেন ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ, ড্যান্সিং মাষ্টারের বেতনও তদনুরূপ; খুব বড় অভিনেত্রীর বেতনও ষাট পঁয়ষট্টির বেশী ছিল না। ইহার পূর্ব্বে স্বর্গীয় গোপাললাল শীল যখন এমারেল্ড থিয়েটার করেন, তখন একবার অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তবে সে হার অমরবাবুর তুলনায় বড় বেশী ছিল না, আর সে থিয়েটারও স্থায়ী হয় নাই। অমরবাবু এইরূপ উচ্চ হারে বেতন তো বাড়াইলেনই, সঙ্গে সঙ্গে বোনাস্ বেনিফিটেরও প্রচলন করিলেন; হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ডের চেহারাও ফিরিল। আগে অতি চোতা কাগজে প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিল বাহির হইত; অমরবাবু উৎকৃষ্ট কাগজে অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফোটো দিয়া সুন্দর সুদৃশ্য হ্যাণ্ডবিল বাহির করিতে লাগিলেন; হ্যাণ্ডবিল লেখার ভঙ্গীও বদলাইল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সরস ও সংযত ভাষার পরিবর্ত্তে—"হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার, নাট্যজগত স্তম্ভিত! নাটকের ঘাত প্রতিঘাতে মানব জীবন দোদুল্যমান! সারি

সারি সখীর সারি; নাচে গানে ধূলো পরিমাণ, ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ" ইত্যাদি ঘটোৎকচী ভাষায় বাজার সরগরম হইয়া উঠিল। অমরবাবুর পশার জমিয়া গেল; তিনি একজন জনপ্রিয় অভিনেতারূপেও খ্যাতি লাভ করিলেন।

"বাঙ্গলা দেশে সে কালে কবি, হাফ্-আখড়াই, তরজা প্রভৃতির সমাদর ছিল। ছড়া কাটিয়া, উতর গাহিয়া, সং সাজিয়া গালাগালি দিয়া আমোদ করিবার রীতি, রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকার পরিবর্ত্তন করিয়া আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শুনিতাম, কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম আমলে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে ন্যাশানাল থিয়েটারের এইরূপ ছড়া কাটিয়া গালাগালি চলিত। আমরা কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এ সব বড় একটা দেখি নাই; এই রীতির পুনঃ প্রচলন হইল ক্লাসিকের অভ্যুদয় হইতে; অমরবাবু থিয়েটার খোলার কিছুদিন পরে থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলকে ক্রমশঃ খবরের কাগজে পরিণত করিলেন।

"কিন্তু যাহাই হউক, অমরবাবু দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। অমরবাবু যখন থিয়েটার করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স বোধ হয় কুড়ি কিম্বা একুশের অধিক নয়; এই অল্প বয়সে, বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন নাট্য-সম্প্রদায়ের নানা কূট চালবাজীর মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া নিজেকে জাহির করা—সাধারণ শক্তির কাজ নহে। বালক অমরেন্দ্রনাথ কোন বাধা-বিঘ্ন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র নিজের সামর্থ্যে ও প্রতিভায় নূতন ও পুরাতনের যুদ্ধে গৌরবের সহিত জয়লাভ করিয়াছিলেন। আর এ জয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তখনকার সময়,—তখনকার সাধারণ দর্শকবৃন্দ। সেই কথাটাই খুলিয়া বলিতেছি।

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর বাঙ্গলা দেশের থিয়েটার, যাহাদের লইয়া প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহাদের দ্বারাই নানা রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। এক ন্যাশানাল ও গ্রেট ন্যাশানালের দল ভাঙ্গিয়াই—ষ্টার, এমারেল্ড, সিটি, মিনার্ভা—জন্মগ্রহণ করে। বেঙ্গল থিয়েটারের কথা স্বতন্ত্র; তাহাদের পুরাতন চাল মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বদলায় নাই। এ সকল দল ভাঙ্গাভাঙ্গির কথা আমি পরে বলিব। আমার উপস্থিত বক্তব্য এই, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া থিয়েটারের দর্শকবৃন্দ সব নাট্যশালাতেই সেই একই পুরাতন পরিচিত মুখ দেখিয়া আসিতেছিলেন; নাটক বদলাইতেছিল, কিন্তু নায়ক সেই স্বর্গীয় অমৃতলাল, না হয় স্বর্গীয় মহেন্দ্র বসু। গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে সাজিতেন বটে, কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরের শেষাশেষি কয়েক বৎসর তিনি সাজা একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইদানীং প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের চরিত্র ভিন্ন তাঁহাকে মানাইতও না। এমারেল্ড কি ষ্টারে কোন নূতন নাটক বিজ্ঞাপিত হইলেই, লোকে পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিত নায়ক সাজিবেন, হয় মহেন্দ্রলাল, না হয় অমৃতলাল মিত্র। সিটি এবং মিনার্ভায় স্বর্গীয় প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ও চুণীলাল দেব 'হিরো' সাজিতে সুরু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও পুরাতন দলের সংসৃষ্ট ও পুরাতন দলের মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া—দর্শক কর্ত্তৃক ঠিক নূতন বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই। এই সকল কারণে এবং বাহির হইতে নূতন কোন ক্ষমতাপন্ন অভিনেতাকে মাথা তুলিতে না দেখিয়া সাধারণ দর্শক এক প্রকার ঠিক করিয়াই লইয়াছিলেন যে, থিয়েটার জিনিসটা যেন একটা বিশেষ দলেরই একচেটিয়া ব্যবসা; বাহির হইতে ইহার দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এদিকে অমৃতলাল

ও মহেন্দ্রলাল—দিন দিন পুরাতন হইয়া আসিতেছিলেন। বয়সতো কাহারও হাতধরা নয়? নবীন নায়কের ভূমিকায় ইঁহারা ঠিক আর খাপ খাইতেছিলেন না। সাধারণ দর্শক অপেক্ষা করিতেছিল "নূতনের" জন্য। ঠিক এই সময়েই অমরবাবু থিয়েটার খুলিলেন। অমরবাবু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে। চোরবাগানের সুবিখ্যাত দত্তবংশের সহিত আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা নাই কলিকাতার এমন বড় কায়স্থের ঘর খুব কমই আছে। তারপর, অমরবাবু যখন থিয়েটার করিতে নামিলেন, তখন তাঁহাকে বালক বলিলেও চলে। তিনি সুপুরুষ ছিলেন, সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নূতন থিয়েটারে 'নায়ক' সাজিতে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই একবাক্যে বাহবা দিতে লাগিলেন—যেমন বাহবা ও হাততালি সখের থিয়েটারের অভিনেতারা অনায়াসে পাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রীতি ও স্নেহের আসনে বালক অমরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইল। সাধারণ দর্শকদেরও তখন পুরাতনে অরুচি হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারাও মুখ বদলাইতে চাহেন; তাঁহারাও সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সে গ্রহণের অর্থ—'এস নূতন,—ন্যাশানাল থিয়েটারের রথী মহারথীগণের পর বহুদিন আর নূতন কাহাকেও দেখি নাই—এস তুমি অভিমন্যু, তোমাকেই আমরা আমাদের রঙ্গ-নায়ক বলিয়া জয়মাল্য পরাইয়া দিই।'

"কিন্তু এইটুকু পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন, অমরবাবুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কেবলমাত্র দর্শকবৃন্দের এই আগ্রহ ও উৎসাহের জন্য। দর্শকবৃন্দের এই আগ্রহ ও উৎসাহ, তাঁহাদের এই প্রীতি ও আদরের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার যোগ্য শক্তিও তাঁহার ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ অধ্যবসায়, লোকচরিত্রে

অভিজ্ঞতা এবং দুর্জ্জয় সাহস,—উন্নতি করিবার এই সকল সদ্‌গুণ, তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি থিয়েটার করিতে নামিয়া পুরাতন প্রচলিত পন্থার অনুসরণ সর্ব্বথা করেন নাই; তখনকার থিয়েটারী ব্যবসার যে ধারা, তাহা তিনি বদলাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যিনি লিখিবেন তিনি দেখিবেন—বাঙ্গলা নাট্যশালা বাহ্যিক ও আর্থিক সৌষ্ঠব ও উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সময়ের নাট্যশালায় যে নূতন জীবন দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তিনি যে থিয়েটারী আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া যান—তাহার জের এখনও চলিতেছে বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতন বৃদ্ধি, গুণের আদর, রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিজ্ঞাপনে ও হাণ্ডবিলে নাম জাহিরের আড়ম্বর—এ সবই অমরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি। অমরেন্দ্রনাথের নীতিই ছিল—"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।" পুরাতন দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে উঠিতে হইয়াছিল, এবং সে যুদ্ধে তিনি কখনও হারেন নাই। নিজের দলকে পুষ্ট করিবার জন্য তিনি অর্থকে অর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যত টাকা লাগে—"অমুককে" চাই-ই চাই। থিয়েটারের বিক্রয় কম হইলে অমরেন্দ্রনাথ অস্থির! যেমন করিয়া হউক বিক্রয় বাড়ান চাই—তা কে জানে চতুঃপ্রহরব্যাপী অভিনয় অনুষ্ঠান—কে জানে উপহার বিতরণ! ইহার জন্য থিয়েটারে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। নূতন নাটক যখন তিনি খুলিয়াছেন, তখন মুক্তহস্তে খরচ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—প্রতিযোগিতায় কেহ তাঁহাকে হটাইতে না পারে। মুদীর হিসাব-নিকাশী বুদ্ধি লইয়া তিনি একদিনও থিয়েটার করেন নাই। তিনি মেজাজী বড়লোকের মত থিয়েটার করিয়াছেন। আর এইজন্যই তাঁহাকে সময় সময় "মাসুল"ও দিতে হইয়াছে—

যথেষ্ট! কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? অর্থের অনটন—দলের লোকের শত্রুতা,—পুস্তকের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে কোনদিনই বিচলিত করিতে পারে নাই। প্রায় আট দশ বৎসর খুব জোরের সহিতই তিনি 'ক্লাসিক' থিয়েটার চালাইয়াছিলেন। নিজের শক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাঁহার থিয়েটারে তিনি যে নিয়ম চালাইয়াছেন তাহাই চলিয়াছে। বেলা তুইটায় থিয়েটার—তাহাতেও ক্লাসিকে অসম্ভব ভিড়! বেলা বারোটায় থিয়েটার—তাহাতেও অসংখ্য দর্শক! একবার অতি বর্ষায় কলিকাতা ভাসিয়া গিয়াছিল; হাটবাজার, অন্য থিয়েটার সব বন্ধ, কিন্তু ক্লাসিক খোলা; টীনের ছাদ দিয়া জল পড়িতেছে, বসিবার স্থানে এক হাঁটু জল; তখনও দেখি ক্লাসিকের দর্শক ছাতি মাথায় দিয়া বেঞ্চ ও চেয়ারে পা তুলিয়া বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছে। সে সময়ের দর্শক যেন অমরেন্দ্রনাথের নামে মাতিয়া উঠিতেন। দর্শকবৃন্দের এই ভালবাসাকে লক্ষ্য করিয়াই—ক্লাসিক হইতে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে যাইবার সময় অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস আমি যদি বনে গিয়া থিয়েটার খুলি সেখানেও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।"

"পূর্ব্বে বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের ব্যবসায়ের দিকটার ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু অভিনয় বা নাটকের ধারা বদলাইয়া উহার নব কলেবর কিছু দিতে পারেন নাই। তখনকার প্রচলিত অভিনয় পদ্ধতিকেই তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার থিয়েটারে, এক গিরিশচন্দ্রের "ভ্রান্তি" "সৎনাম" "পাণ্ডব-গৌরব" "মনের মতন" নাটক ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয় নাই বলিলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। বরং ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ গীতিনাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি,

তাহার একটা নূতন রূপ তিনি দিয়াছিলেন। নৃত্যে নূতন ভঙ্গীর প্রচলন ও প্রবর্ত্তন তাঁহার থিয়েটারেই হয়; ক্লাসিকের নাচগান তখনকার দর্শকের খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। অধিকাংশ সময়ই তিনি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সে পুনরভিনয়ে অনেক সময় কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়াছেন, কিন্তু সেও ঐ পুরাতন পন্থার অনুসরণে। "একটা নূতন কিছু কর" করিতে গিয়া, আর্টের দোহাই দিয়া পুরুষ চরিত্রের 'কটাওটে চন্দ্রহার ও নারী চরিত্রে পুরুষোচিত লম্বা কোঁচা ও কাছার' প্রচলন তিনি করেন নাই। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসুর প্রদর্শিত অভিনয় ধারাকেই অবলম্বন করিয়া তিনি অভিনয়ে রসসৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা অনেক সময়েই ফলবতী হইয়াছে। বহু নাটকের বহু ভূমিকা তিনি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গলা নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস বা অমরবাবুর জীবনী লিখিবেন, তাঁহাদের উপরই ইহার বিস্তৃত আলোচনার ভার দিয়া আমরা আমাদের যেটুকু বক্তব্য, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।"

অপরেশ বাবুর বক্তব্যের অনেক কথার সহিত আমরা একমত, সেই জন্য আমরা তাঁহার সমগ্র উক্তিই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; সুতরাং অনর্থক সে কথার আলোচনায় লিপ্ত হইয়া পুনরাবৃত্তি করিব না। তবে তাঁহার যে সমস্ত উক্তির সহিত আমাদের মতের মিল নাই, সেই বিষয়ে দুই একটা কথা বলিয়া এ আলোচনার উপসংহার করিব। তবে একটা কথা;—অপরেশ বাবুর সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রতিষ্ঠা, অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের পর। সুতরাং তিনি যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার শোনা কথা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল নহে। তা' ছাড়া, তিনি কখনও অমরেন্দ্রনাথের সহিত

এক থিয়েটারে কাজ করেন নাই ; সব সময়েই তাঁহার প্রতিদ্বন্দী রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার অমরেন্দ্রনাথের বিষয়ে একটু বিরুদ্ধ ও বিপক্ষ ভাবাপন্ন হওয়া একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? অমরেন্দ্রনাথের অসীম গুণপনা ও অনুপম অভিনয়কুশলতার বিষয়ে অন্ধ হওয়া, একান্ত বিস্ময়ের কথা কি ? তাঁহার রচনা কতকটা পক্ষপাতদোষদুষ্ট হওয়া একান্ত বিচিত্র কি ? কেন না, এই একই কথা, অর্থাৎ নটজীবনে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলিয়াছেন, শুনুন :—

"অমরেন্দ্রনাথের বহুপূর্ব্বে থিয়েটার জিনিব বাংলা দেশে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু স্বর্গীয় দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র, স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এবং সরস্বতীর বরপুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ **আত্মোৎসর্গ করিয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে নটরূপে অবতীর্ণ হওয়ায়, আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশটা যেন থিয়েটারে মাতিয়া উঠিল**। সুশ্রী, সুকণ্ঠ, সুমিষ্টভাষী, সুপ্রসিদ্ধ-বংশোদ্ভব অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রদীপের আলোকে আলোকিত বঙ্গরঙ্গভূমি যেন সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিলেন ; তাহাতে সমগ্র দেশের দৃষ্টি বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হইল। অভিনেতা অভিনেত্রীর আর্থিক উন্নতি হইল, হাজার দু'হাজার টাকা বোনাসের সৃষ্টি হইল, কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে দু'শ' তিনশ' টাকা বেতনে অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ দেড়টা দুটো মুন্সেফকে হারাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, দেশের বড় বড় লোক, উকীল, ব্যারিষ্টার, প্রোফেসর প্রভৃতি অমরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ ঝালাইবার জন্য অবাধে গ্রীণরুমে গিয়া

Behind the scenes যথাসম্ভব আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন, আর সমাজে বসিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—"অমন ঘরের ছেলে এমন অধঃপাতে গেল।"

এই ত' সমাজের অবস্থা ও তৎকালীন সমাজে এই ত' অভিনেতার স্থান! অমরেন্দ্রনাথের নটজীবন গ্রহণে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধ্যে কিরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথচ অপরেশবাবু লিখিতেছেন,—"তাঁহাকে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারে নায়ক সাজিতে দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই একবাক্যে বাহবা দিতে লাগিলেন—যেমন বাহবা ও হাততালি সখের থিয়েটারের অভিনেতারা অনায়াসে পাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রীতি ও স্নেহের আসনে বালক অমরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইল।" এই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অমরেন্দ্রনাথকে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি। সুতরাং অপরেশচন্দ্রের উক্তির উপর আর বেশী কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন আছে কি?

আরও এক জায়গায় অপরেশবাবু লিখিয়াছেন,—"বিজ্ঞাপনে ও হাততালিতে নাম জাহিরের আড়ম্বর—এ সবই অমরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি!" অথচ এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রবাবু বলেন,

"অমরেন্দ্রনাথ ভুঁইফোড় অভিনেতা হন নাই! অমরেন্দ্রনাথ canvass করিয়া দর্শক বসাইয়া, করতালির জোরে বড় Actor নাম লাভ করিবার চেষ্টা করেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতা হইবার জন্য রীতিমত সাধনা করিয়াছিলেন। তবে নাট্যজগতে অত উচ্চ আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

এ সম্পর্কে ১৩০৬ সাল, ৩রা ভাদ্রের 'বঙ্গবাসী'র মন্তব্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন :—

"ক্লাসিক থিয়েটারের মণিরাগে কলিকাতার এমারেল্ড থিয়েটারের সৌন্দর্য্যরাগ দিন দিন দীপ্ত বিভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। এমারেল্ডে কত এল, কত গেল; কোন কোন নাট্য-কোম্পানী বিফল-বাসনায়, ব্যর্থ-মনোরথে, দায়গ্রস্ত হইয়া পরিম্লান হেঁটমুখে, নৈরাশ্যের অবসাদে, অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। ক্লাসিকের এখন পূর্ণ সৌভাগ্য। **কেবল গুণেই সেই সৌভাগ্যের পূর্ণ প্রচার হইতেছে। না হইবে কেন, স্বয়ং ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতার আদর্শ স্থলের উচ্চাসন পাইয়াছেন;** তদুপরি বঙ্গের নাট্যগুরু অভিনয়ের শাস্ত্রাচার্য্য স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রহিয়াছেন। অমরেন্দ্র স্বয়ং কৃতী বটে। * * অভিনয়ে ত্রুটি নাই, কার্য্য-পরিচালনে ত্রুটি নাই, বিনয়-ব্যবহারে ত্রুটি নাই, আদর অভ্যর্থনায় ত্রুটি নাই। গিরিশবাবু নাটক লিখিতেছেন, অমরেন্দ্র নাটক লিখিতেছেন, মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইয়াছে; চরম উন্নতি না হইবে কেন?"

পাঠক অপরেশবাবুর বক্তব্য ও এই উক্তি দুটা মিলাইয়া দেখিবেন কি?

আর একটা কথার অবতারণা করিয়া, এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। অপরেশবাবু বলিলেন,—"অন্য থিয়েটার মহলে অভিনেতা অভিনেত্রী ভাঙ্গাইবার একটা সাড়া পড়িয়া গেল; নিজের দল পুষ্ট করিবার জন্য তিনি দ্বিগুণ, চারিগুণ পর্য্যন্ত মাহিয়ানা দিয়া লোক ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। * * নিজের দলকে পুষ্ট করিবার তিনি অর্থকে অর্থ জ্ঞান করিতেন না। যত টাকা লাগে—অমুককে চাই-ই চাই।"

আমরা কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের জীবনে এ উক্তির এত বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য

করিয়াছি, যে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অমরেন্দ্রনাথের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। অন্য কোন বড় অভিনেতার সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়াই, তিনি একা একটা থিয়েটার চালাইবার দুঃসাহস ও সামর্থ্য রাখিতেন; এবং উত্তরজীবনে তিনি এ বিষয়ের বহু প্রমাণও দিয়াছেন। ক্লাসিক উঠিয়া যাইবার পর, নাট্যজগতের সমস্ত রথী মহারথী—এমন কি তাঁহার নিজ হাতে গড়া সম্প্রদায় পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয় মিনার্ভায় চলিয়া গেল, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ একা হতবীর্য্য ষ্টার থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন; একা কোহিনুরের আক্রমণ হইতে মিনার্ভাকে গিয়া রক্ষা করিলেন; একা শেষ জীবনে অসীম প্রতাপের সহিত ষ্টার থিয়েটার চালাইলেন। এ সমস্ত কথার আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব। বর্ত্তমানে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলি।

নিজে ছাড়া অন্য কোন অভিনেতার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অমরেন্দ্রনাথ কখনও থিয়েটার পরিচালনা করিবার প্রয়াসী হন নাই। গিরিশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন,—'কুছ পরোয়া নেহি!' মহেন্দ্রলাল চলিয়া গিয়াছেন—যান! অঘোর পাঠক, প্রবোধ ঘোষ, দানিবাবু, চুণি দেব, নৃপেন্দ্র বসু, পূর্ণ ঘোষ, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী,—যখন যিনি তাঁহার থিয়েটার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, অমরেন্দ্রনাথ কখনও সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, কখনও কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। আবার কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী থিয়েটার ছাড়িয়া বেকার অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়া আছে, লোকমুখে তাঁহার পরিচালিত থিয়েটারে তাহার যোগদানের ঔৎসুক্য শুনিয়া, অমরেন্দ্রনাথ সানন্দে তাহাকে নিজের দলে গ্রহণ করিয়াছেন। এ যদি দল ভাঙ্গান হয়, তাহা হইলে

আমরা নাচার। উত্তরজীবনে মিনার্ভা থিয়েটার হইতে একমাত্র সুশীলাবালাকে ভাঙ্গান ছাড়া, তিনি কখনও কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে অন্য দল হইতে ভাঙ্গাইয়া নিজের দল পুষ্ট করেন নাই। ক্লাসিক প্রতিষ্ঠার সময়, তখনকার সমস্ত ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রী ষ্টারে। তিনি কাহাকেও ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই। মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ যে সমস্ত অভিনেতৃবর্গ বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের ও নাট্যজগতে তদানীং অখ্যাতনামা নটনটিগণকে লইয়া তিনি নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। তাহার পর, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্য বশতঃ গিরিশচন্দ্র দলবল সহ ষ্টারের সংশ্রব পরিত্যাগ করিবার কয়েক মাস পরে, যখন তাঁহারা কোথাও নিযুক্ত ছিলেন না, তখন তিনি সকলকে সাদরে নিজের দলে আনেন,—অন্য কোন দল হইতে ভাঙ্গাইয়া নহে। দ্বিতীয় বার গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে আসিলেন, মিনার্ভা থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর। তৃতীয় বার আসিলেন, মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকার গিরিশচন্দ্রকে পদচ্যুত করার ফলে। অমরেন্দ্রনাথ কোনবার ভাঙ্গাইলেন কি ?

চুণিবাবুর বেলাতেও তাই। প্রথম বার মিনার্ভা থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর, ও দ্বিতীয় বার মনোমোহন বাবুর সহিত মনোমালিন্যের ফলে, তিনি ক্লাসিকে আসিয়া যোগদান করেন। দানিবাবুর কথা, তাঁহার জীবনীকার স্বয়ং কি লিখিয়াছেন, দেখুন ;—"ইতিমধ্যে চুণিবাবু 'সংসার' নাটক অভিনয় করিবেন স্থির করিলে, অল্প অল্প শেয়ারে দানীবাবুর পোষাইবে না বলিয়া তিনি ক্লাসিকে চলিয়া যান।" তারাসুন্দরী ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ যখন ক্লাসিকে যোগ দেন, তখন তাঁহারা কোন থিয়েটারের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না ; উভয়ের ক্লাসিকে আসিবার আগ্রহ শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের ডাকিয়া পাঠান।

অনর্থক উদাহরণের সংখ্যা বাড়াইয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। অপর থিয়েটার হইতে লোক ভাঙ্গাইবার দৃষ্টান্ত, এক সুশীলা ব্যতীত, অমরেন্দ্রনাথের জীবনে যে দ্বিতীয় নাই, ইহা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি। বরঞ্চ অপরেশবাবুর আলোচ্য গ্রন্থ পড়িলেই পাঠক এ বিষয়ে তাঁহার দলের অসামান্য কৃতিত্ব দেখিতে পাইবেন। আমরা অনর্থক আর এ সব কথার আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। কোনখানে যথার্থ ঘটনার সহিত অপরেশচন্দ্রের উক্তির অনৈক্য, তাহা একটু নিবিষ্টচিত্তে এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:০:—

'কাজের খতম' ও 'দোললীলা' অভিনয় ; কলিকাতায় প্লেগ (১৮৯৭-৯৮)

আলিবাবার প্রতিষ্ঠার পর অমরেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। আর থিয়েটার জমাইবার ভাবনা রহিল না। সামনে বড়দিন, বড়দিনের আসর সরগরম করিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ একখানি পঞ্চরং রচনা করিলেন ; নাম দিলেন—কাজের খতম। নিখুঁত আয়োজনের পর, অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা সহকারে, ২৫শে ডিসেম্বর (১৮৯৭), শনিবার, 'কাজের খতম' খোলা হইল। ইহার প্রথম অভিনয় রজনীতে ভূমিকা-বণ্টন হইয়াছিল এইরূপ :—

রমাকান্ত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মিঃ ভোস্—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্টু—রাণীসুন্দরী, কুলচন্দ্র—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, গণেশগোবিন্দ—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), মতিলাল—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ফটিক—আশুতোষ পালিত, বাচস্পতি—নটবর চৌধুরী, স্যাকরা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, চুরুটওয়ালা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সুশীলা, মণি-হ্যাণ্ডবিল-ওয়ালী ও চুরুটওয়ালী—কুসুমকুমারী, শশীকলা ও স্যাকরাণী—ভূষণকুমারী, রঙ্গিণী—লক্ষ্মীমণি।

'কাজের খতমে'র সমালোচনাকল্পে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তৎসম্পাদিত "পুরোহিত ও অনুশীলনে"র ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"এই 'পঞ্চরং' রচনার উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রণেতা জানাইয়াছেন—"শিক্ষিত সমাজে আমাদের বর্ত্তমান রঙ্গভূমি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সেই মতভেদের উপর ভিত্তি করিয়া এই পঞ্চরংখানি লিখিত হইয়াছে।"

"এই অযাচিত কৈফিয়ৎ দেওয়া না দেওয়া সমান। বাঙ্গালা থিয়েটার দেখিতে আর এখন লোকের অপ্রবৃত্তি নাই। যাঁহাদের রুচি বিকৃত ছিল, তাঁহাদের সেই রুচি বিকার বিনষ্ট হইয়াছে। থিয়েটারে আসিতে লোকের অপ্রবৃত্তি কেন, তদুত্তরে যে সকল কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহা সকল স্থলে ঠিক ঠাক হয় নাই। যে সকল কথা বলিলে চলিত, তেমন অনেক কথা বলা হয় নাই। এ স্থলে একটা প্রধান কথার প্রসঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছি।

"এখন ট্রামওয়ে-যাত্রীদের সম্মিলন-স্থল, একটা প্রকাণ্ড সভার স্থানীয় হইয়াছে। তথায় রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, গৃহস্থালীর কথা, থিয়েটার-প্রসঙ্গ, সংবাদপত্রের সংবাদ ইত্যাদি সব বিষয়েরই কথা হইয়া থাকে। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, কতিপয় ভদ্রলোক, হাইকোর্টের ট্রামওয়ে যোগে আফিসে যাইতেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বাবু, অদ্য যে জন্য পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাই আলোচিত হইতেছিল। বাঙ্গালা থিয়েটারে যাওয়া উচিত কিনা—ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছিল। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুই দলই প্রবল ছিল। থিয়েটারের পক্ষীয় এক ব্যক্তি, বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়েরা এইবার আমার একটা কথায় অবধান করুন। দেখুন—থিয়েটার যদি কোন কাজেরই না হইবে, তবে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মত নিরপেক্ষ প্রবীণ ব্যক্তি, গুরুতর যত্ন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া

থিয়েটারের ইতিহাস মুদ্রিত করিতে বসিতেন না।" এই কথার
পরেই ঐ আলোচনা—ঐ তর্ক স্থগিত হইল। বলা অনাবশ্যক,
থিয়েটারের সমর্থনপক্ষকারীরাই জয়ী হন।

"এই পঞ্চরঙের প্রস্তাবনায় স্কুলের ছাত্রীগণের আবির্ভাব।
প্রস্তাবনার নাচ, গান, ঢঙ্ ইত্যাদি খুব ভাল। খৃষ্টানী ধরণের সুর,
অতি উত্তম। ঐ সুরানুকরণ অত্যন্ত পরিপাটী। প্রথম দৃশ্যে
সাধারণতঃ সবই ভাল। বাচস্পতির "বাঙালে" কথা খুব পরিপাটী।
তৃতীয় দৃশ্যে শশিকলার কণ্ঠস্বর, নিতান্ত মধুর। যেন শ্রোতৃবর্গের প্রাণে
সুধাধারা ঢালিয়া দেয়। চতুর্থ দৃশ্যে স্যাকরা ও স্যাকরাণী, চুরুটওয়ালা ও
চুরুটওয়ালী, রেজানীবেশিনী বেশ্যাগণ—এ সকল বিলক্ষণ মজাদার
চিত্র। পঞ্চম দৃশ্যে রঙ্গিনীর অভিনয়, অত্যুত্তম। ষষ্ঠ দৃশ্যে "বাউল"
রমণীগণ অতি সুন্দর।

"এই পঞ্চরঙে বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার, বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ও বাঙ্গালা
সংবাদপত্র-সম্পাদকের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র স্বীকার্য্য
নয়। লেখকের প্রথম উদ্যম, উত্তম হওয়াই আবশ্যক।

"পঞ্চরঙের সকল কথা ধর্ত্তব্য নয়, এটা 'স্বীকার্য্য' (Postulate)।
"স্বীকার্য্য" কেন—'স্বতঃসিদ্ধ' (Axiom) বলিলেও হানি নাই। তথাপি
আপত্তির কারণ এই যে, উহা হইতে সাধারণ্যে একটা ভ্রান্ত সংস্কার
দাঁড়াইয়া যায়। এই আপত্তি ছাড়িয়া দিলে, সরলভাবে বলিতে হইবে,
অমরেন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশ্য সাধু। সাধু উদ্দেশ্যের নিমিত্তই আমরা
তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া উপসংহার করিলাম। আশা করি,
অমরেন্দ্র বাবু, আমাদিগকে ক্রমেই অধিকতর সুখী করিবেন।

"পুস্তকখানি মধুর ও মনোহর সুর-সঙ্কুল। শেষের "উজ্জ্বল দৃশ্য'
অতীব সুন্দর—সেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য—উজ্জ্বলতম।"

এই পঞ্চরং সম্বন্ধে "হিন্দু পেট্রিয়ট" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯ খৃঃ) লিখিয়াছিলেন :—

"To review the book, it would be too late now as it has been played a long time. The play was marvellous. We would finish by simply remarking that the talented author has incessantly whipped the so-called "Reformers," which they very rightly deserve."

যাহা হউক, 'কাজের খতম' খুব জমিয়া উঠিল। মতিলাল চরিত্রাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ এক নূতন ছবি দেখাইলেন। আবার নববর্ষের আসর জমাইবার জন্য শনিবার, ৮ই জানুয়ারী (১৮৯৮), "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" অভিনীত হইল। এই নাটকে অমরেন্দ্রনাথ বৃহন্নলাবেশে নর্তকরূপে দেখা দিলেন। এই ভূমিকার অভিনয়েও তিনি খুব যশ অর্জ্জন করেন। অতঃপর 'ধ্রুব চরিত্র' নাটকে অমরেন্দ্রনাথ উত্তানপাদ সাজেন।

ইহার কিছুদিন পরে, রবিবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে, ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের 'বেনিফিট নাইট' হয়। আমরা যতদূর জানি, কোন অভিনেতার সাহায্যকল্পে থিয়েটারে বেনিফিট নাইটের প্রচলন নাট্য জগতে এই প্রথম। অভিনেতৃবর্গের দুরবস্থা দূর করিবার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সাধনকল্পে তিনি যে পথ অবলম্বন করেন, এই অভিনয় রজনী তাহার সূচনা এবং এই প্রকার বেনিফিট নাইটের প্রবর্ত্তক অমরেন্দ্রনাথ। ইহার পর, এই রাত্রির অনুকরণে ক্লাসিকে ও অন্যান্য থিয়েটারে অভিনেতা-বিশেষের সাহায্যকল্পে কত শত রজনীর যে অভিনয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ক্লাসিকে প্রতি বৎসর পূজার পূর্ব্বে সমস্ত অভিনেতা

ও অভিনেত্রীবর্গের সাহায্যার্থে যে অভিনয় আয়োজন হইত, তাহার বিজ্ঞাপনী-পত্রে এইরূপ লিখিত থাকিত ঃ—

"For the actors and actresses of the Classic Theatre, the favourites of native stage, who strained their every nerve to please and entertain the public, the sale proceeds of this night will be made over to them for their Puja accoutrements ; Admirers and frequenters of this theatre will please attend this night's performance."

ইহা ছাড়া, সমস্ত বড় বড় অভিনেতার বিশেষ বেনিফিট নাইটের ব্যবস্থা ছিল। মাঝারীরাও বাদ যাইতেন না—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাহায্যকল্পেও বিশেষ অভিনয় রজনীর আয়োজন হইত।

যাহা হউক, অমরেন্দ্রনাথের সাহায্যকল্পে নাট্যজগতে এই প্রথম বেনিফিট নাইটে আলিবাবা ও কাজের খতম অভিনীত হইল। বিক্রয় হইল অসম্ভব ; টিকিট না পাইয়া কত দর্শককে যে ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া যাইতে হইল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। হুসেনের অংশ লইয়া অমরেন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব মাত্রেই, সেই বিরাট্ জনতা তাঁহাকে সমস্বরে যেরূপ ভাবে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিল, তাহা বর্ণনাতীত। জনপ্রিয়তার এই অকৃত্রিম নিদর্শন পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তিনি চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটার উঠিয়া যাওয়ায়, ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি চুণিলাল দেব আসিয়া অমরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন। তাঁহার ভ্রাতা নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ-শেষের সঙ্গে সঙ্গে, ক্লাসিক থিয়েটারে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ বাল্য-সঙ্গী দুইজনকে পাইয়া পরম প্রীত হন ও চুণিবাবুকে

অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার এবং তাঁহার অন্য এক ভ্রাতাকে ঐকতান-বাদনাধ্যক্ষ (ব্যাণ্ড মাষ্টার) পদে নিযুক্ত করেন।

১৮৯৮ সালের দোলের দিন, মঙ্গলবার, ৮ই মার্চ, অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার নূতন গীতিনাট্য দোললীলার প্রথম অভিনয় করেন। ইহার প্রথমাভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ :—

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী—কুসুমকুমারী, শ্রীরাধা—ভূষণকুমারী, বৃন্দা—লক্ষ্মীমণি, ললিতা—রাণীসুন্দরী, আয়ান—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সখিগণ—সুশীলাবালা, জ্ঞানেশ্বরী, নারদাসুন্দরী, বিনোদিনী (ছোট), ইত্যাদি ইত্যাদি।

দোললীলা—গীতিবহুল নাটিকা, ইহাতে অমরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত কোন ভূমিকা না থাকায় তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বইখানি জমিতে দেরী হইল না। গোপ ও গোপীবেশে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও কুসুমকুমারী আসর মাৎ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের দ্বৈত নৃত্যে—"কেন বা দিলি এ নব করে"—ষ্টেজ ফাটিয়া যাইত। দোললীলা দর্শকের মনোরঞ্জনে এতদূর সমর্থ হইয়াছিল যে, তখনকার দিনে রাস্তার লোকের মুখে মুখে ইহার গান ফিরিত। এ সম্পর্কে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন :—

"The Classic Theatrical party are surely gaining ground over their fellow performers by the introduction of some excellent dramas, which deserve attention of the theatre-going public. Like Alibaba, their Dole Lila has also been a great success."

নিত্য নবরঙ্গে দর্শকগণের প্রীতি জাগাইবার জন্য, অমরেন্দ্রনাথ শুধু দোললীলা খুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তখন কলিকাতায় নূতন

বায়স্কোপের আমদানী। জিনিষটা কি দেখিবার জন্য ও জানিবার জন্য দর্শকগণের আগ্রহ ও কৌতূহল অপরিসীম। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয়ের সঙ্গে বায়স্কোপের ব্যবস্থা করিলেন। ৪ঠা এপ্রিল রবিবার, আলিবাবার সঙ্গে রঙ্গালয়ে প্রথম বায়স্কোপ প্রদর্শিত হইল।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৯৮ সালের মার্চ্চের গোড়াতেই সহরে প্লেগ দেখা দেয়। দেখিতে দেখিতে রোগ এমন সংক্রামকভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, দলে দলে নরনারী কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়নে তৎপর হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের সহিত ষ্টার থিয়েটারের মনকষাকষি হয়। তাঁহার শেষ দুই নাটক "কালাপাহাড়" ও "মায়াবসান" লোকানুরঞ্জন করা দূরের কথা, তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রচারিত ও অধিকাংশ দর্শকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। গিরিশ-চন্দ্র বিরক্ত হইয়া দলবল সহ ষ্টার ছাড়িয়া দেন ও প্লেগের আবির্ভাব সহ ক্লাসিক হইতে দুএকজন অভিনেতা অভিনেত্রী ভাঙ্গাইয়া, সকলকে লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলিয়া যান।

মে মাস নাগাদ কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে, ষ্টার থিয়েটার দেড়মাস কাল ধরিয়া অভিনয় করা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ পূর্ণ উদ্যমে থিয়েটার চালাইতে থাকেন। ভয়ে কলিকাতা ত্যাগ দূরের কথা, আমরা তাঁহাকে এ সময় এক নূতন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই।

"মহামারী মৃত্যুরোলে নগরী মুখর—
করে'ছ রোগের সেবা, নির্ভীক অন্তর!

পলাইছে নরনারী,
মৃতদেহ সারি সারি—

দেখেছি শ্মশান ঘাটে, সৎকারে তৎপর!
শীতার্ত্ত অনাথে হেরি' করুণায় গলে',
অঙ্গবাস মুক্ত করি' তাহারে যে দিলে—
তাই তব শয্যা পাশে,
তা'রাও কেঁদেছে বসে',
'অকস্মাৎ মোদের' তুমি অমরায় গেলে!"

অমরেন্দ্রনাথের সাহায্যে কত রোগী যে প্রাণ পাইল, কত দুঃস্থ পরিবার যে পরম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল, কত দুঃখী যে অর্থ পাইয়া খাইয়া বাঁচিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অমরেন্দ্রনাথের এ এক নূতন রূপ! প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া, স্বহস্তে প্লেগ-রোগীর সেবায় তৎপর হইলেন, স্বয়ং মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন, নিজে উপযাচক হইয়া শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনের প্রতিপালনের ভার লইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। সেই জন্যই আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে 'গরীবের মা বাপ' বলিত, সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে আমরা রাস্তার ভিখারীকে পর্য্যন্ত কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার এ সময়কার কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিলে যথার্থই সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'নায়কে'র কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে হয়,—"হৃদয়ের তুলনায় অমরেন্দ্রনাথ অপরাজেয়, বুঝি বা অদ্বিতীয়।"

কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের মুখে, আমরা অমরেন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কার কতকগুলি ঘটনা শুনিতে পাই। সেইগুলি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ আলোচনার পরিসমাপ্তি করিব।

সাহিত্য-সম্পাদক, প্রসিদ্ধ সমালোচক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলেন,—

"যখন কলিকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব হয়, সেই সময় চতুর্দ্দিকে ভীষণ মড়ক। যে বাড়ীতে প্লেগ ঢুকিতেছে, সে বাড়ী একেবারে উজাড় করিয়া দিতেছে। অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে। পিতা পুত্র ছাড়িয়া, স্বামী স্ত্রী ছাড়িয়া, পুত্র পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছে। আত্মীয়লোক প্লেগ হইলে ভয়ে আত্মীয়ের সেবা করিতেছে না; প্লেগের মড়া হইলে অন্য লোক দূরের কথা আত্মীয় লোকে আত্মীয়ের দাহ করিতেছে না। এইরূপ যখন অবস্থা, সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত নিজের থিয়েটারের অভিনেতাদের লইয়া প্লেগে মরা বহু মড়া ঘাড়ে করিয়া তাহাদের সৎকার করিয়াছেন। অল্পদিন গত হইল যখন দামোদরের ভীষণ বানে বর্দ্ধমান জেলা ডুবিয়া যায়, বহুলোক নিরাশ্রয় গৃহহীন হয়, সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। বন্ধু বান্ধব লইয়া নিজের মোটরে চড়িয়া, চিড়া মুড়কীর বস্তা ও কাপড়ের বস্তা লইয়া বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিয়াছেন।"

নায়ক-সম্পাদক, বাগ্মীবর, স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—

"কলিকাতায় যখন প্লেগ ভীষণভাবে দেখা দিয়াছিল, তখন অমরেন্দ্রনাথ বহু প্লেগ-রোগীকে নিজ অর্থব্যয়ে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন এবং বহু মৃতব্যক্তিগণের সৎকারাদি কার্য্য করাইয়াছিলেন। একবারের কথা আমাদের স্মরণ আছে। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় শেষ হইলে, অমরেন্দ্রনাথ ও আমি টম্‌টম্ হাঁকাইয়া অমরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিতেছিলাম। ছাতুবাবুর বাজারের পাশ

দিয়া যখন আমরা গমন করিতেছিলাম, আমি দেখিতে পাইলাম যে, একটী বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের প্লেগে মৃত্যু হওয়ায় সে অত্যন্ত কাঁদিতেছে ; কিন্তু তাহার রোদন শুনিয়াও, কেহ ঐ পুত্রের সৎকারের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে না। তখন শীতকাল, তাহার উপর প্লেগের সময় ; কেহ ভয়ে স্বগৃহ হইতে বাহির হইতেছে না। আমি টমটম্ থামাইয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় অমরেন্দ্রনাথ আমার হস্তে ঘোড়ার রাশ দিয়া, শীঘ্র টমটম্ হইতে অবতরণ করিল। আমি তাহাকে অনেক নিষেধ করিলাম ; কিন্তু সে তাহা না মানিয়া সেই বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হইল। আমি অনন্যোপায় হইয়া রাশ রাখিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। অমরেন্দ্রনাথ সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া, ক্লাসিক থিয়েটার হইতে লোক আনাইয়া, তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করাইয়া দিল এবং শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানঘাটে চলিল। সেখানে তাহার দাহ করাইয়া, রাত্রি প্রায় ২॥টার সময় বাটী ফিরিয়া আসিল।"

ভারতবর্ষ-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয় বলেন,—

"একদিন আমি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাই। অভিনয়ের পর অমরবাবু বল্লেন—"চলুন দাদা, আমি আপনাকে আমার বাড়ী যাবার সময় আপনার বাড়ীতে নাবিয়ে দিয়ে যাই।" আমি তাঁর কথায় সম্মত হয়ে তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলুম—তাঁর টমটম গাড়ী তৈরী ছিল, আমরা গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি যে, ফুটপাতের উপর একটী বুড়ো একখানি ছেঁড়া কাপড় গায়ে দিয়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। তখন শীতকাল, সেই দারুণ শীতে গরম জামা কাপড় গায়ে দিয়েও আমরা বেশ শীত অনুভব করছিলুম। সে বেচারাকে সেই

রকম অবস্থায় দেখে অমরবাবু আমায় বল্লে যে,—"দেখছেন দাদা, আমাদের দেশের অবস্থা দেখছেন—এই দারুণ শীতে এই বৃদ্ধ একখানা শীতবস্ত্র অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে। যে রকম অবস্থা দেখছি, তাতে বোধ হয় যে অল্পক্ষণ পরে শীতের প্রকোপে এ মরে যেতে পারে—এতেও বলে কিনা যে আমাদের দেশের অবস্থা আগেকার চেয়ে ভাল হয়েছে"—এই কথা বলে অমরবাবু নিজের গা থেকে বহুমূল্য শালখানা খুলে নিয়ে সেই বৃদ্ধের গায়ে সযত্নে চাপা দিয়ে দিলে। বৃদ্ধ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে খানিকটা চেয়ে রইল, সেই দারুণ শীতে তার কথা কইবার শক্তি ছিল না—নীরবে চেয়ে থেকে সে তার কৃতজ্ঞতা জানালে।

"আর একদিনের কথা—একবার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত তাঁর মজিলপুরের বাটীতে একটা সাহিত্যিক সম্মিলনী করেন এবং কলিকাতার সব বড় বড় সাহিত্যিকদের তাইতে নিমন্ত্রণ করেন। যেদিন আমরা যাব, তার আগের দিন ক্লাসিক থিয়েটারে বসে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে তার পরদিন বেলা এগারটার সময় আমি ও পাঁচকড়ি বাবু এসে অমরবাবুর সহিত মিলিত হয়ে এক সঙ্গে সব ষ্টেশনে যাব। সেই বন্দোবস্তমত আমি তার পরদিন ঠিক এগারটায় ক্লাসিক থিয়েটারে এসে দেখি যে, কেউ কোথাও নেই—কেবল একটী স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনবতী হয়ে থিয়েটারে যে শিবের মন্দির আছে, সেই মন্দিরের কাছে বসে আছে। আমি বরাবর অমরবাবুর ঘরের দিকে সেই মন্দিরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সেই স্ত্রীলোকটী এসে আমাকে বল্লে—"আপনি কি অমর বাবু?" আমি বল্লুম—"কেন?" স্ত্রীলোকটী বল্লে—"আমি একটী ভদ্রঘরের দরিদ্রা বিধবা স্ত্রীলোক। আমার একটী মাত্র ছেলে আছে—সেই পুত্রটী জ্বরবিকারে

ভুগতেছিল—আমি আমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় এবং বন্ধক রেখে তার চিকিৎসা চালিয়েছি কিন্তু আর আমার কিছুই নেই। এদিকে এক মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শমত আজ এক রকম গ্যাস আনিয়ে তার নাকে না দিলে সে আর বাঁচবে না। আজ তার অবস্থা বড়ই খারাপ। আমি কখনও ঘরের বাহির হইনি—ছেলের প্রাণের মায়ায় ভদ্রঘরের মেয়ে হয়েও আজ পাড়ার একটী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এসেছি। কারণ এই গ্যাস ও অন্যান্য ওষুধ আনাতে প্রায় চল্লিশ টাকা খরচ হবে। আমি পাড়ার অনেকের কাছে ঋণ চেয়েছি, ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু কোথাও পাইনি। অনেকের মুখে আগে শুনেছিলুম এবং আজও পাড়ার একটী বুড়োলোক আমায় বল্লেন যে, অমরবাবু খুব দয়ালু লোক, তাঁর কাছে বিপদ জানালে কখনও বিফল হতে হয় না—তাই আমি অমরবাবুর কাছে এসেছি, কিন্তু এখানে কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না, তাই বড় উৎকণ্ঠায় বসে আছি।" আমি সমস্ত কথা শুনে তাকে বসতে বলে, অমরবাবুর ঘরে গিয়ে তাকে সব কথা বললুম। আমার মুখে সব কথা শুনে অমরবাবু সেই স্ত্রীলোকটীর কাছে চলে এল; আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এলুম। সেই স্ত্রীলোটীর সঙ্গে কথা কয়ে অমরবাবু আমায় বল্লে যে—"দাদা, আমি আজ আপনাদের কাছে বড় লজ্জায় পড়লুম। আমি আপনাদের সব মজিলপুরে নিয়ে যাব বলেছিলুম, আর আমাদের যাবার খরচার জন্য পঞ্চাশটা টাকাও রেখেছিলুম, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটীর মুখে সব শুনে বুঝলুম যে, অন্ততঃ চল্লিশ টাকার কম এর ছেলের জন্য অকসিজেন গ্যাস ও অন্যান্য ওষুধ আসতে পারে না, তাই একে আমি চল্লিশটা টাকা, আর ধরুন পথ্যের জন্যও পাঁচটা টাকা—এই মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি—আজ আর আমাদের যাওয়া হল না।" এই বলে অমরবাবু ভিতরে তাঁর কাছে তাঁর যে

ড্রেসার (বেশকারী) বসেছিল, তাকে ডেকে তার হাতে চল্লিশ টাকা দিয়ে বল্লে যে, "তাড়াতাড়ি গাড়ী জুতিয়ে এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এই সব ওষুধ কিনে দিয়ে এঁর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস", এবং সেই স্ত্রীলোকটীর হাতে পাঁচটী টাকা দিয়ে বল্লেন যে,—"মা, আপনি কেন এতদূর কষ্ট করে এলেন—আপনি ভদ্রঘরের স্ত্রী—আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে আমি লোক পাঠিয়ে আপনার সব ব্যবস্থা করে দিতুম। তা যা হোক, আপনি পাঁচটী টাকা আলাদা করে রেখে দিন, বেদানা কি দুধের প্রয়োজন হলে আপাততঃ এইতে চালাবেন; তারপর—আমার লোক আপনার বাড়ী দেখে আসছে, তাকে দিয়ে আমি অন্য যা দরকার হয় জেনে, পাঠিয়ে দোব। যতদিন না আপনার ছেলে ভাল হয়, ততদিন যা দরকার হয় আমায় জানাবেন।" সেই স্ত্রীলোকটী কাঁদতে কাঁদতে দুহাত তুলে অমরবাবুকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে গেল। তারপর পাঁচকড়িবাবু এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সব কথা শুনে বললেন যে,—"আমাদের যাওয়া বন্ধ থাকতে পারে না; যে রকম করে হোক আমরা যাবোই।" অমর বাবু বল্লে,—"তা আর কি করে হবে? কেশিয়ার বা অন্য কোনও কর্ম্মচারী আর এ বেলা থিয়েটারে আসবে না—আমার কাছে পাঁচটী ভিন্ন টাকাও নেই। স্নুতরাং কি করে যাওয়া হবে?" তারপর আমায় উদ্দেশ করে বল্লে যে,—"দাদা, আপনার কাছে কি কিছু হবে?" আমি বল্লুম যে,—"আমি তোমার মতন আমীর লোকের সঙ্গে যাব জানি, সেই জন্যে কিছু সঙ্গে করে আনিনি। তা যাক্ আমরা ওই পাঁচ টাকাতেই যাবো—চল আমরা থার্ড ক্লাস করে যাই।" তারপর আমরা মহা আনন্দিত হয়ে থার্ড ক্লাস করে যাত্রা করলুম। অমর ভায়া রেলে উঠে আমাদের নিকট মাপ চেয়ে বলতে লাগলেন যে,—"আমি আজ

আপনাদের বড়ই কষ্ট দিলুম।" আমি বল্লুম,—"ভায়া, কিছু কষ্ট নয়—তুমি আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাস করে নিয়ে যেতে এবং হোটেলে খাওয়াতে! এতে আমাদের যা আনন্দ হত, তোমার এই মহৎ কার্য্যের দরুণ আমাদের তা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ অধিক আনন্দ হয়েছে।"

"অমরবাবু দানের সময় কখনও পাত্রাপাত্র নির্ব্বাচন করত না, সকলের প্রার্থনা সে পূর্ণ করত। শুধু হৃদয়ের দিক দিয়ে দেখলেই (অভিনয়াদি অন্য গুণের কথা ছেড়ে দি) তার তুলনা নেই। কবির ভাষায় বলতে হয়—তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—:০:—

ক্লাসিকে অভিনয়লীলা (১৮৯৮-৯৯)

প্লেগের প্রকোপ কমিলে, গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে সময়ে নাট্যজগতে, গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ সে সকল কথা না শুনিয়া, কাহারও নিষেধ না মানিয়া, গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকার ও শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজের থিয়েটারে আনিলেন।

দানীবাবুকে লইয়া গিরিশচন্দ্র যখন ক্লাসিকে যোগ দিলেন, তখন জুলাই মাস (১৮৯৮)। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের পর অমরেন্দ্রনাথ—কি নূতন, কি পুরাতন—কোন নাটকের অভিনয়েই হাত দেন নাই। আলিবাবা, কাজের খতম, দোললীলা প্রভৃতি গীতিনাট্যই আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল; নাটকের প্রয়োজন হইলে, হরিরাজ, দেবী চৌধুরাণী, পলাশীর যুদ্ধ, নল দময়ন্তী প্রভৃতি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলিই পুনরভিনীত হইত। এখন গিরিশচন্দ্র আসিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, পুরাতন প্রসিদ্ধ নাটকগুলির পুনরভিনয় করিবেন। কিন্তু তারাসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর, ক্লাসিকে নায়িকার উপযুক্তা অভিনেত্রীর অভাব। কুসুমকুমারীকে দিয়া তিনি বেশীর ভাগই কাজ চালাইয়া লইতেন বটে, কিন্তু তখন কুসুমকুমারীর গীতিনাট্যে খুব

সুনাম। তাহা ছাড়া, একা একজন কতদিক সামলাইতে পারে! সে সময় তিনকড়ি ও প্রমদাসুন্দরী উভয়ে থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের পূর্ব্ব বেতন বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া, উভয়কেই নিজের থিয়েটারে আনিলেন ও খুব উৎসাহের সহিত মেঘনাদ বধ, মুকুলমুঞ্জরা, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটক মহলায় ফেলিলেন। তখনকার দিনের দর্শকদের নাচগানের উপর অত্যধিক অনুরাগবশতঃ, তিনি গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত 'মেঘনাদ বধে'র মধ্যে নিম্নলিখিত দুইখানি গান রচনা করিয়া সংযুক্ত করিয়া দিলেন। গান দুইটী এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, সেই হইতে অদ্যাবধি যখনই যেখানে 'মেঘনাদ বধ' অভিনীত হইয়াছে, প্রত্যেক অভিনয়েই অমরেন্দ্রনাথের গান দুইটী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এমন কি, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ও গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক গ্রথিত 'মেঘনাদ বধ' নাটকের মুদ্রিত সংস্করণেও, যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক গান দুইটী সংযুক্ত করা হইয়াছে।

রক্ষঃরমণীগণের গীত—

বীর সাজে আজি সাজে রক্ষঃকুলকামিনী।
শাণিত ঝলকে যেন ঝলকে দামিনী॥
বদ্ধ আঁটি চল সবে, "জয় রক্ষরাজ" রবে,
গৌরব গুমরে ভবে, দানবনন্দিনি।
চল, বীরপদভরে, কাঁপাইয়া চরাচরে,
বর শরে রঘুবরে নাশিব এখনি।

সখিগণের গীত—

এত কেন গরব লো তোর ঢ'লে ফুল গড়িয়ে গেলি।
এল বঁধু প্রাণের মধু হাসিমুখে লুটিয়ে দিলি ॥
যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়ে, থাক্‌বি পরের দাগা নিয়ে,
জেনে শুনে কোন্ প্রাণে লো, তুলে শেল বুকে নিলি ?
চুপি চুপি তোরে বলি, সে বড় চতুর অলি,
আস্‌বে কি আর, ভাস্‌বি লো তুই, ফুটে গেলি কলি ছিলি ॥

যথারীতি মহলা দিয়া, প্রথমে মেঘনাদ বধ অভিনীত হইল। গিরিশ-চন্দ্র রাম, মহেন্দ্রবাবু লক্ষ্মণ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য রাবণ, অমরেন্দ্রনাথ মেঘনাদ, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিভীষণ, অঘোরনাথ পাঠক হনুমান, প্রমদাসুন্দরী প্রমীলা ও পান্নারাণী নৃমুণ্ডমালিনীর অংশ গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই খুব কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইল। তবে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গেল। তাঁহার মত রঙ্গমঞ্চোপযোগী আকৃতিবিশিষ্ট নট অদ্যাবধি কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন নাই। তিনি ষ্টেজে অবতীর্ণ হইলে মনে হইত, যথার্থই যেন তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া রঙ্গপীঠ আলোকিত করিতেছে। সেই সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি যখন ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া লক্ষ্মণকে ধিক্কার দিত, দর্শকগণ চক্ষের সম্মুখে নিমেষ মধ্যে সেই সৌম্য মুখমণ্ডল রোষারক্তিম রূপে পরিণত দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া যাইতেন ; আবার সেই মেঘনাদই যখন বিভীষণকে কক্ষদ্বারে দ্বাররক্ষীরূপে দণ্ডায়মান দেখিয়া হতাশা ও গঞ্জনা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিতেন,—

"এতক্ষণে জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে !"

তখন সকলে ভুলিয়া যাইতেন যে, এটা অভিনয়,—ত্রেতাযুগের মেঘনাদ নহে। যৌবনে গিরিশচন্দ্র এই ভূমিকার অভিনয় করিয়া, 'বঙ্গের গ্যারিক' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যাঁহারা মেঘনাদরূপী অমরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, অমরেন্দ্রনাথ এই ভূমিকার অভিনয়ে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাই কবি অমরেন্দ্র-তিরোধানে অতি খেদে গাহিয়াছিলেন,—

মেঘনাদ সিংহনাদে নাদি রঙ্গস্থলে,
লক্ষ্মণে শাসিবে কেবা একা যজ্ঞস্থলে ?
রোষি' অস্ত্র ঝনৎকার,
কোদণ্ডের সে টঙ্কার,
"লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে !"

ক্লাসিকে যখন মহাসমারোহে মেঘনাদ বধ অভিনীত হইতেছিল, তখন মহেন্দ্রলাল বসু গিরিশচন্দ্রের সহিত একত্র কাজ করিতে অসম্মত হইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে চলিয়া গেলেন ও সেখানে অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত মিলিত হইয়া, নূতন থিয়েটারে অভিনয় করিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র না দমিয়া, দানিবাবুকে দিয়া লক্ষ্মণ সাজাইতে লাগিলেন ও তাহার অনতিকাল পরেই (৩০শে জুলাই, ১৮৯৮) মুকুল-মুঞ্জরা খুলিলেন। ভূমিকালিপি এই :—অঘোরনাথ পাঠক অচ্যুতানন্দ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য জয়ধ্বজ, চুণিলাল দেব চন্দ্রধ্বজ, দানিবাবু মুকুল, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ক্ষিতিধর, অমরেন্দ্রনাথ বরুণচাঁদ, অক্ষয় চক্রবর্ত্তী ভজনরাম, তিনকড়ি দাসী তারা ও কুসুমকুমারী মুঞ্জরা। কিন্তু এত শক্তিমান্ নটনটী সমন্বয়ে অভিনীত হওয়া সত্ত্বেও, মুকুল-মুঞ্জরা তেমন জমিল না। তখন শনিবার, ২৭শে আগষ্ট, অমরেন্দ্রনাথ প্রফুল্লের পুনরভিনয় করিলেন। ভূমিকাগুলি এই ভাবে বণ্টিত হইল :—

যোগেশ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমেশ—চুণিলাল দেব (পরে হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য), সুরেশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ভজহরি—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাঙ্গালীচরণ—শ্রীশচন্দ্র রায় (পরে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু), জনৈক লোক—অঘোরনাথ পাঠক, পীতাম্বর—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মদন ঘোষ—গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাসুন্দরী—হরিদাসী (গুলফম), জ্ঞানদা—তিনকড়ি দাসী, প্রফুল্ল—কুসুমকুমারী, জগমণি—জগত্তারিণী ।

বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, নূতন দৃশ্যপট আঁকাইয়া প্রফুল্লের অভিনয় হইল। সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, এমন নাচগানের যুগে এরূপ গুরুগম্ভীর বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে,—বিশেষতঃ এমন বর্ষার দিনে,—ভিড় হইবে না। কিন্তু বিক্রয় দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন, তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। বহু লেখক বহু প্রকারে গিরিশচন্দ্রের এ অভিনয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ পর্য্যন্ত বহু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা যোগেশের ভূমিকাভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু কেহই গিরিশ-চন্দ্রের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। পরে অমরেন্দ্রনাথও এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে সে কথার আলোচনা করিব। এ দিন তিনি ভজহরির অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিনয় সম্পর্কে ৩রা সেপ্টেম্বর, (১৮৯৮) তারিখের 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' বলেন,—

"Next to Babu Giris Chandra Ghose's acting, the least conventional was that of the representative of Bhajahari, who was no other than the intelligent manager." সমালোচনায় অন্য কোন পুরুষ চরিত্রের কথা উল্লেখও করা হয় নাই।

ভজহরির ভূমিকা অভিনয়ও অমরেন্দ্রনাথের এক মহীয়সী কীর্ত্তি।

বহু জনপ্রিয় অভিনেতা তাঁহার পর এ ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তেমনটী আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। তখনকার দিনে অমরেন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকাভিনয়ে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট বলিয়া স্বীকৃত ত' ছিলেনই ; তাহার উপর আবার অঘোর ও ভজহরির ভূমিকায় অসামান্য কলানৈপুণ্য দেখাইয়া, তিনি যে যশ অর্জ্জন করেন, তাহাতে তাঁহাকে সে সময়কার অদ্বিতীয় 'সিরিও-কমিক অ্যাক্টর' বলিলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১লা আগষ্ট, ১৮৯৯ খৃঃ, একখানি খোলা চিঠিতে অমরেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :—"Not to speak of your doings, that have already been household Topics."

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, শনিবারে অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার প্রথম অভিনয় হয়। বহু নবাঙ্কিত দৃশ্যপট সহকারে, খুব ধুমধামের সহিত নূতন নাটক খোলা হয় ও প্রথমাভিনয় রজনীতে এইভাবে ভূমিকা বিতরিত হয় :—

উপেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামরাম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, রমণ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দাওয়ান—গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালু সর্দ্দার—চুণিলাল দেব, ঐ অনুচর—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ইন্দিরা—কুসুমকুমারী, কামিনী—বিনোদিনী (হাঁদি), সুভাষিণী—রাণীসুন্দরী, গৃহিণী—লক্ষ্মীমণি, হারাণী—কুমুদিনী, সুন্দরী—ভূষণকুমারী।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও নাটকখানি বিশেষ লোকপ্রিয় হয় নাই। ১২ই অক্টোবর (১৮৯৮) তারিখে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরারে' ইহার এক সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কথার সঙ্গে তাঁহারা লেখেন :—

"The delicate girl (Indira) is not constitutionally strong enough to bear the glare of footlights. Bankim however, is a name to conjure with, and shorter pieces of his novel or no novel, and never intended for the stage, have already

been vended as articles of theatrical commerce. Babu Amarendra Nath Dutt can therefore hardly be blamed, if he could not resist the temptation of utilizing for his company a piece like Indira, which contains here and there fine and brilliant situations such as are calculated to hit home and contribute to the entertainment of the present-day play-goer. His however, has been no more paste-and-scissor work's work. He has filled out the picture to the regulation dimensions by the creation of a number of incidental characters, who attach themselves to the theme, and like the parasites of the botanical world, serve to suck the juice out of their supporter. Among such creations is the fascinating figure of Fullora—a variant upon the Pagalini of Billwamangal, but a good deal less relevant to the thesis of the play. Upendra, a milk-and-watery individual in the original, is improved into an earnest and passionate soul by the dramatiser who himself essays the role. The character is far below his talents, but he makes his intellectual best of it. * * * Songs, chiefly devotional ones, are scattered up and down the piece. These are composed by the dramatiser, and are such as any of the best Bengali song-composer of the day, might sing without the faintest blush. * * * Some of the scenes painted for the representation, are excellent productions of art. Among these are the Chetla Bridge, and the drawing room in the last scene, the

decorations of the latter being such as only the most refined taste is capable of suggesting. That the manager has been profuse in the use of his brains and purse in the getting-up and mounting of the piece is a fact that would admit of no denial. That his efforts to please his constituents have proved successful so far, might be gathered from the circumstance that the third performance of the piece took place on Saturday last before a well-crowded house."

ইন্দিরা অভিনয়ের পর, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন গীতিনাট্য "নির্ম্মলা" রচনা করেন ও ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮, রবিবার, বড়দিনের দিন, ক্লাসিকে নির্ম্মলার প্রথম অভিনয় হয়। বাংলা এবং মধুসূদন দাদা ও গুরু-মহাশয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া অমরেন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। ইহাতে খুব উচ্চাঙ্গের নাট্যসম্পদ বিশেষ কিছু না থাকিলেও, স্থানে স্থানে নব প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় গ্রন্থকারের বেশ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত গীতিমাধুর্য্যে গ্রন্থখানি এত উজ্জ্বল যে, তদ্দ্বারা 'নির্ম্মলা' অনায়াসেই দর্শকের হৃদয় জয় করিয়া ফেলে। ইহার প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ :

সদানন্দ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ষণ্ড—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণু বাবু), কুষ্মাণ্ড—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), পরমানন্দ—অঘোরবিহারী চক্রবর্ত্তী, কিশোর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জটিল—কিরণবালা, নিমচাঁদ—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নির্ম্মলা—প্রমদাসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণ—কুসুমকুমারী, শ্রীরাধা—রাণীসুন্দরী, বৃন্দা—নীরদাসুন্দরী, কালিন্দী—পান্নামণি, জটিলের মাতা—হরিদাসী (গুলফম)

অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অভিনীত 'কিশোর' সম্বন্ধে "Power and Guardian" নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন :—

"Babu Amarendra Nath Dutt, the author played the role

of "Kishore" admirably well. His natural grace and elegance as an actor endeared him for the time being to all present."

এই সময়ে নাট্যজগতে আবার একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অর্দ্ধেন্দু বাবু ও মহেন্দ্র বাবু থিয়েটার জমাইতে অসমর্থ হওয়ায়, মিনার্ভা বন্ধ হইয়া যায়। তখন এইচ, এল, মল্লিক নামে এক ভদ্রলোক 'লেসী' হইয়া ঐ থিয়েটার ভাড়া লন। এদিকে অমরেন্দ্রনাথের সহিত সামান্য এক সূত্রে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া, চুণিলাল দেব ২০শে নভেম্বর হইতে ক্লাসিক থিয়েটারের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া মল্লিক মহাশয়ের সহিত মিলিত হন। চুণিবাবু তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, "যদি থিয়েটার জমাইতে চান, তাহা হইলে গিরিশবাবুকে আপনার থিয়েটারে আনুন।" সেই পরামর্শমত এইচ, এল, মল্লিক গিরিশবাবুকে ম্যানেজার করিয়া থিয়েটার চালাইতে সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহাকে ক্লাসিক থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া আনেন। নির্ম্মলার প্রথম অভিনয় রজনীর দিন, গিরিশচন্দ্র ২।৪ জন অভিনেতা অভিনেত্রী লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া যান।* অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, পূর্ণ উদ্যমে, সগৌরবে ও সদর্পে থিয়েটার চালাইতে থাকেন ও গিরিশচন্দ্র পরিচালিত মিনার্ভা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ক্লাসিকই যে রঙ্গজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা প্রমাণে সক্ষম হন। মহেন্দ্র বাবু আসিয়া সেই সময় হইতে আবার ক্লাসিকে যোগ দেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে নির্ম্মলার জনপ্রিয়তাবশতঃ নূতন কোন নাটক খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরাতনের মধ্যে ৪ঠা

---

* জানি না কেন, এই ঘটনা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ সকলে নীরব। এই থিয়েটার এক পক্ষকালের মধ্যে উঠিয়া যায় বলিয়া কি ?

ফেব্রুয়ারী শনিবার, এক রাত্রির জন্য 'বিষাদ' অভিনীত হয়। ক্লাসিকে বিষাদের এই প্রথম অভিনয়। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার ইণ্ডিয়ান্ ড্রামাটিক্ ক্লাব-যুগে অভিনীত নায়ক অলর্কের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর বেনিফিট উপলক্ষেও বিষাদের অভিনয় হয়।

এই বৎসরের প্রথম হইতেই, কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছিল। জনহিতকর কার্য্যসাধনে অমরেন্দ্রনাথ চিরদিনই উন্মুখ। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, শনিবার, ৪ঠা মার্চ্চ, Municipal Agitation Fund-এর বেনিফিট উদ্দেশ্যে হরিরাজ ও দোললীলা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন ও ঐ দিনের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ঐ ফণ্ডে দান করেন।

১১ই মার্চ্চ, ১৮৯৯ খৃঃ, শনিবার, 'প্রফুল্ল' লইয়া, গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে মহাসমারোহে মিনার্ভার উদ্বোধন হয়। অমরেন্দ্রনাথও গিরিশচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া পরের শনিবার, অর্থাৎ ১৮ই মার্চ্চ ক্লাসিকে প্রফুল্লের অভিনয় করেন ও স্বয়ং যোগেশের অংশে দর্শককে দেখা দেন। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার হাণ্ডবিলে লেখেন,— "যোগেশ—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ (অধীন)" ; দেখাদেখি, অমরেন্দ্রনাথও নিজের নামের পার্শ্বে "অধীন" বা "my humble self" কথাগুলি সংযুক্ত করিয়া দেন। এই "অধীন" লেখা রীতিটী বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল।

২৫শে মার্চ্চ, শনিবার, ক্লাসিকে ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের "দশরথের মৃগয়া বা সিন্ধুবধ" নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। দশরথ সাজেন অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারী সিন্ধু। সিন্ধুর মধুর সঙ্গীতে সমস্ত দর্শক বিশেষ প্রীত হন। কিছুদিন ধরিয়া নাটকখানি ক্লাসিকে খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

এদিকে গিরিশচন্দ্রের সহিত অমরেন্দ্রনাথের দ্বন্দযুদ্ধ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। জানি না কি কারণে এক পক্ষের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের মিনার্ভায় অভিনয়লীলা শেষ হইয়া গেল। মিনার্ভার কঙ্কালে প্রাণসঞ্চারে অসমর্থ হইয়া, তিনি মার্চ্চের শেষে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়া আসিলেন। গতবার যখন তিনি ক্লাসিকে ছিলেন, তখন তাঁহাকে নাট্যকার ও শিক্ষকের পদে বৃত করা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার অবস্থানকাল ছয় মাসের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে একখানিও নূতন নাটক রচনা করিয়া দেন নাই। তাহা ছাড়া, অকস্মাৎ তাঁহাকে কোন কথা না জানাইয়াই গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য এবার গিরিশচন্দ্রকে নিজের থিয়েটারে আনিবার কালে অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত রীতিমত লেখাপড়া করিয়া, তবে ক্লাসিকে আনিলেন। কথা রহিল,—গিরিশচন্দ্র বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিখানি করিয়া নূতন বহি—তাহার মধ্যে দুইখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক—ক্লাসিকে অভিনয়ার্থ লিখিয়া দিবেন। ঐ সর্ত্তানুসারে গিরিশচন্দ্র 'দেলদার' রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

এবার গিরিশচন্দ্র ক্লাসিকে আসিলে, অমরেন্দ্রনাথ 'জনা' অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাজা স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অমরেন্দ্রনাথের নিকট জনার অভিনয় দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ও উপস্থিতিতে ৮ই জানুয়ারী এক রাত্রির জন্য ক্লাসিকে জনার অভিনয় হইয়াছিল। এখন গিরিশচন্দ্রকে লইয়া, ২৯শে এপ্রিল, ঐ নাটকের পুনরভিনয় হইল। গিরিশচন্দ্র বিদূষক, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য নীলধ্বজ, তিনকড়ি জনা, অমরেন্দ্রনাথ প্রবীর ও কুসুমকুমারী মদনমঞ্জরী সাজিলেন। গিরিশবাবুর ইচ্ছা ছিল যে দানিবাবু প্রবীর সাজেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে

তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"দানির প্রবীর ত দেখিয়াছেন, এবার দেখুন আমার প্রবীর তাহার অপেক্ষা ভাল হয় কিনা?" অমরেন্দ্রনাথ এ কথার মর্য্যাদাও রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ দুই প্রবীরের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা কঠিন। হাবভাবের দিক দিয়া দানিবাবু অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করিতেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তির দিক দিয়া অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ছাপাইয়া যাইতেন; বিশেষতঃ মাতার সহিত প্রথম কথোপকথনের দৃশ্যে ও প্রেমাভিনয়ের দৃশ্যগুলিতে তাঁহার অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের হইত, যে তাহার তুলনা হয় না। প্রবীরের মৃত্যুদৃশ্যের প্রথম দিকে, দানিবাবু অতি চমৎকার অভিনয় করিতেন। দৃশ্যারম্ভেই তিনি নিদ্রাঘোরে বলিতেন—"এস এস কোথা আনন্দিনি!" তারপর হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া, "একি কোথা আমি" বলিয়া, তাঁহার সেই ভ্যাবাচ্যাকা, বিস্মিত ভাব ও তদনুযায়ী মুখভঙ্গী, তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিত। কিন্তু এই দৃশ্যের শেষের দিকের অভিনয়ে প্রবীর যখন প্রেম, ক্রোধ ও ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে কন্যাকে বলিতেন,—

ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?

তখন অমরেন্দ্রনাথ এত মনোমুগ্ধকর অভিনয় করিতেন যে, প্রবীরের প্রস্থানের পর, 'সিন' একেবারে ঝুলিয়া পড়িত।

অতঃপর ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের 'দেলদার' অভিনীত হয়। ইহার প্রথমাভিনয় রজনীর (১০ই জুন, ১৮৯৯) পাত্রপাত্রীগণ এই:—

দেলদার—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নেসা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গহন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মরণ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), কুহকী—অঘোরনাথ পাঠক, পিয়ারা—কুসুমকুমারী, ধারা—ভূষণকুমারী, রেখা—প্রমদাসুন্দরী, কুহকিনী—পান্নারাণী

গহনের চরিত্রে বিশেষ কিছু অভিনয়-চাতুরী দেখাইবার ক্ষেত্র ছিল না। তবু 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১৪ই জুন, ১৮৯৯) লেখেন :—

"And to crown all, the manager himself interpreted the congenial character of Gahan (hero number two)—a character, which it must be said is far below his intellectual level."

দেলদারে নাটকীয় সম্পদ্ বিশেষ কিছু না থাকিলেও, নাচগানের মাধুর্য্যবশতঃ দর্শকের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

ইহার পর দুই শনিবার করমেতিবাই (অমরেন্দ্রনাথ আলোক. কুসুমকুমারী করমেতি, গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় পরশুরাম, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য আগমবাগীশ, অক্ষয় চক্রবর্ত্তী টুক্‌রো, ভূষণকুমারী রাধিকা, জগত্তারিণী কৃত্তিকা ও গুলফম হরি অম্বিকা); দুই শনিবার প্রফুল্ল (গিরিশচন্দ্র যোগেশ ও অমরেন্দ্রনাথ ভজহরি) ও একরাত্রি পলাশীর যুদ্ধ (গিরিশচন্দ্র ক্লাইভ ও অমরেন্দ্রনাথ সিরাজ) অভিনয়ের পর, ২৬শে আগষ্ট (১৮৯৯) ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের নূতন গীতিনাট্য 'শ্রীকৃষ্ণের' প্রথম অভিনয় হয়। প্রধান ভূমিকাগুলির পরিচয়লিপি এই :—

শ্রীকৃষ্ণ—কুসুমকুমারী, বলরাম—প্রমদাসুন্দরী, নন্দ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উপানন্দ—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদাম—রাণীসুন্দরী, সুদাম—লক্ষ্মীমণি, ব্রহ্মা—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, নারদ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ফলওয়ালা—অঘোরনাথ পাঠক, শ্রীরাধিকা—ভূষণকুমারী, যশোদা—পান্নারাণী, রোহিণী—জগত্তারিণী, জটিলা—কুমুদিনী, কুটিলা—হরিদাসী (গুলফম)।

শ্রীকৃষ্ণকে অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত সমস্ত গীতিনাট্যের মধ্যমণি বলিলে কিছু অন্যায় বলা হয় না। আদর্শ সাহিত্য হিসাবে হয় ত' শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কিছু মর্য্যাদা নাই; কিন্তু মূল্যনিরূপণকালে একটী কথা

আমাদের অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অমরেন্দ্রনাথ কখনও আদর্শ সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, অভিনয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সে সমস্ত রচনা করিয়াছেন। এমন ভাবে চরিত্র ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে অভিনয়ে রসসৃষ্টি হইতে পারে ও সে বিষয়ে সফল হইলেই তিনি স্বীয় পরিশ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, দর্শকগণের রুচি ও প্রীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ফলে তাঁহার কোন বই কখনও থিয়েটারে 'মার' খায় নাই। শ্রীকৃষ্ণেও আমরা ইহার ব্যতিক্রম তো দেখিই না, বরঞ্চ পূর্ণ পরিণতি দেখি। আলিবাবার পর এমন জমজমাটী কোন অপেরা ক্লাসিকে আর অভিনীত হয় নাই। ইহার গানগুলির রচনা দক্ষতা ও অপরূপ সুরমাধুরী সর্ব্বশ্রেণীর সমস্ত দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। বিশেষ করিয়া, শ্রীরাধিকার দুইখানি গান এত জনপ্রিয় হয় যে, আমরা এখানে সে দুটী উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কাহা জীবনধন, বৃন্দাবন প্রাণ,
কাহা মেরি জনমকি রাজা।
শূন্য অমরপুরী, আও আও মুরারী,
মোহন বাঁশরী বাজা॥
নয়ন সলিলে বসন ভিগাওল,
সাধ কি সাগর হিয়া পর উথাল,
শিরতাজ মেরি শিরমে আ যা॥
নয়নকি রোশনি নয়ন ছোড়কে,
ঘুরত ফিরত কাহা ফাঁকে ফাঁকে,
হা হা প্রিয় বঁধু এ কোন সাজা॥

(হারে) নিপট কপট তুঁহু শ্যাম।

(রাধা) রোয়ে রোয়ে মরে, তুহারি চরণ ধারে,

আগু ন বিচারি ছি ছি তুয়া গুণধাম॥

লাজ মান হরি, যমুনা পানিমে ডারি,

বারি বারি করি পিয়াসে ফুকারি,

চোরা চিত মন চোর কায়সে নিবারি—

কলিজে কাটারি হরি লিয়ে তেরে নাম॥

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯, তারিখে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' লেখেন,—

"The new playlet, "Sri Krishna", which has recently been produced at the above theatre seems to have taken well with its constituents. The subject affords abundant room for singing and scenic display, of which the management have taken the fullest advantage. The dances are well arranged and they are better enjoyed, probably because they are few in number. The songs are gems of lyrical composition, and with the exception of two of Jayadeva's, are all Babu A. N. Dutt's own. The numbers lend themselves easily to music and the music is tuneful, if occasionally it is of a reminiscent character. The piece presents some of the incidents of Krishna's early life, closing with Kaliya Daman. The introduction of Radha in the play is a daring subversion of chronological sequence, for which the only justification shown is that the represen-

tative of the character sings a couple of songs that bring down the house. To the average play-goer, the play might appear in the light of light refreshments. There are passages in the piece, however, which to the religious minded might taste as substantial fare. Taken all round, the representation affords uninterrupted entertainment for a couple of hours or so."

৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'সময়' লেখেন :—

"ষ্টারে নূতন নাটক মৃচ্ছকটিক, রয়াল বেঙ্গলে নূতন নাটক বভ্রু-বাহন এবং মিনার্ভায় নূতন গীতিনাট্য মদালসার প্রবলতর আকর্ষণ সত্ত্বেও ক্লাসিকের কি গ্যালারি, কি পিট, কি ষ্টল, সকল আসনই দর্শকে ভরিয়া গিয়াছিল; এমন কি অনেকে ৩।৪ ঘণ্টা দাঁড়াইয়াও অভিনয় দেখিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক, ক্লাসিকে দর্শকের এরূপ আধিক্য, উহার কর্তৃপক্ষদিগের কার্য্যক্ষমতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। * * আমরা অপেক্ষাকৃত লঘুভাবমূলক ও চিত্তহারী "শ্রীকৃষ্ণের" অভিনয় দর্শনে বিশেষ প্রীত হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা অবলম্বনে এই গীতিনাট্যখানি বিরচিত এবং যমলার্জ্জুনভঙ্গ ও কালীয়দমন এই দুইটী লীলাই ইহার অবলম্বন। দৃশ্যপটের চাকচিক্য, গীতগুলির সুরের লালিত্য ও পারিপাট্য এবং নৃত্যের সুন্দর ভাবপূর্ণ ভঙ্গিমাতে, শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় সাধারণ দর্শকগণের বড়ই মনোরঞ্জক হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই বাল্যলীলায় শ্রীরাধার আবির্ভাব পুরাণদুষ্ট হইলেও, কেবল ঐ অংশের অভিনেত্রীর দ্বারা গীত দুইটী সুমধুর গীতের জন্য সে দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে না। বাস্তবিকই গীত দুইটীর সুরলয় যেমন সুন্দর, শ্রীরাধার অংশ অভিনয়কারিণী গান

দুইটীকে হাবভাবাদির সহিত তদধিক সুন্দররূপে গাহিয়া সকলকেই এক অপূর্ব্ব ভাবমোহে বিভোর করিয়াছিলেন; শুদ্ধ এই দুইখানি গান শুনিলেই রাত্রি জাগরণ সার্থক হয়। ফলতঃ, ঐদিন শ্রীকৃষ্ণ অভিনয়ের দুই ঘণ্টা কাল আমরা বেশ আনন্দের সহিত কাটাইয়াছিলাম।"

বাহুল্যভয়ে আমরা অন্যান্য সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম না। মাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক জনপ্রিয়তাবশতঃ, এই গীতিনাট্যখানি অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পরিচালিত বা অপরিচালিত প্রত্যেক রঙ্গালয়েই অভিনীত হইয়াছে। এমন কি, গ্রামোফোনের রেকর্ডে পর্য্যন্ত "শ্রীকৃষ্ণ" পালা তোলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের অভিনয়ে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগিত না বলিয়া, ইহার সহিত আর একটী পুস্তক জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন হইত। আমরা ইহার প্রথম তিন রজনীর অভিনয়লিপি দিলাম।

২৬শে আগষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ ও কাজের খতম।

২রা সেপ্টেম্বর—শ্রীকৃষ্ণ ও মেঘনাদ বধ।

রাম—গিরিশচন্দ্র; লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু; মেঘনাদ—অমরেন্দ্রনাথ।

৯ই সেপ্টেম্বর—শ্রীকৃষ্ণ ও সীতার বনবাস।

রাম—গিরিশচন্দ্র; লক্ষ্মণ—অমরেন্দ্রনাথ; সীতা—তিনকড়ি।

ক্লাসিকে ইহা সীতার বনবাসের প্রথম অভিনয় নয়—চতুর্থ অভিনয়; ইতিপূর্ব্বে ৮ই মার্চ্চ, বুধবার, যখন ক্লাসিকে সীতার বনবাসের প্রথম অভিনয় হয়, তখনও অমরেন্দ্রনাথ লক্ষ্মণ সাজিয়াছিলেন কিন্তু মহেন্দ্রবাবু হইয়াছিলেন রাম। যৌবনে মহেন্দ্রবাবু লক্ষ্মণের অংশে অতুলনীয় অভিনয় করিতেন। সীতার বনবাসে লক্ষ্মণের কথা স্মরণ হইলে, তাঁহারই কথা লোকের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই এখন তিনি বার্দ্ধক্যে আর এসব নামকরা ভূমিকায় নামিতে চাহিতেন

না—পাছে ভূমিকার যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষণে তিনি অসমর্থ হন, পাছে তাঁহার পূর্ব্ব অভিনয়ের সুনামের লাঘব হয়। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে ও আগ্রহে, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকাগুলিতে নামিতে হইত। তাই পূর্ব্বে একদিন সীতার বনবাসে লক্ষ্মণ সাজিয়াছিলেন, এখন মেঘনাদ বধে লক্ষ্মণ সাজিলেন ও পরে (২৫শে নভেম্বর, ১৮৯৯) পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেই দিন গিরিশচন্দ্র ক্লাইভ ও অমরেন্দ্রনাথ মোহনলাল সাজেন। মোহনলালের অংশে এই তাঁহার প্রথম অভিনয়।

তিন সপ্তাহ শ্রীকৃষ্ণ অভিনয় হইবার পর, ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৮৯৯) ক্লাসিকে 'ভ্রমর' খোলা হয়। অমরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া, 'ভ্রমর' নাম দিয়া তাহার অভিনয় করেন। সত্য মিথ্যা জানি না, শোনা যায়, এমারেল্ড থিয়েটারে যখন "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রথম অভিনীত হয়, তখন সে সংবাদ শ্রবণে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্তের উইল নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিলে, তাহার নামও বদলাইয়া 'ভ্রমর' রাখা উচিত।* ক্লাসিকে ভ্রমরের প্রথম অভিনয় রজনীতে ভূমিকা-নির্ব্বাচন হয় এইরূপ :—

কৃষ্ণকান্ত—মহেন্দ্রলাল বসু, হরলাল—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দলাল—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাধবীনাথ—চণ্ডীচরণ দে, নিশাকর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ব্রহ্মানন্দ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরে—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সোনা—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, রূপো ও বিধু—অহীন্দ্রনাথ দে, স্বপ্ন—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ভ্রমর—কুসুমকুমারী, রোহিণী—প্রমদাসুন্দরী, যামিনী—ভূষণকুমারী।

---

* "আমরা শুনিয়াছি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, আমার "কৃষ্ণকান্ত" যদি "ভ্রমর" নামে অভিনীত হয়, তাহা হইলে আমার বড়ই সন্তোষের কারণ হয়।"—চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬।

ভ্রমরের এই মুষ্টিমেয় অভিনেতৃবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই এখন পরলোকগত। কিন্তু পাঠকবর্গের মধ্যে নিশ্চয়ই এখনও বহুলোক বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা সে অভিনয় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে সত্য সাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, ভ্রমরের অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার যে কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অসামান্য। বড় বড় ভূমিকার কথা ছাড়িয়া দি, ছোটখাট ভূমিকার অভিনেতারা পর্য্যন্ত এত নিখুঁত অভিনয় করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্য কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিনয় হয় কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলালের।

কৃষ্ণকান্তের ভূমিকায় মহেন্দ্রলাল যে অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন, তদ্দ্বারা তিনি সহজেই প্রমাণ করেন যে, স্থবির হইলেও সিংহ সিংহই বটে, শৃগাল নহে। ভ্রমরের ভূমিকায় কুসুমকুমারীর সে মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়, আজিও ভুলিবার নয়। আজ পর্য্যন্ত কেহ এ অংশে তাঁহার সমকক্ষ অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই। এ সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' লিখিয়াছিলেন,—"The role of Bhramar is one, which is difficult of stage representation. The story covers a period of several years during which Bhramar grows from a playful kitten into a responsible wife. The earlier portion of her life is one of loving ingeniousness, and not of conscious archness, such as is exhibited by the interpreter. The transition into the graver mood, however, is in the case of the player, an artistic achievement." বস্তুতঃ, অদ্যাবধি ভ্রমরের ভূমিকায় কুসুমকুমারী অদ্বিতীয়। রোহিণীর ভূমিকায় প্রমদাসুন্দরীও অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য

'ভ্রমর' নাটকে গোবিন্দলালের ভূমিকায়

অমরেন্দ্রনাথ।

ভ্রমর—কুসুমকুমারী।

ভ্রমর।—বল দেখি, আমি কে ?

দেখান। পরে তারাসুন্দরীও এ ভূমিকার অভিনয়ে যশস্বিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু বালবিধবার দারুণ অন্তর্দ্দাহ, প্রবৃত্তির সংগ্রাম, রূপমোহ প্রভৃতি প্রমদাসুন্দরীর অভিনয়ে এত সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিত যে, অমন যে লোকপ্রিয় গোবিন্দলাল—রোহিণীর প্রতি সহানুভূতিবশতঃ স্থানে স্থানে সেই গোবিন্দলালের উপরও দর্শকের রাগ হইত। কিন্তু তারাসুন্দরীর অভিনয়ে তেমন হইত না।

আর অমরেন্দ্রনাথ!—

বঙ্কিম অক্ষয়কীর্ত্তি কল্পনার জাল,
তুমি যেন মূর্ত্তিমান্ সে গোবিন্দলাল!
রোহিণীর রূপ আশে,
ভ্রমরে কাঁদালে শেষে,
বিনা দোষে বালিকার ভাঙ্গিলে কপাল।

তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে ২০শে সেপ্টেম্বর (১৮৯৯) তারিখে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' বলেন,—

"The representation however is a substantial dramatic feast. The interpreter of Govindalal is the very embodiment of love, passion and distracting remorse. He casts conventionalism to the winds, and throws himself heart and soul into the situations in which the text places him. The various phases of the character are well differentiated and his impassioned utterances plunge the house into a whirlpool of excitement. The rescue of Rohini, who drowns herself in the tank, is a realistic performance, in the truest sense of the word. In this the players mean to be

serious and not to palm off a make-believe on the spectators, and hence the thrill of emotion with which the spectacle is received."

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) লিখিয়াছিলেন,—

"অভিনয় দেখিতে দেখিতে শত শতবার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গিয়া নাটকের বিষয়ে তন্ময় হইয়া গিয়াছি, সত্য ভুলিয়া গিয়া স্বপ্নকে সত্য জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছি। * * অভিনয়ের নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমরা যতই প্রশংসা করি না, তাহাও যেন যথেষ্ট হয় না। বাস্তবিক গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের অভিনয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্থানাভাববশতঃ আমরা প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে পারিতেছি না, কিন্তু গোবিন্দলালের বিদায়কালীন ভ্রমরের আক্ষেপ—সংসারে অনাস্থা, প্রসাদপুরের গ্রাম্যপথে গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি আক্রমণ, ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় একশেষ দুর্দ্দশাপন্ন গোবিন্দলালের আগমন ও বারুণীর ঘাটে যাইবার পথে গোবিন্দলালের উন্মত্তাবস্থা ইত্যাদি এই কয়টী উপলক্ষে গোবিন্দলালের অভিনয় দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। অন্তরে প্রকৃত রসের সম্যক্ উদ্দীপনা হইয়াছে, অন্তর্জগতের ভীষণ ছবি আমাদের হৃদয় নেত্রের সমক্ষে উজ্জ্বল-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, আমরা সহস্র প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও অভিনীত বিষয়ের মরীচিকায় ভুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। আর কি চাই? এই ত উপন্যাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, নাটকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, অভিনয় নিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। ধন্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী প্রতিভা ও ধন্য অমরেন্দ্রবাবুর অভিনয়-পারিপাট্য!"

অদ্যাবধি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, "যত বড় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বা অভিনেত্রীই হউন না কেন, যত বিভিন্ন

চরিত্রের অভিনয়ে যত দক্ষতার পরিচয় দিন না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কৃতিত্বের সহিত যাঁহারা অভিনয় না করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ণরথী বলিয়া স্বীকার করা চলে না।" এ প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে একমাত্র গোবিন্দলালের ভূমিকার অভিনয়েই অমরেন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ণরথী। শুধু কৃতিত্বের সহিত অভিনয় নয়, গোবিন্দলালরূপী অমরেন্দ্রনাথকে দেখিলে দর্শকের মনে স্বতঃই উদিত হইত যে, বঙ্কিমচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রণয়ন করিয়াছেন। এত অনিন্দ্যসুন্দর, এত মনোহর, এত মর্ম্মস্পর্শী হইত অমরেন্দ্রনাথের গোবিন্দলাল! আমাদের ভাষায় এমন অধিকার নাই, রচনায় এমন ঝঙ্কার নাই যে, অমরেন্দ্রনাথের সেই চিত্ত-বিভ্রমকারী অপূর্ব্ব অভিনয় বর্ণন করি। কালির আঁচড়ে ও কণ্ঠস্বরকে রূপ দেওয়া যায় না, [illegible] [illegible] ও মুখভঙ্গীকে আঁকিয়া দেখান যায় না। আমরা কেমন করিয়া বুঝাইব, গোবিন্দলাল কিরূপে ভ্রমরের সহিত প্রেমালাপ করিতেন, কিরূপে রোহিণীকে জল হইতে উদ্ধার করিতেন, কিরূপে তাহাকে হত্যা করিতেন, কিরূপে আত্মহত্যার দ্বারা মর্ম্মদাহের জ্বালা নিবাইতেন! তবে এইটুকু দেখিয়াছি যে, অমরেন্দ্রনাথ গোবিন্দলালরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবামাত্রই মনে হইত যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সারা দর্শকমণ্ডলীর উপর দিয়া খেলিয়া চলিয়া গেল; গোবিন্দলালের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণের হৃদয়ের স্পন্দনও দ্রুততালে উঠিতে বা নামিতে লাগিল; তাঁহার প্রত্যেক কথা শুনিবার জন্য সকলে আকুল আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে সেই হৃদয়বিদারক উক্তি—"আমার [illegible] ভ্রমর—আমি প্রবাস থেকে আসবার অপেক্ষায়

জানালায় বসে থাকতো। তেমন সময় সে বাপের বাড়ী গিয়ে বসে থাকত না ;"—শ্রবণ করিয়া সকলে ভ্রমরের দুঃখে অভিভূত হইয়া গেলেন। গোবিন্দলাল যখন—"পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলুম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলুম। তুমি কি রোহিণি, তোমার জন্যে ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, সেই ভ্রমরকে ত্যাগ করলুম! তুমি কি রোহিণি, তোমার মুখ চেয়ে, সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম! সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম! সেই ভালবাসার এই প্রতিদান! সেই আত্মত্যাগের এই বিনিময়! সর্ব্বনাশি! পিশাচি! রাক্ষসি! তোর তো কিছুরই অভাব ছিল না। রাজরাণীও এত আদরে থাকে না। তবে কেন তুই এমন কাজ করলি? ছিঃ ছিঃ অতি ঘৃণিত কাজ! নরকেও তোর"—বলিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন; আবার—"আশ্চর্য্য, রোহিণি, এখনও তোমার বাঁচবার সাধ হয়? না—না, তা হবে না। তোমার বাঁচা হবে না; তুমি না মরলে জগতে আমার মত অনেকে প্রতারিত হবে! তোমার মরণই মঙ্গল"—বলিয়া রোহিণীকে হত্যা করিয়া তাহাকে চিরজীবনের মত বিদায় দিলেন, তখন নারীহত্যাকারী বলিয়া গোবিন্দলালের উপর কাহারও ঘৃণার উদ্রেক হইল না, বরঞ্চ রোহিণীর রূপের ফাঁদে পড়িয়া আদর্শ-চরিত্র গোবিন্দলালের এই শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া সকলের হৃদয় তাঁহারই প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গেল। ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলালের শুধু "আহা-হা!" শুনিয়া সকলের মনে হইল, শুধু গোবিন্দলালের ভ্রমর মরিল না, নিজেদেরও বুঝি কোথায় কি একটা হারাইয়া গেল; কিন্তু অন্তর বিকল, ইন্দ্রিয় অচল, কি হারাইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার বা খুঁজিয়া দেখিবার শক্তিটুকুও কাহারও নাই!

গোবিন্দলাল ত' কাঁদিলেন না, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া মন এমন করে কেন? হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অশ্রু, বুক ঠেলিয়া, চক্ষু ফুঁড়িয়া বাহিরে আসে কেন? শুধু "আহ-হা!" আর কিছু নয়, কিন্তু সামান্য এই কয়টা অক্ষরের ভিতর এত শোকের প্রবাহ কোথায় লুক্কায়িত ছিল! মৃদু নিরস কণ্ঠস্বর, অথচ অন্তর্দাহের মর্ম্মবেদনায় উচ্ছ্বসিত, অনুতাপের দাবাগ্নিতে ভস্মীভূত হৃদয়ের শুষ্ক অভিব্যক্তি শুধু "আহ-হা!" শেষ দৃশ্যে সেই গোবিন্দলাল—"চলো—চলো—সেই মহাপথে চলো, সেই চিরশান্তির পথে চলো, সেই নির্ব্বাণ মুক্তির পথে চলো। অনেক খেলা ত' খেললে, অনেক জিনিস ত' দেখলে, অনেক আঘাত ত' বুকে নিলে! এখনও কি তৃপ্তি হয়নি?......কে ও ভ্রমর! ঐ যে রোহিণী! ভ্রমর—রোহিণী, রোহিণী ভ্রমর!......আমি যাই! ভ্রমর! ভ্রমর! আমার সাধের ভ্রমর!" বলিতে বলিতে যখন জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন, তখন গোবিন্দলালের "আহ-হা!" উক্তি দর্শকের মুখ দিয়া নিঃশ্বসিত হইল, সকলে ভাবিল,—"বেচারা মরিয়া বাঁচিল।"

রজনীর পর রজনী, একই দর্শক একই নাটকের একই অভিনয় দেখিয়াছে, অথচ প্রতি রজনীতে একই ভাবসাগরের পূর্ণাবর্ত্তে নিমজ্জমান হইয়া, সেই "আহ-হা", বলিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। জানি না, আমাদের দেশে গুণের সমাদর কতখানি! কিন্তু তাহা যদি থাকে, তাহা হইলে সকলেই মানিবেন যে, এক গোবিন্দলালের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নটদিগের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।

ভ্রমরের অভিনয়-দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন অমরেন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লেখেন, আমরা এখানে সেখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ভাই অমর !

পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" পরিবর্ত্তিত করিয়া গত শনিবার 'ভ্রমর' নাম দিয়া—যে অভিনয় করিয়াছ, তাহা দেখিয়া যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

মনে পড়ে কি সেইদিন—যে দিন প্রথম তোমাকে রঙ্গমঞ্চে—"সিরাজে"র অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখি, সেইদিন তোমাকে বলিয়াছিলাম, যে নাট্যজগতে একদিন তোমার বহু উচ্চে স্থান হইবে, তুমি সমগ্র বঙ্গবাসীর আদরের সামগ্রী হইবে। তখন আমার কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলে, কিন্তু এখন আমার সে সময়ের গণনা সত্য হইয়াছে কি ?

"A nation is known by its Theatre"—কথাটা বড়ই ঠিক। আমাদের যেমন দেশ, থিয়েটারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাও তদ্রূপ ! তোমার অবিদিত নাই,—অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁহারা বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান রাখেন, তাঁহারা থিয়েটারের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন ! কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাঁহারা যত বড় লোকই হউন, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি সুখী হও, তুমি জয়ী হও, রঙ্গভূমির প্রতি ভালবাসা তোমার অক্ষয়—অমর—অজর হউক !—

তোমার

নবীন।

'ভ্রমর' নাটকে বারুণী পুষ্করিণীতে ঝম্পোদ্যত গোবিন্দলালের ভূমিকায়
অমরেন্দ্রনাথ ।

বস্তুতঃ 'ভ্রমর'কে বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের এক যুগযুগান্তকারী নাটক বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। কেনন, সর্ব্ববিষয়ে 'ভ্রমর' বঙ্গরঙ্গালয়ের এক নবযুগ আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল। দৃশ্যপটে—বারুণী পুষ্করিণীর দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে যে বাস্তবিকতাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহাতে রঙ্গভূমি সাজসজ্জার দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে বদলাইয়া যায়। গোবিন্দলাল ঘোড়ায় চড়িয়া ষ্টেজে অবতীর্ণ হইতেন, তাই হ্যাণ্ডবিলে ও বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইত—'অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল'; সেই হইতে ঐ কিংবদন্তী বাঙ্গলা ভাষায় প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘোড়ায় চড় কাহাকেও কোন ছবি দেখিলে এখনও আমরা বলিয়া থাকি—অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল। বিক্রয়ের দিক দিয়া, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ভ্রমরের মত সাফল্যপূর্ণ নাটক অতি বিরল। ক্লাসিকে ইহার বিক্রয়ের কথা এখনও অনেকের হয়ত স্মরণ আছে। "থিয়েটারে বাদুড় ঝোলা" বাক্যটির উদ্ভব হয়, এই ভ্রমরের বিক্রয়াধিক্য দর্শনে। কি যে ভিড়, সাধারণ পাঠক তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি। ফুটবল খেলার মাঠে, বর্ত্তমান "Queue system" প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেকার দিনের কথা এখনও বোধ হয় অনেক দর্শকের মনে আছে। কি যে টিকিট কিনিবার আগ্রহ ও তজ্জন্য কি যে ভাড়াভাড়ি, চড়াচড়ি! সে ছবি স্মরণে আনিলে, ক্লাসিকে ভ্রমরের জনপ্রিয়তা অনেকে খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সময় নাই—অসময় নাই,—যেদিন যখনই ভ্রমর দেওয়া হইয়াছে, 'ফুল হাউস' বিক্রী। তখনকার দিনে শনি ও বুধবার অভিনয় হইত রাত্রি ৯টায় ও রবিবার ৭॥০টায়। যে ম্যাটিনী অভিনয় আজকালকার দিনে থিয়েটারের অপরিহার্য্য অঙ্গ, সেই ম্যাটিনী অভিনয় অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃকই ক্লাসিকে সর্ব্বপ্রথম

প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে অপরাহ্ন দুইটার সময়, নাট্যজগতের প্রথম ম্যাটিনীর উদ্বোধন হয়—এই যুগান্তকারী নাটক 'ভ্রমর' লইয়া। কেবল ২টায় নহে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক যে মধ্যাহ্ন বারটার সময়ে অভিনয় প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়, সেদিনও অভিনীত হয়—এই সর্ব্বজনপ্রিয় 'ভ্রমর'। কি দুপুর ১২টা, কি বেলা ২টা, কি বৈকাল ৪টা, কি সন্ধ্যা ৭৷৷টা, কি রাত্রি ৯টা,—যে সময়েই ভ্রমরের অভিনয় হইয়াছে, কখনও দর্শকের অভাব হয় নাই। তখন ইলেক্‌ট্রীক ছিল না, প্রেক্ষাগৃহে পাখা নাই,* গ্যালারী ও পিটে বসিবার জন্য বেঞ্চ, কিন্তু কোনদিকে দর্শকের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই—অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার জন্য সকলে পাগল। কোনপ্রকারে একখানা টিকিট কিনিয়া একবার ভিতরে ঢুকিতে পারিলেই হইল! রঙ্গগৃহে আর তিলধারণের স্থান নাই, কিন্তু তবুও বাহিরে দর্শকেরা একখানা টিকিটের জন্য চিৎকার করিয়া বলিতেছেন যে, "আমরা বসিবার জায়গা চাহি না। টিকিট পাইলে আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইব।" বস্তুতঃ রাত্রির পর রাত্রি, কত দর্শক যে শারীরিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, গ্রীষ্মের উত্তাপ উপেক্ষা করিয়া, কত লোক যে দাঁড়াইয়া, আবার কেহ বা জানালার গরাদে ধরিয়া উঁচু হইয়া, কেহ বা জানালার কুলুঙ্গির উপর বসিয়া, সে সময় (বা তাহার পরে) ক্লাসিকে অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যথার্থই তখন অমরেন্দ্রনাথের নামে সারা বাংলা দেশ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল।

---

* এক পিঠে অমরেন্দ্রনাথের ছবি ও অপর পিঠে প্রোগ্রাম মুদ্রিত হইয়া, পিচবোর্ডের পাখা দর্শকগণের মধ্যে বিতরিত হইত।

আর একটা কথা বলিয়া আমরা ভ্রমরের প্রসঙ্গ শেষ করিব। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পরে, দানিবাবু মনোমোহন থিয়েটারে ভ্রমরের পুনরভিনয় করিয়া, স্বয়ং গোবিন্দলালের অংশ লন। কিন্তু তখন তিনি নাট্যজগতের একছত্র সম্রাট হইলেও, এ ভূমিকায় দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিয়াছিলেন, "অমরের যে অপূর্ব ছবি এখনও লোকের চোখে লাগিয়া আছে, তাহা মুছাইবার সাধ্য আমার নাই। এ সব ভূমিকায় অমর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"*

ভ্রমর অভিনয়ের পর, অন্য সব থিয়েটার 'কানা' হইয়া গেল। জাতিধর্মনির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণ কর্তৃক "বিডন ষ্ট্রীট কেল্লা" নামে অভিহিত হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গরাজ্যে একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। ইহার পর একমাত্র, ১৮ই নভেম্বর তারিখে গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ অভিনয় ভিন্ন, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিকে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। গিরিশচন্দ্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও, অমরেন্দ্রনাথই ম্যাকবেথের ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমাভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি এই :—

ডানকান, ম্যাকডাফ ও ১ম দূত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ম্যালকম—প্রমদাসুন্দরী, ডনালবেন—রাণীসুন্দরী, ম্যাকবেথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যাঙ্কো, সিটন ও রক্তাক্ত সৈনিক—নীলমণি ঘোষ, লেনক্স—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী, রস—চণ্ডীচরণ দে, মন্টীথ ও

* দানিবাবুর জীবনীতেও এ কথার উল্লেখ আছে। জীবনীকার লিখিয়াছেন,—"(অঘোর ও গোবিন্দলাল) এই দুইটী ভূমিকায় অভিনয় নিন্দনীয় না হইলেও দানিবাবু অমরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ যে হরিরাজ, গোবিন্দলাল, ভীম এবং অঘোরের ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, দানিবাবু নিজেও তাহা স্বীকার করিতেন।"

যুবা সিউয়ার্ড—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অ্যাঙ্গাস ও ২য় দূত—অহীন্দ্রনাথ দে, কেটনাস—ভোলাচাঁদ ঘোষ, বৃদ্ধ সিউয়ার্ড—মহেন্দ্রলাল বসু, ফ্লিয়েন্স—টুকুমণি, দ্বারপাল ও প্রথম ডাকিনী—জীবনকৃষ্ণ সেন, বৃদ্ধ, ডাক্তার, ১ম হত্যাকারী ও ২য় ডাকিনী—নটবর চৌধুরী, হিকেট—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ২য় হত্যাকারী ও ৩য় ডাকিনী—শ্রীশচন্দ্র রায়, লেডী ম্যাকবেথ—কুসুমকুমারী (পরে তিনকড়ি), লেডী ম্যাকডাফ—হরিদাসী (গুলফম), পরিচারিকা—গোলাপসুন্দরী।

মাত্র তিনরাত্রি অভিনয়ের পরই ম্যাকবেথ বন্ধ হইয়া যায়। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ না হইলেও, অন্য এক হিসাবে ম্যাকবেথ অভিনয়ের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। আমরা পরে যথাসময়ে সে কথার আলোচনা করিব।

এ সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারের জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের 'নবযুগ' পত্রিকা হইতে একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। নবযুগ বলিতেছেন :—

"অমরেন্দ্রনাথের হাতে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চ এত অল্পকাল মধ্যেই যে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিবে,—ইহার অভিনীত বিষয়গুলি সাধারণের এতদূর চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। উত্থানোন্মুখ যুবক অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় চাতুর্য্যে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গত সোমবার দিন, এই রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথের 'ভ্রমর', তৎপরে মিস্ ডগমারের অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিপরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা স্থানাভাববশতঃ সেদিনকার অভিনয় দেখিতে পারি নাই। ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে 'ভ্রমর' অনেকবারই অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু সেদিনকার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, এখনও সর্ব্বসাধারণের ভ্রমরাভিনয় দেখিবার তৃষ্ণা মিটে নাই। আমরা এতদিন লোকের মুখে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় কৌশলের প্রশংসাবাদ শুনিয়া আসিতেছিলাম।

কিন্তু বড়দিন উপলক্ষে, আলিবাবা এবং কাজের খতমের অভিনয়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, স্থানাভাববশতঃ এবারে তৎসম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। বারান্তরে বিস্তৃত সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল; আশা করি এজন্য অমরবাবু ক্ষমা করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ক্লাসিকে আলিবাবার অভিনয়ে নূতনত্ব ঘুচিল না, ইহাও অমরেন্দ্রনাথের অতুলনীয় অভিনয় কুশলতার পরিচায়ক। আমরা অমরেন্দ্রবাবুর সৌজন্যে নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:—

'বিডন ষ্ট্রীট কেশরী' অমরেন্দ্রনাথ

(১৯০০)

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সোমবার, অমরেন্দ্রনাথের নূতন সামাজিক নক্সা 'মজা' প্রথম অভিনীত হয়। মজায় একটী ছাত্রদের মেসের দৃশ্য আছে; সেই দৃশ্যটীর জন্য তখনকার ছাত্রমহলে রীতিমত একটা আন্দোলন পড়িয়া যায়। সেই আন্দোলনের ঢেউ বেশ কিছুদূর গড়াইয়াছিল, কেন না, সংবাদপত্রের স্তম্ভে পর্য্যন্ত ঐ দৃশ্যের প্রতিবাদ-কল্পে খানকয়েক প্রেরিত পত্র ছাপা হয়। অমরেন্দ্রনাথ সে সকল পত্রের যথোচিত উত্তর দিয়া, ক্ষুব্ধ ছাত্র-সম্প্রদায়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। এতৎসত্ত্বেও (অথবা এই নিমিত্তই) 'মজা' খুব জমিয়া যায় ও দর্শকের বিশেষ প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হয়। আমাদের মনে হয়, অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত নক্সাগুলির মধ্যে 'মজা' অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। উত্তর-কালে 'মজা' ষ্টার, মিনার্ভা, গ্র্যাণ্ড প্রভৃতি নানা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে মজার প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম দিলাম :—

মিঃ ধুরন্ধর পাকড়াশী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, হরিহর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নদেরচাঁদ—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, নিতাই—নটবর চৌধুরী, কানাই—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, গণক—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, মালতী—প্রকাশমণি, ফুলকুমারী—কুসুমকুমারী, মোহিনী—প্রমদাসুন্দরী, গণক-পত্নী—বিনোদিনী (হাঁদি)।

মজার সমালোচনা-কল্পে, 'নবযুগ' (৪ঠা জানুয়ারী, ১৯০০) লেখেন :—
"ক্লাসিকে 'মজা' সত্য সত্যই মজা! যে মজার মজায় বর্ত্তমান সমাজটী মজাদার,—যে মজার মজায় মজিয়া সংসার মজিয়াছে ও মজিতেছে,—সেই মজার মজায় মজিয়া যে মজাটুকু পাইয়াছেন, আমাদের অমরেন্দ্রনাথ সেই মজা হইতে মজা তুলিয়া, একটী খাঁটী 'মজা' গড়িয়া, গত সোমবার সহস্রাধিক দর্শককে মজাইয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ 'মজা'য় যে মজা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের আর একটী পুরাতন মজার কথা মনে পড়িয়াছে—"যে বুঝেছে সে মজেছে, যে না বুঝেছে সে আছে ভাল, আধবুঝনির প্রাণটা গেল।" মজার মজায় যদি সকলে মজিতে জানিত, তবে কি আমাদের সংসার এত মজিত অথবা আমরাই মজিতাম? অমরেন্দ্রনাথের হাতে ক্লাসিকে নিত্য নূতন মজায় মজিয়া, সাধারণে আর কিছুতে মজিতেছে না, ইহাও এক মজা! সেই মজার উপর বর্ত্তমান সমাজের সাড়ে ষোল আনা মজা কুড়াইয়া একটী নিরেট নিঁখুৎ 'মজা'য় দর্শক মজান, যে সে মজার কথা কি? মজার একটু নমুনা দেখুন।—

"সাঁচ্চা বুলি, আমরা বলি, ভয় করি না তাই।
বল্‌বো ছুটো, নয়কো ঝুটো, রাগ ক'র না ভাই॥
কুলের বধূ ঘরের কোণে,
ব'সে থাকে ঘোমটা টেনে,
ছাড়িয়ে শাড়ী, চড়াও গাড়ী, লজ্জা সরম নাই।
(ছিঃ ছিঃ) পার্কে যাওয়া, খাওয়াও হাওয়া, বলবো কি আর ফাই ফাই॥
কি এক বিষম ঢেউ উঠেছে,
নাকের উপর কাঁচ বসেছে,
মুখে বলি "রিফর্‌মেশন", এ এক ফ্যাসান দেখতে পাই।
(আবার) কলম গুঁজে, চক্ষু বুজে, এডিটারী ধুয়ো ছাই॥

বুক ফুলিয়ে, চেন্ ঝুলিয়ে, হুম্‌রো চুম্‌রো বাবু,
কমিশনার পদটী নিয়ে শেষে হলেন কাবু,
(আবার) কংগ্রেস নিয়ে, দেশ মজিয়ে, নিজের মাথা নিজে খাই ॥
কাজ কি কথা, মাথা বাথা, এখন তবে 'গুড্‌বাই' ॥

পাঠক, 'মজা'র যোল আনা মজা এই কয় পংক্তিতেই আছে। কিন্তু এ 'মজা' চক্ষে না দেখিলে, মজা পাইবেন কি ?"

এই সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৭ই জানুয়ারী, ১৯০০) লেখেন :—

"In connection with the representation of "Maja" on the boards of the Classic theatre, Babu Amarendra Nath Dutt is to be congratulated no less as author than as manager and player. For a production intended for the "season" the highest praise that can be accorded to the piece is that it has a plot,—a plot, which admits of the introduction of some new characters on the stage, such as kitchen-boys, tailor-women and a fortune teller and his wife, and through these, of some novel and characteristic dances. Two songs are sung in English, both being full of allusions to the war in South Africa, and of sentiments of loyalty to the British Power. Of the two, the latter song, which is sung by the representatives of Boer slave-girls, is composed in a style, which is generally associated with the coloured races of America. The verbal portion of the play is conducted with as much humour and "go", as the songs and dances are executed with spirit and dash. The "Mess" scene, short as it is,

presents a harrowing picture of student life in Calcutta, and for the sake of Mofussil boys and their unsuspecting guardians, one would fain hope the picture were untrue, or at least over coloured. The duet, sung and danced to by the fortune teller and his wife, makes the event of the evening and fairly brings down the house. Of the local scenes exhibited, the view of the front of the Classic Theatre and that of a portion of the Eden Gardens merit particular mention. The last scene presenting a number of girls singing, while swinging, looks like some rich oriental dream, steeped in colours and crowded with exquisite figures of enchantment."

কলিকাতার তদানীন্তন যাবতীয় সংবাদপত্রে, মজার সুখ্যাতিপূর্ণ দীর্ঘ দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বাহুল্য ও পুনরুক্তি ভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

অতঃপর ক্লাসিকে 'পাণ্ডব-গৌরবে'র অভিনয় হয়। ক্লাসিকে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটকের মধ্যে পাণ্ডব-গৌরবই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাধিক দর্শকাকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার রচনা ও অভিনয় বিষয়ে বেশ একটু ইতিহাস আছে। আমরা সে কথা যতদূর জানি, তাহা বলিতেছি।

গিরিশচন্দ্র যখন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষে, দ্বিতীয়বার ক্লাসিকে আসেন, তখন তাঁহার সহিত অমরেন্দ্রনাথের কি চুক্তি হয়, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। কিন্তু তাহার পর প্রায় নয় মাস কাল গত হইল, অথচ গিরিশচন্দ্র এক 'দেলদার' ছাড়া ক্লাসিকে অভিনয়ার্থ

অন্য কোন গ্রন্থ লিখিলেন না। অমরেন্দ্রনাথ অবশ্য সেদিকে গ্রাহ্য না করিয়া, নিজেই বই লিখিয়া থিয়েটার চালাইতেছিলেন। কিন্তু ভ্রমরের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, একদিন গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথকে বলেন,—"আমার জন্যই তোমার থিয়েটারের এত সুনাম ও বিক্রয়। সুতরাং তোমার উচিত আমাকে আমার মাহিয়ানার বদলে থিয়েটারের একটা বখরা দেওয়া।"

অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলেন,—"আপনি নাট্যজগতের পিতা, সুতরাং আমার থিয়েটারের গৌরবস্বরূপ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার থিয়েটারের আজ যে এত সুনাম ও প্রতিপত্তি, বিচার করিয়া দেখুন, সত্যই ইহার মূলে আপনার কৃতিত্ব কতখানি! থিয়েটার চলিতেছে বেশীর ভাগ আমার নিজের বইএ, ও আমার নিজের অভিনয়ের জোরে। আপনার একখানি ছাড়া দুইখানি নূতন বহি ক্লাসিকে অভিনীত হয় নাই। সুতরাং ক্লাসিকের এই প্রতিষ্ঠার একটুকু অংশও আপনি সত্য সত্যই দাবী করিতে পারেন কি? সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়াও আপনি যদি অন্যায়রূপে আজ বখরা চাহিয়া বসেন, তাহা হইলে আমি আপনার সে দাবী মিটাই কি করিয়া? ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে অপারগ।"

গিরিশচন্দ্র তাহাতে বলেন,—"কিন্তু আমাকে একটা বখরা দিলে তোমার কত লাভ, তাহা বুঝিয়া দেখ। আমি যদি অন্য কোন থিয়েটারে যাইবার চেষ্টা না করিয়া, স্থায়ীভাবে তোমার থিয়েটারে থাকি, তাহা হইলে সেটা ক্লাসিকের কত গৌরবের কথা হইবে, ভাবিয়া দেখ। বখরা পাইলে ত' আর আমি কোথাও যাইবার কখনও কল্পনাও করিব না।"

স্বাধীনচেতা অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে উত্তর দেন,—"দেখুন, আমার কাছে স্পষ্ট কথা। আপনার এ উক্তির উপর নির্ভর করিতে আমি অক্ষম। বখরা দি বা না দি, যদি আমার সর্ব্বনাশের সুবিধা বোঝেন, তাহা হইলে আপনি যে দলবল সহ আমার থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দ্বিধা বোধ করিবেন না, এ কথা আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি। সুতরাং আপনাকে বখরা দিতে পারিব না।"

গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথের উত্তরে বিরক্ত হইয়া বাড়ী চলিয়া যান ও ১০ই ডিসেম্বরে দক্ষযজ্ঞে দক্ষের ভূমিকা (অমরেন্দ্রনাথ মহাদেব) অভিনয় করার পর হইতে থিয়েটারে আসা বন্ধ করিয়া দেন। এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, মিনার্ভা থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকার গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিক হইতে ভাঙ্গাইয়া নিজের থিয়েটারে আনিতে চেষ্টা করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্ট কোন জবাব না দিলেও, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকেন। কানাঘুষায় কথাটা ক্রমশঃ অমরেন্দ্রনাথের কানে গিয়া পঁহুছায়। তিনি ইহা শুনিয়া, একদিন গিরিশচন্দ্রের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—"শুনিতেছি, আপনি নাকি আবার ক্লাসিক ছাড়িয়া মিনার্ভায় যোগ দিবার মতলব করিতেছেন। কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অতীব দুঃখের বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার থিয়েটারে আপনি যথেষ্ট সম্মানের সহিত আছেন। নচেৎ আপনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যত্র কোথাও সেরূপ করিলে, সেখানে টেঁকিতে পারিতেন কি?"

গিরিশচন্দ্র নীরব রহিলেন দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—"আপনার সহিত আমার কি কথা ছিল, বলুন দেখি? বৎসরে চারখানা বই—তাহার মধ্যে দুইখানা নাটক—দেওয়া ত' দূরের কথা, আপনি

প্রায় বছরখানেক হইল ক্লাসিকে আসিয়াছেন, অথচ একমাত্র দেলদার ছাড়া আর কোন বই দেন নাই। তা সে যাক্, আমি জানি, আপনার দ্বারা আর বই-টই লেখা হইবে না। সে আমি তখন আপনার বিনা সাহায্যেও কোনরূপে চালাইয়া লইব। আমি মাস মাস আপনার বাড়ীতে আপনার মাহিনা ৩০০৲ পঁহুছাইয়া দিয়া যাইব; তবে আমার অনুরোধ,—এই বৃদ্ধ বয়সে অনর্থক অন্যত্র কোথাও গিয়া আর ধাষ্টামোর পরিচয় দিবেন না।"

অমরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া গিরিশচন্দ্র একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথ ভিন্ন নাট্যজগতে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির এমন সাহস ছিল না যে, গিরিশচন্দ্রকে এরূপ কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসে। অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, গিরিশচন্দ্র পাশের ঘর হইতে তাঁহার নিত্যসহচর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"অবিনাশ, বাবু (থিয়েটারের সকলেই অমরেন্দ্রনাথকে এই নামে ডাকিতেন) যা বলিয়া গেল, শুনিলে ত'? সত্যই কি দেলদার ছাড়া বছরখানেকের মধ্যে তাহাকে অন্য কোন বই দেওয়া হয় নাই?"

অবিনাশবাবু যখন জানাইলেন যে, যথার্থই দশ মাসের মধ্যে গিরিশচন্দ্র একমাত্র দেলদারই রচনা করিয়াছেন, তখন তিনি বলিলেন,—"বেশ, কালীকলম লইয়া বস। আজই বই লেখা সুরু করিব।" সেইদিন হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে পাঁচটী অঙ্ক লিখিয়া, নাটক সমাপ্ত করিয়া, গিরিশচন্দ্র ষষ্ঠ দিনে অমরেন্দ্রনাথের নিকট পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিলেন। এত ব্যাপারের পর যে নাটক রচিত হইল, তাহাই 'পাণ্ডব-গৌরব'।

যথাসময়ে পাণ্ডব-গৌরব পড়া হইল। গিরিশচন্দ্র আবার আসিয়া মহলায় বসিলেন। তিনি বলিলেন যে,—"আমি এইরূপ ভূমিকা

নির্ব্বাচন করিয়াছি—মহেন্দ্র ভীষ্ম, অমর শ্রীকৃষ্ণ, দানি ভীম, তিনকড়ি সুভদ্রা, কুসুম উর্ব্বশী আর আমি কঞ্চুকী।" অমরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"সে কিরূপে হইতে পারে? নায়কের অংশে অভিনয় করিতে আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে? দানি কেন—আমিই ভীমের ভূমিকা লইব।"

গিরিশচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা? তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি শ্রীকৃষ্ণের পার্ট লিখিয়াছি, সুতরাং তুমি ভিন্ন সে অংশ কে অভিনয় করিতে পারিবে? তোমার শ্রীকৃষ্ণ ও দানির ভীম সাজা উচিত।"

অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,—"বেশ, আপনারা সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। দানিও পার্ট বলুক, আমিও পার্ট বলি,—যে ভাল অভিনয় করিবে, তাহাকেই ভীমের পার্ট দেওয়া হইবে।"

তদনুযায়ী ব্যবস্থাই হইল। মহেন্দ্রবাবু, অঘোরবাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, হরিভূষণবাবু প্রভৃতি ক্লাসিকের সমস্ত রথী মহারথীগণ দ্বারা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্বীকৃত হইল যে, অমরেন্দ্রনাথই এ ভূমিকায় শ্রেষ্ঠতর অভিনয় করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও সে কথা মানিলেন, কিন্তু বলিলেন,—"হ্যাঁ, তুমিই ভাল পার্ট বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি না করিলে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা কে অভিনয় করিতে পারিবে? আমি তোমার জন্যই ঐ পার্ট এত বড় করিয়া লিখিয়াছি। সেটী যে শেষে মাঠে মারা যাইবে!"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কেন, দানিই সে পার্ট করিতে পারে। তবে সে যদি তাহাতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে আমি অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই ঐ ভূমিকা অভিনয় করাইব। সেজন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না।"

দানিবাবু সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; তিনি অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবানুযায়ী ভূমিকা গ্রহণে সম্মত ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার মতানুযায়ী ভূমিকা বণ্টন হইল না বলিয়া মনে মনে ভীষণ চটিয়া গেলেন। তিনি দানিবাবুকে ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিলেন ও তদনুযায়ী দানিবাবু ক্লাসিক ত্যাগ করিয়া ষ্টারে চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ প্রমদাসুন্দরীকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করাইলেন।

এখানে তৎকালীন নাট্যজগতে দানিবাবুর কিরূপ স্থান ছিল, তাহার আলোচনা করা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উত্তর কালে তিনি অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার দ্বারা প্রভূত যশ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য; পরে সিরাজদ্দৌলা, ওসমান, চাণক্য, ঔরংজেব, ভীষ্ম, খিজির খাঁর অংশে তিনি দর্শক-সমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—অর্থাৎ ১৯০০ সালে, তিনি গুরুগম্ভীর ভূমিকায় একজন নিম্ন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ভিন্ন অন্য কোনরূপে গণ্য হইতেন না। বরঞ্চ হাস্যরসবিশিষ্ট ভূমিকাতেই দানিবাবুর প্রতিভা বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইত। তিনি ষ্টারে কিরূপ অভিনয় করিতেছেন, এই কথা একদিন গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল বসুকে জিজ্ঞাসা করাতে, অমৃতবাবু বলিয়াছিলেন যে,—"কমিক পার্টেই দানির বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। আমার বিশ্বাস, কালে ও অর্দ্ধেন্দুর সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া ওর চেহারা ও কথার ভঙ্গী কমিক পার্টেরই বেশী উপযোগী।" গিরিশচন্দ্র মুখে সে কথা স্বীকার করিলেও, মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলেন,—"সে কথা সত্য, কিন্তু আমার ছেলে একজন কমিক অ্যাক্টর হইবে! তাহা কখনও হইতে পারে না।"

তাহার পর হইতে গিরিশচন্দ্র নিজে দানিবাবুর শিক্ষার ভার গ্রহণ

করেন ও গুরুগম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহাকে তৈয়ারী করিতে থাকেন। কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দানিবাবু একমাত্র প্রবীর ভিন্ন অন্য কোন নায়কের ভূমিকায় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, দানিবাবুকে পাণ্ডব-গৌরবে ভীমের ভূমিকা দিয়া, তাঁহাকে সে অংশে যথোপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা তৈয়ারী করিয়া, নায়কের অংশে তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের আপত্তিতে তাঁহার সে ইচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি দানিবাবুকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া, নিজেও ক্লাসিক ছাড়িবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে, গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় পাণ্ডব-গৌরবের পুনরভিনয় করেন। তখন সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়া নায়কের অংশে দানিবাবুর প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। পিতার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এবার তিনি ভীমের অংশে অমরেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন। পরিণাম কি হইল, তাহা সমস্ত নাট্যামোদীরই অবগত। ভীমের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় সম্বন্ধে দানিবাবুর নিজের মত আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এমন কি—যে গিরিশচন্দ্র এই ভীমের পার্ট পুত্রকে না দেওয়াতে রাগ করিয়া ক্লাসিক ছাড়িয়া দেন,—সেই গিরিশচন্দ্রই একদিন দানিবাবুকে এই অংশে অভিনয় করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হ্যাঁরে দানি, কাল তুই কি অ্যাক্টো করছিলি—ভীমের না সিরাজদ্দৌলার?" দানিবাবু অপ্রতিভভাবে উত্তর দেন,—"সব পার্টই কি আর একজনের হয়!"*

---

* দানিবাবুর জীবনীতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে।

এ বিষয়ে অধিক বিস্তার করা বাহুল্য মাত্র। পাঠকগণ বিচার করিবেন, অমরেন্দ্রনাথ ভীমের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক নিজের জিদ বজায় রাখিয়া, অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন কিনা!

যাহা হউক, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে, পাণ্ডব-গৌরবের প্রথম অভিনয় হয়। সে রজনীতে যে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রধান প্রধান ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

দণ্ডী—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কঞ্চুকী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভীষ্ম—মহেন্দ্রলাল বসু, (পরে দানিবাবু), ভীম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাদেব ও দুর্ব্বাসা—চণ্ডীচরণ দে, ইন্দ্র, অনিরুদ্ধ, বিদুর ও সহদেব—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, কার্ত্তিক ও দুর্য্যোধন—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, নারদ, শকুনি ও দ্বারকার দূত—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, বলরাম—অহীন্দ্রনাথ দে, শ্রীকৃষ্ণ—প্রমদাসুন্দরী, সাত্যকি ও কর্ণ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, যুধিষ্ঠির—নটবর চৌধুরী, ঘেসেড়া—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, কুন্তী—হরিদাসী (গুলফম), রুক্মিণী—ভূষণকুমারী, সুভদ্রা—তিনকড়ি দাসী, দ্রৌপদী—গোলাপসুন্দরী, উর্ব্বশী—কুসুমকুমারী, উত্তরা—টুকুমণি, জয়া—রাণীসুন্দরী, ঘেসেড়ানী—লক্ষ্মীমণি।

পাণ্ডব-গৌরবের অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটারের সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নাটকে এত ভূমিকা সত্ত্বেও, বাজীমাৎ করেন—ভীম ও সুভদ্রা। শেষোক্ত ভূমিকার অভিনয় তিনকড়ির সাফল্যপূর্ণ অভিনেত্রী জীবনের একটী গৌরবস্তম্ভস্বরূপ বলিলেও বাড়াইয়া বলা হয় না। আর উদার, আশ্রিতবৎসল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক ভীমের ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১২ই এপ্রিল, ১৯০০) লেখেন :—

"The Bhima of the play is utterly unlike the Bhima of tradition. He is not a figure of Brobdignarian proportions,

and does not make a reckless expenditure of lung power. Calm, yet firm, devoted to Krishna, and yet dutiful towards Dandi, who sought his protection, stands Bhima, the centre of interest and the admiration of friend and foe alike. The role is in the hands of the talented manger, who is gifted with what Massinger ascribes to the Roman actor Paris, "a tuneable tongue and neat delivery." The representation of the character is in the forefront of Babu A. N. Dutt's many admirable impersonations."

বঙ্গবাসী বলেন, "অমরেন্দ্রনাথ ভীমের অভিনয়ে ধন্য ধন্য হইয়াছেন।"

দৈনিক সমাচার (২২শে মার্চ্চ, ১৯০০ খৃঃ) লিখিয়াছিলেন ঃ— "ক্লাসিকের অমরেন্দ্রের আর নূতন পরিচয় কি দিব? তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপন প্রতিভাবলে অভিনয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। নাট্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার নামে এখন যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়েন। 'হরিরাজে'র অভিনয়ে আমরা একদিন যে প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়াছিলাম, 'পাণ্ডব-গৌরবের' ভীমের অংশ অভিনয়ে সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখিলাম।"

বঙ্গভূমি (৯ই ফাল্গুন, ১৩০৬) বলেন,—"অভিনেতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী লইয়াছিলেন ভীম। ভীমের অভিনয় অমরেন্দ্র বাবুর উপযুক্তই হইয়াছে।"

বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথের ভীমের অভিনয় অতুলনীয়। ভীমের কথা মনে হইলেই আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—বিশাল দেহ, স্থূল বপু, দীর্ঘাকার এক পুরুষ। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথকে দেখিলে

আমাদের এ সমস্ত ধারণা পাল্‌টাইয়া যাইত। প্রথম অঙ্কে তাঁহার আবির্ভাব নাই। দ্বিতীয় অঙ্কের পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভীমের আবির্ভাবে দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি মূর্চ্ছনায় তাঁহাদের মধ্য দিয়া একটা পুলক শিহরণ বহিয়া যাইত। কি দ্রৌপদীকে আশ্বাসদান কালে—

নিশ্চয় জিনিব রণ ভেব না ভামিনী।

কি সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দিবার সময়—

জান না কি ফাল্গুনীরে তুমি ?
ভুবন হইলে অরি গাণ্ডীবী বিজয়
অভয় দানিবে, হবে আশ্রিত যে জন—

কি অর্জ্জুনকে প্রবোধ দানে—

চমৎকৃত হয়ো না ফাল্গুনী—
দেব নাগ নরে, গন্ধর্ব্ব কিন্নরে—
যক্ষ রক্ষ দিক্‌পাল আদি—
কৃষ্ণবাদী কে দিবে আশ্রয় ?

অমরেন্দ্রনাথের অনুপম বচনভঙ্গীতে দর্শকগণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এ সমস্ত পংক্তি অদ্যাবধি তাঁহার মত কেহ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই—অভিনয় তো দূরের কথা! আবার ভীম যখন যুধিষ্ঠিরকে রণে উত্তেজিত করিতে বলিতেন—

শুনেছি শ্রীমুখে বারে বার,
হরি কভু অরি নহে কার,
মিত্রভাব শত্রুভাব—তারণ কারণ!
যদি তনু হয় ক্ষয়, কিবা তাহে ভয় ?
পার হব ভবার্ণব গোখুর সমান!

যখন নিজকার্য্যসমর্থনোদ্দেশ্যে সাত্যকীকে বলিতেন—

তুমিও পাণ্ডব বন্ধু ওহে ধনুর্দ্ধর,
সৎযুক্তি সুধাই তোমায়,—
আমি দি'ছি দণ্ডীরে অভয়,
উচিত কি আশ্রিতে বর্জ্জন ?
তুষ্ট কি হবেন কৃষ্ণ আশ্রিতে ত্যজিলে ?

যখন কৃষ্ণকে দম্ভভরে দ্বৈরথ-সমরে আহ্বান করিয়া সাত্যকীকে বলিতেন—

এ ত' নহে স্পর্দ্ধা ধনুর্দ্ধর,
বাধিলে সমর বীর স্বচক্ষে দেখিবে !
পণ মম জানে অরিগণে,—
রণে পৃষ্ঠ দেখাইতে নিষেধ আমার।
দেখ' যদি থাক উপস্থিত,—
চক্র হেরি', পলক না পড়িবে নয়নে।

সে দৃপ্তভঙ্গী, সে ভাবোদ্বেলিত অভিনয় দেখিয়া মনে হইত, বুঝি দ্বাপরের ভীম কলিতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরণীবক্ষে বিচরণ করিতেছেন। আবার যখন মাতা বংশের সম্মানরক্ষাহেতু অনুযোগ করিতেন, তখন ভীম বলিতেন,—

নাহি করি বংশের সম্মান ?
জ্ঞান হয়,—পুরন্দর করে না সাহস—
এ হেন কর্কশবাণী কহিতে সম্মুখে।
রাখিব বংশের মান দেখিবে জগৎ।
ভীমসেন বংশ অভিমানী,
ত্রিভুবন মানিবে জননী ;

উদ্ভব ভারতবংশেতে মম—
বংশের বিক্রম প্রকাশিব ভূমণ্ডলে।

আবার—

নহে মা ভারতবংশ ভোজবংশ সম,
ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল শিখে নাই কেহ—
ভারতের বংশধরগণে।
ভারতবংশের পণ না হয় লঙ্ঘন ;
সাক্ষ্য তার ভীষ্ম পিতামহ—
পণরক্ষা হেতু ক্ষত্র উচ্চ বংশধর,
ক্ষত্রজয়ী রাম সনে করিল সমর,
অবতার আখ্যা যার।

কি-সে বংশমর্য্যাদাজ্ঞান, যাহা দেখিয়া মনে হইত, কুন্তী না হইয়া আজ অন্য কেহ ভীমকে এরূপ কটু কথা বলিলে, সেই দিনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা হইয়া যাইত। কি-সে অপূর্ব্ব আবৃত্তি, সে বাক্যানুযায়ী বীরোচিত অঙ্গভঙ্গী, সে অবর্ণনীয় শ্লেষপূর্ণ উক্তি! কৈ, তেমন সূক্ষ্মভাবে রসসৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে ত' আজ পর্য্যন্ত অন্য কাহাকেও দেখিলাম না। তাহার পর কৃষ্ণের সহিত কথোপকথনে—"না জানি কি গুরু অপরাধে" প্রভৃতি পংক্তি তো তদানীন্তন নাট্যামোদীমাত্রেরই কণ্ঠস্থ ছিল। অনর্থক তাহা উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। দৃশ্য শেষে প্রস্থানকালে ভীমের—

অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
* * * * কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়মনপ্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়—
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,

রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে,
উচ্চ কণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ !
নহ কভু ভক্তাধীন !
নহে কেন কর হতমান ?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণ নাম আর না আনিব মুখে !

সে অদ্ভুত হতাশা-দম্ভ-অভিমান-বীরত্বব্যঞ্জক সর্ব্বরসসমন্বিত অভিনয়, সে অননুকরণীয় গমকপূর্ণ আবৃত্তিকৌশল শুনিয়া দর্শকবৃন্দ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতেন। নিম্নতর গ্রামে সুরু হইয়া, অমরেন্দ্রনাথের সে আকাশবাতাসপ্লাবী কণ্ঠস্বর যখন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত, তখন তাহাদের করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপিয়া উঠিত। বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথের যশোমুকুটে অভিনয়-সাফল্যের যে সমস্ত মহামূল্য উজ্জ্বল মণিগুলি খচিত আছে, ভীমের ভূমিকাভিনয় তন্মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলে বোধ হয় কোন পাঠকই প্রতিবাদ করিবেন না।

অমরেন্দ্রনাথের এই সময়কার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ তাঁহাকে "Garrick of Bengal" আখ্যায় বিভূষিত করেন। তাঁহার 'হরিরাজ' অংশাভিনয়ের কথা বলিতে গিয়া, 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (২২শে মে, ১৯০০) লেখেন :—"We must confess that Babu Amarendra Nath Dutt, **rightly called by the theatre going public, the Garrick of the Bengali Stage,** absolutely surpassed himself in it. The story is chiefly borrowed from Hamlet and Babu Amarendra Nath has

to play the part of the hero. It is an extremely difficult part, and there are not many actors in England who are up to playing it; and yet he manages it so well as to compare favourably with some of the best actors in England. * * Furthermore, Babu Amarendra Nath has contributed very largely within recent years towards the improvement and regeneration of the Bengali Stage. He spends and that usefully, great sums of money on scenes and dresses, and he has done it so far so well as would almost induce one to think when looking at them, that he is in one of the tip-top English Theatres. This, of course, is what people naturally expect from a man of his position, education and talents."

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:০:—

সমাজ-সংস্কারক অমরেন্দ্রনাথ

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ম্যাক্‌বেথ অভিনয়ের একটা বিশেষ মূল্য সম্বন্ধে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করিব। সে সময় এখন আসিয়াছে।

সর্ব্ববিধ প্রকারে নটের উন্নতিসাধন মানসেই যে অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতার জীবিকা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তখনকার দিনে সমাজে অভিনেতার কি স্থান ছিল, তাহারও আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি। অসম্ভব রকমের বেতন বৃদ্ধি ও বোনাস্‌-বেনিফিটের প্রবর্ত্তন করিয়া অভিনেতৃবর্গের শুধু আর্থিক উন্নতির পথ অবধারণ করিয়া দিয়াই যে অমরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে, যাহাতে সমাজে নটের সম্মান-বৃদ্ধি হয়, সে জন্যও তিনি প্রভূত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নাট্যশালাতে যোগদান করিতেই সে উন্নতির প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইল। তাঁহার মত সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবককে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, দেশের অধিকাংশ লোকের মনের গতির স্রোত সহসা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে সকল ব্যক্তি থিয়েটারকে এত ঘৃণা করিতেন যে, থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিলেন। থিয়েটার যে বাস্তবিক ঘৃণার বস্তু নহে, জনসাধারণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গালয়ে প্রবেশের

পর, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'কাজের খতম' রচনা করিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি দেশের সমস্ত পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে সমাদর সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে আনিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি তিনি রাজা মহারাজাদের, ধনী বিদ্বান্‌দের, উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদের—মোট কথা, যাঁহারা সমাজের শিরোমণি-স্বরূপ, তাঁহাদের—থিয়েটারে আনিয়া অভিনেতৃবর্গের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সবিশেষ সাহায্য পাইবেন। হাজার হৌক, অভিনেতারাও সমাজের অঙ্গ ত' বটে; অতএব, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কখন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবেন না, নটদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সম্মানদানে অবহিত হইবেন। জনসাধারণও সমাজের মাথাওয়ালা লোকদের থিয়েটারে আসিয়া অভিনেতাদের সহিত অবাধে মিশিতে দেখিয়া, তাহাদের প্রতি পূর্ব্ব ঘৃণার ভাব পোষণ করিবে না। এই উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্রনাথ, একে একে চৌগাছার রাজা রজনীকান্ত রায় চৌধুরী, বি, এ; নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়; কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমীর হোসেন, সি, আই, ই; কাশীর মহারাজা; মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কে, সি, এস, আই; মহারাজা স্যর প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কে, সি, এস, আই; রামপুরের নবাব; কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী; বালেশ্বর অধিপতি বৈকুণ্ঠনাথ দে প্রভৃতি দেশের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিগণকে নিজের থিয়েটারে আনিতে লাগিলেন।

কিছুকালের মধ্যেই অমরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রসূত কার্য্যের ফল দেখা দিল। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ক্রমশঃ থিয়েটারকে কম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। থিয়েটার যাওয়া যে লোকের চক্ষে

বিশেষ দোষের কার্য্য বলিয়া আর পরিগণিত রহিল না, তাহা আমরা ক্লাসিকের বিক্রয়াধিক্য হইতেই অনুমান করিতে পারিয়াছি। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, আদর্শ-চরিত্র স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন দেশবরেণ্য ব্যক্তি 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিজেরা অমরেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে রবিবার, ২৬শে নভেম্বর, ১৮৯৯ তারিখে ম্যাক্‌বেথ অভিনয়ের আয়োজন করিয়া তাঁহাদের ক্লাসিক থিয়েটারে আনিলেন। তাঁহারা অভিনয় দর্শনে ও অমরেন্দ্রনাথের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে এত মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, সে কথা অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান্ মিরার প্রভৃতি দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণকে জ্ঞাপন করিতে ত্রুটী করিলেন না। 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' লিখিলেন :—

The Hon'ble Justice Chunder Madhub Ghose, the Hon'ble Justice Guru Dass Banerjee, Mr. K. G. Gupta and Mr. P. L. Roy write :—

We went to the Classic Theatre on Sunday last (the 26th November 1899), to witness the performance of the opera "Sree Krishna", and of Babu Girish Chandra Ghose's Bengali translation of Shakespeare's Macbeth, and we were much pleased with what we saw.

The stage arrangements were all very good, the costumes rich and appropriate, and the scenes splendidly represented. The actors did their parts well on the whole, Krishna, the fruitseller and the cowherd boys in "Sree Krishna" and

Macbeth, the witches, the porter and Lady Macbeth in Macbeth being deserving of special mention. * * * *

The two classic songs of Joydev incorporated in the opera "Sree Krishna" were sung extremely well.

We should add that we were received with great kindness and courtesy by the manager and the Assistant Manager, Mr. A. J. Abraham.

(Sd.) C. M. Ghose
,, Guru Dass Banerjee
,, K. G. Gupta
,, P. L. Roy

The 28th November, 1899.

তাঁহাদের মত দেশপূজ্য ব্যক্তিগণের স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এরূপভাবে দেশী থিয়েটারে প্রবেশ—এই বোধ হয় প্রথম। ইহাতে যে বাংলা রঙ্গালয়ের গৌরব বর্দ্ধিত হইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেইজন্যই আমরা বলিয়াছিলাম যে, সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইলেও 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তাহা হইল—এইরূপে জনসাধারণের চক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালার মর্য্যাদা বৃদ্ধি।

মহারাজা স্যর যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ম্যাকবেথ' অভিনয়ের দিন উপস্থিত হইতে না পারিয়া, অমরেন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশের যথার্থ কারণ নিরূপণে সহায়তা করে বলিয়া বিশেষ মূল্যবান্। আমরা পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

My dear Amar Babu,

* * * I need hardly assure you, that an intelli-

gent young man of a respectable family as you are, you have always my best sympathies in the **cause of the native stage you have undertaken.**

Yours sincerely,

(Sd.) Joteendra Mohun Tagore.

ইহার পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গগৌরব স্যর রমেশচন্দ্র দত্তের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে শোভাবাজার রাজবাটীতে মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক ক্লাসিক থিয়েটার অভিনয়ার্থ আহুত হয়। সে অভিনয়ে মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ ও রমেশ বাবু ব্যতীত, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' সম্পাদক মহামতি নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কলিকাতার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ, বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতিকল্পে অমরেন্দ্রনাথের অসীম দান ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাকে একটী স্বুবর্ণপদক উপহার দেন ও সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বলেন,—"আপনি যখন থিয়েটারে ঢুকিয়াছেন, তখন অবশ্য এইবার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিঃসঙ্কোচে থিয়েটারে যাওয়া আসা করিবেন।"

এরূপ উৎসাহপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া, রঙ্গালয়ে দেশপূজ্য ব্যক্তিবর্গকে আনয়ন বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া গেল। এবার তিনি স্থির করিলেন যে, মহামান্য ছোট লাট বাহাদুরকে ক্লাসিক থিয়েটারে আনিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল ও গৌরববর্দ্ধন করিবেন। পূর্ব্বে চোরবাগানের প্রসিদ্ধ ধনী রায় অমৃতলাল মিত্র

বাহাদুরের বাটীতে তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ছোট লাট বাহাদুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। সে সময় ক্লাসিক থিয়েটারও ঐ উৎসবে অভিনয়ার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছিল ও বঙ্গেশ্বরের অভ্যর্থনা উপলক্ষে অমরেন্দ্রনাথ "পূজা ধর বঙ্গেশ্বর" শীর্ষক একটী গান রচনা করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ছোট লাট বাহাদুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এখন অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ক্লাসিক থিয়েটারে আনিবার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন ও তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের সংবাদ দেশী, বিলাতী, সমুদয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। নটের এ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভে বাঙ্গালী সমাজ চকিত হইয়া উঠিলেন। তাহার উপর আবার ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে, পাণ্ডব-গৌরবের সপ্তম অভিনয় রজনীর দিন, কলিকাতার রাস্তাঘাটে, অলিতে গলিতে এক প্ল্যাকার্ড দেখিয়া সহরবাসিগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

Please note.
Grand Auspicious Night ever
memorable in the annals of the Indian Stage.
Special Performance in aid of the
Indian Famine Relief Fund.
Thursday, the 5th April, 1900.
Under the distinguished patronage and
immediate presence of
HON. SIR JOHN WOODBURN, K. C. S. I.
Lieutenant Governor of Bengal
and his staff.
Watch for details.

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গেশ্বরের ক্লাসিকে পদার্পণ করা হইল না। কেন হইল না, তাহা স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়" পত্রে প্রকাশিত "ছোটলাট বাহাদুর ও ক্লাসিক থিয়েটার" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন। আমরা সে প্রবন্ধটী আগামী অধ্যায়-স্বরূপ পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ব্যাপার পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিব। মোট কথা, ছোট লাট বাহাদুর কতিপয় পরশ্রীকাতর লোকের প্রেরোচনায় বাংলা থিয়েটারে আসিলেন না। তখন অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস্ হইতে সুরু করিয়া, সমস্ত জজ, রেজিষ্ট্রার, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতিকে ক্লাসিক থিয়েটারে আনিয়া অকাতরে ধূলিমুষ্টির ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া বড় বড় পার্টী (party) দিতে লাগিলেন। দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণ অমরেন্দ্রনাথের সুমধুর আলাপ ও আদর-আপ্যায়নে প্রীত হইয়া, তিনি যাহাতে বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি বিধান করিতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১০ই ডিসেম্বর, ১৯০১) যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা অবান্তর হইবে না।

"The presence of Sir Francis Maclean (Chief Justice of Bengal), Lady Maclean and other distinguished ladies and gentlemen at the Classic Theatre on Saturday last must be counted an event in the latter day history of the Bengali stage. The pavilion was tastefully decorated on the occasion and comfortable arrangements were made for the seating of the guests. On his Lordship taking his seat in the royal box, Babu A. N. Dutt, the Manager of the Theatre, read out an address of welcome in which passing

allusion was made to the condition under which the Bengali stage is now worked. In replying His Lordship cordially thanked the manager for the honour done him, and remarked that it was always his ambition to promote friendly intercourse between the Europeans and the Indians. After the ceremony was over, the curtain rose upon the production of a new melodrama * * * *."

পাঠকবর্গ যেন ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০১, তারিখটী দেখিয়া মনে না করেন যে, ইহাই ক্লাসিকে পদস্থ রাজপুরুষদিগের প্রথম আগমন। মহামান্য ছোটলাট বাহাদুরের থিয়েটারে আসা পণ্ড হওয়ার পর হইতেই অমরেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীগণকে থিয়েটারে আনিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বঙ্গীয় নাট্যশালায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও পদস্থ রাজপুরুষদিগকে আনয়ন করার প্রথম পথপ্রদর্শক অমরেন্দ্রনাথ। তিনি প্রথমে ২৩শে জুন (১৯০০) তারিখে, মাননীয় বিচারপতি মিঃ সেল, মিঃ ষ্ট্যান্‌লী ও মিঃ হ্যারিংটন-প্রমুখ হাইকোর্টের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে থিয়েটারে আনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে, ২।৩ মাস অন্তর ক্লাসিকে এ প্রকার উৎসব লাগিয়াই থাকিত। অমরেন্দ্র-নাথ এ নীতির অনুসরণ করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির, তথা অভিনেতৃবর্গের এক মহা কল্যাণ সাধন করিলেন। এই সকল মহামান্য ব্যক্তিগণের পদার্পণে বঙ্গীয় রঙ্গালয় শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইল। অভিনেতারা সমাজে যতটা ঘৃণার পাত্র ছিলেন, ততটা আ[র] রহিলেন না। বড় বড় রাজপুরুষগণ ও দেশের নেতৃবৃন্দ অভিনেতাদিগকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক, বহু সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, সসম্ভ্রমে করমর্দ্দন করিয়া সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে

এবং নানারূপ পুস্তিকায় লিখিয়া অভিনেতাগণ যে ঘৃণার পাত্র নহেন—তাঁহারা যে দেশের এবং জাতির উন্নতি ও কল্যাণকামনা করিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা দেশবাসীকে বিশেষরূপে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি নানাশ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া, তাঁহাদিগকে নিজকৃত সমুদয় কার্য্য দেখাইতে লাগিলেন। অভিনেতারা যে কি বস্তু—তাহারা যে যথার্থই জাতির সম্মানযোগ্য—তাহা বুঝিতে পারিয়া, সাধারণে অভিনেতাগণকে সম্মান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গালয়ের বহিরুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, তিনি এমনভাবে সমস্ত বিষয়ের সংস্কারসাধন করিলেন যে, জনসাধারণ ও সমস্ত কর্ম্মচারীবর্গ রঙ্গালয়কে একটা বড় আপিসের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

তখনকার দিনে ও এখনকার দিনে কত প্রভেদ! বর্ত্তমানে কোন সম্মানিত ব্যক্তির থিয়েটারে আগমন কাহারও মনে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। সকলেই মনে করেন,—"আসিলেই বা! আমার কি?" কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের এ নীতির মূল্যনির্দ্ধারণকালে আমাদের তৎকালীন দেশের ও সমাজের কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা অভিনেতাকে তেমন ঘৃণার চক্ষে দেখি না (তাহাও অমরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ও এই নীতির অনুগ্রহে), ইংরাজকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখি না, আমোদ প্রমোদ আমাদের জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ, দেশাত্মবোধ পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু তখনকার কালে দেশের হাওয়া ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, ইংরাজদের বাহবা পাইবার জন্য সকলে লালায়িত ছিলাম। সুতরাং সেই ইংরাজ-রাজপুরুষেরা যখন আমাদের ঘৃণিত দেশীয় রঙ্গালয়ে আসিয়া সমানভাবে অভিনেতাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন, তখন জনসাধারণের চক্ষে ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত কিনা,

তাহা পাঠকবর্গই বিচার করুন। এই মর্য্যাদাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই যে অমরেন্দ্রনাথ এ প্রকার ব্যাপারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ ষ্ট্যান্‌লীকে ১লা আগষ্ট, ১৯০১, তারিখে প্রদত্ত অভিনন্দন হইতেই জানা যায়। ঐ অভিনন্দন পত্রের একস্থানে অমরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

"The native stage, though yet in its infancy, exerts an educative influence over native society unsurpassed by any other educational institution of this country. To encourage the stage is to encourage healthy education and to develop the fine feelings of the human heart. Your Lordship by your kindness and generosity towards me—the manager-actor of this Theatre, has raised the native stage in the estimation of the public."

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিঃ ও মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লী অমরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—"অমরবাবু, আমরা এমন সন্তোষ কখনও লাভ করি নাই; তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ, তোমার সম্বর্দ্ধনায় আমরা সম্মানিত হইয়াছি। যতদিন ভারতবর্ষে থাকিব, কলিকাতায় আসিবার সুযোগ হইলেই সেই সময় একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তোমার থিয়েটারের উন্নতি হউক, এই প্রার্থনা।"

"রঙ্গালয়" পত্রে এই উৎসব সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল। আমরা তাহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"প্রধান বিচারপতির পদ ছোটলাটের পদ তুল্য; অথবা অন্য হিসাবে অধিকদিন স্থায়ী বলিয়া অন্য শাসনকর্ত্তার পদসম্মান অপেক্ষা সমাজের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। মহামতি ষ্ট্যানলী সাহেব

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের প্রধান বিচারপতির পদ পাইয়াছেন। সেই পদ-প্রাপ্তি জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন করা হইল। পূজা করিলেন ক্লাসিক থিয়েটারের অধিকারী শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ, পূজা হইল ক্লাসিক রঙ্গ-মঞ্চে। সে পূজা দেবতার গ্রাহ্য হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মহামান্য ষ্ট্যানলী মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিয়াছেন,—সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া পানভোজন করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে শ্লাঘার কথা, বাঙ্গালী থিয়েটারের পক্ষেও শ্লাঘার কথা। তাঁহার উপস্থিতিতে বাঙ্গালীর রঙ্গকার্য্য সম্মানিত ও উন্নীত হইয়াছে।

"আমাদের দেশে বিলাতী যাহা কিছু গৃহীত হইয়াছে, সে সকলই রাজা ইংরেজের উৎসাহে এবং উদ্যোগে ; কেবল থিয়েটারে রাজা ইংরেজ কোন উৎসাহই প্রদর্শন করেন নাই। কারণ পাদ্রীরা বলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম মহাশয়রাও সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া থাকেন যে, থিয়েটারের অভিনেত্রীসকল বেশ্যা ; সুতরাং থিয়েটার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কেবল বড় লাট ও ছোট লাট থিয়েটারগৃহে আসিয়া থিয়েটার দেখেন নাই। * * * এই নিষেধের মূল্য কিছুই নাই, কেবল শ্রেণী-বিশেষের খেয়ালের পুষ্টি করা মাত্র। থিয়েটার বেশ্যা না হইলে চলে না, হয় থিয়েটার বন্ধ করিতে হয়, নয় বালকের সাহায্যে স্ত্রীঅংশ অভিনয় করাইতে হয়। মৃত রাজকৃষ্ণ রায় বালকের সাহায্যে থিয়েটার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সুতরাং থিয়েটারী ব্যবসায় চালাইতে হইলে বেশ্যার সাহায্য অনিবার্য্য। এমন অবস্থায় বেশ্যা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করাও মূর্খতার পরিচায়ক। থিয়েটারের অভিনেত্রীর বার্দ্ধক্যেও দারিদ্র্যের ভয় নাই।

"যাহা হউক এই ত অবস্থা। এই অবস্থায় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী

থিয়েটারের অধ্যক্ষের নিকট অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন ;—শ্লাঘার বিষয় সকল থিয়েটারের অধ্যক্ষেরই। রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর উৎসাহ থাকিলে বাঙ্গালীর থিয়েটার সুমার্জ্জিত ও সংযত হইবে, অভিনয়কার্য্যে উন্নতির সম্ভাবনা হইবে। বিলাতে রাজা অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন। এ দেশে রাজার জাতি রাজপ্রতিনিধি বাঙ্গালীর থিয়েটারে শুভাগমন করিয়া উৎসাহ প্রদান করিলে বাঙ্গালী কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। পরে যদি কখন যোগ্যপদ হয়, তখন বাঙ্গালীর থিয়েটার রাজার নিকট অর্থ-সাহায্যও পাইতে পারে।"

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০২, তারিখে, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্‌লীনের দ্বিতীয়বার ক্লাসিকে আগমন উপলক্ষে "রঙ্গালয়ে" যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। "রঙ্গালয়" বলেন,—

"শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ, বঙ্গ-রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন।—বাঙ্গালীর থিয়েটারের নাম শুনিলে, ইংরাজেরা হাসিত, বিদ্রূপ করিত!—এখন সেই বাঙ্গালীর থিয়েটার দেখিয়া, ইংরাজ মোহিত হয়, শত মুখে সুখ্যাতি করে, বিলাত হইতে বন্ধুবর্গ আসিলে, সঙ্গে করিয়া আনিয়া, বাঙ্গালীর থিয়েটার দেখায়। বন্ধুবর্গ মিলিয়া, একত্রিত হইয়া, ডিনার-টেবিলে বসিয়া, বাঙ্গালীর থিয়েটারের কথা কয়,—দৃশ্যপট পরিচ্ছদের প্রশংসা করে, অভিনয় কৌশলের গুণকীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর কি আশা করা যাইতে পারে? বাঙ্গালীর দ্বারা, বাঙ্গালা দেশে, আর কি হইতে পারে?—উৎসাহ দেয়, সাহায্য করে, দুটো ভরসার কথা কয়,—যদিও এমন একটীও ধনী বাঙ্গালী বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত দেখি না,—তথাপি যে এতদূর উন্নতির পথে, বঙ্গ রঙ্গালয় আসিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে?

"অমরেন্দ্রনাথ, রঙ্গালয়ের যে বন্ধুর পথ,—হৃদয়ের শোণিত পাতে উন্মুক্ত করিয়াছেন,—লোক নিন্দা, সমাজ, দুর্জ্জয় অপবাদ—এই সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ নাট্যজগতে যে বিজয়-বৈজয়ন্তি উড্ডীয়মান করিয়াছেন, বাঙ্গালাদেশ,—আজ যদি সে মহৎ কার্য্যের এক কণা আদর্শ ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত, তবে কোটী কোটী ভারতবাসী পাশা-পাশি বসিয়া আনন্দে মাতিয়া, প্রীতি ও হর্ষের চক্ষে দেখিত, বাঙ্গালার রঙ্গালয়—বিলাতের রঙ্গালয় অপেক্ষা কোনও গুণে নিকৃষ্ট নহে। যেখানকার যা কিছু ভাল সামগ্রী,— ভাল অভিনেতা, ভাল অভিনেত্রী, অমরেন্দ্রনাথ সমস্ত একত্র করিয়া জোট বাঁধিয়াছেন। সুতরাং 'ক্লাসিকে'র তুলনা 'ক্লাসিক'।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—ঃ*ঃ—

"ছোটলাট বাহাদুর ও ক্লাসিক থিয়েটার"

গত পরিচ্ছেদে আমরা অমরেন্দ্রনাথ লিখিত "ছোট লাট বাহাদুর ও ক্লাসিক থিয়েটার" শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রবন্ধটী "রঙ্গালয়"-পত্রের ১৩০৭ সালের ১৬ই ও ২৩শে চৈত্রের সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকের অবগতির জন্য আমরা সেইটী এই গ্রন্থের বর্ত্তমান পরিচ্ছেদস্বরূপ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

আমি একজন রাজভক্ত প্রজা; ইংরাজরাজ্যে প্রজা নহে কে? সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলে রাজভক্ত। তবে কি দেব-ভক্তি, কি রাজ-ভক্তি—সকল ভক্তিরই একটু তারতম্য আছে। কথায় বলে—"ভয়ে ভজা" আর "ভক্তিতে ভজা"। আমি প্রজাটী ভক্তিতেই রাজাকে ভজিয়া থাকি, ভয়ে নহে। যখন বুয়ার যুদ্ধের প্রথম উত্থান; লেডিস্মিথ গেল, কিম্বার্লি গেল, মেফ্‌কিং গেল, লর্ড মেথুন, নয়টী কামান বুয়ার চরণে সমর্পণ করিয়া ফিরিলেন। চারিদিকে ইংরাজের যুদ্ধকলঙ্ক প্রচারিত হইতে লাগিল। অনেকেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইংরাজ এইবার 'থার্ড পাওয়ার' হইল, বুয়ার যুদ্ধ জয় অসম্ভব, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, ইংরাজের পুণ্যময় রাজ্য,—যতই কেহ নিন্দা করুন, ইংরাজ রাজ্যের বিচার, নিক্তির কাঁটায় হইতেছে।

ভূতপূর্ব্ব প্রিন্স অফ্ ওয়েল্স্, যিনি অদ্য সপ্তম এডওয়ার্ড উপাধি ধারণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের—শস্য শ্যামলা জননী জন্মভূমির অধীশ্বর হইয়াছেন, ইংরাজ রাজ্যের বিচার মহিমায় তাঁহাকেও 'ডকে' দাঁড়াইতে হইয়াছে। এক নীচ ব্যক্তি আসিয়া লর্ড মেওকে হত্যা করিল, বিচার-পতি নরম্যান সাহেব নিহত হইলেন, ইংরাজের তুলাদণ্ডের তখনও একটু এদিক ওদিক হইল না। মাতাল হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিলে তাহাকে যেরূপভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া গিয়া অপরাধ সপ্রমাণ করাইয়া দণ্ড দেওয়া হয়, উক্ত হত্যাকারীও সেইভাবে ব্যবহৃত হইল। রাজপ্রতিনিধি খুন হইলেন, শত শত নরনারীর চক্ষের সম্মুখে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল,—অনায়াসে হুকুম হইলে হইত, "দুরাত্মাকে গলা পর্য্যন্ত মাটিতে গাড়িয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ান হউক।" তুমি আমি কি করি বল দেখি? বাটীর চাকর যদি কোনও একটা বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্য করে, তাহাকে প্রহার দিয়া আধমরা করিয়া তাড়াই না কি? সংসারে ক্ষমাশীল পুরুষ কয়জন? কলমে অনেকে থাকিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যে বিরল। তাই বলিতেছিলাম. ইংরাজের তুঙ্গশৃঙ্গ-স্পর্শী যশগৌরব বুয়ার সমরে অটুট থাকিবে, সে দুর্দ্দিনেও আমার মনে বদ্ধমূল ছিল; অনেকের সঙ্গে এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে অনেক তর্কও হইয়াছিল, তাঁহারা আমাকে 'গোঁড়া' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমি একজন মনে জ্ঞানে ইংরাজের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রজা, দায়ে পড়িয়া নহে। এক স্থলে অনেক গণ্যমান্য লোক ভোজ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আমিও উক্ত সভায় আহূত হইয়া গিয়াছিলাম। বঙ্গের বর্ত্তমান ছোট লাট স্যার জন উডবরণ মহোদয় সম্বন্ধে কথোপকথন উঠিয়াছিল। অনেকেই বলিতে লাগিলেন, এরূপ সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ও উচ্চ-হৃদয় ছোট লাট আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে আসিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ,

কিন্তু তিনি কিছু দুর্ব্বলচিত্ত (weak-minded)। আমি বলিয়াছিলাম, "স্যার জন উডবরণের স্নেহময় চক্ষে উচ্চ নীচ ভেদ নাই। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তিরও দুঃখকাহিনী কাণে তুলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেন, প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। মোটের উপর কথা, তিনি অহংজ্ঞানশূন্য। কিন্তু হতভাগ্য সমাজ আমাদের কাল হইয়াছে, উচ্চপদস্থব্যক্তি হইলেই তাঁহাকে একটু উঁচু চালে চলিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণের সহিত মেশামিশি করিলে তাঁহার নিন্দা হইবে, যদি তিনি আকাশপানে সদা সর্ব্বদা না তাকাইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যেও মাটীর পানে চাহিয়া চলেন, তাহা হইলে তিনি তদীয় উচ্চ পদের যোগ্য নহেন। সমাজ এই নিয়মে চলিতেছে, দুঃখের বিষয় এই যে, আদর্শ রাজ্য সুশিক্ষিত ইংরাজ সমাজও এ নিয়মের বহির্ভূত নহে। স্যার জন উডবরণ দয়াপরবশ হইয়া অতি সামান্য ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতে যান, হয়ত ভিতর ভিতর এমন কতকগুলি কারণ জুটিয়া উঠে, অথচ বাহিরের লোকের তাহা জানিবার উপায় নাই। সেই অবস্থায় কেবলমাত্র আপনার পদগৌরব বজায় রাখিবার জন্য স্যার জন উডবরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া, আপনাকে দুর্ব্বলচিত্তের (weak-minded) লোক বলিয়া কিয়দংশে প্রতীয়মান করান।"

দলের ভিতর একজন বিদ্রূপ করিয়া আমায় বলিলেন, "অমরবাবু উডবরণ সাহেবের এত পক্ষপাতী কেন? বোধ হয় ছোটলাট বাহাদুরকে ক্লাসিক থিয়েটারে লইয়া গিয়া একটা হিড়িক করিয়া থোক্‌থাক্ কিছু উপার্জ্জন করিবেন। কেমন না?" দলের আর একজন একটু মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "ক্লাসিক থিয়েটারে ছোটলাট বাহাদুর আসিবেন? অমরবাবু যদি এ চেষ্টা করেন, তবে বাতুলতার পরিচয় দিবেন মাত্র।" আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়,

এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর এক গাঁয়ে মাথা ব্যথা। হইতেছিল রাজনীতি আলোচনা,—কথা পাড়িলেন ক্লাসিক থিয়েটারের। ঈশ্বর যা করেন,—ভালর জন্যই। আপনাদের কথায় আমার একটী নূতন সাধের উদয় হইল। থিয়েটারের সংস্পর্শে জড়িত বলিয়া আপনাদিগের ন্যায় মহোদয়গণের চক্ষে উপেক্ষার পাত্র হইতে পারি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছোটলাট বাহাদুরের করুণ দৃষ্টিতে আমার আদর আপনাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইবে না।" ঐ রাত্রি হইতে আমার মনে কেমন একটা জেদ হইল, ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তাঁহার পবিত্র পদার্পণে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চ যাহাতে ধন্য হয়, সে উদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিব। পরদিন প্রাতঃকালেই স্বদেশ-গৌরব স্বনামধন্য সুযোগ্য 'মিরার'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। নরেন্দ্রবাবু আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, আমার উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য করিতে প্রস্তুত। তিনি আমায় আশ্বাস দিলেন, ছোটলাট বাহাদুরকে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে আনিয়া অভিনয় দেখাইবার জন্য যথোচিত সাহায্য করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না। যথাসময়ে আমি ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহার অভ্যর্থনায় পরম আপ্যায়িত হইলাম। বোধ হয় এরূপ শুভ সৌভাগ্য যোগ আর কখনও কোন রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের অদৃষ্টে ঘটিবে কি না সন্দেহ। এই প্রথম ছোটলাট বাহাদুরের সহিত একত্রে পাশাপাশি বসিয়া আমি কথা কহিলাম। ওরূপ সরল প্রকৃতি ও উচ্চহৃদয় ইংরাজ বোধ হয় ইংলণ্ডেও বিরল। প্রায় তিন কোয়ার্টার কাল তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন চলিতে লাগিল। আমাদের স্থানাভাব; সুতরাং সে কথামৃত পান করাইয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তি

সাধন করিতে পারিলাম না। শেষ যখন উঠিয়া আসি, ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন, "ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখিবার জন্য কোনদিন যাইব, অতি সত্বরই পত্র লিখিয়া জানাইব।" যথাসময়ে আমরা পত্র পাইলাম, বৃহস্পতিবার, ৫ই এপ্রিল ১৯০০ সাল, রাত্রি ৯টার সময় নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত "ম্যাকবেথের" অভিনয় দেখিবার জন্য ছোটলাট বাহাদুর সদলে আসিবেন, এইরূপ স্থির হইল। আমরা সমস্ত সংবাদপত্রে উক্ত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিলাম। আর রক্ষা আছে কি? পরশ্রীকাতর, কুঞ্চিতহৃদয়, নীচাশয় বাঙ্গালীগণের টনক নড়িল। আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, অনেক সাধ্য সাধনায় যাঁহার দর্শন মেলে না, সেই ছোটলাট বাহাদুরের সহিত বিনা আয়াসে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাদর সম্ভাষণ পাইলাম। এমন কি তিনি আমার থিয়েটারে আসিয়া অভিনয় দেখিবেন স্বীকার করিয়া পত্র দিলেন,—আমার এ সম্মান বাঙ্গালী ভায়াদের বক্ষঃস্থলে বজ্রের অধিক গিয়া বাজিল। ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যেও মহা গোলযোগ উঠিল,—এমন কি অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের ভ্রাতৃবর্গও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ছোটলাট বাহাদুরের "ক্লাসিক রঙ্গ-মঞ্চে" আগমন কাঁচিয়া যায়। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, চারিদিক হইতে নানারূপ কুৎসাপূর্ণ পত্র ছোটলাট বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। রাজপুরুষগণের মধ্যে একটা ঘোরতর আন্দোলন চলিল। ছোটলাট বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাহার আর সন্দেহ কি? আমিও মনে জ্ঞানে সেটা বুঝিলাম। ঠিক এই সময়ে আমরা 'বেলভেডিয়ার' হইতে আর একখানি পত্র পাইলাম, তাহার ভাবার্থ এই,—"ছোটলাট বাহাদুর অবগত হইয়াছেন, ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীগণ ভদ্রবংশসম্ভূতা নহে,—তাহারা

চরিত্রহীনা যুবতী। এ সংবাদ সত্য কি না শীঘ্র পত্রের উত্তর দিয়া জানাইবেন।"

বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের যাহা কিছু ত্রুটী, সে কেবল অভিনেত্রী লইয়া, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং ছোটলাট বাহাদুরের পক্ষে এ সংবাদ নূতন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ এই স্যার জন উডবরণ মহোদয়ের সম্মুখে এই অভিনেত্রীবর্গ লইয়া আমি ইতিপূর্ব্বে দুই তিন বার অভিনয় করিয়াছি। হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌লীন্ বাহাদুরও ছোটলাট সাহেবের সহিত অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

অভিনয় দর্শনে আনন্দিত হইয়া তিনি যে প্রশংসাপত্র আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা একটী অমূল্য রত্ন! রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ আর অধিক কি আশা করিতে পারেন? বিশেষ বাঙ্গালা দেশে?

আমার মনে হইল, পত্রের উত্তর দেওয়া অপেক্ষা ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্তে সহানুভূতির অঙ্কপাত হইবেই হইবে। বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর উচ্চ গৌরবে আঘাত দিবার জন্য হতভাগ্য বাঙ্গালীর দল চেষ্টা পাইতেছে, এ কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে, ছোটলাট বাহাদুর অবশ্যই অন্য মত হইবেন। কিন্তু আমার একা যাওয়া অপেক্ষা যোগ্য সহায় লইয়া উপস্থিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। পূজ্যপাদ নরেন্দ্র বাবু স্বীকার পাইলেন, তিনি ছোটলাট বাহাদুরের কাছে যাইবেন এবং যথাসাধ্য বলিবেন। মান্যবর ভারতগৌরব অনারেবল্ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করেন, যাঁহার ভরসা আমি জীবনের একটা প্রধান অবলম্বন বলিয়া বোধ করি, যাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ লাভে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিও জনসমাজে আদৃত হইয়াছে,—তিনিও নরেন্দ্র বাবুর সহিত ছোটলাট বাহাদুরের

নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহায়তা করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। স্থির হইল, তৎপর দিন আমি, সুরেন্দ্র বাবু ও নরেন্দ্র বাবুকে লইয়া মধ্যাহ্নে "বেলভেডিয়ারে" উপস্থিত হইব।

বেলা ১১॥০ সাড়ে এগারটার পর, মাননীয় সুরেন্দ্র বাবু, পূজ্যপাদ নরেন্দ্র বাবু এবং আমি, আশা ও আশঙ্কায় আন্দোলিত হইতে হইতে বেলভেডিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমর বাবু, আপনার কি বোধ হয়? ছোটলাট বাহাদুরের কর্ণে এরূপভাবে বিষ ঢালিল কাহারা?" আমি উত্তর করিলাম, "যদি অভয় দেন তো স্বরূপ বলি। আমার বোধ হয়, আমাদের স্বদেশগৌরব * * * মহাপ্রভুরাই প্রাণপণে বাদ সাধিতেছেন।" সুরেন্দ্র বাবু হাসিতে লাগিলেন। এমন সময় গাড়ীখানা গড়ের মাঠের মাঝ বরাবর আসিয়া থামিয়া গেল। অদৃষ্টগুণে ঘোড়া মহাপ্রভুও এ সময় বাম হইলেন। তিনি আর চলিতে চান না। নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমাদের একটার মধ্যে যেমন করিয়া হউক পঁহুছিতে হইবে। এই মর্ম্মে আমি ছোটলাট বাহাদুরকে গতকল্য একখানি পত্র দিয়াছি। দৈব বিড়ম্বনা আমাদিগকে অভিভূত করিল দেখিতেছি।" সুরেন্দ্র বাবু "God's 'gainst us" —"God's 'gainst us" বার বার বলিয়া ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঘোড়াটা নূতন কেনা হইয়াছিল। ঘোড়ারই সম্পূর্ণ দোষ, কোচম্যানকে দায়ী করিতে পারিলাম না। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তিনজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে দশমিনিট ধরিয়া ঘোড়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিবার পর গাড়ী চলিল। আমরা আবার কথা কহিতে সুরু করিলাম। নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আপনার

থিয়েটারের বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্রবৃন্দের পত্রাবলী আমার "মিরার পত্রিকায়" প্রকাশিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ছাত্রবৃন্দের আপনার উপর রাগের কারণ কি?" আমি উত্তর দিলাম,—"শুধু ছাত্রবৃন্দ কেন, এই হতভাগ্যের উপর এখন অনেক মহাশয়ই বিরূপ। তাহার কারণ আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা এই। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেক হুম্‌রো চুম্‌রো তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী বাবুগণ, সারা জন্মটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, এমন কি ভদ্রভাবে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও হুইস্কির খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারেন না, আর আমি নিতান্ত মূর্খশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াও পায়ের উপর পা দিয়া কাটাইতেছি, পরপ্রত্যাশী হইয়া মোসাহেবী করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে না। প্রায় দুইশত লোক আমার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে, পরশ্রীকাতর নীচ ব্যক্তির তাহা সহ্য হইবে কেন? আর ছাত্রদের কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের নিগ্রহের কারণ, আমার "মজা" প্রহসনে মেসের (Mess) বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করা। এই ছাত্রনিবাসের দৃশ্য লেখায়, আমায় আক্রমণ করিয়া অনেক পত্র আপনার "মিরার পত্রিকায়" মুদ্রিত হইবার নিমিত্ত আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। আপনিও তাহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছিলাম। রাগের এই একমাত্র কারণ দেখিতেছি। কিন্তু ছাত্রবৃন্দ আমার নিকট হইতে যেরূপ উপকৃত, বোধ করি এরূপ পুনঃ পুনঃ নিঃস্বার্থ উপকার অন্য কাহারও নিকট হইতে তাঁহারা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। চাঁদা যে কত দিয়াছি, তাহার ঠিকানা নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য তখনই ছাড়িয়া দিয়াছি। এমন কি গ্যাসের খরচা পর্য্যন্ত আপনার পকেট হইতে দিয়াছি। প্রেসিডেন্সি

কলেজে যখন "হ্যামলেট" অভিনয় হয়, প্রায় সমস্ত পোষাক ও দৃশ্যপট ইত্যাদি আমি যোগাইয়াছিলাম। যেদিন ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী মাননীয় জেমস্ সাহেব ছাত্রবৃন্দ পরিবৃত হইয়া, আমার রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমায় অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার শিক্ষায় ছাত্রগণ ছোটলাট বাহাদুরের সমক্ষে "ম্যাক্‌বেথ" অভিনয় করিবেন ও সেই উপলক্ষে সমস্ত পোষাক ও দৃশ্যপট ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে, আমি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলাম। অভিনয়ান্তে ধন্যবাদ দিবার ধূম পড়িয়া গেল। Shifter পটপরিবর্ত্তনকারীরা পর্য্যন্ত ধন্যবাদ লাভে বঞ্চিত হইল না। কিন্তু এ হতভাগ্যের নগণ্য নাম কেহ একবার মুখেও আনিল না, যদিও সে মহা উৎসব আমার সাহায্য ও উদ্যোগ ব্যতীত সম্পাদিত হইত না; তাহার জন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। কেবলমাত্র আপনাদের নিকট, ছাত্রবৃন্দের প্রতি আমার নিঃস্বার্থ সহানুভূতির প্রমাণ দিবার জন্য পুরাতন কাহিনীর অবতারণা করিলাম। কেবলমাত্র অপরাধ, "মজায়" ছাত্রনিবাসের দৃশ্যটী লেখা।"

এই সময়ে আবার গাড়ী থামিল। যথার্থই ঘোড়াটা আমাদের নিতান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। একটা বাজিতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। ঘোড়াকে গালাগালি দিলে সে তো আর কথা কানে তুলিবে না, কাজেই সকল ঝাঁজ কোচম্যানের উপর ঝাড়িলাম। সেও ঝোঁকের উপর ঘা কতক আচ্ছা করিয়া ঘোড়াকে চাবুক লাগাইল। গাড়ী চলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আপনার থিয়েটারে কোন্ কোন্ রাজা মহারাজা ও গণ্যমান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অভিনয় দর্শনে উপস্থিত ছিলেন, তাহার একটী তালিকা রাখিয়াছেন কি?"

আমি উত্তর দিলাম,—"হ্যাঁ, সেরূপ একটী সম্পূর্ণ তালিকা আমি সঙ্গে রাখিয়াছি এবং যে সমস্ত মহামান্য মহোদয়গণের সহানুভূতিপত্র আমি তালিকার সহিত আনিয়াছি, তাহা ছোটলাট বাহাদুরকে দেখাইলেই তিনি অনায়াসে বুঝিবেন, ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চ ঘৃণার সামগ্রী নহে। তবে নিন্দুকের চক্ষে কোহিনুর কাচ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

নরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তালিকাভুক্ত নামগুলি বলুন দেখি শুনি।" আমি পড়িয়া বলিতে লাগিলাম,—"কাশীর মহারাজা, বৰ্দ্ধমানের মহারাজা, কাশীমবাজারের মহারাজা, রামপুরের নবাব, মুর্শিদাবাদের নবাব, মাননীয় রাজা রণজিৎ সিং বাহাদুর, স্বদেশগৌরব আর, সি, দত্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কত নাম করিব। তা ছাড়া ইংরাজ ও বাঙ্গালী কর্তৃক সমভাবে পূজিত মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, বিজ্ঞান-সাগরের কর্ণধার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বঙ্গের মুখোজ্জ্বল রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ষ্ট্যান্‌লী সাহেব, হ্যারিংটন সাহেব, আবগারী বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মিঃ কে, জি, গুপ্ত, ব্যারিষ্টারপ্রবর মিঃ পি, এল, রায়, প্রভৃতি বহু বহু প্রখ্যাতনামা, স্বনামধন্য মহোদয়গণ আমাদের রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়া অভিনয় দর্শনে সানন্দচিত্তে যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, আমি এক এক করিয়া পড়িতেছি, শুনুন।"

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"প্রথমে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহানুভূতি পত্রখানি পাঠ করুন।"

আমি পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। স্থানাভাব,—বাধ্য হইয়া শেষের কয়েকটী ছত্রমাত্র পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত মুদ্রিত করিলাম।*

* আমরা পত্রখানি পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি। পুনরুল্লেখ ভয়ে এখানে আবার মুদ্রিত করিলাম না।

মহারাজার পত্র পাঠান্তে, নরেন্দ্র বাবুর অনুরোধে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের প্রশংসাপত্র পড়িতে লাগিলাম। 'ম্যাক্‌বেথ' অভিনয় রাত্রে তাঁহারা উপস্থিত হন, আমি ম্যাক্‌বেথের অংশ (part) গ্রহণ করিয়াছিলাম। পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উক্ত প্রশংসাপত্রের কয়েক পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। *

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পাঠ করিবার উদ্যোগ করিতেছি,—এমন সময়ে লাট ভবনের সিংহদ্বারের সম্মুখে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানি আর পড়া হইল না।

ক্রমশঃ

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস, যে কোন কারণেই হউক, উহার বাকী অংশ মুদ্রিত হয় নাই। তবে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নহি। অন্ততঃ আমরা উহার অবশিষ্টাংশ দেখি নাই। সেই কারণে অসম্পূর্ণ প্রবন্ধই পুনর্মুদ্রিত হইল।

---

* এইখানিও আমরা ২৩৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছি। সেই জন্য এখানে আবার ছাপা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

—ঃ০ঃ—

গিরিশচন্দ্রের সহিত দ্বৈরথ সমর

(১৯০০)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি যে, ক্লাসিক থিয়েটারে মহা-সমারোহে পাণ্ডব-গৌরবের অভিনয় হইতে লাগিল। বখরা লইয়া, পাণ্ডব-গৌরব রচনা লইয়া ও ভীমের ভূমিকা লইয়া—এই তিন দফা কারণে অমরেন্দ্রনাথের সহিত গিরিশচন্দ্রের যে মনোমালিন্য চলিতেছিল ও তাহার ফলে গিরিশচন্দ্র যে ক্লাসিক ছাড়িবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহারও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সে সুযোগ আসিতে বেশী বিলম্ব হইল না। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত পূর্ব্ব হইতেই কথাবার্ত্তা চালাইতে-ছিলেন; এখন তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া—যেদিন ছোটলাট বাহাদুরের ক্লাসিক থিয়েটারে আগমন উপলক্ষে প্ল্যাকার্ডে সারা কলিকাতা সহর ছাইয়া গেল, সেইদিন অভিনয়ের পর, গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ত্যাগ করিলেন। ৮ই এপ্রিলে (১৯০০) কঞ্চুকীর ভূমিকায় তাঁহার নাম ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি থিয়েটারে আসিলেন না। ১৪ই এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারের নাট্যকাররূপে তাঁহার নাম বিজ্ঞাপিত হওয়ার শেষদিন। তাহার পরদিন, তিনকড়ি দাসী, অঘোর পাঠক প্রভৃতি জনকয়েক অভিনেতা অভিনেত্রীকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া তিনি

officially ক্লাসিক ছাড়িয়া মিনার্ভায় চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ মহা ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহার সহিত গিরিশচন্দ্রের তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্ট ছিল ও তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল যে, কোন পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করিলে অপর পক্ষকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা দিবেন। অমরেন্দ্রনাথ পার্শ্বচরগণের প্ররোচনায় গিরিশচন্দ্রের মার্চ্চের মাহিনা আটক করিলেন ও হাইকোর্টে তাঁহার নামে মামলা রুজু করিয়া Injunctionএর জন্য দরখাস্ত করিলেন, অন্যথায় ৩০০০৲ টাকা দাবী করিলেন।

নাট্যজগৎ সরগরম হইয়া উঠিল। ৩রা মে তারিখে হাইকোর্টে মামলার শুনানী হইল ও ৭ই মে তারিখে মাননীয় বিচারপতি মিঃ সেল রায় দিলেন। অমরেন্দ্রনাথের injunctionএর প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। ৫ই মে ও ৯ই মে তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এই মামলা সংক্রান্ত যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

CLASSIC THEATRE—At the High Court on Thursday, before Mr. Justice Sale, the Rule obtained on behalf of Amorendra Nath Dutt, Proprietor and Manager of Classic Theatre, calling upon Girish Chandra Ghose the defendant to show cause why an injunction should not be issued against him restraining him till the 26th March 1902 from lending or offering his services or entering into any engagement either as a Dramatic writer or as an actor to or with any theatre, whether public or private other than the Classic Theatre, came on for hearing. Messrs.

Jackson, W. C. Banerjee, and R. Mitter, instructed by Mr. A. S. Barrow, appeared for the plaintiff in support of the Rule and Sir Griffith Evans and Mr. Garth instructed by Mr. Charu Chandra Mitter appeared for the defendant to show cause against the Rule. His Lordship after hearing counsels on both sides, took time to consider the Judgment.

CLASSIC THEATRE—At the High Court on Monday, Mr. Justice Sale delivered judgment on the Rule, obtained on behalf of Amorendra Nath Dutt, Proprietor and Manager of the Classic Theatre, against Girish Chandra Ghose, particulars of which have already appeared. His Lordship discharged the Rule remarking that on the affidavits, the breach was committed by the plaintiff by non-payment of the money. Then, with regard to the Rs. 3000/- three thousand mentioned by way of liquidated damages, His Lordship thought that it did not prevent the plaintiff from applying for an injuncture. But as the defendant said that he understood that Rs. 3000/- three thousand would be the damage for any breach of contract, it was a question of evidence. But His Lordship thought that it was not safe to grant an injuncture at present. The suit would not be beard for sometime and this is a case which ought to be expedited and if the parties would make any applica-

tion, the Court would be disposed to entertain it. M
R. Mitter, who appeared for the plaintiff, then applied f
an order that the suit might be expedited. The Court sa
that Mr. Mitter must consult the other side first, and th
the application could be made.

Injunction বাহির করিতে অসমর্থ হইয়া অমরেন্দ্রনাথ আ
মামলা বিষয়ে ঢিলা দিয়া, একাগ্রচিত্তে থিয়েটার পরিচালনে
দিলেন—যাহাতে গিরিশচন্দ্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে
বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও ক্লাসিকের প্রত
কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। অমরেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব গৌরবেই ক্লাসিক চালাই
লাগিলেন।

শনিবার, ২৬শে মে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের নূতন গীতিন
"দুটী প্রাণ" অভিনীত হইল। প্রথম রজনীর পাত্রপাত্রীগণের
এই :—

সুন্দর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজা—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কোটাল—অতীন্দ্র
ভট্টাচার্য্য, ঐ পুত্র—আশুতোষ পালিত, রাণী—পান্নারাণী, বিদ্যা—রাণীসু
মালিনী—কুসুমকুমারী, কোটাল-পত্নী—লক্ষ্মীমণি, কালী—প্রমদাসুন্দরী, সীতাে
ওয়ালা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, মিহিদানাওয়ালী—বিনোদিনী (হাঁদি)।

'দুটী প্রাণে'র নাট্যাংশ পাঠকবর্গের চিরপরিচিত "বিদ্যাসুন
অবলম্বনে রচিত হইলেও, কতদূর দর্শকের প্রীতিসাধনে সমর্থ হইয়াছি
তাহা 'ইণ্ডিয়ান্ মিরারে'র ৭ই জুন তারিখের সমালোচনায় প্রকা
ঐ সংবাদপত্র বলেন,—

"It has in it everything which admirers of plays
this description would insist upon having. Pretty mu
prettier dances, and most brilliant scenery greet the e

'হুটিপ্রাণ' গীতিনাট্যে পক্ষীহস্তে সুন্দরের ভূমিকায়
অমরেন্দ্রনাথ।

and eyes of the play-goer at every turn. In these particulars, the traditions of the "Classic" stage have been scrupulously maintained, nay, in some respects, indubitably surpassed. The representation is a "triumphant success" from the box-office point of view."

'দুটী প্রাণ' যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একদিন বাগান হইতে থিয়েটারে আগমনকালীন, বিডন ষ্ট্রীটে এক বাড়ীর দেওয়ালে একটী প্ল্যাকার্ড অমরেন্দ্রনাথের নজরে পড়িল—"মিনার্ভায় সীতারাম।" থিয়েটারে আসিয়াই তিনি 'সীতারাম' উপন্যাস আনাইয়া, সেই রাত্রির মধ্যেই তাহাকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন ও মাত্র এক সপ্তাহ ব্যাপী মহলার পর ৩০শে জুন তারিখে, সীতারামের প্রথম অভিনয় হইল। সে রজনীর পাত্রপাত্রীগণ :—

সীতারাম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গঙ্গারাম—মহেন্দ্রলাল বসু, চন্দ্রচূড়—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, চাঁদশা—নটবর চৌধুরী, ফকীর—জীবনকৃষ্ণ সেন, মৃন্ময়—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাধর স্বামী—পান্নালাল সরকার, নবীন ভাণ্ডারী ও শ্যামচাঁদ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, রামচাঁদ—অহীন্দ্রনাথ দে, শ্রী—কুসুমকুমারী, নন্দা—রাণীসুন্দরী, রমা—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), জয়ন্তী—ভূষণকুমারী, মুরলা—হরিদাসী (গুলফম)।

ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মিনার্ভায় সীতারাম খুলিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সদর্পে হ্যাণ্ডবিলে ঘোষণা করিলেন—"ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে।" তাঁহার সীতারাম অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত কবি গাহিয়াছিলেন :—

অশ্বপৃষ্ঠে "সীতারাম"—কি অপূর্ব্ব শোভা !
ছুটে যেন রোধিবারে গিরিশ-প্রতিভা !

নটগুরু সনে রণ !
দম্ভে করে আস্ফালন
"ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা ।"

সীতারামের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন ও অভিনয় সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১৯শে জুলাই, ১৯০০) বলেন :—

"Babu Amarendra Nath Dutt is a firm believer in the maxim, "whatever thy hand endeth to do, do it with all thy might," and he has given a practical proof of his belief in dramatising "Sitaram" and putting it on the boards with himself in the name part. The original, admittedly, does not lend itself to the purposes of the stage, and liberties have therefore been taken with a view to rendering the text not only stage-worthy, but also considering the present day taste, audience-worthy. Expansion of characters is one of the things, nay, it is necessary, when the original is a synthetic or suggestive kind. The characters of Sitaram and Chandra Chura have, therefore gained by the expansion. But creation is "another story." The characters of Jiban Bhandari, his worthy spouse, and his tiny son as introduced in a scene set apart for them, as also those of Ramchand and Shamchand are evidently meant to represent comic relief, the well balanced audience owe the dramatiser "much thanks". Sitaram and his two wives are made short work by being tempted with a river whereinto to make a tragedy closing jump. This arrangement,

convenient as it may be for the purpose of a tragic end, is going beyond the cards. So far for the dramatisation. When all is said for and against it, the "for" will be found immeasurably to outweigh the "against." Now about the rendering. Sitaram, as is already mentioned, is in the hands of the dramatiser, who ranges over the whole gamut of feelings with exceptional skill. The cooing of the dove, the sighing of the furnace and the roaring of the lion come equally handy to him. The make-up however is not as happy as can be. * * This however does not detract in the least from the merits of the impersonation. The songs, which the renderer of Sri sings, are well composed in both words and tune and they are done capital justice to by her. Sri, is on the other hand, a difficult part to tackle and it must be said to the credit of the actress entrusted with it, that she comes off the ordeal, not only unscathed but also with flying colours. The representative of Roma is seen in her best in the Durbar Scene. * * * Jayanti was played with a resignation which sits so well on the character. The scene in which she is put up for brutal punishment, is one of the powerfullest ever enacted on the stage. The house is strung up to concert pitch, and the conduct of those upon the stage, is quite in keeping with the stirring event. Gangaram is in veteran hands, and the only suggestion

that can be offered him is to invest in one of the various specifics that are advertised for sale as promising to cure loss of memory. Chandra Chura is a character which fits the player like a proverbial glove. * * Conscientiousness and earnestness mark the prominent players and small wonder that their efforts meet with due recognition at the hands of those to whom they appeal. The dressing and mounting need no separate comment as the enterprise of the management in this connection is so well known. The play has "grit" in it, and it is destined to keep the stage for some time yet."

ইহা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের কোন কোন জীবনীকার বলেন যে, সীতারাম অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। কোন্ যুক্তিবলে তাঁহারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই। ক্লাসিক থিয়েটারে সীতারাম উপর্য্যুপরি সাত শনিবার ধরিয়া অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডব-গৌরব, ভ্রান্তি প্রভৃতিরও একাদিক্রমে ইহার অধিক রাত্রি অভিনয় হয় নাই। তাহা ছাড়া তখনকার থিয়েটার পরিচালনা রীতি আজকালকার মত ছিল না। তখনকার দিনে থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা কোন নাটকের একাদিক্রমে অনবরত অভিনয় করিয়া, তাহাকে পুরাতন করিয়া ফেলিতেন না। ভবিষ্যতে সে নাটকের পুনরভিনয়ে যাহাতে দর্শকগণের কৌতূহল সমভাবে জাগরিত থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই অভিনয় তালিকা (প্রোগ্রাম) নির্ব্বাচিত হইত। তাই আমরা এখন পর্য্যন্ত ভ্রমর, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, প্রফুল্ল,
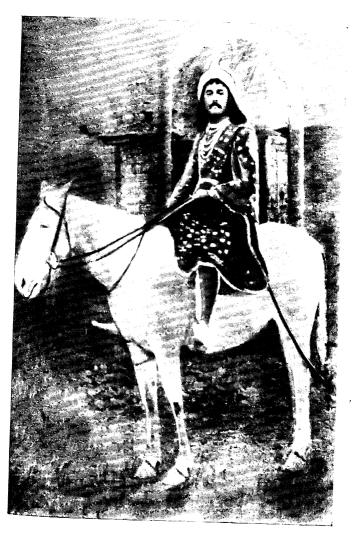
'সীতারাম' নাটকে সীতারামের ভূমিকায়
অশ্বারোহণে অমরেন্দ্রনাথ।

বলিদান, প্রভৃতির অভিনয়ে দর্শকের যথেষ্ট সমাগম দেখি। সে যাহা হউক, মিনার্ভাতেও সীতারামের অভিনয় একাদিক্রমে ক্লাসিকের অপেক্ষা বেশী রাত্রি হয় নাই ; যদিও বা হইয়া থাকে তো এক আধ রাত্রি। কিন্তু দর্শকের সমাগম ক্লাসিকে মিনার্ভা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইয়াছিল। তবে আমরা গিরিশচন্দ্রের 'সীতারাম' অভিনয় দেখি নাই। হইতে পারে, কাহারও কাহারও মতে সে অভিনয় অমরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা উচ্চাঙ্গেরই হইয়াছিল। কিন্তু যদি তাহা হইয়াও থাকে, তাহাতে অমরেন্দ্রনাথের অগৌরবের কোন কারণ দেখি না, কেন না, গিরিশচন্দ্র তাঁহার অভিনয় দ্বারা অমরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার এক কণাও হানি করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ এইটুকু আমরা জানি যে, তিন রাত্রি সীতারামের অংশে অবতীর্ণ হইবার পর, গিরিশচন্দ্র আর নিজে না সাজিয়া, সে ভূমিকা চুণিলাল দেবকে দিয়া দেন। ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের নিকট সীতারাম অভিনয়ে পরাজিত হইয়াছিলেন ?

যাহা হউক, উভয় থিয়েটারে অভিনয়ব্যাপারে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। উভয় থিয়েটারই হ্যাণ্ডবিলে পরস্পরকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ লিখিলেন,—"নট, নর্ত্তকী ও নাপিত—তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।" শুধু তাই নয়, গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, নানাপ্রকার ছড়া কাটিয়া হ্যাণ্ডবিলে ছাপান স্থুরু হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ব্যঙ্গচিত্রও বাহির হইতে লাগিল। কোনটাতে হয়ত দাঁড়িপাল্লা আঁকিয়া একদিকে অমরেন্দ্রনাথকে ও অপরদিকে গিরিশচন্দ্রকে বসান হইল ; অমরেন্দ্রনাথের দিক ভারী হওয়ায় নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িল, গিরিশচন্দ্রের দিক হাল্কা হওয়ায় উপরের দিকে উঠিয়া গেল। আবার

অন্য কোন কার্টুনে হয় ত' 'টাগ-অফ-ওয়ার'—দড়ি লইয়া টানাটানি হইতেছে, অমরেন্দ্রনাথের দল হেলায় গিরিশচন্দ্রের দলকে হারাইয়া দিতেছে। এইরূপে উভয় থিয়েটারের তুলনায় ক্লাসিকই যে গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত মিনার্ভা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহাই দর্শকগণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রও কোমর বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে নামিলেন। তিনি হ্যাণ্ডবিলে ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন :—"Our representation, we feel bold to say, will prove to them that howling is not acting and that such a subject, at once serious and sublime ought not to be handled by quacks who will unscrupulously lay their hands on the most complicated cases without possessing the requisite qualification of even a common-place amateur."

উত্তরে অমরেন্দ্রনাথ লিখিলেন,—"We do not know—rather we are not ambitious of making a gigantic preface, but to appeal to our patrons and friends with due courtesy and dignity to come and see our performances and then compare! No doubt they will find a difference of Heaven and Hell! No more for the present! Now good bye!"

গিরিশচন্দ্রও হটিবার পাত্র নন, তিনি পরদিন সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনীতে লিখিলেন :—

'N. B. It has been said that there is a difference of Heaven and Hell! Aye! Let us hope so at least."
জনসাধারণ জয়মাল্য কাহাকে পরাইলেন, তাহা উভয় থিয়েটারের পরবর্ত্তী ইতিহাসেই প্রকাশ।

এই দ্বৈরথ সমর শুধু থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপনীতেই আবদ্ধ

রহিল না। সীতারাম অভিনয়ের পর, গিরিশচন্দ্রকে ও মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারকে ব্যঙ্গ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ "থিয়েটার" নামে এক কৌতুকনাট্য রচনা করিলেন। তখন ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথের পরম বন্ধু স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সোনার স্বপন" নামে এক গীতিনাট্য মহলায় পড়িয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, আগামী শনিবার ঐ অপেরা ও স্বরচিত নব প্রহসন—এই উভয় পুস্তকেরই একসঙ্গে প্রথম অভিনয় করিবেন। তিনি তদনুযায়ী অনুজ্ঞাও দিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন কারণে আরও এক সপ্তাহ অভিনয় পিছাইয়া দিতে হইল। কি সে কারণ, তাহা রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের ভাষাতেই আমরা বলিতেছি। এই ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ অমরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের আরও খানিকটা পরিচয় পাইবেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে এমন তুচ্ছ কারণে কোন পুস্তকের প্রথমাভিনয় পিছাইয়া দেওয়া, বড় কম মহত্ত্বের লক্ষণ নহে। বৈকুণ্ঠবাবু লিখিয়াছেন :—

"যখন ক্লাসিক থিয়েটার খুব জমিয়াছিল, সেই সময়ে এক রবিবার রাত্রে তিনি নৃত্যশিক্ষক ও সঙ্গীতশিক্ষককে বলেন যে, "আমি আজ যে কৌতুক নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছি,—আগামী সোমবার দিনের বেলা হইতে তাহার রিহার্সাল আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শনিবারেই তাহার অভিনয় করিতে হইবে।" তাঁহারা "তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সোমবার বেলা তিনটার সময় অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারে আসিয়া দেখিলেন, নূতন নাটকের নাচগান শিক্ষা চলিতেছে; কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়া, সন্ধ্যার সময় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও দেখেন নাচগান চলিতেছে। নৃত্যশিক্ষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বালিকারা কাজ করিতেছে দেখিয়া গিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে আবার তাহাদিগকে আনাইয়াছ ?"

"নৃত্যশিক্ষক উত্তর দিলেন, "উহাদিগকে আদৌ ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।"

"অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের আহারাদির কি ব্যবস্থা হইয়াছিল ?"

"উত্তর শুনিলেন, "বাজার হইতে মিষ্টান্নাদি আনাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

"অমরেন্দ্রনাথ বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "কি! ইহারা পরশু ও গতকল্য সমস্ত রাত্রি অভিনয় করিয়াছে। এখনও ইহাদের পেটে অন্ন পড়িল না! এখনই ইহাদের ছাড়িয়া দাও; আর বলিয়া দাও, কালি হইতে ভাত খাইয়া বেলা দুইটার সময় আসে।"

"নৃত্যশিক্ষক কহিলেন, "তাহা হইলে আগামী শনিবারে নূতন পুস্তক অভিনয় করা অসম্ভব।"

"অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অভিনয় না হয় আর এক কি দুই সপ্তাহ পিছাইয়া যাইবে। দুগ্ধপোষ্যা বালিকা বধ করিয়া আমি ব্যবসায় চালাইতে চাহি না।"

"এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকাগাড়ী ডাকাইয়া বালিকাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অনেক সময় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিনেতা বা কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইয়াছে, পরে তাহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া স্বয়ং ডাকাইয়া আবার তাহাদিকে স্ব স্ব কার্য্যে বহাল করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা বিরল নহে।"

২৫শে আগষ্ট (১৯০০), ক্লাসিকে "সোনার স্বপন" ও থিয়েটারে"র প্রথম অভিনয় হইল। আমরা সে রজনীর পরিচয় লিপি নিম্নে দিলাম :—

সোনার স্বপন :—বিভোর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মন্দানিল— নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু,

মলয়ানিল—ননীলাল বন্দোপাধ্যায়, লহরা—কুসুমকুমারী, নীলপরী—ভুবনেশ্বরী, লালপরী—বিনোদিনী (হাঁদি), শ্বেতা—রাণীসুন্দরী।

থিয়েটার ঃ—গুণেন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বরেন—অহীন্দ্রনাথ দে, যতীন—বিনোদিনী (হাঁদি), নটবর—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, খাঁটিচাঁদ—জীবনকৃষ্ণ সেন, রসময়—নটবর চৌধুরী, স্বর্ণলতা—রাণীসুন্দরী, রসবতী—কুসুমকুমারী, ক্ষেন্তমণি—হরিদাসী (গুলফম), পটলসুন্দরী—পটল।

"সোনার স্বপন" গ্রন্থখানি অমরেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রে একটু অভিনবত্ব আছে, তাই সেখানি আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম ঃ—

ভাই অমরেন্দ্র !

বিমলোজ্জ্বল অরুণ-আভা ভাতে যার হৃদাকাশে ;
জীবিত-কুসুম সুষমারাশি মধুর মাধুরী পরকাশে।
ভালে যাহার দিব্য-আলোক—কান্তি-কোমল গরিমা-পুলক,
সরল-প্রীতি বান্ধব-প্রেম—বিকাশে যাহার উচ্চ-আশে ;
সদা বাঁধা যথা স্নেহ-মমতা—কাব্য প্রতিভা প্রেম সরলতা,
আপনা ভাবিয়া জগজনে যেবা টানে অন্তরাবাসে ;—
সেই তুমি মম হৃদয়-বন্ধু, কবিতার সাথী অমৃত-সিন্ধু,
গৌরব-ছবি উজল ইন্দু, বঙ্গ রঙ্গ নিবাসে।
ভো সুধীবর ধী-শকতিমান্—চরিত চিত্রকর প্রধান !
নাট্যামোদী নাটকাখ্যান-কারী ক্লাসিকালো হে !
দীন কবি আমি কোথা কি পা'ব ?
তোমার বাগান কি দিয়ে সাজাব ?
সোনার স্বপন ক্ষুদ্র মুকুলে জ্যোতিঃ তোমার ঢাল হে !—

হাতে তুলে দিনু দেখো ভাই দেখো,
যে ভাবেতে পার রেখো ভাই রেখো,
ঘুমপোরা চোখে সোনার স্বপন তোমারে সঁপিনু উল্লাসে,
পুরস্কার—তিরস্কার—পুরুষকারে প্রকাশে।

২২।২৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩০৭, ১লা ভাদ্র, শুভ জন্মাষ্টমী।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্ল—

"সোনার স্বপন" ও "থিয়েটারে"র যুগ্ম অভিনয় সম্বন্ধে আমরা দুটী সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন ঃ—

"In spite of a scowling sky, which subsequently developed into a heavy shower, the splendid double programme drew an immense crowd and there were many, who had to come away disappointed for want of space. * * The enterprising young Manager performed the role of hero, appeared in his usual colours and was repeatedly applauded by the admiring audience. The pantomime commenced with an amusing antique dance in the old Kabi style, which was much enjoyed. There are brilliant touches of wit and humour scattered all over the play. There was no lack of originality on the author's part. Some portions were really instructive. On the whole, we congratulate the company and its young manager Babu Amarendra Nath Dutt on their successful double performance and hope that the

public will continue to encourage them in the way they are doing now."

৯ই সেপ্টেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' বলেন :—

"The opera (Sonar Sapan) is followed by a new after-piece which goes by the name of 'Theatre', and which seems to send the auditors off their balance. It is cruelly conceived, for no sooner than they recover from the convulsion of laughter brought about by one charge of battery than another fit seizes them. There is matter enough and to spare in the piece to make the unskilful laugh but there are also passages and situations and transactions hinted at in it, such as are calculated to make the judicious grieve. The rendering however is characterised with a 'go', such as would strike even the most unsympathetic critic. * * * The "stage upon stage" scene, presents the climax and the scene is rendered with marked effect. The prologue song, which is sung after the now disappearing "Kobi" style, prepares the audience for what is to follow, and the concluding dance sends them home thinking how each succeeding "song and dance" piece unfolds a fresh page in the comprehensive volume of the dancing master's brain."

অমরেন্দ্রনাথ খুব সুখ্যাতির সহিত একই দিনে "বিভোর" ও "গুণেন" এই বিভিন্ন রসসমন্বিত দুইটী ভূমিকার অভিনয় করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। সঙ্গে সঙ্গে "সোনার স্বপন" ও "থিয়েটারে"র অসামান্য

সাফল্য দর্শনে, অন্য লোকেরা ত' দূরের কথা,—নিজেই বিস্মিত হইয়া যান। অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই বলিতেন,—"সোনার স্বপন ও থিয়েটারের মত বিক্রয় আমি অন্য কোনও বই হইতে পাই নাই।" এই বিক্রয়াধিক্যের স্রোতে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারকে খাড়া রাখিতে পারিলেন না। অমরেন্দ্রনাথকে পাল্‌টা ব্যঙ্গ করিয়া, নরেন্দ্রনাথ সরকার "সাধের বাসর" নামে একটী কৌতুকনাট্য রচনা করিয়া থিয়েটারে অভিনীত করাইলেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু সুবিধা হইল না। নূতন নাটক লিখিয়া, পুরাতনের পুনরভিনয় করিয়া, স্বয়ং যোগেশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভূমিকায় নামিয়া, গিরিশচন্দ্র থিয়েটার জমাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন। শেষে "সধবার একাদশী"তে নিমচাঁদের অংশে—যাহাতে, 'মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,

প্রথমে দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার'—

সেই নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথও ১৪ই অক্টোবরে, 'মাত্র এক রাত্রির জন্য' বিজ্ঞাপন দিয়া, প্রতিযোগিতায় "সধবার একাদশী"র অভিনয় করিলেন। প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বণ্টিত হইল :—

নিমচাঁদ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অটল—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, জীবনচন্দ্র—চণ্ডীচরণ দে, নকুলেশ্বর—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ঘটিরাম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কেনারাম—নটবর চৌধুরী, কাঞ্চন—কুসুমকুমারী।

গিরিশচন্দ্রের তুলনায় অমরেন্দ্রনাথের নিমচাঁদ যে অনেক নিকৃষ্ট হইল, তাহা লেখাই বাহুল্য। কিন্তু হইলে কি হয়, গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় টেঁকিতে পারিলেন না। এই নিমচাঁদই বোধহয় তাঁহার সেখানকার শেষ অভিনয়। তিনি স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রবাবুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, "তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো, ক্লাসিকের সহিত

প্রতিদ্বন্দিতায় আগে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হউক, তাহার পর তোমাকে আমি তৈয়ারী করিয়া দিব।” কিন্তু ক্লাসিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শক সমাগম দেখিয়া, নরেন্দ্রবাবু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তিনি গিরিশচন্দ্রের সহিত এগ্রিমেণ্ট বাতিল করিয়া দিয়া, তাঁহাকে বরখাস্ত করিলেন ও ২৪শে অক্টোবর হইতে নিজেই মিনার্ভার ম্যানেজার হইয়া বসিলেন। গিরিশচন্দ্র রাগিয়া ‘লাল’ হইয়া গিয়া, বাড়ীতে গিয়া বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু তিনকড়ি ব্যতীত তাঁহার দলের অন্য সকলে (যথা, দানিবাবু, অঘোর পাঠক, প্রভৃতি) ঐ ২৪শে অক্টোবর তারিখ হইতে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়া আসিলেন। সেদিন কলিকাতায় দেওয়ালী উৎসব ; ক্লাসিকে পলাশীর যুদ্ধ ও নলদময়ন্তী অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে দানিবাবু সিরাজ ও প্রবোধ ঘোষ মোহনলাল এবং শেষোক্ত নাটকে অমরেন্দ্রনাথ নল, দানিবাবু বিদূষক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ কলি ও কুসুমকুমারী দময়ন্তী সাজিলেন। ক্লাসিক অপ্রতিহত গতিতে নাট্যজগতে রাজত্ব করিতে লাগিল।

বস্তুতঃ এই সময়ে ক্লাসিক ব্যতীত অন্য সমস্ত থিয়েটারের দুর্দ্দশা স্মরণ করিলে বাস্তবিকই দুঃখিত হইতে হয়। মিনার্ভার অবস্থা ত’ সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। বেঙ্গল থিয়েটারের কথা কিছু না বলাই ভাল, কেন না ইহার কিছুদিন পরেই ঐ থিয়েটার উঠিয়া যায়। আর যে ষ্টার থিয়েটার একদিন নাট্যজগতের শীর্ষদেশে ছিল, তাহার এমন দুরবস্থা হইল যে, বাড়ীভাড়ার খরচ না থাকা সত্ত্বেও, মাস মাস অভিনেতা অভিনেত্রীর মাহিনা যোগাইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তাহার বিলুপ্ত হইল। শুধু তাই নয়, অমৃতলাল বসু মহাশয়ের হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হওয়ায়, তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথের নিকট “সরলা”র নাট্যরূপ বিক্রয়ার্থ পাঠাইলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার অর্থের প্রয়োজন

শুনিয়া সাগ্রহে তাহা ক্রয় করিলেন ও এবার ষ্টারের সহিত প্রতি-যোগিতায় অগ্রসর হইয়া, ১১ই নভেম্বর তারিখে ক্লাসিকে "সরলা"র প্রথম অভিনয় করিলেন। সে রাত্রে ভূমিকা বণ্টন হইল এইরূপ :—

বিধুভূষণ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশীভূষণ—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, গোপাল—জানি, গদাধর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), বিপিন—বিনোদিনী (হাঁদি), নীলকমল—অক্ষয়-কুমার চক্রবর্ত্তী, রমেশ—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণু বাবু), রামধন—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সরলা—কুসুমকুমারী, প্রমদা—প্রমদাসুন্দরী (পরে তারাসুন্দরী), শ্যামা—হরিদাসী (গুলফম)।

আগে যেমন ষ্টারে "সরলা"র সুনাম ছিল, এবার সেইমত ক্লাসিকে "সরলার" সুখ্যাতিতে দর্শকগণ মুখরিত হইয়া উঠিল। বিধুভূষণের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করিলেন। এই ভূমিকায় তাঁহার এত সুনাম হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে যখনই তিনি এই অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কখনও আশাতিরিক্ত দর্শকের অভাব হয় নাই। তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধানে' (২৯শে কার্ত্তিক, ১৩০৭) লিখিয়া-ছিলেন :—

"যাহা কখন পুরাতন হয় না, যাহাতে কখনও অরুচি হয় না, তাহাতে যদি নূতনত্বের আদেশ করিয়া, নূতন রসের সঞ্চার করিয়া, নূতন ভাব উদ্রেকের চেষ্টা হয়—তবেই সে চেষ্টা সার্থক এবং যে চেষ্টা করে, তাহার সার্থক জীবন! বলিতে কি সেদিন ক্লাসিকে সরলার অভিনয়ে আমরা অনেক নূতনত্ব দেখিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস ছিল, অভিনয় ব্যাপারে প্রথমে যেরূপ ভাব প্রদর্শিত হয়, অনুকরণে তাহার আর উৎকর্ষতা সাধন হয় না। ক্লাসিকে সরলার অভিনয় দর্শনে, আমাদের সে ভ্রম দুর হইয়াছে। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে, আমরা

'সরলা' নাটকে বিধুভূষণের ভূমিকায়
অমরেন্দ্রনাথ।

বিধুভূষণের অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। বিধুভূষণ সাজিয়াছিলেন, ক্লাসিকের অমর অভিনেতা অমরেন্দ্র। এরূপ গার্হস্থ্য নাটকের অভিনয়ে অমরেন্দ্রবাবু যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা তুলনার যোগ্য নহে। * *অধিক আর কি লিখিব? ক্লাসিক থিয়েটারে যেরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত, সেইরূপ অভিনয় চাতুর্য্য এবং ততোধিক লোক সমারোহ। অমর! তুমি অমরকীর্ত্তি লাভ কর।"

গদাধরের ভূমিকায় দানিবাবুও অসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, এই তাঁহার ক্লাসিকে প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয়। পূর্ব্বে বেলবাবু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু গদাধররূপী দানিবাবু এমন বিমল হাস্যরসের সৃষ্টি করিতেন, যে দর্শকগণ সময়ে সময়ে বেলবাবুকে ভুলিয়া যাইত। গদাধরের ভূমিকায় দানিবাবুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও সে ছবি ভুলিবেন না। অমরেন্দ্রনাথ পরে—১৬ই নভেম্বর, (১৯১০) তারিখে—এক রাত্রির জন্য গদাধরের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু এ ভূমিকার অভিনয়ে তিনি দানিবাবুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

এ দিকে গিরিশচন্দ্র যে বাড়ীতেই বসিয়া আছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অমরেন্দ্রনাথকে সকলে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহার চেষ্টা করিয়া গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ক্লাসিকে আনা উচিত। অমরেন্দ্রনাথ গিয়া গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তখনও হ্যাণ্ডবিল-দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড অপমানের জ্বালা ভোলেন নাই। তিনি অমরেন্দ্রনাথের প্রকাশ্য ত্রুটী স্বীকার ও "থিয়েটারে"র অভিনয় বন্ধ ভিন্ন ক্লাসিকে ফিরিতে সম্মত হইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আপনি আমার পূজ্য ব্যক্তি, গুরু তুল্য; সুতরাং আপনার কাছে ত্রুটী স্বীকারে আমার আপত্তি কি? যেভাবে প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনা বা

ক্রটী স্বীকার চান, লিখিয়া দিন, আমি তাহা হ্যাণ্ডবিলে ছাপাইয়া দিব। কিন্তু আমার অনুরোধ, ভবিষ্যতে আবার বখরা টখরা চাহিয়া অনর্থক মনোবিবাদের সৃষ্টি করিবেন না। আর "থিয়েটার" বন্ধ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু তাহা করিব কি করিয়া? উহা এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে, আমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিলে আপনি মনে করিবেন যে আমি বাড়াইয়া বলিতেছি। আপনি স্বয়ং থিয়েটারে গিয়া অভিনয় দেখিয়া তাহার জনপ্রিয়তা পরীক্ষা করুন। তাহার পর যদি "থিয়েটার" বন্ধ করিতে বলেন, আমি রাজী আছি।" বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র অবুঝ ছিলেন না, অভিনয় দেখিবার পর তিনি কখনও সে অনুরোধ করেন নাই।

মিনার্ভা ত্যাগের ঠিক এক মাস পরে, অর্থাৎ ২৪শে নভেম্বর, ১৯০০ (৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭) তারিখে গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্লাসিকে যোগদান করিলেন। সেদিনকার ক্লাসিক থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" বলিয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইল :—

"নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুল চূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত, আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকল গুলিরই সৃষ্টিকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র! প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই—'গিরিশচন্দ্রে'র শিক্ষায় গৌরবান্বিত! তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশ বাবুর সহিত বিবাদ করিয়া, নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম।—বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশ বাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন

নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন 'ক্লাসিকে' অভিনীত হইবে। "ক্লাসিক থিয়েটার" ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র' এখন 'ক্লাসিকের'! নিবেদনমিতি।"

শুধু গিরিশচন্দ্রকে আনিয়াই অমরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হইলেন না। তখন তারাসুন্দরীও ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিলেন। লোক-মুখে তাঁহার ক্লাসিকে যোগ দিবার ইচ্ছা শুনিয়া, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকেও ক্লাসিকে আনিয়া অষ্টবজ্র সম্মিলন করাইলেন।* বাকী ছিল শুধু তিনকড়ি, তা তিনিও কিছুদিন পরে মিনার্ভা উঠিয়া গেলে ক্লাসিকে যোগ দিলেন। বস্তুতঃ সে সময় ক্লাসিকে যেমন নটনটীর সমাবেশ হইয়াছিল, তাহা নাট্যজগতে কখনও হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ ব্যতীত, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, দানি বাবু, অঘোর পাঠক, প্রবোধ ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রাণু বাবু, অক্ষয় চক্রবর্ত্তী, নটবর চৌধুরী, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্র দে, সঙ্গীতাচার্য্য দেবকণ্ঠ বাগচী, বংশীবাদক অমৃতলাল ঘোষ, হারমোনিয়ম-শিক্ষক ভূতনাথ দাস, ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্ম্মদাস সুর ও আশুতোষ পালিত, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, রাণীসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা (বুঁচি), ফিরোজাবালা, লক্ষ্মীমণি, গুলফম হরি, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গই তখন ক্লাসিকে বিরাজমান। সে একদিন গিয়াছে,—যখন নাট্যজগতের

---

* তারাসুন্দরী ক্লাসিকে আসিয়া, ১৫ই ডিসেম্বরে অমরেন্দ্রনাথের 'নির্ম্মলা' গীতিনাট্যে নির্ম্মলার অংশে দর্শকগণকে প্রথম অভিবাদন করেন। অমরেন্দ্রনাথ হ্যাণ্ডবিলে লিখিয়াছিলেন :—নির্ম্মলা—জগদ্বিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

প্রায় সকল সার সার রত্নগুলিই ক্লাসিকে সমবেত হইয়াছিলেন!—রঙ্গালয়ের অমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—অমন দেশব্যাপী সুখ্যাতিগৌরব বুঝি বঙ্গীয় নাট্যজগতে আর কোনও নাট্যশালার অদৃষ্টে ঘটে নাই!

ক্লাসিকের এই অকল্পনীয় প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১৩০৭ সাল, ১৫ই মাঘের "রঙ্গভূমি"তে প্রকাশিত "ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থ ই বলিয়াছিলেন ঃ—

"শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম জানে না, বাঙ্গালা দেশে এমন লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে নাট্যজগতে তাঁহার মত দ্বিতীয় কীর্ত্তিমান্ পুরুষ তো দেখি না। * * এখন তাঁহার একাদশ বৃহস্পতি। * * ভাগ্যবান্ পুরুষের সকল লক্ষণ অমরেন্দ্রনাথে পূর্ণ মাত্রায় আছে, * * যে সম্ভ্রান্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতার সহিত তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাহাতে এমনটী না হওয়াই বিচিত্র। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন যেমন সমধিক গৌরবের কথা নহে, পরন্তু তাহা পালন না করিলে ঘোর প্রত্যবায় ও অধর্ম্ম আছে; সম্ভ্রান্তবংশীয় বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্য-কুশল অমরেন্দ্রনাথেরও তেমনি ঐ সকল গুণ না থাকাই দোষের কথা। * * *

"সত্যই থিয়েটার মহলে অমরেন্দ্রনাথের একরূপ অসম্ভাবিত পসার প্রতিপত্তি হইয়াছে। থিয়েটার-দর্শনেচ্ছু স্ত্রীপুরুষ, এখন অমরেন্দ্রনাথের নামে পাগল হয়। এমন দিন নাই যেদিন ক্লাসিক থিয়েটারে লোক পরিপূর্ণ না হয়। অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবামাত্র, দর্শকবৃন্দ আনন্দে করতালি দিতে থাকে; তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও অভিনয় দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। * *

"এমনটি কেন—বলিতে পার? যে নাটক হোক্—ক্লাসিকের এত প্রতিপত্তি কিসে বল দেখি? মুক্তকণ্ঠে বলিব, অমরেন্দ্রনাথের প্রতিভায় ও যোগ্যতার গুণে। বিশেষ অমরেন্দ্রনাথের প্রতিভাপূর্ণ মুখমণ্ডল ও মিষ্টভাষে, এবং সৌজন্য ও সমাদরে, সকলেই মুগ্ধ। অমরেন্দ্রনাথ মানুষ চেনেন; মানুষের মনের ভাব বুঝিতে পারেন—দেশের হাওয়া বুঝেন; তাই কঠিন কার্য্যক্ষেত্রের এই ঘোর প্রতিদ্বন্দিতার দিনে আজ তিনি জয়যুক্ত। * *

"আসল কথা,—অমরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া এখন অনেকেরই হিংসা হয়। তাঁহার ভাল দেখিয়া হিংসা হয়, তাঁহার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া হিংসা হয়, তাঁহার গুণগরিমা দেখিয়া হিংসা হয়, তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠা দেখিয়া হিংসা হয়; সর্ব্বোপরি তাঁহার অজস্র অর্থ সমাগম দেখিয়া হিংসা হয়। অমরেন্দ্রনাথ যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া, একরূপ জীবন সঁপিয়া, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, একমাত্র থিয়েটার ধ্যানজ্ঞান করিয়াছেন, দিনরাত সেই ভাবেই বিভোর আছেন, কেহ দেখিবে না, বুঝিবে না এবং বুঝাইয়া বলিলেও মানিবে না,—কেবল ভাবিতে থাকিবে,—এক সহযাত্রী আমরা, একের ভাগ্যে কেন চতুর্দ্দোলা আসন হইল, আর আমরা কেন সেই আসন স্কন্ধে লইয়া বহিয়া মরি?—বিধাতার একি অবিচার,—মানুষের একি মহাভ্রম! ঐ দত্তদের বাড়ীর কালকের কেলো ছোঁড়া—আ-মর—সে এখন থিয়েটার রাজ্যের রাজা হলো—বঙ্গের আরভিং হেলো—আরও কত কি হোলো—আর আমি কতকালের ভিটিরান এক্টর, আমি একজন নামজাদা থিয়েটারওয়ালা—আমার বেলায় কিছু নেই!—কিছু নেই কেন তাহা কি একটু নিবিষ্টচিত্তে কখনও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছ? তুমি চিরদিন জগৎকে অর্থাৎ আপনাকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছ,—এখন কাল পূর্ণ

হইয়াছে,—এখন তুমি ফাঁকি পড়িবে না ত, ফাঁকি পড়িবে কি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মত উদ্যমশীল, কৃতকর্ম্মা, উদ্যোগী পুরুষ?

"আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি এবং প্রার্থনাও করি, অমরেন্দ্রনাথ মতি স্থির ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বিধাতার বিধানে নির্ভর করিয়া গন্তব্যপথে চলিতে থাকুন; আদর্শমূলক উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়ে দেশের লোককে এক সোপান উচ্চে তুলুন; গুণী কৃতী লেখকগণকে অর্থ দিয়া এবং তাহাদের গ্রন্থ লইয়া, উদার উন্নত প্রণালীতে থিয়েটার চালাইতে থাকুন। "নূতন বা বাহিরের গ্রন্থকারকে আমল দিও না, নিজের পসার নষ্ট হইবে"—এই হীননীতি কুমন্ত্রণা গ্রাহ্য না করিয়া, তিনি সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্র হইতে রত্ন আহরণ করুন। দেখিবেন অল্পকাল মধ্যে তিনি দেশের একটা স্থায়ী উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভগবানের রাজ্যে সাধুতার বা সদিচ্ছার পূরণের কখনই ব্যর্থ হয় না।"

দশম পরিচ্ছেদ

—:o:—

বায়স্কোপ ও "রঙ্গালয়"

(১৯০১)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের নববর্ষের দিন, ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথের নূতন কৌতুক নাট্য 'চাবুকে'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি এই :—

মট্‌কমোহন—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ময়ূরচাঁদ—অহীন্দ্রনাথ দে, ভ্যাবাকান্ত—চণ্ডী-চরণ দে, গবাকান্ত—নটবর চৌধুরী, প্রিয়লাল—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্যালারাম—অক্ষয়-কুমার চক্রবর্ত্তী, মোল্লাচাঁদ—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টর—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, তরঙ্গিনী—কুসুমকুমারী, মদনমোহিনী—রাণীসুন্দরী।

'চাবুক' সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১১ই জানুয়ারী) লিখিয়াছিলেন :—

"* * * As to the get up of the piece, it would suffice to say that it is in the Classic's best. From the introduction of the lady Highlanders in the opening scene down to the dance of the girls on serpent's hood in the closing one, the "Chabuk" is a characteristic showpiece, neither money on the part of the management nor invention or design on that of the dancing master, having been spared to render the representation acceptable to the play goer of the season. As to the literary portion of the piece, the author has

attempted to make the play more intellectual than any he has written in a similar direction. A number of songs are sung, prettily composed in verse and tune, but so far as the wording is concerned the best of the lot is that, which is sung by "Airy girls" and which strings together in a highly ingenuous way, the names or works of some of the distinguished literary lights of modern Bengal. * *"

"চাবুক" রচনার কিছুদিন পূর্ব্বে, কি কারণে 'বঙ্গবাসী'র সুযোগ্য সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ বসুর সহিত অমরেন্দ্রনাথের মনোমালিন্য ঘটে। অমরেন্দ্রনাথ যোগেন বাবুর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া "চাবুক" রচনা করিয়া, থিয়েটারে অভিনয় করান। যোগেনবাবু তাহাতে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বাগানে গিয়া অমরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার ঐকান্তিক অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ মাত্র ছয় রাত্রি অভিনয়ের পর, "চাবুক" বন্ধ করিয়া দেন।

এই সময়ে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গগমন উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র "অশ্রুধারা" নামে একটী সময়োচিত ক্ষুদ্র নাটিকা প্রণয়ন করেন। ২৬শে জানুয়ারী, অশ্রুধারার প্রথম অভিনয় হয় ও অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে ১ম ভারতসন্তানের অংশ গ্রহণ করেন। চারি রাত্রি অভিনয়ের পর অশ্রুধারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ক্লাসিকে এমন একটী ঘটনা ঘটে, যাহার মূল্য সে সময় তেমন কিছু না হইলেও, বর্ত্তমানের চক্ষে বিচার করিলে, বিশেষ মূল্যবান্। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১, অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয়তালিকায় ঘোষণা করেন—

BIOSCOPE—Series of superfine pictures from our world renowned plays—Vramar, Alibaba, Hariraj, Dole Lila,

Buddha, Sitaram, Sarala &c. will be produced to the extreme astonishment of our patrons and friends.

আমাদের দেশে সিনেমার আমদানী অনেক দিন হইয়াছে, কিন্তু সিনেমা লইয়া বাঙ্গালী মহলে আজকাল যেমন সাড়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে এমন ছিল না। বাঙ্গালী অভিনেতারা এখন সিনেমায় ছবি দিতেছেন। নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত ভারতীয় পৌরাণিক চিত্র "শিবরাত্রি", জে, এফ, ম্যাডানের সম্প্রদায়স্থ বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গের দ্বারা অভিনীত হইয়া সর্ব্বপ্রথম চিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। উহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ফিল্ম। তাহার পর কত শত যে বাঙ্গালী ফিল্ম হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই যে বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গ কর্ত্তৃক ছবি তোলান, ইহারও প্রতিষ্ঠাতা ও পথপ্রদর্শক অমরেন্দ্রনাথ। বাস্তবিকপক্ষে শিবরাত্রি তোলার প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী চিত্রে গৃহীত ও প্রদর্শিত হয়, তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাই। তখন বায়স্কোপ এ দেশে নূতন এবং পাশ্চাত্য দেশবাসীরাও তখন এখনকার মত বড় বড় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের ছবি তোলান নাই। সে সময়ে বায়স্কোপের এমন কিছু আদর ছিল না; মধ্যে মধ্যে থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখান হইত, তাহাও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে। আজকালকার মত সিনেমার জন্য প্রাসাদতুল্য বাড়ীও তখন ছিল না। এখন যেমন সিনেমা দেখা একটা নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তখন ততটা ছিল না, লোকে কখনও কালেভদ্রে বায়স্কোপ দেখিতেন। অমরেন্দ্রনাথ জনসাধারণের কৌতূহল অধিক পরিমাণে উদ্দীপিত করিবার জন্য, অন্যান্য থিয়েটারের মত কেবল বিদেশ হইতে আনীত ছবি দেখাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, কি উপায়ে দেশী ছবি, দেশীয় অভিনেতৃবৃন্দের দ্বারা তোলাইয়া দেখান যাইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞের সহিত পরামর্শ করিয়া.

তাঁহার থিয়েটার সম্প্রদায় লইয়া বিখ্যাত নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের চিত্র উঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে অমরেন্দ্রনাথ সীতারামের ভূমিকা অভিনয় করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ অভিনয় দেখাইলেন, তাহা অপূর্ব্ব ও অনুপমেয়। ইহা ছাড়া আলিবাবায় হুসেন, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরাজে হরিরাজ, সরলায় বিধুভূষণ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধ প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন। নৃত্যাচার্য্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু আবদালা সাজিয়া এবং অন্যান্য অভিনেতৃবর্গ দস্যুসর্দ্দার, দস্যুগণ, মর্জ্জিনা, সখীগণ ও অন্যান্য নাটকে অন্য অন্য ভূমিকা লইয়া বায়স্কোপের চিত্রে যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ গুণানুসারে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালী অভিনেতৃবর্গ কেবল যে থিয়েটারের অভিনয়ে সুদক্ষ তাহা নহে,—বায়স্কোপের নির্ব্বাক অভিনয়েও তাহারা অদ্ভুত পটু। একবার শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রাজপুরুষগণের সম্মুখে এই সকল বাংলা ছবি দেখান হইয়াছিল,— তদ্দর্শনে তাহারা বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালী নটনটীরা বিনা চর্চ্চায় ও বিনা অভিজ্ঞতায় যেরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়—এইরূপ অদ্ভুত অনুকরণশক্তি একমাত্র বাঙ্গালী-জাতির পক্ষেই সম্ভব।"

এই সকল বাঙ্গালা চিত্রাভিনয় দেখিয়া, বাঙ্গালী দর্শকগণ অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং নিজের দেশের ব্যাপার সচল ছবিতে সর্ব্ব-প্রথম দর্শন করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, বাঙ্গালা থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখান আরম্ভ হইলে প্রথম যতটা আগ্রহ ছিল, কিছুদিন পরে তাহা কমিয়া গেল। ক্রমে বায়স্কোপের রজনীতে দর্শকসংখ্যা কম হইতে লাগিল। ইহার অন্যতম

প্রধান কারণ এই যে, সেই সময়ে লোকে সাধারণতঃ ইউরোপীয়গণের বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদও হয় নাই, স্বদেশী আন্দোলনও হয় নাই, সুতরাং লোকে দেশী জিনিষ অপেক্ষা বিদেশী বস্তুই বেশী ভালবাসিতেন। তাই ক্লাসিক থিয়েটারে "থিয়েটার রয়েল" অপেক্ষা বায়স্কোপের দর্শকসংখ্যা অনেক কম হইত। এতদ্দর্শনে অমরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরে তাঁহার থিয়েটারে প্রদর্শিত বায়স্কোপের বিজ্ঞাপনে মহা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া,—অবশেষে হতাশ হইয়া বাঙ্গালী অভিনয়ের চিত্র দেখান বন্ধ করিয়া দিলেন।

উপরোক্ত কারণে অমরেন্দ্রনাথকে বায়স্কোপে বাঙ্গালা ছবি তোলাইবার সাধ বিসর্জ্জন দিতে হইল।* যদিও এখন বাঙ্গালা ছবি তোলা হইতেছে, তথাপি সে সময়ে সহানুভূতি ও উৎসাহ অভাবে, অমরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বিফল মনোরথ হওয়াতে জাতীয়তা হিসাবে আমাদের ক্ষতি হইয়াছে। তখন যদি তিনি কৃতকার্য্য হইতেন, তাহা হইলে আজ আমরা নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে, নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখরকে, নটকুলমণি মহেন্দ্রলালকে, নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথকে, নটরাজ অমৃতলাল মিত্রকে আমাদের চক্ষের সম্মুখে সচল চিত্রে দেখিতে পাইতাম।

বড়ই দুঃখের বিষয়, যে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী প্রথম এই দেশে বায়স্কোপের আমদানী করেন, উৎসাহ ও সহানুভূতির অভাবে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহার নাম হীরালাল সেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ক্লাসিক

---

* অমরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে এ আশা ত্যাগ করেন নাই। তাহার শেষ জীবনে ষ্টার থিয়েটারে অবস্থানকালে তিনি বায়স্কোপ তোলাইবার জন্য সমুদ্রের ধারে উপযুক্ত জমি ক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু কাল তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইতে দেয় নাই। ছবি তোলাইবার পূর্ব্বেই তিনি সুরধামে প্রয়াণ করেন।

থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখাইতে আরম্ভ করেন। উত্তম উত্তম নূতন যন্ত্রপাতি আনাইয়া তাহার দ্বারা তিনি অনেক ছবি তোলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের কতকগুলি নাটকের দৃশ্য তিনিই তুলিয়াছিলেন ; এতদ্ব্যতীত কলিকাতার চিৎপুর রোড প্রভৃতির ছবিও তিনিই তোলেন। এই সকল ছবি তৎকালীন পাশ্চাত্য দেশের ছবির তুলনায় কোনও অংশে হীন ছিল না। বাঙ্গালীর দেশে বায়স্কোপের বাঙ্গালা ছবি তিনিই সর্ব্ব প্রথম তুলিয়াছিলেন এবং অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সম্প্রদায়ই বায়স্কোপের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী অভিনেতা।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের আর একটী ঘটনার উল্লেখ না করিলে অমরেন্দ্র-নাথের জীবনকথা একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেটী "রঙ্গালয়" পত্রিকার প্রকাশ। জাতীয় জীবনে উন্নতির পথে যখন আমাদের জাতি প্রথম অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে কতকগুলি মহাপুরুষ বিধাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জাতির উন্নতির নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে সভ্যতার শীর্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে চিরস্মরণীয় কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় জীবনের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কোন জাতিকে বিশিষ্টতা প্রদান করিতে হইলে, জগতের সমক্ষে সভ্য ও উন্নত বলিয়া পরিচিত করিতে হইলে, তাহাকে সভ্যতার সমস্ত অঙ্গ প্রদান করিয়া সুসজ্জিত করিতে হয়। জাতির দীনতা ও অভাব মোচন করিবার জন্য, আমাদের জাতীয় উন্নতির সেই আদিযুগে পূর্ব্বোল্লিখিত মনীষীগণ সংবাদপত্র

প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিয়া সমগ্র জাতিকর্ত্তৃক সম্মানার্হ ও পূজনীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, অমরেন্দ্রনাথও সেইরূপ নাট্যশালার মুখপত্র ও প্রতিনিধিস্বরূপ সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির একটী বৃহৎ অভাব ও দীনতা মোচন করিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার হইতে "রঙ্গালয়" নামক এক সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাধারণ সংবাদপত্রে নাট্যশালার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইত, তৎসত্ত্বেও নাট্যশালার মুখপত্রস্বরূপ কোন সংবাদপত্র ছিল না। সংবাদপত্রাদি অভিনয়ের গুণাগুণ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন—তাহাতে নাট্য-শালা-সংক্রান্ত সংবাদাদি বা বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাইত না। অমরেন্দ্র-নাথ এই অভাব দূরীকরণ-মানসে "রঙ্গালয়" প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া, তাহার অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলেন। উহার প্রথমাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"নানাবিধ কারণে প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কোপদৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক, প্রতি পদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা! যদি প্রয়োজন হয়,—উক্ত মহাত্মাগণের মনোবিরাগের কারণ, আমরা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরে প্রমাণ করিব। আপাততঃ স্থানোপযোগী হইবে না বলিয়া বিরত হইলাম।

"অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষ গুণের সত্যাসত্য বিচার করেন! হয়ত কোনও সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"অমুক স্থানটী ভাল হয় নাই!"—কেন ভাল হইল না,—মন্দ কোন খানটায়, এবং সংশোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে,—সে সকল কথা কেহই বা বলে, আর কেহই বা শোনে!! অথচ আমাদের

এমন কোনও উপায় নাই, যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য, এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ সমূহ সর্ব্বসাধারণের উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য,—আরও কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়,—কিরূপ শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়,—রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার উদ্দেশে,—**'রঙ্গালয়'** নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে প্রকাশিত হইবে।"

এই পত্রপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই "রঙ্গভূমি" নামক নাট্যশালা-সম্পর্কীয় আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানি চার পাঁচ মাসকালের অধিক স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত "রঙ্গালয়" প্রায় চারি বৎসর সগৌরবে পরিচালিত হইয়া বিশেষ কারণে উঠিয়া যায়। তিনি এই পত্রিকাখানি চালাইতে ও ইহার বহুল প্রচারের জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন। সকলেই যে ব্যবসা করে, তাহা লাভের জন্যই করে। অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু লাভের আশায় খবরের কাগজের ব্যবসা করেন নাই। তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার মুখপত্রস্বরূপ "রঙ্গালয়" সংবাদপত্র বাহির করিয়া, ইহাতে যে খরচ পড়িত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ভাল আইভরি ফিনিস্ কাগজে ইহা ছাপা হইতে লাগিল, ভাল আর্ট পেপারে মুদ্রিত সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গ কর্ত্তৃক অভিনীত নানা নাটকের দৃশ্যান্তর্গত ছবি প্রতি সংখ্যায় এক একখানি করিয়া বাহির হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথের ছবি ঘরে ঘরে রক্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রতি সংখ্যায় খরচ পড়িত ছয় পয়সা কিন্তু গ্রাহকগণ মাত্র দুই পয়সা মূল্যে ইহা পাইতেন ও ইহার বার্ষিক মূল্য মাত্র আড়াই টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল। এরূপ অল্প মূল্যে এত ভাল কাগজ ইহার পূর্ব্বে কেহ

কখনও পান নাই। "রঙ্গালয়" প্রকাশিত হইতেই বঙ্গদেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল—নাট্যজগতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ও গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যরথিগণের রচিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ, মনোরম গল্প, হৃদয়গ্রাহী কবিতা প্রভৃতি সম্বলিত প্রথম সংখ্যা, ১৩০৭ সালের ১৭ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১লা মার্চ্চ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দ, শুক্রবারে প্রকাশিত হইল।* এরূপ অভিনব সংবাদপত্র পাইয়া বাঙ্গালীরা দলে দলে মহা আগ্রহের সহিত "রঙ্গালয়" লইতে লাগিলেন। সে যে কি আগ্রহ, কি অনুরাগ, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রতি সপ্তাহে "রঙ্গালয়" বাহির হইবার দিন, ক্রেতারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে আসিয়া হকারদের নিকট হইতে কাগজ নগদ কিনিতে লাগিলেন; পাছে শেষ হইয়া যায়, এই ভয়ে সকলেই আগে লইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং তখন একরূপ কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। ইহার আরও গ্রাহক বৃদ্ধির নিমিত্ত অমরেন্দ্রনাথ এই নিয়ম করিলেন যে, "রঙ্গালয়ের" গ্রাহক মাত্রেই "অমর গ্রন্থাবলী", "গিরিশ গ্রন্থাবলী" প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক উপহার পাইবেন। ফলে গ্রাহক সংখ্যা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, কোন কোন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করা সত্ত্বেও, পুরাতন সংখ্যাগুলি নূতন গ্রাহককে সরবরাহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়" মারফত ভাবী গ্রাহকদের জানাইয়া দিলেন যে, 'ফাইল' পূর্ণ করিবার জন্য পুরাতন সংখ্যা যোগাইতে তিনি অক্ষম, সুতরাং

* ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খৃঃ রঙ্গালয়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে বলিয়া অনুষ্ঠানপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ করিতে না পারায়, ১লা মার্চ্চে ঐ সংবাদপত্র প্রথম প্রচারিত হয়।

যিনি যখন গ্রাহক হইবেন, তখন হইতে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি কিছুকাল পরে "রঙ্গালয়ে" বিজ্ঞাপন দিলেন যে,—"আমরা রঙ্গালয়ের গ্রাহক-সংখ্যা এক লক্ষ পূর্ণ করিব; এই নিমিত্ত আমরা নিয়ম করিলাম যে, যিনি এই সময় হইতে রঙ্গালয়ের গ্রাহক হইবেন, তিনি একরাত্রি বিনামূল্যে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।" তখন ক্লাসিক থিয়েটার বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার। সুতরাং এইরূপ বিজ্ঞাপন বাহির হইতে, বাঙ্গালী-মহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল ও এই নিমিত্ত আরও শত শত ব্যক্তি ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। "রঙ্গালয়" মহাসমারোহে ও পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল।

"রঙ্গালয়ে"র এইরূপ উন্নতিতে বোধ হয় অন্য কোনও সংবাদপত্রের গ্রাহকসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এই কথা এখানে অবতারণা করার কারণ এই যে, সহযোগী এক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকপত্র অমরেন্দ্রনাথের এই সদনুষ্ঠান ও স্বার্থত্যাগের প্রশংসা না করিয়া, পরিবর্ত্তে পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন, "কালে কালে কতই দেখিব আর কতই হইবে। সংবাদপত্রের গ্রাহকবৃদ্ধির চেষ্টায় কোনও সংবাদপত্র প্রথমে ছবি ও পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন, এখন আবার বিনামূল্যে থিয়েটার দেখাইতেছেন।"

ব্যবসায়ীমাত্রেই সঞ্চয়ের চেষ্টা করে কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ক্ষেত্রে নামিয়াও লাভের চেষ্টা দূরে থাক, আত্মীয়-স্বজনের উদরপূরণ করা দূরে থাক্, পরিবর্ত্তে যে তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত তোলা পয়সা ব্যয় করিয়া "রঙ্গালয়" পত্রখানির বহুল প্রচার করিতে লাগিলেন—সেজন্য সুখ্যাতি না করিয়া কেন যে সহযোগী পরিহাস ও শ্লেষ করিলেন, তাহার যথার্থ কারণ আমরা বুঝিলাম না। বোধ হয় অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের

লোক ও "রঙ্গালয়" থিয়েটার-সংক্রান্ত কাগজ বলিয়া, তাঁহাদের কৃপা কটাক্ষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন!

এই "রঙ্গালয়ের" নিমিত্ত অমরেন্দ্রনাথকে অনেক টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল। এত অধিক গ্রাহক ছিল এবং বিজ্ঞাপনও অনেক পাওয়া যাইত বলিয়া তাঁহাকে এই কাগজের বহুল প্রচারের নিমিত্ত দেউলিয়া হইতে হয় নাই। কিন্তু তিনি স্বয়ং থিয়েটার পরিচালনা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। "রঙ্গালয়ে"র জন্য তিনি যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের কর্ম্মপটুত্বের অভাবে সংবাদপত্রের প্রকাশ বিষয়ে নানাপ্রকার গোলযোগ হইতে লাগিল। গ্রাহকদিগের অভিযোগে অমরেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন। একবার ভাবিলেন যে "রঙ্গালয়" তুলিয়া দিবেন; বৎসর খানেক প্রকাশিত হইবার পর, কিছুদিনের জন্য "রঙ্গালয়" বন্ধও হইয়া গেল। শেষে পাঁচকড়ি বাবুর বিশেষ অনুরোধে ও আগ্রহে তিনি "রঙ্গালয়"কে পুনর্জ্জীবিত করিলেন কিন্তু স্বত্বাধিকারীর দায়িত্ব তিনি আর নিজের স্কন্ধে বহন করিতে অস্বীকৃত হইয়া, পাঁচকড়ি বাবুকেই উহার সমুদয় স্বত্ব ও স্বামিত্ব দান করিলেন। ১৯০২, ২২শে মে হইতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি আর রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলেন না;—পাঁচকড়ি বাবুকে বলিলেন,—"রঙ্গালয় প্রচারের জন্য যে অতিরিক্ত টাকা লাগে, আমাকে বলিবেন, আমি দিয়া দিব। কিন্তু উহার প্রকাশ সম্বন্ধে ঝক্কি বহন করিতে পারিব না। সে সমস্ত ভার আপনার। দেখিবেন যেন গ্রাহকগণের অভিযোগে আমাকে আবার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে না হয়। আমি শুধু টাকা দিয়াই খালাস।"

এইরূপে প্রায় চারি বৎসর "রঙ্গালয়" চালাইবার পর, ষাট হাজার টাকা লোকসান দিয়া অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়ে"র প্রকাশ বন্ধ করিয়া

দেন। শুদ্ধ এই টাকা লোকসানের জন্য তিনি বিচলিত হইতেন না, কিন্তু সে সময় এমন একটা কারণ ঘটে, যাহার জন্য অমরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া "রঙ্গালয়" তুলিয়া দিতে হয়। আমরা যথাসময়ে সে কারণ আলোচনা করিব। আপাততঃ "রঙ্গালয়" প্রকাশ দ্বারা তিনি যে এক মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কথাটুকু বলিয়াই বর্ত্তমান্ বক্তব্যের উপসংহার করিব। এটা শুধু আমাদের উক্তি নহে, অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'নায়ক' লিখিয়াছিলেন :—

"থিয়েটারের কার্য্যে অমরেন্দ্রনাথ অনেক নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়াছিল, বাঙ্গালা থিয়েটারের জন্য একটা লিটরেচর (Literature) সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছিল। যে হিসাবে সোমপ্রকাশের ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হিন্দু পেট্রিয়টের ৺কৃষ্ণদাস পাল আমাদের স্মরণযোগ্য, সেই হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণযোগ্য। * * অমরেন্দ্রনাথ এই দলের শেষ প্রতিভাশালী নট, কবি, নাট্যকার, প্রহসন লেখক ও ম্যানেজার। তাহাতে একাধারে সকল গুণ বিদ্যমান ছিল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল বসু ছাড়া তাহার মতন সর্ব্বকর্ম্মান্বিত পুরুষ বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে আর কেহ নাই—ছিলও না। কেবল তাহাই নহে, অমরেন্দ্র কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি, অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। সাজপোষাকে, দৃশ্যে, নৃত্যে, অভিনয়ভঙ্গীতে তিনি অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, সাধারণ দর্শকের চিত্তবিনোদনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের পর আর সহজে একটী দ্বিতীয় অমরেন্দ্র আমরা খুঁজিয়া পাইব না।"

"রঙ্গালয়" প্রকাশের ফলে অমরেন্দ্রনাথকে দুটী মানহানির মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। একটী 'নবযুগে'র

সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে, অপরটী বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত। প্রথমটীতে ‘রঙ্গালয়’ ফরিয়াদী, ও দ্বিতীয়টীতে তাহারা আসামী। উভয় ব্যক্তিই অমরেন্দ্রনাথের নিকট অশেষ প্রকারে উপকৃত। অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সে সমস্ত কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া “রঙ্গালয়ে” “আমাদের শত্রু” বলিয়া পর পর কয়েকটী প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন। আমরা অনর্থক সে সমস্ত উপকারের তালিকা উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। উপেন্দ্র বাবু তাঁহার “বসুমতী” পত্রিকায় একদিন ভগবানের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, “অমর নাট্যশালা নামে স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপিত হউক।” কিন্তু পরে কোন এক কারণে অমরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। উভয় পত্রিকাই উভয়ের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন, এমন কি “রঙ্গালয়ে” উপেন্দ্র বাবুকে উদ্দেশ করিয়া এক ব্যঙ্গ চিত্র প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে উপেন্দ্র বাবু “রঙ্গালয়ের” বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনেন। ২।৩ দিন শুনানীর পর, উভয়ের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ও চেষ্টায় গোলযোগ মিটিয়া যায়—উপেন্দ্র বাবু মামলা তুলিয়া লন।

অপর মামলাটী কিন্তু অত সহজে মিটে নাই। পূর্ণবাবুর ইচ্ছা ছিল যে তিনি “রঙ্গালয়ে”র সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ফেলিয়া পাঁচকড়িবাবুকে ঐ পদ দেওয়াতে, তিনি নবযুগে “রঙ্গালয়”কে ও পাঁচকড়িবাবুকে গালিগালাজ করিয়া নানারূপ প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে বিরক্ত হইয়া পাঁচকড়িবাবুকে দিয়া পূর্ণবাবুর নামে মানহানির মামলা রুজু করান। বহুদিনব্যাপী শুনানীর পর, ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণবাবুকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় দেন ; কিন্তু আপীলে হাইকোর্ট হইতে মামলা পুনর্বিচারের আদেশ হয়।

তাহার পরের ঘটনা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"অমরেন্দ্রনাথের উদারতার অনেক দৃষ্টান্ত আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। সকলগুলি তো এ ক্ষেত্রে বিবৃত করা সম্ভবপর নয়। একটা বিষয় বলিলে আপনারা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন, তিনি কত মহৎ কত উদার ছিলেন। কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদকের সহিত রীতিমত কয়েকমাস ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল। শুধু মোকদ্দমা নয়—অমরেন্দ্রনাথের তখন "রঙ্গালয়" নামক পত্রিকা ছিল। দুই কাগজে রীতিমত পরস্পরে অকথ্য ভাষায় কটূক্তি পর্য্যন্ত চলিতেছিল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দীর আর্থিক অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না—অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটার তখন জোর চলিতেছিল। সেই সম্পাদক মহাশয় যে সপ্তাহে অমরেন্দ্রনাথকে যথেষ্ট গালিগালাজ করিয়াছিলেন, সেই সপ্তাহের (বোধ হয়) রবিবারে—একেবারে অমরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই অবাক্! অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া আপনার ঘরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হঠাৎ এদিকে যে? থিয়েটার দেখিতে নাকি?" খানিকক্ষণ অমরেন্দ্রনাথের মুখপানে চাহিয়া সে ভদ্রলোক ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "অমরবাবু! আমি আর পাচ্ছি না!" দয়ার্দ্রহৃদয় অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"বেশ তো, এখুনি এই রাত্রেই এখানে মিট্‌মাট্ হইয়া যাক্—তার জন্য আর চিন্তা কি? আমি আপনার কনিষ্ঠ সোদর সমান!" সে ভদ্রলোক তখন অমরেন্দ্রনাথের দুটী হাত ধরিয়া পূর্ব্বোক্তভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি যে বংশের ছেলে, তোমার যেরূপ মেজাজ তাতে আমার জানা আছে, তুমি আমায় ক্ষমা করিবে। কিন্তু আমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য না করিলে আমি

সপরিবারে মারা যাই !—আজ বৎসরাবধি বাড়ী ভাড়া দিতে পারি নাই বলিয়া, সপরিবারে অনাহারে পথে দাঁড়াইয়া আছি !" অমরেন্দ্রনাথ—(বোধ হয় চক্ষের কোণে এক ফোঁটা জল আসিয়াছিল)—একহাতে চক্ষু মুছিয়া টিকিট ঘর হইতে ক্যাশ বাক্স আনাইয়া সে রাত্রের সমস্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরম শত্রুকে সানন্দচিত্তে তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা ! এমন মহৎ—এমন উদার ছিলেন আমার সুহৃদ্‌বর সোদরসমান অমরেন্দ্রনাথ !"

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

নাট্যজগতের শীর্ষে ক্লাসিক

(১৯০১-৩)

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ, শুক্রবার, নটকুলচূড়ামণি মহেন্দ্রলাল বসুর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অতিশয় সমাদর সহকারে ক্লাসিক থিয়েটারে রাখিয়াছিলেন; শুধু তাই নয়—সেইখানেই তাঁহার বাসের জন্যও সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হন। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে নটের বিচলিত হইলে চলে না,—জনসাধারণকে আনন্দদানের নিমিত্ত তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত, সেখানে ব্যক্তিগত শোকদুঃখের স্থান কোথায়? তাই মহেন্দ্রবাবুর স্মৃতির সম্মানার্থ একরাত্রি অভিনয় বন্ধ দিয়া, ক্লাসিকের নাট্যলীলা যথাপূর্ব্ব চলিতে লাগিল।

১৬ই মার্চ্চ, গিরিশচন্দ্রের 'রামনির্ব্বাসনে'র পুনরভিনয় হইল। প্রবোধচন্দ্র ঘোষ দশরথ, অমরেন্দ্রনাথ রাম, দানিবাবু লক্ষ্মণ, কুসুমকুমারী সীতা ও তারাসুন্দরী কৈকেয়ী সাজিলেন। তাহার পর বর্ষবিদায় উপলক্ষে অমরেন্দ্রনাথ এক বিরাট্ ব্যাপারের আয়োজন করিলেন। গিরিশচন্দ্র তৃতীয়বার ক্লাসিকে আসিবার পর আর রঙ্গমঞ্চে নামেন নাই। "বঙ্গের গ্যারীক গিরিশবাবুর শেষ অভিনয়, তিনি আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয়

'কপালকুণ্ডলা' নাটকে নবকুমারের ভূমিকায়

অমরেন্দ্রনাথ।

কপালকুণ্ডলা—কুসুমকুমারী।

নব।—কপালকুণ্ডলা, একবার বল তুমি অবিশ্বাসিনী নও।

করিবেন না", বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া, ১৩ই এপ্রিল (৩১শে চৈত্র, ১৩০৭) 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। গিরিশচন্দ্র নিমচাঁদ, অমরেন্দ্রনাথ অটল ও কুসুমকুমারী কাঞ্চনের অংশে অবতীর্ণ হইলেন। যে গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদ অভিনয় দেখিতে মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে মিনার্ভায় একেবারে জনসমাগম হয় নাই, সেই একই লোকের একই অভিনয় দেখিবার জন্য এবার ক্লাসিকে "বাদুড় ঝুলিতে" লাগিল। অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস!

২০শে এপ্রিল, মহাসমারোহে গিরিশচন্দ্রের 'মনের মতনে'র প্রথম অভিনয় হইল। সে রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ ঃ—

মির্জ্জান—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), কাউলফ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সায়েদ খাঁ—নটবর চৌধুরী, টাহার—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নেহার—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ফকির—অঘোরনাথ পাঠক, সমরকন্দাধিপতি—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কাজি—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বণিক—চণ্ডীচরণ দে, গোলেন্দাম—তারাসুন্দরী, দেলেরা—কুসুমকুমারী, সানিয়া—গুলফম হরি, পরিয়া—রাণীসুন্দরী, মনিয়া—কিরণবালা, ইত্যাদি।

সাহিত্য হিসাবে 'মনের মতন' খুব উচ্চাঙ্গের নাটক না হইলেও, অভিনয়গুণে দর্শকগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ, দানিবাবু ও তারাসুন্দরী স্ব স্ব ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

ইহার পর, ১লা জুন, গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কপালকুণ্ডলার প্রথম অভিনয় হয়। ঐ নাটকের ভূমিকার পরিচয়লিপি এই ঃ—

অধিকারী ও চটারক্ষক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নবকুমার—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাপালিক—অঘোরনাথ পাঠক, জাহাঙ্গীর—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বৃদ্ধ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বালক ভৃত্য—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), সর্দ্দার উড়ে—নটবর চৌধুরী, কপালকুণ্ডলা—কুসুমকুমারী, মতিবিবি—তারাসুন্দরী, শ্যামা—রাণীসুন্দরী, পেশমান—লক্ষ্মীমণি, মেহেরউন্নিসা—ভুবনেশ্বরী।

পরে গিরিশচন্দ্র পাঁচটী বিভিন্ন অংশে, দানিবাবু জাহাঙ্গীরের অংশে ও তিনকড়ি মতিবিবির ভূমিকায় অভিনয় করেন।

কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে নাট্যজগতে এক আশাতীত আন্দোলন উপস্থিত হয়। একবাক্যে সমস্ত সংবাদপত্র ও দর্শকগণ—নবকুমার, মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের অজস্র সুখ্যাতি করেন। অমরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'রঙ্গালয়ে' উদ্ধৃত সমালোচনায় লিখিত হয়—"নবকুমারের বেশী পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আমরা পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করিয়া, স্বার্থশূন্যহৃদয়ে বলিতেছি যে নবকুমারের অংশ যেরূপ হওয়া উচিত, তদুপযুক্তই হইয়াছিল।" 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' বলেন:—"The hero is played by the manager himself who by no means stains the credit he has already established as a popular interpreter of emotional roles."

কুসুমকুমারী, মতিবিবির ভূমিকা তাঁহাকে না দিয়া, তারাসুন্দরীকে দেওয়াতে, বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ষ্টার থিয়েটারে তিনি এ ভূমিকা অভিনয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু তারাসুন্দরী এই অংশে যে অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় চিত্র ফুটাইতে সক্ষম হন, কুসুমকুমারী তাহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ ও তারাসুন্দরীর অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে আগুন জ্বলিয়া উঠিত—সকলেরই মনে হইত, বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমার ও মতিবিবি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ষ্টেজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তারাসুন্দরীর সে অনুপমেয় উক্তি—"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ করে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ করো না"—ভুলিবার নয়।

নবকুমার বলিলেন, "তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

দক্ষিণে—'কপালকুণ্ডলা' নাটকে নবকুমার ও কাপালিকের ভূমিকায়

অমরেন্দ্রনাথ ও অঘোরনাথ পাঠক।

বামে—'ফটিকজল' গীতিনাট্যে লল্লু ও জুমেলীর ভূমিকায়

দানিবাবু ও রাণীসুন্দরী।

(ব্লকটী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে নহে। এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া, নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমিষ আয়তচক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজ-রাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য-শাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল।" নবকুমাররূপী অমরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের এই মূর্ত্তিমতী লুৎফ-উন্নিসাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "একি, কে এ রমণী! কম্পিত নাসারন্ধ্র, ললাটদেশে ধমনী স্ফীত—রমণীয় রেখা! জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিত, দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় ফণা তুলে দণ্ডায়মানা কে এ রমণী, এ উন্মাদিনী যবনী কে?"

মতি। তোমায় ত্যাগ করবো—এ জনমে নয়। তুমি আমারই হবে।

নব। এ কি অপূর্ব্ব শোভা—বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী শোভা—হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হয়। আমার বহুদিনের কথা স্মরণ হচ্ছে, আমার প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন আমি শয়নাগার হতে বহিষ্কৃত করতে উদ্যত হয়েছিলেম, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এমনি তার চক্ষু প্রদীপ্ত হয়েছিল, এমনি ললাটদেশে রেখাবিকাশ করেছিল, এমনি নাসারন্ধ্র কেঁপেছিল, এমনি মস্তক হেলেছিল; বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়েনি, আজ এ যবনীকে দেখে সে মূর্ত্তি মনে পড়েছে; তুমি কে?

সে অপূর্ব্ব অভিনয়ে দর্শকগণ যুগপৎ স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া যাইতেন। সে সময়ে প্রেক্ষাগৃহে যথার্থই প্রবাদোক্ত সূচীপতন হইলে,

তাহারও শব্দ শোনা যাইত। যাঁহারা সে অভিনয় দেখেন নাই, বর্ণনা দ্বারা তাঁহাদিগকে সে কথা বুঝাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

ক্লাসিকের প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাও অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত কপালকুণ্ডলার অভিনয় করেন। সেখানে প্রিয়নাথ ঘোষ নবকুমার, চুণিলাল দেব কাপালিক ও তিনকড়ি মতিবিবি সাজেন। তুলনায় ক্লাসিকের অভিনয় যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা লেখাই বাহুল্য।

কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব সাফল্যে পুলকিত হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ গিরিশ-চন্দ্রকে 'মৃণালিনী' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করিয়া, বেঙ্গল থিয়েটার হইতে পুরাতন মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি আনাইয়া দেন ও শনিবার ২৭শে জুলাই ক্লাসিকে মৃণালিনীর প্রথম অভিনয় হয়। সে রজনীর অভিনেতৃবর্গের নাম দিলাম :—

পশুপতি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, হৃষিকেশ—অঘোরনাথ পাঠক, ব্যোমকেশ—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, দিগ্বিজয়—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, মাধবাচার্য্য—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, লক্ষ্মণ সেন—নটবর চৌধুরী, বক্তিয়ার খিলিজী—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শান্তশীল—অহীন্দ্রনাথ দে, মৃণালিনী—কিরণবালা, গিরিজায়া—কুসুমকুমারী, মনোরমা—প্রমদাসুন্দরী।

মৃণালিনীর সাফল্যপূর্ণ অভিনয়েও ক্লাসিকের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। পশুপতি, হেমচন্দ্র, দিগ্বিজয় ও গিরিজায়ার অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথের হেমচন্দ্র অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকগণের আগ্রহ চিরদিন সমানভাবে উদ্দীপ্ত ছিল।

দ্বিতীয়াভিনয় রজনীতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের খেলা দেখাইতে গিয়া, ষ্টেজ-ম্যানেজারের অসাবধানতাবশতঃ প্রতিমা-বিসর্জ্জনোদ্যত পশুপতিরূপী গিরিশচন্দ্রের মাথার চামড়া স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়া ফোস্কা পড়ে।

সেই জন্য গিরিশচন্দ্র ভবিষ্যতে আর এ ভূমিকা অভিনয় করিতে অসম্মত হইলে, দানিবাবু পশুপতির অংশ লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তিনি খুব যোগ্যতার সহিত পশুপতির ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

ইহার পর ৭ই আগষ্ট, বুধবারে "বিশেষ রজনী উপলক্ষে মাত্র এক রাত্রির জন্য" অমরেন্দ্রনাথ 'জনা'য় শ্রীকৃষ্ণ সাজেন। সে অভিনয়ে দানিবাবু প্রবীর, কুসুমকুমারী জনা ও অঘোর পাঠক বিদূষকের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৭ই আগষ্ট (১৯০১) তারিখে, পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "দক্ষিণা" লইয়া বেঙ্গল ষ্টেজে অরোরা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র পর, অমরেন্দ্রনাথ 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু অরোরার সহিত প্রতিযোগিতায় সে নাটক বন্ধ রাখিয়া, তিনি ঐ রাত্রেই ক্লাসিকে 'রাবণ বধে'র পুনরভিনয় করেন। ভূমিকালিপি এই :—

রাবণ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাম—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্মণ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), বিভীষণ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, হনুমান—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা—জগত্তারিণী, নিকষা—হরিদাসী (গুলফম), মন্দোদরী—প্রমদাসুন্দরী, সীতা—কুসুমকুমারী, ইত্যাদি।

এই সময় পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পূর্ব্বোল্লিখিত মানহানির মামলা খুব রেষারেষির সহিত চলিতেছিল। অমরেন্দ্রনাথ পূর্ণ বাবুকে ব্যঙ্গ করিয়া "গুপ্তকথা" নামে এক প্রহসন রচনা করিয়া, ৩১শে আগষ্ট, তাহা ক্লাসিকে প্রথম অভিনয় করান। সে রজনীর ভূমিকালিপি এই :—

অর্দ্ধচন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশিশেখর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ব্যোমচাঁদ—[illegible]ন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নুটুবিহারী—ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমাধব—নটবর চৌধুরী, [illegible] মদনমোহন—প্রমথনাথ ঘোষ, কবিরাজ হরগোবিন্দ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, টেলার [illegible]রদচন্দ্র—অহীন্দ্রনাথ দে, উকিল ললিতমোহন—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অদ্ভুতচন্দ্র—

আশুতোষ পালিত, ছুঁচকিমণি—লক্ষ্মীমণি, হীরা—রাণীসুন্দরী, নীরা—বিনোদিনী (হাঁদি), ধীরা—ভুবনেশ্বরী, অধীরা—নীরদাসুন্দরী, বিজলী—কুসুমকুমারী।

আমরা 'গুপ্তকথা' সম্বন্ধে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'বঙ্গভূমি', ২৫শে ভাদ্র, ১৩০৮, মঙ্গলবার—'গুপ্তকথার' অভিনয়ে যেন কাহারও গুপ্তকাহিনী প্রকাশিত। এই রঙ্গভঙ্গব্যঙ্গময়ী নূতন নক্সায় 'তর বেতর চেহারা দেখে' কখন 'মুচ্‌কে মুচ্‌কে' হাস্‌তে হয়, আবার কখন 'মনে মনে গম খেয়ে' থাকতে হয়—কথাটা ঠিক। এ দর্পণে অনেকের চিত্র প্রতিবিম্বিত—চেনা অচেনা অনেককেই দর্শন লাভ হয়। "হাসির ফোয়ারা, গানের গর্‌রা, নাচের হর্‌রা" লইয়া, "নূতন ছাঁচে, নূতন ছাঁদে, নূতন ঢংএ, নূতন রংএ" এই নূতন নক্সাখানি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত! "ঝাল, মিষ্টি, টক, ইত্যাদি ষড়রসের আধার" গুপ্তকথা, "বড় সরেস চাটনী!" অভিনয় দেখিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তবে যাঁহার বন্ধুবান্ধবের চিত্র 'গুপ্তকথায়' প্রতিফলিত ও যে সকল দর্শকের মিত্রবর্গের চরিত্র গুপ্তকথায় ব্যক্ত হইয়াছে বা যাহারা নিজ নিজ প্রতিচ্ছায়া "গুপ্তকথা" দর্পণে প্রতিবিম্বিত সন্দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা যে কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। মূল্যবান্ পোষাক, ও দৃশ্যপট এবং নৃত্যগীতে নূতনত্ব দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

ENGLISHMAN, SEPT, 5, 1901—The satire "Gupta Katha" attracts crowded audience to the Classic Theatre. The piece deals with many social evils and is smartly written. The songs, dances, costumes and scenes are admirable. The energetic manager, Babu A. N. Dutt is to be congratulated on the success of the new production.

ENGLISHMAN, SEPT. 10, 1901—The second performance of Babu A. N. Dutt's satire "Gupta Katha" attracted an excellent and most appreciative audience to the Classic Theatre on Saturday night. The performance was an admirable one reflecting the highest credit on principals and chorus. The author himself took the title role. In the course of the performance, several pretty dances were introduced. The Gupta Katha should attract a full attendance on Saturday next, when a third performance takes place.

HINDU PATRIOT, SEPT. 7, 1901—On last Saturday, the Classic Theatre was literally packed from floor to ceiling and many had to go away disappointed for want of space, when a new satire entitled "Gupta-Katha" from the pen of Babu A. N. Dutt, the energetic manager of the Theatre, was put on the boards. The piece is very smartly written and is full of mirth and wit. The songs and dances are quite original and interesting. The police compound where a big dog-cart and a pretty waler horse appear on the stage and the scene of Lal Bazar are among others to be mentioned. The Fairy place is the grandest of all. The energetic manager Babu A. N. Dutt should be congratulated on the success of the satire.

BENGALEE, SEPT. 5, 1901—On Saturday last, the Classic

Theatre put on their stage a satire, entitled "Gupta Katha." The house was literally packed from floor to ceiling and hundreds had to go away disappointed for want of seats. The book itself is a whip for many social evils and is full of mirth and chaste wits. The songs are after the model of Moliere and the dances were exquisitely lovely and original. The costumes and sceneries were rich and appropriate. The energetic manager Babu A. N. Dutt should be congratulated on the success of this new production.

এই একই ভাবে ইণ্ডিয়ান্ মিরার, চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ প্রভৃতি বিবিধ সংবাদপত্রে "গুপ্তকথা"র নানাপ্রকার সুখ্যাতি করেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম না।

গুপ্তকথার প্রথমাভিনয় রজনীতে তাহার সঙ্গে রাবণ-বধের অভিনয় হয় ;—দ্বিতীয় রজনীতে দক্ষযজ্ঞের। এই নাটকে অমরেন্দ্রনাথ প্রথম দক্ষের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন ও দানিবাবু মহাদেব, তারাসুন্দরী সতী ও কুসুমকুমারী তপস্বিনী সাজেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর, গুপ্তকথার সঙ্গে চৈতন্যলীলার প্রথম পুনরভিনয় হয়। অমরেন্দ্রনাথের একজন বিজ্ঞ বন্ধুর অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্যের লীলার তিন অংশ তিনজন প্রধানা অভিনেত্রী কর্ত্তৃক অভিনীত হয়—বাল্যলীলা রাণীসুন্দরী, গার্হস্থ্যলীলা তারাসুন্দরী ও বৈরাগ্য প্রমদাসুন্দরী। তাহা ছাড়া অমরেন্দ্রনাথ মাধাই, প্রবোধ ঘোষ জগাই ও কলি, এবং বনবিহারিণী (ভুনি) নিতাই সাজেন। (অমরেন্দ্রনাথ পরে এ নাটকে কলির ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।) ইহার পর ২৮শে

সেপ্টেম্বর হইতে গুপ্তকথার সহিত গিরিশচন্দ্রের নূতন পৌরাণিক গীতিনাট্য "অভিশাপ" অভিনীত হইতে থাকে। ইহাতে অমরেন্দ্রনাথের কোন ভূমিকা ছিল না। অভিশাপ অভিনয়ের কিছুদিন আগে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ক্লাসিক ছাড়িয়া মিনার্ভায় চলিয়া যান। সেই কারণে কুসুমকুমারী এই গীতিনাট্যে নৃত্য সংযোজনা করেন। স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক নৃত্যশিক্ষা বঙ্গরঙ্গভূমির ইতিহাসে এই প্রথম। কুসুমকুমারীর কার্য্যকুশলতায় বিশেষ প্রীত হইয়া, গিরিশচন্দ্র অভিশাপের দ্বিতীয়াভিনয় রজনীতে তাঁহাকে একটী সুবর্ণ পদক পুরস্কার দেন। এই নৃত্যশিক্ষা বিষয়ে কুসুমকুমারী কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্যপ্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেই এই গ্রন্থের প্রকৃত নৃত্যশিক্ষক বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

অতঃপর ২৪শে নভেম্বর তারিখে, যোগেশের অংশে গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া, প্রফুল্ল অভিনয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র অভিনয় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, দর্শকদিগের অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ যোগেশ সাজেন। আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছিলাম যে, অমরেন্দ্রনাথের যোগেশের ভূমিকাভিনয়ের আলোচনা আমরা পরে যথাস্থানে করিব। তাই এইখানে এইদিনকার অভিনয়ের যে সমালোচনা, আট জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত প্রেরিত পত্র হিসাবে 'রঙ্গালয়ে' মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"* * এই সময়ে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ষ্টেজে আসিয়া বলিলেন যে, "আমাদের নাট্যকার

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আজ যোগেশ অভিনয় করিবার কথা ছিল। কিন্তু আসিবার সময় গাড়ীর পাদানে লাগিয়া তাঁহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে এবং সেজন্য তিনি আজ অভিনয় করিতে পারিবেন না। এখন আপনাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।" ইহা শুনিয়া সকলেই বলিলেন যে, আপনি যোগেশের অংশ অভিনয় করুন। তাহার পর অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম দৃশ্যেই যোগেশের মুখে "বড় বউ আজ বড় আমোদের দিন" শুনিয়া আমাদের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তৎপরে যতই আমরা অমরবাবু কর্ত্তৃক যোগেশের অভিনয় দেখিতে লাগিলাম, ততই আমাদের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। শেষে যোগেশের নিকট "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" শুনিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আমরা গিরিশবাবুকে যোগেশের অংশে দেখিয়াছি এবং প্রত্যেক দৃশ্যেই তাঁহার অভিনয়ের সহিত অমর বাবুর তুলনা করিয়া দেখিলাম যে, অমর বাবু গিরিশ বাবু অপেক্ষা কোন অংশে খারাপ নন। অভিনয়কালীন তাঁহার আঙ্গিক হাবভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, গিরিশ বাবুই বুঝি অভিনয় করিতেছেন। যদি তাঁহার স্বর আরও কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইত, তাহা হইলে তিনি যোগেশের অংশ অভিনয়ে গিরিশবাবুর সমকক্ষ হইতে পারিতেন।"

'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের যোগেশের ভূমিকাভিনয়কে আরও অনেক উচ্চে স্থান দেন। ঐ সংবাদপত্রের মতে অমরেন্দ্রনাথ এই অংশে অন্য সমস্ত অভিনেতা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের উক্তি তুলিয়া দিলাম :—

HINDU PATRIOT, DEC. 7, 1901—The part of Jogesh

which was enacted by the energetic manager Babu A. N. Dutt, was so beautifully played that every time he made his appearance on the stage, tears were seen flowing abundantly from the eyes of the audience. *Babu A. N. Dutt, as Jogesh we may freely admit, excels others who personated this part before.*

৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌লিনের উপস্থিতিতে, "সোনার স্বপন" প্রণেতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত "ভোমারি"র প্রথম অভিনয় হয়। সে রজনীর পাত্রপাত্রীগণের পরিচয় :—

সমসুদ্দীন—অঘোরনাথ পাঠক, আমীরুদ্দিন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গোলাম কাদের—অহীন্দ্রনাথ দে, হায়দার আলি—নটবর চৌধুরী, ইব্রাহিম—দেবকণ্ঠ বাগচী, কৎলু—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ফৈজু—প্রমথনাথ ঘোষ, কাশেম—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দরবারী—ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গুলজার—প্রমদাসুন্দরী, গোলেনা—তারাসুন্দরী, আমিনী—কুসুমকুমারী, জুলেখা—রাণীসুন্দরী, মোহিনী—ভুবনেশ্বরী, আমিরণ—পান্নারাণী, বৃদ্ধা—কুমুদিনী।

"ভোমারি" অভিনয় সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১০ই ডিসেম্বর, ১৯০১) বলেন,—

"As Amiruddin, the manager makes the most of a part, in which there is not much. It strikes one that he has chosen a role much below his gifts and it is only in the ordeal scene that he finds a suitable field for the display of the stuff that is in him. * * The reception accorded to the piece on its first performance tends to show that it will "pull" this many a day."

মিনার্ভা থিয়েটার "তোমারি"র জবাবে "আমারি" বলিয়া এক নাটিকার অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা,—১৮ই জানুয়ারী তারিখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত "বহুৎ আচ্ছা"র অভিনয়। গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথ ইহার জন্য কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে 'বহুৎ আচ্ছা'র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইয়াছিল। ইহার প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ ঃ—

মিঃ চম্পটী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র—অঘোরনাথ পাঠক, রমেশচন্দ্র—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সুরেশচন্দ্র—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী—অহীন্দ্রনাথ দে, পরেশচন্দ্র ও খানসামা—ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবেকা—কুসুমকুমারী, সুকেশিনী—প্রমদাসুন্দরী, সুবেশিনী—রাণীসুন্দরী, সুহাসিনী—কিরণবালা, সুভাষিণী ও আয়া—বিনোদিনী (হাঁদি), ইন্দুমতী—নগেন্দ্রবালা (বুঁচি), সরোজিনী—ভুবনেশ্বরী।

মিঃ চম্পটীর ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ যে ছবি দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় এবং তাঁহার সে অভিনয় অদ্যাবধি আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। শুধু তাই নয়, সঙ্গীতবিশিষ্ট অংশে এই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। পূর্ব্বে হইতে তাঁহার মুখের প্রতি কথা ত' দর্শকেরা লুফিয়া লইতেনই, এখন আবার ইহাতে রেবেকারূপিণী কুসুমকুমারীর সহিত তাঁহার দ্বৈতগীতে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িত, সংখ্যাতীতবার 'এনকোর' ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। এ সময় এই সব কারণে তাঁহার জনপ্রিয়তা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের একটা ঘটনা উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না।

সেদিন রবিবার,—দ্বিপ্রহর দুইটার সময় অভিনয় ছিল ও মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ঐদিন থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া,

বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতিকল্পে অমরেন্দ্রনাথের অসীম আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণপদক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। পদকে লেখা ছিল—"Presented to Mr. A. N. Dutt in recognition of his services to the Bengali stage."

ষ্টেজে যখন এই পদক-পুরস্কার অনুষ্ঠান চলিতেছিল, তখন সমাগত দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক উঠিয়া বলেন যে, "আমরা এই ব্যাপারে কিছু বলিতে চাই।" ষ্টেজের উপর সাদরে আহূত হইয়া, তাঁহাদের মুখপাত্র অমরেন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনটী প্রদান করেন ও দলের অন্যান্য সকলে মিলিয়া উহার মুদ্রিত কপি দর্শকগণের মধ্যে বিতরণ করেন।

To,

BABU AMORENDRA NATH DUTT.

THE GARRICK OF BENGAL,

Proprietor and Manager of

CLASSIC THEATRE.

Hail ! Hail ! O thou—
Sweet Child of Art.
Dost thou see the oblation,
Offered thee by mortals,
Or art thou asleep ?
The shell bloweth thy name.
The air resoundeth the Horizon,
And shakes the East withal !
O, look thine rivals,

How like dumb !
They play the cymbals—
That make the stones laugh.
O, art thou a mortal, or,
The Art of Acting, jealous of thee,
Hath ensconced in thine frame.
O, if angels could see thine beauty
They would steal on earth,
And make mortals mad.
Man heareth not his own trumpet.
Beauty lives not in the house of
Self. It lurks about—
In the eyes of others.
Thy tragedy moveth the stone.
Thy Chivalry ignites fire in iron.
Had Garrick lived, he would have seen
Rival in thee. Thrive, thrive on—
And God bless thee.

ক্লাসিকের এই গৌরবময় যুগে, অরোরা থিয়েটার ক্লাসিক হইতে তারাসুন্দরীকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া যান। তারাসুন্দরীর যাইতে একান্ত অনিচ্ছা ছিল এবং সে সময় যদি অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সামান্য কিছু মাহিনা বাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি ক্লাসিকেই থাকিতেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তখন আত্মশক্তিতে অসীম আস্থাবান্, তাই তিনি তারাসুন্দরীর সামান্য বেতনবৃদ্ধির প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না, ১লা

ফেব্রুয়ারী হইতে তারা অরোরায় চলিয়া গিয়া, সেখানে খুব সুখ্যাতির সহিত দেবী চৌধুরাণীতে দেবী, সরলায় শ্যামা, কালপরিণয়ে মোক্ষদা, রিজিয়ায় রিজিয়া প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করিতে লাগিলেন। কাজটা যে বিশেষ সমীচীন হয় নাই, তাহা উত্তর জীবনে অমরেন্দ্রনাথ বহুবার আপশোষ করিয়া বলিতেন। যাহা হউক, তারাসুন্দরী চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ক্লাসিকের প্রতিষ্ঠার কোন হানি হইল না, ক্লাসিক প্রদীপ্ত তেজেই জ্বলিতে লাগিল।

২২শে মার্চ্চ, ক্লাসিক থিয়েটারে 'শিবজী'র প্রথম অভিনয় হইল। বঙ্গীয় নাট্যশালায় জাতীয়তামূলক নাটকের অভিনয় এই প্রথম। মনোমোহন গোস্বামী 'রোসিনারা' নামে এক নাটক রচনা করেন; অমরেন্দ্রনাথ সেই নাটকের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া, 'শিবজী' নাম দিয়া তাহাই ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করান। প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বিতরিত হয়:—

শিবজী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যাঙ্কোজী—অহীন্দ্রনাথ দে, তানাজী—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সদাসুখ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথপন্থ ও ডেগোমা—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রামদাস স্বামী—অঘোরনাথ পাঠক, জয়সিংহ—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু), যশোবন্ত সিংহ—চন্দ্রকুমার সেন, আরাংজেব—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), সায়েস্তা খাঁ—নটবর চৌধুরী, দিলীর খাঁ—চণ্ডীচরণ দে, দানেশমন্দ—জীবনকৃষ্ণ সেন, মোবারক—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, জিজিবাঈ—হরিদাসী (গুলফম), সইবাঈ—প্রমদাসুন্দরী, রোসিনারা—কুসুমকুমারী, ভবানী—ভূষণকুমারী, রোমেনা—রাণীসুন্দরী।

শিবজীর অভিনয় সম্বন্ধে "রঙ্গালয়" বলেন,—"যিনি শিবজীর অংশ লইয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা প্রধান আসন দিতে বাধ্য। তিনি বেশ সূক্ষ্ম অভিনয়চাতুরী দেখাইতে পারিয়াছিলেন, সে চাতুরী সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে চাতুরীর মর্ম্ম না বুঝিলেও মুগ্ধ হইতে হয়।" "অভিনয়কালীন আঙ্গিক ভাবভঙ্গী এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরা

তাঁহাকে যথার্থই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। রাজপুত-শিবিরে যশোবন্ত সিংহের সাক্ষাতে ছত্রপতি শিবজীর অভিনয়ে দেহ রোমাঞ্চিত ও কণ্টকিত হইয়াছিল। যিনি তাঁহার হরিরাজ, ম্যাকবেথ, যোগেশ প্রভৃতি অংশের অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি আমার কথার সার্থকতা বুঝিবেন।"

'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (৯ই এপ্রিল, ১৯০২) বলেন,—"The duty of rendering Sivaji devolves on the manager, who takes a firm hold on the character and plays it vigorously, yet discreetly and well succeeds in bringing out the fiery energy and the loving heart which make the dominant features of that patriot's nature. The interpreter of Aurengzeb does not seem to sufficiently imagine himself into the character. He does not let it take hold on him and consequently he does not take hold on the audience."

শুধু অভিনয়ে নয়, দৃশ্যপটেও 'শিবজী' বেশ নূতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। ময়ূর সিংহাসন এবং নরকের ন্যায় দৃশ্য সে পর্য্যন্ত কোন রঙ্গাধ্যক্ষ দেখাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

১২ই এপ্রিল, ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথের নূতন নাটিকা "ফটিক জলে"র প্রথম অভিনয় হয় ও ১৯শে এপ্রিল হইতে রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের হাস্যজনক প্রহসন "ঘোর বিকার" তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ফটিক জলের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম :—

প্রভাত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, লাল্লু—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ভল্লজী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, সদানন্দ—নটবর চৌধুরী, জুমেলী—রাণীসুন্দরী (পরে কুসুমকুমারী), ফুলিয়া—কিরণবালা, শরৎসুন্দরী—প্রমদাসুন্দরী, সন্ধ্যা—ভুবনেশ্বরী।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"ক্লাসিকের ফটিকজল সত্যসত্যই ফটিকজল ; স্নিগ্ধ, শীতল, স্বচ্ছ, সুন্দর। লিখিবার ভঙ্গী আছে, গানের অভিনবত্ব আছে, রসের মাধুরী আছে। না দেখিলে ইহার মাধুরী পাওয়া যাইবে না। ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চ নূতনত্বের আধার ; নাচে গানে নূতনত্ব, সুরে তালে নূতনত্ব, অভিনয় চাতুরীতে নূতনত্ব, নাটক-নাটিকার লিখন-পদ্ধতিতে নূতনত্ব। এ নূতনত্বে চটক আছে, জাঁক আছে, জমক আছে ;—আর আছে রসলহরীর লীলামাধুরী। ফটিক-জলের দীর্ঘ সমালোচনা আমরা বারান্তরে করিব। পাঠকগণ একবার অভিনয় দেখিয়া আসুন ; অমরবাবুর গান, জুমেলীর ভঙ্গী, সন্ধ্যার স্নেহশীতল কোমলতা, লাল্লুর তীব্রতা, সর্দ্দারের তেজ, সদানন্দের ধর্ম্মভাব আর ফুলিয়ার দুঃখ, একবার দেখিয়া আসুন। সকলের দেখা শেষ হইলে তবে আমরা বক্তব্য ব্যক্ত করিব। আর যদি হাসির বিকার চাও ত' "ঘোর বিকার" দেখিও।"

'রঙ্গালয়' বলেন,—"ফটিকজল বাস্তবিকই নির্ম্মল স্বচ্ছ ফটিকজল। নবীননীরদধারা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের পিপাসা নিবারণ করে, অমরেন্দ্রবাবুর 'ফটিকজল'ও সেইরূপ আমাদের অভিনয় দেখিবার আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিয়াছে। গ্রন্থকারের 'জুমেলী' ও 'ফুলিয়া'র চরিত্র সৃজন দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। পূর্ব্বে তাঁহার অনেক পুস্তকের অভিনয় দেখিয়াছি কিন্তু কোনটীতে এরূপ সরল চরিত্রবিকাশের আভাসমাত্রও দেখিতে পাই নাই। * * ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—তিনি ঐরূপ নূতন নূতন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া রঙ্গমঞ্চের উৎকর্ষ-সাধন করুন।"

'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১৮ই এপ্রিল, ১৯০২) বলেন,—"Phatik Jal, small though it may be in compass, has the making of a

দেশ মুখরিত হইয়া উঠে। সমস্ত সংবাদপত্র রঙ্গলাল, নিরঞ্জন, পুরঞ্জন, গঙ্গাবাই, অন্নদা প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। 'বসুমতী' (২৬শে ভাদ্র, ১৩০৯) লেখেন,—"এখন অভিনয়ের কথা ;—পুরঞ্জন—নিরঞ্জন দুইজনই পাকা অভিনেতা, অভিনয় কৌশলে উভয়েই বিশেষ পারদর্শী, দর্শকগণ এই দুই যুবক অভিনেতার অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। রঙ্গলাল নিজে গিরিশ বাবু, চিরপ্রশংসিতের আবার কি বলিয়া প্রশংসা করিতে হয় জানি না।"

'রঙ্গালয়' লিখিয়াছিলেন,—"রঙ্গলালের অংশে গিরিশ বাবু নিজেই অভিনয় করেন, সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার নাই। নিরঞ্জন ভাল হইয়াছে, পুরঞ্জন মন্দ হয় নাই।"

'বঙ্গবাসী' (২১শে ভাদ্র, ১৩০৯) লিখিয়াছিলেন :—"তুমি অমরেন্দ্র ! তুমি না নিরঞ্জন ? পুরঞ্জন-নিরঞ্জন অকৃত্রিম সখ্যের সজীব চিত্র-যুগল। গিরিশবাবু সখ্য-প্রেমে ত্যাগ স্বীকারের যে পিযূষ-মন্দাকিনী-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন,—তুমি অমরেন্দ্র !—সে প্রবাহের শান্তিধারা যেন স্বর্গের স্বর্ণ-ঝারি ভরিয়া, দিকে দিকে সেচন করিতেছ। তোমাকেও ধন্য !"

'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (২৩শে জুলাই, ১৯০২) লিখিয়াছিলেন :—

"The two heroes, the two heroines, the discarded Annada, and the good-hearted Gangabai, the revengeful Udai Narain, and the scrupleless Saligram—each of them has a vast deal to say and to do and says and does it with the best of wills. In the scene, in which the two heroes carry on their impassioned dialogue, they strike fire out of each other and ignite, so to speak, the whole house."

অমরেন্দ্রনাথের নিরঞ্জন ও কুসুমকুমারীর গঙ্গাবাই অভিনয় দর্শনে বিশেষ প্রীত হইয়া, কলিকাতার স্বনামখ্যাত ধনী অনাথনাথ দেব মহাশয় ২৬শে জুলাই তাঁহাদের দুইজনকে দুইখানি পদক পুরস্কার দেন। *

ভ্রান্তি যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ রবিবারের আসর রাখিবার জন্য, ১৭ই আগষ্ট. নসীরামের প্রথম পুনরভিনয় করিয়া স্বয়ং নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এ ভূমিকায় কিন্তু তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই; নিজেই সেটা বুঝিয়া পরের সপ্তাহ হইতে গিরিশচন্দ্রকে নসীরাম সাজাইয়া, স্বয়ং অনাথনাথের অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নসীরাম আশানুরূপ জমে নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কি কারণে জানি না, নাট্যজগতের সহিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র স্বনামধন্য সম্পাদক, ভক্তপ্রবর মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের মনোমালিন্য চলিতেছিল। তাঁহাকে পরিহাস করিয়া, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু প্রণীত 'অবতার' নামক প্রহসন ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথও সেই উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার প্রণীত লর্ড গৌরাঙ্গের অনুকরণে 'লাট গৌরাঙ্গ' নাম দিয়া এক সামাজিক পঞ্চরং রচনা করিয়া, ২৭শে

* কথাটা এখানে উল্লেখ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না; কেন না, অমরেন্দ্রনাথ বহুবার এমন পদক পুরস্কার পাইয়াছেন। তবে দানিবাবুর জীবনীতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন যে. পুরঞ্জনের "ভূমিকায় দানি বাবু অমরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।" কাহার অভিনয় উৎকৃষ্টতর হইয়াছিল, পাঠকবর্গের উপর তাহার বিচারের ভার দিয়া আমরা শুধু ঘটনার যথাযথ বর্ণনা করিয়াই থালাস।

সেপ্টেম্বর হইতে তাহা ক্লাসিকে অভিনীত করান। প্রথম অভিনয় রজনীর পরিচয়লিপি :—

হীরালাল—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), টগর—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ধবলকান্তি—ফিরোজাবালা (নেনী), টুনোখুড়ো—জীবনকৃষ্ণ সেন, মহীন্দ্রনারায়ণ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু), দাওয়ান—নটবর চৌধুরী, হ্যাদারাম—ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দরোয়ান—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, রাম চাকর—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নিধির মা—প্রমদাসুন্দরী, ভুমরী—কুসুমকুমারী, ঝুমরী—রাণীসুন্দরী।

ইহার দ্বিতীয়াভিনয় রজনী, ৪ঠা অক্টোবর হইতে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের আদেশক্রমে "লাট গৌরাঙ্গের" নাম 'ভক্তবিটেলে' পরিবর্ত্তন করিতে হয়। পুলিস কর্ত্তৃক পুস্তকের অভিনয় বন্ধ করাইতে অক্ষম হইয়া, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতিলাল ঘোষ অমরেন্দ্রনাথের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে এই বিষয়ে তাঁহার অনুজকে অনুরোধ করিতে বলেন। অমরেন্দ্রনাথের সহিত মতি বাবুর সম্প্রীতির কথা আমরা তাঁহার কৈশোর আলোচনায় বলিয়াছি। মতি বাবু ও হীরেন্দ্র বাবুর অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ সাত রাত্রি অভিনয়ের পর, 'ভক্ত বিটেল' বন্ধ করিয়া দেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (১৮ই অক্টোবর, ১৯০২) লিখিয়াছিলেন :—

"The piece is "Avatar" raised to its *nth* power, and is a merciless exposure of the religious humbug. The character songs which are sandwiched between the scenes afford undoubted delight to those who affect a play of this description. The songs derive their interest greatly from the dances which accompany them. These dances have been thoughtfully arranged by Babu Nripendra Chandra Bose. the well known expert, whose return to the boards of the

Classic Theatre, must be a matter of congratulation to the management."

একা নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু নন, ডিসেম্বর মাস হইতে তিনকড়িও আসিয়া ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দেন।

২৯শে নভেম্বর হইতে খুব সুখ্যাতির সহিত নন্দবিদায়ের পুনরভিনয়ের পর, ২৫শে ডিসেম্বর, ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের নূতন সামাজিক নক্সা "আয়না" প্রথম অভিনীত হয়। অমরেন্দ্রনাথ ইহাতে সৃষ্টিধরের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই রাত্রি অভিনয় করিবার পরই অকস্মাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে গিরিশচন্দ্র সৃষ্টিধরের অংশ লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের মুকুটোৎসব (Coronation) উপলক্ষে কলিকাতায় দরবার হয়। ক্লাসিক সম্প্রদায় সেখানে অভিনয়ার্থ আহূত হওয়ায়, বিডন ষ্ট্রীটস্থ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে ৭ই হইতে ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত সমস্ত অভিনয় বন্ধ থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও, সমাগত রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষগণের বিশেষ অনুরোধে ও আগ্রহে অমরেন্দ্রনাথকে সেখানে অভিনয় করিতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া তিনি সগর্ব্বে যে হ্যাণ্ডবিলখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রঙ্গজগতে ক্লাসিকের কিরূপ স্থান ছিল, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। আমরা সেই হ্যাণ্ডবিলের বক্তব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

The Classic Theatre has had the honour and high privilege of catering to the intellectual and emotional

demands of the loyal citizens who took part in the rejoicings of the Durbar. * * Patrons and Friends will not only excuse us for our absence but we trust, they will gladly offer their congratulations to us.

ক্লাসিকের কয়েকটী আত্মকথা মাত্র !!

কার্য্যক্ষেত্রে অহর্নিশি কি চিন্তা করিবে ? আত্মোন্নতি ! আজ "অমর-রঙ্গে" নট-নটীগণের "মণিকাঞ্চন যোগ"—এই যোগে সুযোগে ক্লাসিকের উন্নতি, আর উন্নতি কি না তাহার নিদর্শন—সহৃদয় দর্শকবৃন্দ !

ভগবৎ কৃপায়, দর্শকগণের দয়ায়, আর সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিতায়, ক্লাসিক আজ নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ সীমায় !! ইহাতে অনেকের চক্ষু টাটায় !! নিন্দুকের সিন্ধুকভরা নিন্দায় আমরা ভীত নহি !

মহাকবি তুলসীদাস উপদেশ দিয়াছেন—

হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুনকে দুর্ভাব নহি, যও নিন্দে সংসার ॥

যেমন নগরের মধ্য দিয়া হস্তী গমন করিলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাজার হাজার কুকুর চীৎকার করিতে থাকে, হস্তী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না ; তেমতি সাধুব্যক্তিকেও নিন্দুকেরা যত নিন্দা করুক না, তাঁহার মন কিছুতেই বিচলিত হয় না !!

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, কাঁচা ময়দা গরম ঘৃতে ফেলিয়া দিলে যেমন ছক্‌ছক্‌ শব্দ করিয়া আড়ম্বর করে, এবং যে পরিমাণে ভাজা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দের হ্রাস হইয়া আসে, সেইরূপ মনুষ্য অল্প জ্ঞান পাইয়া প্রথমতঃ বাচালতা ও বক্তৃতা দ্বারা আড়ম্বর করিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা জন্মিলে আর আড়ম্বর করে না !!

আমরা মহাকবি তুলসীদাস ও ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে প্রণাম করিয়া বলি—

দেবদ্বয় তোমাদের উপদেশে যেন তাহাদের উপদেশ হয়! পশু জন্ম পরিত্যাগ করিয়া যেন পরম পবিত্র মানব জন্ম পায়!

হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

অসুস্থতার পর অমরেন্দ্রনাথ ১৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। এ দিন সীতার বনবাসের পুনরভিনয় ছিল। গিরিশচন্দ্র রাম, অমরেন্দ্রনাথ লক্ষ্মণ, তিনকড়ি সীতা, কুসুমকুমারী লব ও ভূষণ-কুমারী কুশ সাজিয়াছিলেন। সীতার বনবাসে এত বেশী দর্শক সমাগম হয় যে, কিছুদিন ধরিয়া মহাসমারোহে ইহার অভিনয় হইতে থাকে।

এই নাটকের আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ পর পর কয়েকখানি পুরাতন নাটকের পুনরভিনয় করেন। প্রত্যেক বইখানিই এত জনপ্রিয় হয় যে, নয় মাস ধরিয়া ক্লাসিকে কোন নূতন নাটক খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই। (সৎনাম, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কয়েকখানি নূতন নাটকের অভিনয় এই কারণে এ সময় বন্ধ রাখা হয়।) সেই সকল পুরাতন নাটকগুলির তালিকা,—প্রথম পুনরভিনয়ের তারিখ ও প্রধান প্রধান ভূমিকার অভিনেতৃবর্গের নাম সহ—আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

১। ফণীর মণি (শনিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩);—রাজা—হরিভূষণ বাবু, বিরাগ—রাণু বাবু, ফকরে—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শিখা—তিনকড়ি, ধাঙড়কন্যা—কুসুমকুমারী, বারি—ভূষণকুমারী।

২। বিল্বমঙ্গল (বুধবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩);—বিল্বমঙ্গল—অমরেন্দ্রনাথ, সাধক—গিরিশচন্দ্র (এই প্রথম), সোমগিরি—হরিভূষণ

ভট্টাচার্য্য, বণিক্—রাণু বাবু, চিন্তামণি—কুসুমকুমারী, পাগলিনী—তিনকড়ি।

৩। অভিমন্যুবধ (শনিবার, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৩);—যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন—গিরিশচন্দ্র, অর্জ্জুন ও জয়দ্রথ—অমরেন্দ্রনাথ, অভিমন্যু—তিনকড়ি, রোহিণী—কুসুমকুমারী, উত্তরা—বিনোদিনী (হাঁদি)।

তৃতীয় অভিনয় রজনী হইতে অমরেন্দ্রনাথ অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন সাজেন।

৪। নীলদর্পণ (শনিবার, ১৬ই মে, ১৯০৩) ;—মিঃ উড—গিরিশচন্দ্র, মিঃ রোগ—দানিবাবু, নবীনমাধব—অমরেন্দ্রনাথ, বিন্দুমাধব—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, তোরাব—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, গোলোক বসু—গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নেদারু), সাধুচরণ—চণ্ডীচরণ দে, গোপীনাথ—নটবর চৌধুরী, সাবিত্রী—তিনকড়ি, ক্ষেত্রমণি—কিরণবালা, সৈরিন্ধ্রী—কুসুমকুমারী, সরলতা—রাণীসুন্দরী, আদুরী—কুমুদিনী, পদী—পান্নারাণী।

ষ্টার থিয়েটারও প্রতিযোগিতায় নীলদর্পণ খোলেন। 'রঙ্গালয়' লিখিয়াছিলেন,—"আদুরী, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, উড় সাহেব, নবীনমাধব, ও সৈরিন্ধ্রী—এই কয়টী অংশ ক্লাসিকে অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছে। নীলকুঠীর দাওয়ানও বেশ হইয়াছিল। ষ্টারে তোরাব ও সাবিত্রী খুব ভাল। সৈরিন্ধ্রীর ভঙ্গিমা নাই, তবে মাধুর্য্য আছে।"

৫। সীতাহরণ ও তাজ্জব ব্যাপার (শনিবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯০৩);—রাম—অমরেন্দ্রনাথ, লক্ষ্মণ—দানিবাবু, বালি—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, রাবণ—অঘোরনাথ পাঠক, সুগ্রীব—রাণুবাবু, ব্রহ্মা—গোষ্ঠবাবু, হনুমান—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, সীতা—কুসুমকুমারী, মন্দোদরী—ব্ল্যাকী, সরমা—রাণীসুন্দরী।

৬। কৃষ্ণকুমারী (শনিবার, ৮ই আগষ্ট, ১৯০৩);—ভীমসিংহ—গিরিশচন্দ্র (পরে অমরেন্দ্রনাথ), জগৎসিংহ—অমরেন্দ্রনাথ।

বিল্বমঙ্গল ব্যতীত তালিকাভুক্ত প্রত্যেক নাটকই ক্লাসিকে এই প্রথম অভিনীত হইল। গিরিশচন্দ্রের সাধকের অংশ গ্রহণ এই প্রথম বলিয়া আমরা বিল্বমঙ্গলের উল্লেখ করিলাম।

শনিবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, জন্মাষ্টমীর দিন, ষ্টার থিয়েটারে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'প্রতাপাদিত্যে'র প্রথম অভিনয় হয়। ষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত "বঙ্গের শেষবীর বা প্রতাপাদিত্য" নামক উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া, দুই বুধবার অভিনয় স্থগিত করতঃ তাহার উত্তমরূপ মহলা দিয়া, ২৯শে আগষ্ট ক্লাসিকে 'প্রতাপাদিত্য' খোলেন। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি এই :—

প্রতাপাদিত্য—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্কর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), বিক্রমাদিত্য—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, বসন্তরায়—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, উদয়াদিত্য—বিনোদিনী (হাঁদি), গোবিন্দ রায় ও রডা—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রাঘব—ফিরোজাবালা (নেনী), রামচন্দ্র—প্রমথনাথ ঘোষ, সূর্য্যকান্ত ও আকবর—অহীন্দ্রনাথ দে, গোবিন্দদাস—অঘোরনাথ পাঠক, রামরূপ—ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভডু—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ভবানন্দ—নটবর চৌধুরী, মানসিংহ—চণ্ডীচরণ দে, সেরখাঁ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, তোরাব—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, যশোহর রাজলক্ষ্মী—তিনকড়ি দাসী, ছোটরাণী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), পদ্মিনী—রাণীসুন্দরী, বিন্দু—রাখালী, ফুলজানি—কুসুমকুমারী।

ষ্টারের প্রতাপাদিত্য খুব জমিয়া যায়,—বস্তুতঃ দৈন্যদশা পড়িবার পর, এই তাঁহাদের প্রথম সাফল্যপূর্ণ নাটকাভিনয়। সেখানে অর্দ্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্য ও রডার ভূমিকাদ্বয় জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপ, বিজয়া, গোবিন্দদাস ও গয়লাবৌএর ভূমিকায় যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র, নরীসুন্দরী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমণিও অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয়

করিয়াছিলেন। দৃশ্যপটেও ষ্টার খুব জাঁকজমক দেখাইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিযোগিতায় ক্লাসিক ত' একটুও হারেন নাই-ই, বরঞ্চ বিক্রয়ের দিক দিয়া সেখানে ষ্টার অপেক্ষা অধিক অর্থসমাগম হইয়াছিল। তখনকার দিনে রাত্রি ৯টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইত ও তাহার মাত্র ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে টিকিটঘর খোলা হইত। আজকালকার মত সেকালে অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল না। অথচ দুপুর ২টা হইতে প্রতাপাদিত্যের টিকিট কিনিবার জন্য কি সে বিপুল জনসমাগম! দ্বিতীয় অভিনয় রজনীর কথা এখনও আমাদের স্মরণ আছে। টিকিটঘর খোলা হয় নাই, অথচ অসম্ভব জনতা দেখিয়া, ক্লাসিকের তৎকালীন টিকিট-বিক্রেতা চারুচন্দ্র বসু কি করিবেন জানিবার জন্য ছুটিয়া অমরেন্দ্রনাথের বাড়ী আসেন। অমরেন্দ্রনাথের আদেশে সেই দিন হইতে দুপুর ২টার সময় টিকিটঘর খোলা সুরু হয়। এই বিক্রয়াধিক্য দেখিয়াই তিনি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন,—

"We do not sing ourselves our own victory. The fact of our tickets even upto Four-Rupee ones being entirely disposed of long before 8 P. M. on both the first and second nights—indicates our position. All the leading Actors and Actresses are Classic's own: Hence the success! The others—they simply beat the air—because, a lame cannot jump, a blind cannot paint, a dumb cannot sing, never mind if he tries his best."

ষ্টারের বিক্রয়ও কম হইতনা, সেখানেও প্রায়ই "ফুল হাউস" বলিয়া ঘোষণা করা হইত। তবে ষ্টারের 'ফুল হাউসে' যেখানে ছয়শ' হইতে আটশ' টাকা বিক্রয়, ক্লাসিকের 'ফুল হাউসে' সেখানে

আঠারশ’ হইতে বাইশশ’ টাকার ‘সেল’। ক্লাসিকের বিক্রয়াধিক্য ষ্টারের কল্পনাতীত ছিল, তাই অমরেন্দ্রনাথ যখন ষ্টারের স্বত্বাধিকারী হইয়া সেখানকার বসিবার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া, বিক্রয়ের পরিমাণ ক্লাসিকের মত দুই হাজার টাকায় তোলেন, তখন ষ্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বসু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আমরা যখন লোকমুখে শুনিতাম যে ক্লাসিকে বাদুড় ঝুলিতেছে,—আজ ১৮০০৲, কাল ২২০০৲, অমুক দিন ১৯০০৲ ইত্যাদি সেল, আমরা সংবাদটাকে অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে এরূপ বিক্রয় কবির কল্পনা নহে, যথার্থই সম্ভবপর ব্যাপার।” যে যাহা হউক, উভয় থিয়েটারের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। দুই দলের অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনায় সংবাদপত্রের দীর্ঘস্তম্ভ সকল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অবশ্য ক্লাসিকে তখন কিরূপ শ্রেষ্ঠ নটনটীর সম্মিলন ছিল, তাহা আমরা ভূমিকালিপি হইতেই দেখিতে পাই, সুতরাং সেখানকার অভিনয় উচ্চাঙ্গের না হওয়াই অস্বাভাবিক। আমরা বিবিধ সংবাদপত্রের সমস্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না,—মাত্র তিনটী সংবাদপত্র অমরেন্দ্রনাথের প্রতাপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে তুলিয়া দিলাম। ‘ইণ্ডিয়ান্ মিরার’ (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) লিখিয়াছিলেন :—

“The change of dress on the hero's part is unusually frequent for the Bengali stage and indicates the manager's wish to make it a study in colour. And the manager who essays the role has made the character a study in human passions as well. In modulation of tone, and

variety of facial expression, the impersonation is a characteristic achievement and of the intellectual best yet attempted by him. Sankar, the next character in importance, is undertaken by an expert in the heroic line and played with marked intelligence, barring occasional tendency to strike twelve when it is barely nine. * * The characterisation of Phuljani is one in a hundred and it is only to be witnessed, to be fully appreciated. * * Taken as a whole. Protapaditya is one of the most successful historical plays ever produced on the boards of the Classic Theatre. Faults it has no doubt, but in view of the educational effect of the theme on the present day Bengalees, and the masterful manner in which that theme has been worked upon, one might unhesitatingly exclaim, as Cowper did with regard to England,—"With all thy faults I love thee still."

'বঙ্গবাসী' (২৬শে ভাদ্র, ১৩১০) লিখিয়াছিলেন,—"ক্লাসিকে প্রতাপের অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রতাপ—স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। অভিনয়ের সে জীমূতমন্দ্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহ্নি ছুটে।"

'রঙ্গালয়' লিখিয়াছিলেন,—"এইবার দুই প্রতাপের কথা বলিব। ষ্টারের প্রতাপ আবৃত্তি করে ভাল, তবে সে আবৃত্তিতে sermonএর সুর পাওয়া যায়। ষ্টারের প্রতাপ মানায়ও নাই ভাল। ক্লাসিকের প্রতাপ বেশ মানাইয়াছিল, বেশ বলিয়াছিল, সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল। পরন্তু ক্লাসিকের প্রতাপের Intonation ও Accentua-

tion স্থানে স্থানে ঠিক হয় নাই। সুরের পরদা অনেক সময়ে কাটিয়া গিয়াছিল। ক্লাসিকের প্রতাপ একনিষ্ঠ অভিনেতা নহেন। তিনি শিল্পী বটে, পরন্তু তিনি পরিশ্রমী শিল্পী নহেন। তাঁহার Detail অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, খুঁটিনাটি সবগুলি সামলাইয়া ক্লাসিকের প্রতাপ অভিনয় করিলে অতুল্য হইয়া উঠেন। তথাপি ক্লাসিকের প্রতাপ ষ্টারের প্রতাপ অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হইয়াছিল। ক্লাসিকের প্রতাপ দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করে। অভিনেতার প্রধান সম্পদ্ personal Magnetism, ক্লাসিকের প্রতাপে যথেষ্ট আছে। ষ্টারের প্রতাপ নির্জীব ও morbid, ক্লাসিকের প্রতাপে Animalism যথেষ্ট আছে, Morbidity কিছুই নাই। যে উদ্দেশ্যে প্রতাপাদিত্য নাটক উভয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ক্লাসিকের প্রতাপই উপযোগী। * * ষ্টার মাধুর্য্যপ্রধান, ক্লাসিক বীর ও রৌদ্র প্রধান। ষ্টার সংযত, ক্লাসিক উদ্দাম ভাবপূর্ণ। যাহার যেমন রুচি, তাহার সেইটী ভাল লাগিবে। আমাদের ক্লাসিকের অভিনয় ভাল লাগিয়াছিল।"

ক্লাসিকে প্রতাপাদিত্যের দৃশ্যপট সম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঐ সংবাদপত্র বলেন,—

"রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য পরিচ্ছদ,—বর্ণনার অতীত বিষয়, ইহা শতমুখে বলিব। তরতর তটিনী,—কুলুকুলুনাদিনী—তরঙ্গ-রঙ্গময়ী ;—তরণী নাচিতেছে,—দুলিতেছে। আর সেই রণক্ষেত্র—কি ভয়বিস্ময়াবহ দৃশ্য! ধীর স্থির মরালগতি তটিনীর এক তটে,—প্রতাপের বীর্য্যবান্ রণোন্মাদ সৈন্যসমূহ—দূরে প্রতাপ-সহায় ফিরিঙ্গী-বোম্বেটে রডার জাহাজ,—শঙ্কর-প্রতাপের ভৈরব আহব রবে—বাঙ্গালী সৈন্য মাতিল ;

তরবারি ঝলসিল; কামান গর্জ্জিল! অপর তটে মানসিংহের শিবির বাহিনী। প্রতাপপক্ষের নিক্ষিপ্ত বহ্নিস্রাবী রক্ততপ্ত গোলাঘাতে মানসিংহের শিবির ধু ধু জ্বলিয়া উঠিল! কত তরী অকূলে জলে ডুবিল! শেষ দৃশ্য—সেও অতি অপূর্ব্ব! যশোহরেশ্বরীর মন্দির ঘুরিয়া গেল,—দেখিতে দেখিতে প্রতাপের মস্তক ঘুরিল,—প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইলেন। মানসিংহ মূর্চ্ছিত প্রতাপকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলেন।"

পাঁচ রাত্রি শঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় করিবার পর, দানিবাবু ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন বলিতে হইলে তখনকার নাট্যজগতের একটু ইতিহাস দিতে হয়। আমরা তাহা নিম্নে দিতেছি।

ক্লাসিক হইতে তারাসুন্দরী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, প্রিয়নাথ ঘোষ প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেলেও, গুরুপ্রসাদ মৈত্র অরোরা থিয়েটার বেশীদিন চালাইতে পারিলেন না। থিয়েটার উঠিয়া গেলে, অরোরার ম্যানেজার নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ক্লাসিকে ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর ষ্টারে চলিয়া গেলেন। বাকী দলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এদিকে আবার মিনার্ভাও লাল বাতি জ্বালিল। ক্লাসিকের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যে থিয়েটার খাড়া রাখিতে পারেন নাই, নরেন্দ্রনাথ সরকারের সামর্থ্য কোথায় যে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখেন! তখন গিরিমোহন মল্লিক দুই থিয়েটারের ভাঙ্গা দল লইয়া, অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ম্যানেজার করিয়া, বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে ৬ই জুন, ১৯০৩ তারিখে ইউনিক থিয়েটারের পত্তন করেন। উদ্বোধনের দিন ম্যানেজার সতীশবাবুর "রত্নমালা" নামক নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে সতীশবাবু নায়ক প্রমোদকুমারের অংশ লন এবং তারাসুন্দরী মন্দারমালা ও সুশীলাবালা রত্নমালা সাজেন।

কিন্তু সে থিয়েটারও ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন ইউনিকের স্বত্বাধিকারী গিরিবাবু, চুণিবাবুকে অংশীদার করিয়া সেখানে লইয়া যান ও দানিবাবুকেও বখরার লোভ দেখাইয়া ক্লাসিক হইতে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন। দানিবাবু নিমরাজী হন। খবরটা অমরেন্দ্রনাথের কানে উঠে। দানিবাবু বেশ কৃতিত্বের সহিত শঙ্করের ভূমিকাভিনয় করিতে-ছিলেন। শঙ্কর ধরিতে গেলে নাটকের উপনায়কের অংশ। এক কথায় কাহাকে দিয়াই বা এমন অংশ অভিনীত করান যায়! এই সকল নানা কথা ভাবিয়া, দানিবাবুর যাওয়ার সংবাদে অমরেন্দ্রনাথ বিশেষ বিরক্ত হন। সেদিন বুধবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর; অমরেন্দ্রনাথ সাজঘর হইতে দানিবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলেন,—"হাঁ, দানি, শুনিলাম তুমি নাকি ইউনিকে যাইতেছ?" দানিবাবু উত্তর দেন,—"হাঁ। আমি ভাবছিলাম, তোমাকে নোটিস দিব।" শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ বলেন,—"নোটিস দিবার দরকার নাই, তুমি আজই সেখানে চলিয়া যাইতে পার। তোমার পোষাক খুলিয়া দাও, অন্য লোক তোমার পার্ট করিবে।" পোষাক খুলাইয়া লওয়া অভিনেতার পক্ষে বড়ই অপমানের কথা, তাই দানিবাবু অনর্থক কথা না বাড়াইয়া সাজঘরে চলিয়া যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক লোক মারফত পোষাক খুলিয়া দিতে পুনরায় আদিষ্ট হইয়া, তিনি অগত্যা তাহা পালন করেন এবং যদিও বা ইউনিকে না যাইতেন, অমরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে বাধ্য হইয়া তথায় চলিয়া যান। অমরেন্দ্রনাথ এক সপ্তাহ প্রতাপাদিত্যের অভিনয় বন্ধ রাখিয়া, মনোমোহন গোস্বামীকে তৈয়ারী করিয়া, তাঁহাকে দিয়া শঙ্করের ভূমিকা অভিনয় করান।

অমরেন্দ্রনাথের তখন নাট্যজগতে অসীম প্রতিপত্তি, সেই জন্য

* অথচ দানিবাবুর জীবনীতে হেমেন্দ্রবাবু বলেন,—"অংশের দানিবাবু ক্লাসিকের

তিনি ক্রমশঃ একদল লোকের চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মানহানির মামলায় মিটমাট হইয়া গেলেও, 'বসুমতী' মধ্যে মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে খোঁচা দিতে ছাড়িতেন না। এই সময়ে একদিন বসুমতীতে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত 'স্ফটিকজলে'র একটী বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ তাহার জবাবে হ্যাণ্ডবিলে লেখকের বিষয়ে বেশ একটু কটু মন্তব্য করিয়া লেখেন। তাহা পাঠে ভয়ঙ্কর ক্ষেপিয়া গিয়া, হরিসাধনবাবু ও তাঁহার দুইজন বন্ধু (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়) মিলিয়া অমরেন্দ্র-নাথকে খুব গালিগালাজ করিয়া একটী পদ্য লেখেন। তাহার কয়েক ছত্র মাত্র আমাদের মনে আছে, পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহাই আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

বেঁচে থাক ষষ্ঠীর দাস, কেলে সোনা ধন।
কোন তিথিতে জন্মে যাদু হয়েছ এমন?

সংস্রব ছাড়িয়া ইউনিকে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্র ছাড়িতে পারেন নাই, কারণ তখনও তাঁহার বেতন অনেক বাকী ছিল। তবে উপর্য্যুপরি তাগাদা করিয়াও টাকা না পাওয়ায় তাঁহার উৎসাহ ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল।"

ছাপার অক্ষরে উক্তিটা লিখিবার পূর্ব্বে হেমেন্দ্রবাবু, অন্যের কথা ছাড়িয়া দি, অন্ততঃ একবার গিরিশচন্দ্রের নিত্যসহচর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গিরিশচন্দ্রের জীবনীখানি পড়িয়া দেখিতে পারিতেন না কি? গিরিশচন্দ্রের মাহিনা বাকী পড়ে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে, যখন ক্লাসিক থিয়েটারে দুর্দ্দিন ঘনায়মান,—১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দানিবাবু ইউনিকে যাওয়ার পূর্ব্বে নয়। অমরেন্দ্রনাথের—তথা ক্লাসিক থিয়েটারের—অপূর্ব্ব প্রতিপত্তি তখনও যে অপ্রতিহত, তাহা হেমেন্দ্রবাবু অপরেশ বাবুর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'খানা পড়িলেও দেখিতে পাইতেন। হেমেন্দ্রবাবুর মত বিচক্ষণ জীবনীলেখকের 'অপরের মুখে ঝাল খাইয়া', এরূপ 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপান' উক্তি করিবার পূর্ব্বে তাহার যথার্থতা নিরূপণ করিবার একবার চেষ্টা করা উচিত ছিল না কি?

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি বাঁচবে তুমি ম'রে।
নাম বাজাচ্ছ খুবই বটে আজব সহরে ॥
দেখে বিজ্ঞাপনের চক্‌চকানি নটীর ফটোর রাশি।

*　　*　　*　　*

লিখে বিদ্যাসুন্দর, কাজের খতম, মজা, থিয়েটার।
কালিদাস আর সেক্সপিয়ারের মারলে হে পসার ॥
তোমার ষাঁড়চেঁচানি অ্যাক্‌টিংএর চোটে ভাঙ্গল করোগেট।

*　　*　　*　　*

এখন ট্যাঁপা-লুসী কুত্তা নিয়ে কাটাও দু-দশ রাত।
ভয় কি তোমার শেষ দশাতে আছে ভায়ের ভাত ॥

পাছে অমরেন্দ্রনাথ লেখকের পরিচয় জানিতে পারেন, এই ভয়ে নবদ্বীপ হইতে কবিতাটী ছাপাইয়া আনিয়া, তাহা থিয়েটারে থিয়েটারে বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, মুদ্রিত কবিতায় লেখকের কোন নামগন্ধ বা ছাপাখানার কোন উল্লেখ ছিল না। অমরেন্দ্রনাথের মত জনপ্রিয় অভিনেতার নামে এমন কবিতা পড়িয়া, দর্শকসমাজে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেটা যে তাঁহার হ্যাণ্ডবিলের জবাব, তাহা অমরেন্দ্রনাথ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি লেখকের বহু অনুসন্ধান করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া, শেষে ৩১শে অক্টোবরের থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে লেখেন :—

"Go on Tommy! Once, twice, thrice and so forth with your blatant anonymous weapon! Fear not—None will charge your birth or breeding, culpa or cowardice, Etiquette or Education, because an Ass is an Ass all the moments."

অমরেন্দ্রনাথ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, অমৃতলাল বসু ঐ

কবিতার রচয়িতা, কিন্তু এই ঘটনার কয়েক মাস পরে তিনি জানিতে পারেন যে, ভূপেন্দ্রবাবু ইহার অন্যতম লেখক। জানিবার পর তিনি ভূপেন্দ্র বাবুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভূপেন্দ্রবাবুর নিজের ভাষাতেই শুনুন :—

"অমরবাবুর আমার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহার একটু কারণও ছিল,—সেটা তাঁহার মুখেই পরে শুনিয়াছিলাম। আমি অমরবাবুর ক্লাসিক থিয়েটারের আমলে—অলক্ষ্যে অমরবাবুর সহিত একটু শত্রুতাসাধন করিয়াছিলাম। সেটা আমার বুদ্ধিহীনতার দোষে ঘটিয়াছিল। তখন আমার বয়সও অল্প, সুতরাং বিবেচনাশক্তি কম। পাঁচজন বন্ধুর প্ররোচনায় অমরবাবুর সহিত অকারণ সেই শত্রুতা করিয়া তখন ভাবিয়াছিলাম, খুব বাহাদুরী করিয়াছি। তাহার জন্য ভীষণ অনুতাপানলে আমি আজও পর্য্যন্ত দগ্ধ হইতেছি। অমরবাবুর আমার নিকটে প্রথম মহত্ত্ব প্রচার—তিনি স্বয়ং উপযাচক হইয়া আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর (স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ রায়ের) সহিত আমার ক্লাবে গিয়া যোগদান করিলেন। সেই আলাপ পরিচয় হইতে আমি সাধারণ রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসিলাম। অমরবাবুর সহিত অজ্ঞানতাবশতঃ শত্রুতাসাধন করিয়াছিলাম, অমরবাবু তাহার প্রতিশোধ লওয়া দূরে থাক—(কখনো সে কথার উচ্চবাচ্য তো করেন নাই)—উপরন্তু আমাকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার করিয়া নাট্যজগতে আমার নাম প্রচার করিয়া দিলেন। সেই জন্য অমরবাবু আমার নিকট এত মহৎ, এত উদার, এত মহানুভব!"

ক্লাসিকের অমরেন্দ্রনাথ।

ক্লাসিকের হাণ্ডবিল, প্রোগ্রাম, টিকিট, চিঠির কাগজ, অমর-গ্রন্থাবলী প্রভৃতিতে পুনঃ পুন
প্রকাশ জন্য তদানীন্তন রঙ্গদর্শকগণ এই চিত্রের সহিত অতি পরিচিত ছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:*:—

ক্লাসিক ও মিনার্ভার কাণ্ডারী অমরেন্দ্রনাথ

(১৯০৩-৪)

আমরা দেখিয়াছি, অঘোরে অমরেন্দ্রনাথের যে প্রতিভার উন্মেষ, হরিরাজে যাহার বিকাশ,—আলিবাবায় যে জনপ্রিয়তার সূচনা, ভ্রমরে যাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা,—এই সাত বৎসর ধরিয়া সে প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত গতিতে রঙ্গজগতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল। তখনকার দিনে অমরেন্দ্রনাথ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপ্রিয় নট ছিলেন এবং ক্লাসিক থিয়েটারই যে কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রঙ্গালয় ছিল, এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। একই থিয়েটারের এতকাল ধরিয়া এরূপ একাধিপত্য আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন নাট্যশালার ভাগ্যে ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবে কিনা জানি না। অপরেশবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"অমরবাবু ক্লাসিকে এত বড় বড় অভিনেতৃর সমাবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিপত্তি তখন এত অধিক হইয়াছিল যে তিনি থিয়েটারের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার সঙ্কল্প করেন। বহু স্বত্বাধিকারীর পরিবর্ত্তনের পর মিনার্ভার তখন গঙ্গাযাত্রার অবস্থা, অমরবাবু এই সুযোগে তখন মিনার্ভার বাড়ী ভাড়া লইলেন।"

জমিদার প্রিয়নাথ দাস তখন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী। তা ছাড়া মিনার্ভা তখন রিসিভারের হাতে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে

অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়বাবুর নিকট হইতে, মাসিক পাঁচশত টাকা ভাড়ায় তিন বৎসরের জন্য মিনার্ভার লিজ গ্রহণ করিয়া, একসঙ্গে ক্লাসিক ও মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালনে বদ্ধপরিকর হইলেন। সর্ত্ত রহিল—অমরেন্দ্রনাথ দশ হাজার টাকা জমা রাখিবেন ও গৃহসংস্কার করিবেন ; কিন্তু কার্য্যতঃ মাত্র কয়েক সহস্র টাকা জমা দিয়া তিনি মিনার্ভার দখল লইলেন। তিন মাস রিহার্সাল দিয়া, ৭৫০৲ টাকা ব্যয়ে থিয়েটার বাটীর আমূল সংস্কার করিয়া, গ্যাসের পরিবর্ত্তে নূতন বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়া, ক্লাসিকের বিজনেস ম্যানেজার দুর্গাদাস দেকে ম্যানেজার ও ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকারের ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ সরকারকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া, মহাসমারোহে ৺শ্যামাপূজার আয়োজন করিয়া, সকালে নহবৎ ও সন্ধ্যায় ইংরাজী ব্যাণ্ডবাদ্যের আওয়াজে বিডন ষ্ট্রীট মথিত করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ বিরাট্ জাঁকজমকের সহিত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'রঘুবীর' নাটক লইয়া, ৭ই নভেম্বর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার উদ্বোধন করিলেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া রঘুবীর নাটকখানি অমরেন্দ্রনাথের হাতে পড়িয়াছিল। প্রথম যখন 'ক্লাসিকে রঘুবীর' বলিয়া প্ল্যাকার্ড বাহির হইল, তখন তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অভিনয় বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়বার যখন প্ল্যাকার্ড পড়িল, তখন মহেন্দ্রলাল বসু স্বর্গারোহণ করেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জাফরের অংশে মনোনীত করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি দুইবার দুর্ঘটনা ঘটায়, তিনি রঘুবীরের অভিনয় ধামা চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন মিনার্ভার উদ্বোধন করিলেন—সেই নাটক লইয়া। প্রথম অভিনয়রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের নাম :—

রঘুবীর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অনন্তরাও—রাধামাধব কর, জাফর—খগেন্দ্রনা[illegible]

সরকার, ভুলিয়া—প্রিয়নাথ ঘোষ, দেবল—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), মন্নু—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, সখারাম ও কৃষক—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, বলদেব—কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্যামলী—পুঁটুরাণী, পরীবানু—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), সখার মা—গুলফম্ হরি।

রঘুবীর অভিনয় সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান্ মিরার' (১৫ই নভেম্বর, ১৯০৩) লিখিয়াছিলেন,—"The play however belongs to Raghubir and Shyamali and with them the author forms a triumvirate whose power even the most inveterate scoffers do not find it easy to ignore. Babu A N. Dutt, who undertakes the hero's role, lives it with every fibre of his being. He does not spare his brains nor his lung either. In the softer moments however, he is as cool as ice itself. In the struggle between the Brahmin and the Bhil in the character, the player shows himself in one of his most brilliant moods. If it has often been courtesy to say that he shared the honour of the evening, this time it is a compliment unadulterated by flattery."

বস্তুতঃ রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ যে শিল্পচাতুর্য্য দেখান, তাহা যথার্থই অলৌকিক। প্রতি দৃশ্যে, প্রতি কথায়, প্রতি হাবভাবে, প্রতি বাচনভঙ্গীতে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যধারা ক্ষরিত হইত, তেমন শক্তি কোথায় যে পাঠককে তাহার রসাস্বাদন করাই? নর্ম্মদার উদ্দেশ্যে—'উত্তালতরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা' বলিয়া রঘুবীররূপী অমরেন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ উক্তি করিতেন, তাহার উদাত্ত স্বরলহরী এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। অনন্তরাওএর প্রতি রঘুবীরের 'প্রভুমুখে শুনিয়াছি' ইত্যাদি শুনিতে শুনিতে—

'নীচ আমি ভিত্তি ভাল নয়, আদেশ করনা দাসে'

শুনিয়া দর্শকগণ চকিত হইয়া উঠিতেন। অমরেন্দ্রনাথ বলিয়া যাইতেন—

কর্ত্তব্য সাধনে দলিয়াছ
অম্লানবদনে, ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময়ী অন্তরের রেখা।
পায়ে ধরি পিতা, দেখ চেয়ে. কোথায় তোমার স্থান।
পদরেণু পড়ে আছে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—ভিক্ষা আশে
গ্রহশশী নীরবে চাহিয়া—মিলিল না শ্রীচরণ সীমার
সন্ধান। কোথা আমি! অতি ক্ষুদ্র কোথায় জাফর!
কোথা ক্ষুদ্র সে গুর্জর,—সে কি তোমারে ঘেরিতে পারে?
প্রকাণ্ড প্রান্তর লয়ে, লয়ে বন, লয়ে উপবন.
সুনীল গগনস্পর্শী লয়ে শৈলমালা, বিধাতার
সৃষ্টিকাল হতে আছে বাঁধা ব্রাহ্মণের ঘর। * *
যেবা মহাপ্রাণ, সাগর মেখলা ধরা জন্মভূমি তার।

আবার অনন্তরাওএর মুক্তি উদ্দেশ্যে আগত রঘুবীরের জাফরের প্রতি—

কোমলা রমণী প্রাণে
পরশিয়া পুরুষের অঙ্গ সমীরণ, হৃদে যার
তরঙ্গ তাড়ন, হেন নারী-বক্ষ বুকে ধরে কভু
রাজ্য কি শাসিত হয় বীর! মৃত্যু দেছ সহস্র
সংসারে। শোকার্ত্তের করুণ চীৎকারে ভরায়েছ
গুর্জরের নিস্তব্ধ গগন। * * জ্ঞানচক্ষু করি
উন্মীলন, চেয়ে দেখ নরাধম! তীব্র স্মৃতি ভীম
আকর্ষণে, ওই দেখ শত শত বিগত জীবনে
উঠেছে কি তীব্র কোলাহল! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—

প্রতিহিংসা গায়। বিষাদ তরঙ্গভরা শোকাশ্রু অঞ্জলি,
একবাক্যে ভিক্ষা চায় প্রতিহিংসা—হত্যা কর জাফর দেবলে।
আবার—প্রাণ নিতে কোন প্রাণে বলিলে জাফর ?
একদিন যে সাগরে ছিলে ভাসমান, সে সিন্ধুর
নাহি ছিল সীমা। নর্ম্মদার আবর্ত্তের পাকে পাকে
ঘুরে, কণ্ঠায় কণ্ঠায় যবে পশেছিল জল, সে সময়
মৃত্যু যদি করিতে কামনা, সাজিত তখন।

প্রতিশব্দে অমরেন্দ্রনাথ যে অঙ্গভঙ্গী করিতেন ও যে অসামান্য আবৃত্তিকৌশলের পরিচয় দিতেন, বহু অভিনেতাকে তাহার ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াস করিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কৈ, তেমনটি ত' কাহারও মুখে শুনিলাম না। ব্রাহ্মণ ও ভীল প্রকৃতির অন্তর্দ্বন্দের সূচনায় শ্যামলীর প্রতি—

গগনের সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায়
উত্ত্যক্ত সিন্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্ত্তন,
যেইমত মাঝে মাঝে, দূরে—অতিদূরে,
শ্যামচ্ছায়া-বিলসিত বেলাভূমি দেয় কাঁপাইয়া,
পিশাচের আচরণ ধায়, হৃদয়ের নিভৃত গুহায়—
নিদ্রালসা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমার, সেই মত
তুলি বুঝি বিষম ঝঙ্কার,—এইবার শোন বোন্ !
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার—সে কি প্রবোধ
মানিবে আর ? ক্ষুধিত শার্দ্দূল,—সে কি হরিণীর
আকর্ণ বিশ্রান্ত চোখে নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল,
নিশ্চল বসিয়া রবে ? কি করি শ্যামলী ?

আবার ভগবানের উদ্দেশ্যে—

হৃদয়স্থ হৃষীকেশ ! ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি জান প্রভু !—
শুধুমাত্র সাহস ভিক্ষায় পদপানে আছি তাকাইয়া।
কিন্তু কই দেখা ত' দিলেন না প্রভু ! বোঝা ত' হ'ল না !
সাহস ত' এলো না আমার !—ইত্যাদি

উক্তিতে অমরেন্দ্রনাথ যে রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, তাহা যথার্থই অনুপমেয়। আবার পরীবানুর উদ্ধারকল্পে আগত শৃঙ্খলিত রঘুবীর—

শক্তি দাও দেব মহেশ্বর ! মহাবজ্র বিঘূর্ণিয়া,
তীব্র স্রোতে জলদ চালিয়া—শক্তি দাও শরীরে আমার।
রমণীর সরবস ধন—সতীধর্ম্ম সংরক্ষণ—শক্তি দাও
বিশ্বনাশী দেব প্রভঞ্জন। শক্তি দাও—

বলিতে বলিতে যখন শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতেন, তখন দর্শকগণের মনে যে রোমাঞ্চকর আবহাওয়ার সৃজন হইত, তাহা নাট্যজগতে একান্ত বিরল। সেই পরীবানু আত্মহত্যা করিতে চাহিলে, অমরেন্দ্রনাথ যখন বলিতেন—

সেকি ! আমি তোমারে ছাড়িব ? তুমি ধর্ম্ম,
তুমি কর্ম্ম, তুমি আত্মসার—তোমারে ছাড়িব ?
সহস্র আত্মীয় প্রাণে তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা।
ভীলধর্ম্ম জাননা—জাননা বালা !
উপরে বৈকুণ্ঠ প্রলোভন, নিম্নে ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন,
সে যদি আশ্রয় চায়, আপনি শ্রীহরি বাদী
তারে ত্যজি অম্লান বদনে।

তখন শ্রোতৃমাত্রেই বুঝিতেন যে তেমন করিয়া কণ্ঠস্বরে একাধারে

কারুণ্য, বাৎসল্য, দৃঢ়তা, ধর্ম্মপ্রাণতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিবিধ ভাব প্রকাশ করা একমাত্র অমরেন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। আবার পরক্ষণেই মানুষের ক্ষুদ্রশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, শ্যামলীকে হতাশব্যঞ্জক সুরে—

উর্দ্ধে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ, পদতলে
অনন্ত ধরণী ; যেও বোন, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী যেথা ভগবান্, অবলার মহাবল দাতা।

বলিলে, দর্শকগণ মমতায় বিগলিতচিত্ত হইয়া যাইতেন। পঞ্চম অঙ্কে যে দৃশ্যে, রঘুবীরের ভীল প্রকৃতি অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া, আত্মপ্রকাশ করিত, সে দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনয় করিতেন, তাহা বর্ণনা করিতে ভাষা মূক, লেখনী অচল। উন্মাদপ্রায় অনন্তরাও প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, রঘুবীর দূর হইতে দেখিয়া বলিলেন—

কোথা যাও উন্মাদ পথিক ? হ'ল দিবা অবসান।
কোন বুকে ঢুকেছ প্রান্তরে ? কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন।
ফিরে যাও, ফিরে যাও। এখনি ভাসিয়া যাবে ধরা।
স্থান হেথা পাবে না প্রবীণ, ফিরে যাও—ফিরে যাও।
অট্টহাসে হাসে কাদম্বিনী। ভীষণ মেদিনী মূর্ত্তি
আঁধার আলোকে। মেঘনাদে কাঁপে বসুন্ধরা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এখনি মাথায়
ভূমিসাৎ করিবে তোমায়। ফেরো, ফেরো !!

পিতাকে চিনিতে পারিয়া রঘুবীর তাঁহাকে ফিরিতে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

উর্দ্ধে নারায়ণ, তুমি জনক আমার ;
ছুঁয়ে শ্রীপদ তোমার, রঘুবীর করে অঙ্গীকার—

শোন পিতা, শোন শোন—বলদেবে করিব উদ্ধার।
আশ্রিতা নবাব কন্যা—অদ্যই সঁপিব তব করে।
পাছে শত্রু ফের পাছে ফিরে, পুত্রকন্যা লয়ে
প্রাণভয়ে, পাছে ভ্রম দেশদেশান্তরে,
দুরাত্মা জাফরশূন্য করিব সংসার। * *
বুক তার খণ্ডে খণ্ডে করি বিদারণ,
মুণ্ড ছিঁড়ে দিব পূজা কালী পদতলে।

রঘুবীরের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া অনন্তরাও তাহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু রঘুবীর কহিলেন—

আশীর্ব্বাদ কর মহামতি! আর আমি নই প্রভু,
ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান। বিশ্বনাথ জনক আমার।
আমি পুত্র তার। শুধু মাত্র অভ্যস্ত সংহারে।
দেখ প্রভু, শমন মূরতি, ফিরাতে পাপের গতি,
করিতে ধরার ধ্বংশ,—শূলী শম্ভু শিয়রে আমার।
সংহার—সংহার!—হের বক্ষে মুক্তকেশী—
অট্টহাসী অসিতবরণা ভীমা—
ধ্বংসরূপা দানব দলনী।
দেখ দেখি, চিনিতে কি পারহে ব্রাহ্মণ?

অনন্ত। একি মূর্ত্তি? রঘুবীর।—রঘুবীর!—

রঘু। রঘুয়া! রঘুয়া! রঘুবীর নহি আর। পিতা!
মরে গেছে রঘুবীর। মৃত প্রাণ তার, মলভরা
পূতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি। রঘুয়া কণ্টকতরু
উঠেছে সেথায়। তীব্র ফুল গন্ধে তার ভরিবে
মেদিনী। এস দ্বিজ লইতে আঘ্রাণ।

স্তব্ধবক্ষে, রুদ্ধশ্বাসে—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, নিথর হইয়া দর্শকগণ অভিনয় দেখিতেন ;—সে অভিনয়ের তুলনা হয় না। অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন, পড়িয়া আছে শুধু নামটুকু। সে স্বরতরঙ্গ, সে উচ্চ হর্ষধ্বনি, সে ঘনঘন করতালি—তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে। যে আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে তিনি যুগপৎ সহস্র সহস্র দর্শককে মাতাইতেন, কাঁদাইতেন, হাসাইতেন, যে অভিনয় প্রতিভায় তিনি সকলকে হর্ষ, বিষাদ, উত্তেজনা, অবসাদের স্রোতে ভাসাইতেন, যে মন্ত্রবলে তিনি বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাকে 'অমরেন্দ্রনাথের নামে পাগল' করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নাই। পড়িয়া আছে শুধু গোটাকতক বাঁধা বিশেষণের বাহুল্য, ও শ্রুতিমধুর শব্দের আতিশয্য। তাহার সাহায্যে যদি কোন কৃতী লেখক জনসাধারণকে সে প্রতিভার আস্বাদ দিতে পারেন, দিন, কিন্তু আমাদের সাধ্য নাই যে সে অনুপম ছবি ভাষার সাহায্যে লোকচক্ষে আনিয়া ধরি। সুতরাং এ প্রসঙ্গের এখানে ইতি করাই শ্রেয়ঃ।

মিনার্ভার স্বত্বাধিকারীরূপে অমরেন্দ্রনাথের আর একটা উল্লেখযোগ্য অভিনয়—১৫ই নভেম্বরে 'আনন্দমঠে' জীবানন্দের ভূমিকায় (অঘোর পাঠক ভবানন্দ, প্রিয়নাথ ঘোষ মহেন্দ্র, ছোট রাণী শান্তি)। এদিকে ক্লাসিকও তখন প্রবল প্রতাপে চলিতেছিল। তাহার সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ সেখানে ২১শে নভেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'হিরন্ময়ী' খুলিলেন। এই গীতিনাট্যের জন্য অমরেন্দ্রনাথ কয়েকখানি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর প্রথমাভিনয়রজনীর ভূমিকা-লিপি :—

চপল—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, চঞ্চল—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, মদন রাজা—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুরন্দর—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, আনন্দস্বামী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ঐ শিষ্য—পান্না-

লাল সরকার, হিরণ্ময়ী—কিরণবালা, হাসি—রাণীসুন্দরী, সুধা—পান্নারাণী (ছোট), অমলা—কুসুমকুমারী।

১৯শে ডিসেম্বর হিরণ্ময়ীর পঞ্চম অভিনয়রজনীতে অমরেন্দ্রনাথ পুরন্দরের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আলিবাবার পর হিরণ্ময়ীর মত জমজমাট অপেরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আর দ্বিতীয় অভিনীত হয় নাই। বরঞ্চ এক হিসাবে হিরণ্ময়ী আলিবাবাকেও ছাপাইয়া গিয়াছিল। একাদিক্রমে অভিনয়বিষয়ে এই গীতিনাট্য, আলিবাবা দূরের কথা, তৎকালীন সমস্ত নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়াছিল; কেন না, উপর্য্যুপরি একুশ শনিবার ও তাহার পর আরও দুই রবিবার ধরিয়া ইহার ক্রমান্বয়ে অভিনয় হয়। উত্তরকালে মিনার্ভায় 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' একাদিক্রমে পঁচিশ সপ্তাহ চলিয়াছিল, কিন্তু ঐ দুই নাটক ব্যতীত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্য কোন পুস্তকের একাদিক্রমে ২৩ রাত্রি অভিনয়ের কথা আমরা জানি না। অমরেন্দ্রনাথ বলিতেন, এক হিরন্ময়ীর অভিনয়ে তাঁহার ২৫০০০৲ টাকার বেশী লাভ হইয়াছিল।

হিরন্ময়ী জমিয়া উঠিতে অমরেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। এবার তিনি মিনার্ভার প্রতিষ্ঠায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতা যে অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, মিনার্ভা খুলিবার পর এক মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ঐ থিয়েটার লইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

খুলনার উকিল বেণীভূষণ রায় আগষ্ট মাসে রিসিভারের নিকট হইতে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লন। ইতিপূর্ব্বেই অমরেন্দ্রনাথ স্বত্বাধিকারী প্রিয়বাবুর প্রদত্ত 'লিজে'র বলে ঐ থিয়েটার বাড়ী দখল

লওয়াতে, বেণীবাবু থিয়েটার চালনায় বিফলমনোরথ হন, কিন্তু তিনি হতাশ্বাস হন না। দুর্গাদাস দের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া অমরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে থিয়েটারের 'পজেসন' প্রার্থনা করেন। অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে অসম্মত হইয়া বেণীবাবুর লিজও তাঁহার নামে হস্তান্তর করিয়া দিতে বলেন। বেণীবাবু কিছু জবাব না দিয়া, সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। মিনার্ভা থিয়েটার খোলা হইলে, তিনি দুর্গাদাস বাবুর সহিত চক্রান্ত করিয়া অমরেন্দ্রনাথকে তাড়াইয়া থিয়েটার দখল লইবার বন্দোবস্ত করেন। অমরেন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া, ২রা ডিসেম্বর তারিখে, পুলিসের সাহায্যে মিনার্ভার 'পজেসন' লইয়া, পোষাক-পরিচ্ছদাদি থিয়েটারের যাবতীয় জিনিষপত্র ক্লাসিক থিয়েটারে লইয়া আসেন ও দুর্গাদাস দেকে থিয়েটার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, 'সোল প্রোপ্রাইটার'-রূপে নিজের নাম বিজ্ঞাপিত করিয়া, ৫ই, ৬ই ও ৯ই ডিসেম্বর মিনার্ভায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বেণীবাবু চক্রান্ত ব্যর্থ হইল দেখিয়া দুর্গাদাস দেকে দিয়া অমরেন্দ্রনাথের নামে পুলিস কেস করান। অমরেন্দ্রনাথ পালটা বেণীবাবুর নামে মামলা রুজু করেন ও তাহার জবাবে বেণীবাবুও অমরেন্দ্রনাথের নামে নালিশ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস তদন্তের আদেশ দেন ও তাহার ফলে মিনার্ভায় অভিনয় স্থগিত রাখিতে হয়। এই সকল ব্যাপার লইয়া 'রঙ্গালয়ে' একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটী পড়িলে পাঠকগণ ব্যাপারটা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাই আমরা নিম্নে সেটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"কলিকাতার দুইটী থিয়েটার লইয়া এক বিষম বিভ্রাটের উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক থিয়েটারের

অধিকারী, আমাদের রঙ্গালয় পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাবু দুর্গাদাস দেকে আজ চারি পাঁচ বৎসর বিজ্‌নেস ম্যানেজারের পদ দিয়া কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। মিনার্ভা থিয়েটারের দখল পাইয়া অমরেন্দ্রবাবু দে মহাশয়কে উহার ম্যানেজার-পদ প্রদান করেন। মিনার্ভার ম্যানেজার হইয়া দুর্গাদাস বাবু ক্লাসিকের বিজ্‌নেস্ মানেজারের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে—মনীবের হিসাব-নিকাশ করিয়া মনীবের অনুমতিক্রমে যে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, এক গোয়ালের গরু অন্য গোয়ালে বাঁধা রহিল মাত্র; চাকর-মনীবের সম্বন্ধ অমরবাবুর সহিত দুর্গাদাস বাবুর সমান ও সতেজে বর্ত্তমান আছে। পরন্তু ঘটনাস্রোত বুঝি বা উল্‌টা করিয়া দেয়।

"বাবু বেণীভূষণ রায় খুলনার একজন উকিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মাঝে মাঝে থিয়েটারী ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। যখন মিনার্ভা থিয়েটার বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকারের অধিকারে ছিল, তখন কোনক্রমে বেণীভূষণ বাবু ঐ থিয়েটার গৃহের কোন এক স্বত্বে স্বত্ববান্ হয়েন্। বাবু দুর্গাদাস দে মহাশয়ের সহিত বেণীবাবুর পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। বাবু অতুলচন্দ্র দত্ত ওরফে বাবু অতুলচন্দ্র রায় বেণীবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকারী। অতুল বাবুর সহিত দুর্গাদাসবাবুর আনুগত্য আছে। এইত সম্বন্ধ বিচার; হঠাৎ একদিন লোকে শুনিতে পাইল যে, অতুলবাবু ক্লাসিক থিয়েটারের সেক্রেটারী হইলেন; বেতন হইল বোধ হয় মাসিক ৮০৲ টাকা। ইহার পরে বেণীভূষণ বাবুকেও মধ্যে মধ্যে ক্লাসিক থিয়েটারে আসিতে যাইতে অনেকে দেখিতে পাইতেন। অমরেন্দ্রবাবুর সৌজন্যে ও সদ্ব্যবহারে সকলেই

চিরমুগ্ধ, সেই প্রভাবে বেণীবাবুদিগরের ক্লাসিক থিয়েটারে যথেষ্ট খাতির প্রতিপত্তি হইল। অতুলবাবু বুদ্ধিমান্ ও যোগ্য ব্যক্তি, তিনি ক্লাসিক থিয়েটারের হিসাব কিতাবের পরিদর্শন ভার পাইয়া বে-খিরুকিচে কাম-কাজ করিতে লাগিলেন।

"পরে একদিন শুনিলাম যে, অমরবাবু দুর্গাদাসবাবুর বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারী অভিযোগ আনিয়া কলিকাতার পুলিস আদালতে নালিশ রুজু করিয়াছেন। নালিশী ব্যাপারের তদন্তের ভার পুলিসের উপর পড়িয়াছে। তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম—বুঝিবা এ এক দ্বৈরথ যুদ্ধ, দুই দিনের জন্য চলিবে, পরে আবার মিটিয়া যাইবে—চাকর মনীব এক হইবে। পরন্তু পরে পরে আরও তিনটী ফৌজদারী মোকদ্দমা পুলিস কোর্টে রুজু হইল। তখন বুঝিলাম, ব্যূহের সপ্তদ্বারে সপ্তরথী বিদ্যমান, দুর্গাদাসবাবু নিমিত্ত মাত্র। অমরবাবু বেণীভূষণবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন, বেণীবাবু অমরবাবুর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন, শেষে দুর্গাদাসবাবুও আর এক নম্বর মোকদ্দমা অমরবাবুর বিরুদ্ধে আনিয়াছেন। সকল নালিশী ব্যাপারই পুলিস তদারকের বিষয়ীভূত হইয়াছে। পুলিস জবাব দিলে মোকদ্দমার বলিদানের বাজনা বাজিবে। যতদূর শুনিতে পাই, ভিতরে দাওয়ানী ফ্যাসাদ আছে, সে হাঙ্গামাও পরে বাধিবে।

"থিয়েটারের ব্যবসায় মজার সামগ্রী, উপার্জ্জনকে উপার্জ্জন—ইয়ারকীকে ইয়ারকী! কাজেই খামখেয়ালী বাবুদের এ ব্যবসায়ের উপর বড়ই খরদৃষ্টি। এই বিষম খরদৃষ্টিবশতঃ থিয়েটারে ভাল অভিনেত্রীকে চিরস্থায়ী রাখা যায় না, আটঘাট না বাঁধিয়া রাখিলে থিয়েটারের ব্যবসায়ও করা চলে না। অমরবাবু যোগ্য ব্যক্তি, বন্ধুবল ও বুদ্ধিবল তাঁহার যথেষ্ট আছে। তিনি সৎকুলজাত, সদাশয়

ও উদার প্রকৃতির যুবক। তাঁহাকে চিনেন না, নগরে এমন অতি অল্প ধনী ও মানী ব্যক্তি আছেন। তাঁহার সাহায্য করিতে উদ্যোগী নহে, এমন ভদ্রসন্তান অল্পই পাওয়া যাইবে। তবে অমরেন্দ্রবাবুর বিষম অপরাধ এই যে, তিনি থিয়েটারের ব্যবসায় চালাইতে পারেন ভাল—চালাইয়া আসিয়াছেনও ভাল রকমে, তাঁহার লোক বশ করার ক্ষমতা অসীম। তাই বাহিরের লোকে ভাবে যে, পয়সা থাকিলেই তাহারা অমরবাবুর মত থিয়েটার করিতে পারিবে। কাজেই মধ্যে মধ্যে খোস্‌খেয়ালী ধনী যুবজনের উপদ্রবে বিষম বিভ্রাট ঘটে। আর, অমরেন্দ্রবাবু অতি সৌজন্যের বশে বেনো জলকেও ঘরে আনিয়া থাকেন—খাল কাটিয়া নোনা জলের প্রবাহ নিজের বাগানে বহাইয়া থাকেন। ফলে তাঁহাকে কখনও কখনও নোনা জলের আস্বাদ পাইতে হয়, কদাচিৎ তাঁহার প্রকৃত বন্ধুও বিরূপ হইয়া যায়।

"বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই ভদ্রলোক ও শিক্ষিত, আমাদের ভরসা আছে এ হাঙ্গামা পরিণামে মিটিয়াই যাইবে। যত শীঘ্র মিটমাট হয়, ততই ভাল,—ব্যবসায়ের পক্ষে ভাল, নাট্যামোদী সকলের পক্ষে ভাল।"

হাঙ্গামা মিটিতে যথার্থই দেরী লাগিল না। পুলিস তদন্তের ফলে অমরেন্দ্রনাথই মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন, বেণীবাবু ও দুর্গাদাসবাবুর মামলা ফাঁসিয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই বহুবার পাইয়াছি। তিনি বেণীবাবুর ধরাধরিতে তাঁহাদের নামে নিজে যে মামলা রুজু করিয়াছিলেন, তাহা ত' তুলিয়া লইলেনই, উপরন্তু বেণীবাবু রিসিভারের নিকট হইতে মিনার্ভা থিয়েটারের যে লিজ লইয়াছিলেন, তাহাও ৪০০০৲ টাকা দিয়া নিজের নামে পাল্‌টাইয়া লইলেন। ঘর হইতে টাকা না বাহির করিয়া তিনি

কণ্ট্রাক্টার বাবু মনোমোহন পাঁড়েকে বড়দিনের আটরাত্রির সেল বিক্রয় করিয়া, সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বেণীবাবুকে ৪০০০৲ দিলেন।

ইতিমধ্যে গিরিমোহন মল্লিক ইউনিক থিয়েটারের মালিকানা স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিলে, দানিবাবু ও চুণিলাল দেব নিজেদের অংশ বাবদ ১৫০০৲ করিয়া টাকা পাইয়া ইউনিক ছাড়িয়া দেন। তাঁহারা ক্লাসিকে যোগ দিতে চাহিলে, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মিনার্ভায় অভিনেতারূপে নিযুক্ত করেন ও এবার গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজারের পদে বৃত করিয়া, ২৪শে ডিসেম্বর হইতে পুনরায় মিনার্ভায় নিয়মিত অভিনয় স্থরু করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী মিনার্ভায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "হিতে বিপরীত" নামক প্রহসনের প্রথম অভিনয় হয়। অতঃপর লর্ড কর্জ্জনের ঢাকা আগমন উপলক্ষে নবাব বাহাদুর সলিমুল্লা সাহেব সেখানে এক উৎসবের আয়োজন করিলে, সেই অনুষ্ঠানে অভিনয় করিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথের নিকট নিমন্ত্রণ আসে। তাহার সম্মান-রক্ষার্থে অমরেন্দ্রনাথ ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে মিনার্ভা সম্প্রদায় লইয়া ঢাকায় যান। এই ঢাকা গমনের ফলেই তাঁহার এক সঙ্গে দুই থিয়েটার চালাইবার সাধ চিরদিনের মত ব্যর্থ হইয়া যায়।

অমরেন্দ্রনাথ ঢাকায় পঁহুছিলে, অন্যান্য সম্মানিত ও বিশিষ্ট অতিথির মত তাঁহার বাসের জন্য বিশেষ ও পৃথক্ বন্দোবস্ত করা হয়, ফলে তিনি দলের অন্যান্য লোকেদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তাহা ছাড়া, নিজের বংশ ও পদমর্য্যাদা অনুযায়ী তাঁহাকে বড় বড় সম্মিলনে যোগদান করিতে হইত, কাজেই তিনি সম্প্রদায়ের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নজর রাখিতে পারিতেন না, তাই চুণিবাবুর উপর তাহাদের দেখাশুনার ভার অর্পিত হয়। সেখানকার এক মাতব্বর জমিদারের সঙ্গে চুণিবাবুর বিশেষ আলাপ হয়। সেই ভদ্রলোক চুণিবাবুকে মন্ত্রণা

দেন যে, "কেন আপনি এমন পরের গোলামী করিয়া বেড়ান? তাহার চেয়ে আসুন, আমার সঙ্গে যোগ দিয়া আপনাদের সম্প্রদায় লইয়া ঢাকায় অভিনয় করুন। দেখিবেন, কত শীঘ্র দুই পয়সার মুখ দেখিতে পাইবেন। আপনাদের কর্ত্তাটিকেও ছাড়িবেন না, তাঁহাকেও না হয় একটা বকরা দেওয়া যাইবে। তবে আপনারাই ত' সব, আপনারা যদি আমার দলে আসেন, উনি একলা কি করিবেন?" তাঁহার প্ররোচনায় পড়িয়া চুণিবাবু নিজের হিত ভুলিয়া, অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন ও দলের সকলকে জপাইয়া স্বমতে আনেন।

ভিতরে ভিতরে যে এই সব ব্যাপার চলিতেছিল, অমরেন্দ্রনাথ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। সেখানকার অভিনয় কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, যখন তিনি কলিকাতায় ফেরার প্রস্তাব করিলেন, দেখেন কেহই কথাটা গা করিতেছে না। ২।৩ দিন কাটিয়া গেলে, যখন তিনি সকলকে ফিরিবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিল যে, আগে চুণিবাবুর মত লওয়া হউক। অমরেন্দ্রনাথ মহা আশ্চর্য্য হইয়া চুণিবাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, তিনি জমিদার বাবুটীর প্রস্তাব অমরেন্দ্রনাথের নিকট পেশ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা যাইবে ত' চল; নয়ত তোমাদের ফেলিয়া রাখিয়া আজই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।" তাঁহার এ উক্তিতেও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ, সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী পুঁটুরাণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া, দলের সকলের মাহিনা চুকাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং ঢাকা ত্যাগের উদ্যোগ করিতেই, সেই জমিদার মহাশয় গুণ্ডার সাহায্যে তাঁহার কলিকাতা আসার পথ রোধ করিলেন। অবশেষে কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া, সেখান হইতে গোরা সেলর (sailor) গুণ্ডা লইয়া গিয়া, খুব

দাঙ্গাহাঙ্গামার পর, অমরেন্দ্রনাথ তাহাদের সাহায্যে কলিকাতায় ফিরিতে পারিলেন। ফিরিয়াই তিনি ঢাকায় চুণিবাবুর নিকট দলের সমস্ত অভিনেতৃবৃন্দের পদচ্যুতিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। পনর দিনের জন্য তিনি ঢাকা গিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিতে একমাস হইল।*

এদিকে আসল শিকারটী হাতছাড়া হইয়া গেল দেখিয়া, এবং তাঁহার অভাবে চুণিবাবুর দলের অভিনয়বাবদ বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ দেখিয়া, সেই জমিদারবাবুটী চুণিবাবুকে অষ্টরম্ভা দেখান. ফলে নানা অসুবিধা ভোগের পর, তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিতে সক্ষম হন।

এই ঘটনাকে বিকৃতরূপ দিয়া, কোন কোন লেখক † বলেন যে, জনৈক অভিনেত্রীর গহনাগাঁটী বন্ধক দিয়া, চুণিবাবুরা কলিকাতায়

---

* এই ঘটনার দিন পনের পরে, অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় ঢাকা যান—এবার সঙ্গে ক্লাসিক সম্প্রদায়। সেখানে খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করার পর, কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে তিনি পুঁটুরাণীর গহনা ছাড়াইয়া লইয়া, তাহা মালিককে ফিরাইয়া দেন।

† দানিবাবুর জীবনীতে হেমেন্দ্রবাবুও অভিনেতৃবর্গকে ডিস্‌মিস্ করা ও অভিনেত্রী-বিশেষের অলঙ্কার বন্ধকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়,—কেন যে অমরেন্দ্রনাথ সকলকে পদচ্যুত করিলেন, তাহার কারণানুসন্ধান করা তিনি প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। উপরন্তু তিনি বলেন যে, "গৃহে ফিরিয়া চুণিবাবু অমরেন্দ্রনাথকে 'ইন্‌সল্‌ভেন্সী'তে দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন।" মাহিনা ও রাহা খরচ বাবদ চুণিবাবুর কত টাকা পাওনা ছিল মনে করেন বলিয়া হেমেন্দ্রবাবু লিখিলেন যে, তাহা আদায় করিতে চুণিবাবু অমরেন্দ্রনাথের মত সম্মানিত ব্যক্তিকে 'ইন্‌সল্‌ভেন্সী'তে দিবেন? ক্লাসিকের এক রজনীর বিক্রয়ের এক চতুর্থাংশে যে চুণিবাবুর এক বৎসরের মাহিনা হইয়া যাইত। গ্রন্থরচনাকালে হেমেন্দ্রবাবু ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তখনও ক্লাসিক থিয়েটারের বা অমরেন্দ্রনাথের দুরবস্থা সুরু হয় নাই।

ফিরিবার খরচ সংগ্রহ করেন। যদিও এ উক্তির মূলে বিন্দুমাত্র সত্য নাই—(তদানীন্তন অভিনেতৃবর্গের মধ্যে এখনও শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় ও জনকয়েক অভিনেত্রী জীবিতা আছেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারা এ বিষয়ে সত্য সাক্ষ্যও দিতে পারেন)—তবু যদিও বা তর্কের খাতিরে ইহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। চুণিবাবুরা কি আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ব্যবহারের পর অমরেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডারযোগে তাঁহাদের রাহা খরচ পাঠাইয়া দিবেন ?

যাহা হউক, চুণিবাবু ফিরিয়া অমরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তো জীবনে চুণিবাবুর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু চুণিবাবু কৃতকর্ম্মের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুশোচনা প্রকাশ করাতে তিনি আর রাগ পুষিয়া রাখিতে পারিলেন না ; তবে চুণিবাবু পদচ্যুতিপত্র প্রত্যাহার করিবার অনুরোধ করাতে অমরেন্দ্রনাথ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, বলিলেন, "অমন নেমকহারাম লোকেদের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহিনা।" কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা চুণিবাবু জানিতেন,—এবং আমরাও জানি যে, অভিনেতৃবর্গের দুঃখমোচনকল্পেই অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতার জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাই চুণিবাবু যখন তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে এতগুলো লোক যে না খাইতে পাইয়া মারা যাইবে। এই তুমি মুখে বল যে অভিনেতা অভিনেত্রীর দুরবস্থা দেখিয়া তোমার প্রাণ কাঁদে, এই কি তাহার প্রমাণ ? তুমি এ দুঃসময়ে তাহাদের মুখ না চাহিলে, তাহারা দাঁড়াইবে কোথায় ? বেশ, তুমি যদি একান্তই তাহাদের না রাখিতে চাও, তাহা হইলে

অন্ততঃ মিনার্ভা থিয়েটারটী আমাদের ব্যবহার করিতে দাও; আমরা সেখানে অভিনয় করি।”

চুণিবাবুর কাতরোক্তিতে বিচলিত হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন,—বলিলেন, “বেশ, আমি তোমাদের থিয়েটার বাড়ী ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু ভাড়া বাবদ ৫০০৲ টাকা তোমরা মাস মাস ঠিক বাড়ীওয়ালার কাছে পঁহুছাইয়া দিও।” চুণিবাবু তাহাতে সানন্দে স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন ও মহোদ্যমে থিয়েটার খুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, মাহিনার বদলে প্রত্যেকে স্বীয় প্রতিষ্ঠানুযায়ী লভ্যাংশের অধিকারী হইবেন।

কিন্তু ক্লাসিকের প্রতাপের কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! তা’ ছাড়া ষ্টারের ভাগ্যও তখন প্রতাপাদিত্যের দৌলতে অনেকটা ফিরিয়াছে। সুতরাং মিনার্ভার অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, দানিবাবুর মত অভিনেতার ভাগে ৪০৲ টাকাও লভ্য হইল না। এত অল্প টাকায় তাঁহার চলিবে না বলিয়া, তিনি ক্লাসিকে চলিয়া গেলেন। যে থিয়েটারের এই অবস্থা, সে ৫০০৲ টাকা ভাড়া যোগাইবে কেমন করিয়া? কাজেই বাড়ীভাড়া বাকী পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে, সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, চুণিবাবু নূতন নাটকের জন্য অমরেন্দ্রনাথকেই ধরিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথের হাতে তাঁহার বন্ধু মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত ‘সংসার’ ও ‘মুরলা’ নামক দুইখানা নাটক ছিল। সেই দুইখানি পুস্তক তিনি চুণিবাবুকে দিলেন ও দানিবাবু ক্লাসিকে চলিয়া আসিলে, সংসারের নায়করূপে অভিনয় করিবার জন্য মনোমোহন বাবুকে অনুমতি দিলেন। অবশ্য তিনি যে নিঃস্বার্থভাবে এ কাজ করিলেন,—তাহা নহে। তখনও তিনি মিনার্ভার

স্বত্বাধিকারী, হ্যাণ্ডবিলে ও সংবাদপত্রে একমাত্র তাঁহারই নাম "সোল প্রোপ্রাইটার"-রূপে বিঘোষিত হয়—চুণিবাবু বা অন্য কাহারও নামগন্ধ থাকে না। এ অবস্থায় দেনাপাওনা বিষয়ে সমস্ত দায়িত্বই তাঁহার। অবশ্য পাওনা তো কিছুই নাই। ১৯০৩ মে মাসে থিয়েটার ভাড়া লওয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত মিনার্ভা বাবদ এক পয়সারও মুখ তিনি দেখিতে পান নাই। নভেম্বরের বিক্রয়লব্ধ টাকা তদানীন্তন ম্যানেজারের উদর পূর্ত্তি করিল; পুনরুদ্বোধনের পর বড়দিনের বিক্রয় মনোমোহনবাবুকে বিক্রয় করিয়া সে টাকা তিনি বেণীবাবুকে দিলেন। তাহার পর জানুয়ারীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাহা তাঁহার হাতে পড়িল, তাহা অভিনেতা অভিনেত্রীর কয়মাসের মাহিনা দিতেই কুলাইল না; পয়সা পাইবেন কোথা হইতে? বরঞ্চ এখনও মিনার্ভার জন্য ডিপসিটের টাকা বাকী, বাড়ী ভাড়ার দরুণ জুন হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৫০০০৲ টাকা বাকী। বাড়ীওয়ালার তাগাদায় তিনি অস্থির। গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা ধার লইয়া, বাড়ী ভাড়ার দেনা মিটাইলেন। কথা রহিল, তিনি পাঁড়ে মহাশয়কে প্রতি সপ্তাহে আড়াই শত করিয়া টাকা শোধ দিবেন। কয়েক সপ্তাহ সেই ব্যবস্থা মত কাজও হইল, কিন্তু একে একে যখন মিনার্ভার প্রেস বিল, ইলেক্‌ট্রিক্ বিল, বিজ্ঞাপনের বিল প্রভৃতি আসিয়া হাজির হইতে লাগিল, অমরেন্দ্রনাথের চক্ষুঃস্থির। মনোমোহন বাবুর টাকা উশুল দেওয়া দূরে থাক্, তিনি তাঁহার নিকট হইতে আরও টাকা ধার লইয়া জরুরী পাওনাগুলি মিটাইলেন। এইরূপে দেখিতে দেখিতে মনোমোহন বাবুর প্রায় দশ হাজার টাকা পাওনা দাঁড়াইল।

অমরেন্দ্রনাথ চুণিবাবুকে পূর্ব্বোক্ত নাটক দুইখানি দিয়া

জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে এক পয়সা ভাড়া বাকী পড়িলে তিনি থিয়েটার-বাড়ীর দখল লইয়া লইবেন। চুণিবাবু আশ্বাস দিয়া গেলেন যে, না, সে বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের কোন চিন্তা নাই। চিন্তা ছিল কিনা, তাহা আমরা যথাসময়ে দেখিতে পাইব।

২৩শে এপ্রিল, ১৯০৪, মিনার্ভায় সংসারের প্রথম অভিনয় হইল।* চুণিবাবু মিঃ মুর, মনোমোহন গোস্বামী প্রিয়নাথ, হাঁদুবাবু হারুমাষ্টার, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নব খুড়ো, মণ্টুবাবু রমেন্দ্র, নিখিলবাবু বিনোদ, বিড়াল হরি বামা, সরোজিনী প্রতিভা ও কুসুম (বিষাদ) সরযূ সাজিলেন। প্রথম রজনীতে বিক্রয় হইল—১৫০৲; দ্বিতীয় রজনীতে—৭০৲। এই দিন ক্লাসিকে 'সৎনামে'র প্রথম অভিনয় ছিল। ক্লাসিকের কথা আমরা পরে বলিব,—এখন মিনার্ভার কথা চলুক। এই ভাবে আরও দুই সপ্তাহ যাইবার পর, ২১শে মে—সংসারের পঞ্চমাভিনয়ের দিন,—সৎনামের অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ক্লাসিক-ফেরৎ দর্শকে মিনার্ভার প্রায় অর্দ্ধেক ভর্ত্তি

* 'সংসারে'র অভিনয়বিষয়ে অপরেশবাবু ও অবিনাশবাবু দুইজনেই ভুল করিয়াছেন। দুইজনেই বলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ মনোমোহন বাবুকে মিনার্ভার লিজ হস্তান্তরিত করার পর, সংসারের অভিনয় হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোমোহনবাবু মিনার্ভার লেসী হন ২৭শে জুলাই (১৯০৪) হইতে, অথচ সংসার অভিনীত হয় ২৩শে এপ্রিল তারিখে। ২৭শে জুলাই পর্যান্ত থাকিবলে, প্রোগ্রামে, সংবাদপত্রে সর্ব্বত্রই অমরেন্দ্রনাথের নাম 'সোল প্রোপ্রাইটার'-রূপে বিজ্ঞাপিত হইত। অবিনাশবাবু বলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ এক বৎসর মিনার্ভা থিয়েটার চালান। অথচ তিনি ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দকে ৭ই নভেম্বর (১৯০৩) হইতে এক বৎসরের পর ফেলিলেন কেমন করিয়া? অপরেশবাবু ইহার চেয়েও বেশী ভুল করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই সময় ক্লাসিক থিয়েটার রিসিভারের হাতে যায়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে ঘটনা ঘটে, ইহারও এক বৎসর পরে, অর্থাৎ এপ্রিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে।

হইয়া গেল। সংসারের অভিনয় মন্দ হইত না, তাই এই দিনের দর্শক সমাগমে নাটক খানিকটা জমিয়া গেল ও কোন রকমে শনিবারের আসর বজায় রাখিতে সমর্থ হইল।

রবিবারের বিক্রয় বাড়াইবার জন্য, চুণিবাবু ১২ই জুন, রবিবার, অমরেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত দ্বিতীয় নাটক "মুরলার" প্রথম অভিনয় করিলেন। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, এখনও অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী। এ কথার অর্থ এই যে, লাভের কোন অংশে তাঁহার স্বার্থ নাই, অথচ লোকসানের সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার। পাওনাদারের বিল আসিতেছে তাঁহার নামে, বাড়ীভাড়ার তাগাদায় লোক আসিতেছে তাঁহার কাছে। অমরেন্দ্রনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্লাসিকের তহবিল হইতে অন্ততঃ ৫০০০০৲ টাকা লোকসান দিয়াছেন এই মিনার্ভার জন্য। তবু এখনও পাওনাদারের শেষ হয় নাই। একবার ভাবিলেন,—চুণিবাবুদের তুলিয়া দিয়া মিনার্ভার 'পজেসন' লইবেন; আবার ভাবিলেন,—তাহা করিলেও ঘর হইতে মাস মাস ভাড়া গণিয়া দিয়া যাইতে হইবে। যদি চুণিবাবুর কাছ হইতে ভাড়া আদায় হয়, এই আশায় তিনি চুণিবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু চুণিবাবু আসিয়া বিক্রয়ের যা' ইতিহাস দিলেন, তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল। টাকা দেওয়া দূরের কথা, চুণিবাবু উল্টা মিনার্ভাকে বাঁচাইবার জন্য ২।১ রাত্রির জন্য গিরিশচন্দ্রকে ধার চাহিলেন। অবস্থা শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ 'না' বলিতে পারিলেন না—সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ অভিনয়ের আয়োজনে, সোমবার, ২৭শে জুন তারিখে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় গিয়া যোগেশ সাজিয়া দিয়া আসিলেন।

অবস্থা ক্রমশঃ দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল। এদিকে আবার ডিপসিটের

বাকী টাকার জন্য মিনার্ভা থিয়েটার বাটীর মালিকেরা তাগাদা সুরু করিলেন,—বলিয়া পাঠাইলেন, সেই দণ্ডে টাকা শোধ না করিলে তাঁহারা 'লিজ' নাকচ করিয়া দিবেন। বাড়ীভাড়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বাদে—৫০০০০৲ টাকা লোকসান, বেণীবাবুকে ৪০০০৲, ডিপসিটে ৭০০০৲, মোট ৬১০০০৲ টাকা ব্যয়ে যে 'লিজ' তিনি জীয়াইয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাঁচিয়া যায় দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লাসিকে তাঁহার বসিবার ঘরে অনেক লোক বসিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কেহ যদি বিনামূল্যে আমার নিকট হইতে মিনার্ভার 'লিজ' লইতে রাজী থাকেন, আমি তাঁহাকে এই মুহূর্ত্তে তাহা দিয়া দিতে পারি।" মনোমোহন পাঁড়েও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিনামূল্যে কেন, আমি আপনার নিকট হইতে আমার পাওনা সমুদয় টাকা ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি আমাকে 'লিজ' হস্তান্তরিত করিয়া দিন। মালিকদের সহিত যা বন্দোবস্ত করিবার আমি করিব। আপনার আর কোন প্রকার দায়িত্ব থাকিবে না।" অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"এক্ষুণি।"

তাহার পর দিন, ২৭শে জুলাই, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, অমরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া করিয়া, মিনার্ভার বাকী দুই বৎসরের 'লিজ' পাঁড়ে মহাশয়ের নামে হস্তান্তর করিয়া দিলেন। নাট্যজগতে মনোমোহন বাবুর জয়যাত্রা সূচিত হইল। আর চুণিবাবু—তিনি অমরেন্দ্রনাথকে ৫০০৲ টাকা ভাড়া দিতে পারিলেন না বা দিলেন না, কিন্তু মনোমোহনবাবু ৭৫০৲ টাকা ভাড়া দাবী করাতে তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাকেই বলে, নিয়তির পরিহাস!

মিনার্ভার এই ইতিহাসের ব্যাপার আমাদের স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে শোনা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

ক্লাসিকের পতন (১৯০৪-৫)

ঢাকা হইতে ফিরিয়া, অমরেন্দ্রনাথ ৬ই মার্চ্চ (১৯০৪), রবিবার, ভ্রমরে গোবিন্দলালরূপে দর্শকদিগকে দেখা দিলেন। তখনও হিরণ্ময়ী পূর্ণগৌরবে চলিতেছে। তিনি আসিবার কিছুদিন পরে, গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' নাটক মহলায় পড়িল। এই নাটকখানি দুই বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; গিরিশচন্দ্র ইহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী প্রমদাকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থের গুলসানা চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কালব্যাধির আক্রমণে বইখানির রিহার্সাল বন্ধ থাকে, ও পরে তাহার অকাল-মৃত্যুতে ভূমিকাটী অন্যা অভিনেত্রীকে দেওয়া হয়। যাহা হউক, প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ইহার সাজ-সরঞ্জাম করাইয়া, ৩০শে এপ্রিল তারিখে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকে 'সৎনাম' খুলিলেন। প্রথম রজনীর ভূমিকার পরিচয়লিপি এই :--

আওরঙ্গজেব—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), হামিদখাঁ—নটবর চৌধুরী, বিষণ সিংহ ও মীরসাহেব—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, কারতরফ খাঁ—চণ্ডীচরণ দে, করিম—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, মোহান্ত—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ফকিররাম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, রণেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, চরণদাস—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, পরশুরাম—অহীন্দ্রনাথ দে, রঘুরাম—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বৈষ্ণবী—কুসুমকুমারী, সোহিনী—পান্নারাণী, গুলসানা—রাণীসুন্দরী, পান্না—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)।

অমরেন্দ্রনাথ, দানিবাবু, অনুকূলবাবু, কুসুমকুমারী ও রাণীসুন্দরী বিশেষ কৃতিত্বের সহিত স্ব স্ব ভূমিকা অভিনয় করেন ও রণেন্দ্রের অংশাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথের সুনাম সমধিক বৰ্দ্ধিত হয়। কিন্তু চতুর্থ অভিনয় রজনী, ২১শে মে তারিখে, উত্তেজিত মুসলমান জনতার আপত্তিতে অমরেন্দ্রনাথ 'সৎনাম' বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। বিক্রয় হইয়াছে—'ফুল হাউস'; অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া সৎ-নামের পরিবর্ত্তে ভ্রমর ও দোললীলার অভিনয় ঘোষণা করিলেন। 'যাঁহারা না দেখিতে চান, তাঁহারা টিকিটের দাম ফেরৎ পাইবেন'। মনঃক্ষুণ্ণ দর্শকগণের মধ্যে অনেকে মিনার্ভায় 'সংসার' দেখিতে গেলেন।

মানুষের যখন দুর্ভাগ্য আসে, তখন একেলা আসে না। অমরেন্দ্র-নাথ এ যাবৎ মিনার্ভার জন্য ৫০০০০৲ লোকসান দিয়াছেন, অথচ মনোমোহন বাবুর নিকট ১০০০০৲ দেনা, আবার সৎনামের জন্য ৬।৭ হাজার টাকা খরচ, সমস্ত জলে গেল। তাহাতেও তিনি কাতর হইতেন না, কিন্তু ইহাতেও দুর্ভাগ্যের শেষ হয় নাই। গোপাললাল শীলের এষ্টেটের অ্যাড্‌মিন্‌ষ্ট্রেটর (Administrator) মিঃ বেলচেম্বারকে ক্লাসিকের বাড়ীভাড়াস্বরূপ সেই দিন সকালে অমরেন্দ্রনাথ মঙ্গলবারের তারিখ দিয়া একখানি ২০০০৲ চেক দিয়াছেন। ব্যাঙ্কে টাকা নাই; ভাবিয়াছিলেন, শনিবারের 'সেল' ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিয়া, চেকের দাবী মিটাইবেন। এখন টিকিটের দাম ফেরৎ দেওয়ায়, সে আশায় ছাই পড়িল। অমরেন্দ্রনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শেষে তিনি মনোমোহনবাবুর কাছে আরও ২০০০৲ কৰ্জ্জ চাহিলেন। কিন্তু পাঁড়ে মহাশয় পাওনার সমষ্টি আর বাড়াইতে সম্মত হইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ মনোমোহন বাবুর নামে ক্লাসিক থিয়েটারের স্বত্ব বিক্রয়ের খোস কোবালা লিখিয়া দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে উক্ত

টাকা ধার লইলেন। কথা রহিল, তিন মাসের মধ্যে এই দলিল রেজিষ্ট্রী করা হইবে না। তাহার মধ্যে যদি অমরেন্দ্রনাথ এই টাকা না শোধ দিতে পারেন, তাহা হইলে মনোমোহনবাবু ক্লাসিকের মালিক হইবেন।

পাঠকবর্গ প্রশ্ন করিতে পারেন, ক্লাসিকের মত কলিকাতার সেরা থিয়েটারের এমন অবস্থা কেন? নিত্য ফুল হাউস, অসম্ভব বিক্রী, তবু অমরেন্দ্রনাথের টাকার এত টানাটানি কেন? উত্তরটা বুঝাইবার জন্য, ব্যাপারটা একটু খুলিয়া বলিতে হইবে।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, সমস্ত কথা পর্য্যালোচনা করিলে মানিতে হয় যে ইহার একমাত্র কারণ অমরেন্দ্রনাথ নিজে ও ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী—তাঁহার অমিতব্যয়িতা, অবিমৃষ্যকারিতা, অপরিণামদর্শিতা, কর্ম্মচারীদিগের উপর অন্ধবিশ্বাস, ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্মে হেলা এবং সর্ব্বশেষ (কিন্তু সেই জন্য যে গৌণ, তাহা নহে) তাঁহার দয়া।

শেষের কথাটাই আগে ধরি। তাঁহার দয়ার কথা বলিতে গিয়া, সাহিত্য-সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছিলেন,—"ভূপেন্দ্রনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়) অমরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের উচ্চতার কথা যাহা বলিলেন, আমার মতে তাহার হৃদয় তদপেক্ষা আরও উচ্চ, আরও মহৎ ছিল। আমি বহুদিন তাহার সহিত একসঙ্গে কাটাইয়াছি, বহুদিন তাহার বিদ্বৎজন-পরিপূর্ণ বৈঠকখানায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি সেই প্রাতঃকাল হইতে প্রায় দুইটা অবধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অমরেন্দ্রনাথ আহার ও বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কত রকমের প্রার্থী কত রকমের প্রার্থনা লইয়া শুষ্কমুখে, সজল-নয়নে অমরেন্দ্রনাথের নিকট প্রার্থনা জানাইতে আসিত এবং অমরেন্দ্র-নাথও লোক বুঝিয়া, প্রয়োজন বুঝিয়া, লঘুদানে, গুরুদানে, তাহাদের

প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাহাদের শুষ্ক মুখে হাসি ফুটাইতেন। এমন কত লোক আসিতেছে, কত লোক যাইতেছে, অমরেন্দ্রনাথ ক্রমাগত দান করিতেছেন, তাহাতে বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই। **দান করিয়াই অমরেন্দ্রনাথ ফতুর**। অমরেন্দ্রনাথ বিলাসী ছিলেন, আবাল্য বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত, কিন্তু তাঁহার নিজের নিমিত্ত ব্যয়, তাঁহার আয়ের অনুপাতে কিছুই নয়। পরের দুঃখবিমোচনে, পরের অভাব দূরীকরণে অমরেন্দ্রনাথ নিজের সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন। **তাঁহার বিশাল আয় কেবল পরের জন্যই নিয়োজিত ছিল**।" অমরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্যান্য কৃতী লেখকের উক্তি আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। সুতরাং আর এ বিষয়ের বিস্তার করিব না।

তারপর তাঁহার অমিতব্যয়িতার কথা। সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া, তিনি কিরূপে পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। পুনরায় যখন ক্লাসিকের দৌলতে তিনি বিপুল অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেন, তখন তিনি দুই হাতে পয়সা উড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ক্লাসিক হইতে তিনি কম পক্ষে দশ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিলেন, সে টাকা গেল কোথায়? থিয়েটারে যে ন্যূনপক্ষে প্রতি সপ্তাহে সাড়ে চার পাঁচ হাজার টাকার বিক্রয় হইত, সে টাকা কিসে নষ্ট হইল? যতই অমিতব্যয়ী হউন, এত টাকা নষ্ট করিবার ক্ষমতা অমরেন্দ্রনাথের ছিল না, তবু হইল কেন? কতকাংশে দানে বটে, কিন্তু বাকী অংশটা?

অমরেন্দ্রনাথ আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিবার জন্য যে সমস্ত লোক রাখিয়াছিলেন ও থিয়েটারের কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের তিনি অগাধ বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসই

তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। তাহারা টাকা লইয়া কি করিতেছে, তাহার প্রতি তিনি নজরও দিতেন না ; কখনও হিসাব পরীক্ষা করিতে চাহিলে, তাহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ একই বিল payment করা হইয়াছে বলিয়া হুজুরে হাজির করিত, অমরেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে না তাকাইয়াই, তাহাদের কথা বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতেন। তবে তাহাদের চুরীরও একটা পদ্ধতি ছিল। অমরেন্দ্রনাথ নিজের খরচের জন্য চাহিলে কখনও টাকার অভাব হইত না, রঙ্গোপজীবী অভিনেতাদের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য তিনি যে দেশের মাথাওয়ালা লোকেদের আনিয়া বড় বড় পার্টি দিতেন, তাহার খরচের কখনও অনাটন হইত না, খুচরা বিলের টাকার কখনও ঘাটতি পড়িত না (কেন না, তাহা হইতে বেশ দু'পয়সা উপরি আছে, এক বিলের টাকা দশবার দেওয়া হইয়াছে বলিলেও, প্রদত্ত মুদ্রার স্বল্পতাবশতঃ তাহা লোকের চোখে পড়িবে না)—টাকার অভাব হইত, মোটা বিল দেওয়ার বেলায়, বাড়ী ভাড়ার টাকার বেলায়, অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতন দিবার বেলায়। তাও শেষোক্ত ব্যাপার এক রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কুলাইয়া যাইত বলিয়া, তাহা কখনও পড়িয়া থাকিত না। অমরেন্দ্রনাথ কড়া হুকুম দিতেন, 'অমুক দিনের সেল অন্য কোন বাবদে খরচ না করিয়া, আগে সকলের মাহিনা চুকাইয়া দিবে'। বাড়ী ভাড়ার ব্যাপারও বড় আটকাইত না, কেন না গোপাললাল শীল অমরেন্দ্রনাথকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন ও তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাড়ী ভাড়ার কোন গোলযোগ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি পুনঃ পুনঃ অমরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "সে যেন নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করে, আমি তাহাকে থিয়েটার বাড়ী দান করিয়া যাইব।" অমরেন্দ্রনাথের অমার্জ্জনীয় অপরাধ—তিনি এই

সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর পাইলেন না। 'যাচ্ছি', 'যাব', করিতে করিতেই গোপালবাবু ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।

সে যাহা হউক, মুস্কিল হইত বড় বিলের টাকা দিবার সময়। অত বড় থিয়েটার, পাওনাদারেরা বেশী তাগাদা করিতে সাহস করে না; বিল লইয়া আসিলে কর্ম্মচারীরা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া, থিয়েটারের পাস দিয়া, তাহাদের ফিরাইয়া দেয়। অবশেষে বিলের পরিমাণ যখন প্রায় পাঁচ সংখ্যায় গিয়া ঠেকে, তখন আর পাওনা-দারেরা কর্ম্মচারীর অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি কর্ত্তার কাছে চলিয়া যায়। তহবিলে অত টাকা নাই, কাজেই অমরেন্দ্রনাথকে ঋণ করিয়া, বিল মিটাইতে হয়। তখন কিছুদিন কড়া নজর রাখিয়া ধার শোধ হইয়া গেলে, আবার অবস্থা 'পুনর্ম্মুষিক' হয়। ফলে চুরীর মাহাত্ম্যে ব্যাঙ্কে কখনও এক পয়সা যায় না, অমরেন্দ্রনাথ দেখিয়া শুনিয়া ভাবেন, যথার্থ ই বুঝি "যত্র আয়, তত্র ব্যয়" হইতেছে।

কথায় কথায় একদিন এই ব্যাপার শুনিয়া, অমরেন্দ্রনাথের পরম হিতৈষী ও সুহৃদ, 'বোসের সার্কাসে'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় মতিলাল বসু বলেন,—"বল কি? তোমার সিকি রোজগারও আমরা করি না, অথচ আমাদের ত' এ অবস্থা নয়। নিশ্চয়ই তোমার টাকা চুরী হয়।" অমরেন্দ্রনাথ হাসিয়া জবাব দেন, "বেশ, তুমিই তাহা হইলে আমার হিসাব দেখিবার ভার লও না!" মতিবাবু বন্ধুর উপকারার্থ তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, সেই দিন হইতে কাজে লাগিয়া যান। হাণ্ডবিলে তাঁহার নাম "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইতে থাকে। একেলা সময় করিয়া উঠিতে পারিবেন না বলিয়া, তাঁহার ভাই প্রিয়বাবু তাঁহার সহকারী হন।

তিনিও অমরেন্দ্রনাথের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এটা হইল ১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকের কথা।

এইভাবে কিছুদিন যাইবার পর, ক্লাসিকের কর্ম্মচারীবর্গ দেখিলেন, তাহাদের অন্ন উঠিল। এ ত' এক আচ্ছা আপদ কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে! কিরূপে তাঁহাদের তাড়ান যায়, তাহারই পন্থা উদ্ভাবনে সকলে ব্যস্ত হইলেন। নানারকম করিয়া লাগাইয়া অমরেন্দ্রনাথের কান ভারী করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। শেষে একদিন তাহারা অমরেন্দ্রনাথকে বলিল, "শুনিয়াছেন, বাজারে কি গুজব! মতিবাবু নাকি বলিয়া বেড়াইতেছেন যে আপনি বিশ হাজার টাকায় তাঁহাকে ক্লাসিকের অর্দ্ধেক স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছেন।" "রঙ্গালয়ে" ইহার প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়া, তিনি মতিবাবুদের ডাকাইয়া এ গুজবের উৎপত্তি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ফলে একটু বচসাও হইল। শেষে তাঁহারা হিসাবের খাতা ও অমরেন্দ্র-নাথের নামে ব্যাঙ্কের পাস-বহি, তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এই ৬।৭ মাসের মধ্যে সমস্ত দেনা পরিশোধের পর, সমস্ত খরচ খরচা বাদ—মায় অমরেন্দ্রনাথের নিজের ব্যয়, অপব্যয়, দান, খয়রাত,—তাঁহার নামে ব্যাঙ্কে প্রায় ২৬০০০৲ টাকা জমা। ইচ্ছা হইল, একবার গিয়া মতিবাবুকে ডাকিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। এই লজ্জাই তাঁহার কাল হইল এবং ইহাতেই ক্লাসিকের পতনের স্বচনা হইল।

মতিবাবুদের প্রস্থানের পর, অমরেন্দ্রনাথ অতুলচন্দ্র রায়কে ক্লাসিকের "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" নিযুক্ত করিলেন। (তাঁহার কথা পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই মিনার্ভার মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে পড়িয়াছেন।) তাঁহার আমলে যথাপূর্ব্ব চুরী চলিতে লাগিল। তবে কে জানে,

হয়ত বা মতিবাবুদের দৃষ্টান্তে অমরেন্দ্রনাথের চোখ একটু ফুটিয়াছিল। তাই চুরী সত্ত্বেও, ব্যাঙ্কে আমানতি টাকার পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন তিনি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া, দুইটী থিয়েটার একত্র চালাইবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন ব্যাঙ্কে তাঁহার প্রায় ৪০০০০৲ মজুত। কিন্তু এই সময়ে রঙ্গালয়ের জন্য প্রায় ২০০০০৲ টাকা একসঙ্গে বাহির করিয়া দেওয়ার ফলে, এক কথায় জমান টাকা অর্দ্ধেক হইয়া গেল; তাই অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার ডিপসিট বাবদ পুরা ১০০০০৲ টাকা দিলেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও জমা ৭০০০৲, এক মাসের ভাড়া ৫০০৲, দলিল ও অন্যান্য খরচ বাবদ এবং বক্‌শিশ প্রভৃতিতে প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য হইতে বেশ মোটা টাকা লাভ হইলেও, সে টাকা মিনার্ভার গৃহসংস্কারে, ইলেক্‌ট্রিক্‌ ইন্‌ষ্টলেশনে, সাজ সরঞ্জামে সমস্ত খরচ হইয়া গেল। মিনার্ভার সেলের কি গতি হইল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; উপরন্তু পরে দেখা গেল যে, তত্রস্থ ম্যানেজার মহাশয় ক্যাশ লইয়া চম্পট প্রদান কালে, অতুলবাবুর সহায়তায়, অমরেন্দ্রনাথকে প্রায় ৩৫০০০৲ টাকার দায়িত্বে ফেলিয়া গিয়াছেন। ফলে যখন তিনি ঢাকায় যাত্রা করিলেন, তখন দেখেন যে, অভিনেতা অভিনেত্রীর বেতনে, অগ্রিম দাদনে, রাহা খরচ প্রভৃতিতে ব্যাঙ্কের পুঁজি শূন্যে গিয়া ঠেকিয়াছে। হিরণ্ময়ী হইতে ২৫০০০৲ টাকা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সে টাকা ত' সমুদয় একসঙ্গে পাইলেন না, তাই সে টাকার কতকাংশ চুরী হইল, কতকাংশ নিজার্থে ব্যয় হইল, কতকাংশ দানে গেল, ও বাকী দশ বার হাজার টাকা মিনার্ভার কতকগুলি দেনা—দুর্গাদাসবাবুর দয়ার দান—শোধ করিতেই নিঃশেষ হইয়া গেল। এইরূপে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত বিশ হাজার,

প্রতাপাদিত্য, হিরণ্ময়ী প্রভৃতি হইতে ক্লাসিকের লাভ বিশ হাজার, চল্লিশ হাজার টাকা মিনার্ভার গর্ভে ঢালিয়াও তাহার সমস্ত দেনা শোধ হইল না, তিনি আরও কুড়ি হাজার টাকা ধার করিয়া মিনার্ভার বড় বড় পাওনাদারদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন। বাকী দেনা ৫০০০৲ ও বাড়ী ভাড়ার জন্য, মনোমোহন বাবুর নিকট হইতে দশ হাজার টাকা ধার লওয়ার কথা পাঠকমাত্রেই অবগত। ইহার পর, ক্লাসিকের স্বত্ব বিক্রয়ের খোস কোবালা লিখিয়া দিয়া আবার ২০০০৲ ঋণ গ্রহণ।

পাঠকবর্গ বুঝিলেন কিনা জানি না, কেন এ সময়ে অমরেন্দ্রনাথের টাকার এত টানাটানি; কিন্তু একথা তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিতে পারিবেন যে, অমরেন্দ্রনাথের দুর্গতির জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী কিনা। যে থিয়েটার বাড়ী নিজের হইতে পারিত, যাহা দান করিবার জন্য বাড়ীর মালিক সাধাসাধি করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন, অবহেলা করিয়া সে ডাকে কর্ণপাত না করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ নিজের এমন সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন যে, সেই বাড়ীর ভাড়া শোধের জন্য সেই থিয়েটারের বিক্রয় কোবালায় সই দিয়া, তবে টাকা ধার পাইলেন। নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে?

টাকার এই টানাটানির সময়ে, অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়ের" জন্য আর অর্থ ব্যয় করিতে চাহিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই এই পত্রিকার জন্য তাঁহার মোটমাট ষাট হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে, তাই অমরেন্দ্রনাথ পাঁচকড়ি বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর রঙ্গালয়ের জন্য টাকা দিতে পারিব না। আপনি যদি চান তো নিজে রঙ্গালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া কাগজ চালাইবেন, নচেৎ পত্রিকা তুলিয়া দিবেন।" রঙ্গালয় উঠিয়া গেল।

৪ঠা জুন (১৯০৪), ক্লাসিক থিয়েটারে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ষড়াঙ্ক নাটক "পেয়ার" অভিনীত হইল। ইহাতে "রূপরাজে"র ভূমিকা অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ লোকানুরঞ্জনে সমর্থ হন। * ইহার প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ :—

টোডরমল—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মোহান্তমলা—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, রূপরাজ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মালঞ্চনাথ—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, পাগলা—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গুণবন্ত সিং—নটবর চৌধুরী, রতন—অহীন্দ্রনাথ দে, রঘুদেব মাড়োয়ারী—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বেশ্বর—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, আগার্খা—চণ্ডীচরণ দে, পেয়ার—কুসুমকুমারী, হিমলী—কিরণবালা, কেতকী—রাণীসুন্দরী, বিজলী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।

পেয়ারের জন্য অমরেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত গান দুইখানি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

১। হিমলীর গান—

সে যে শিখেছে করিতে শুধু পোড়া অভিমান।
যা ছিল সকলি দিছি, তবু তো পোরে না প্রাণ ॥
যত চায়, তত পায়, কত ক'রে তুষি তায়,
প্রমদার প্রেমদায়—লাজ মান অবসান।
কি আছে কি দিব আর, যা ছিল করেছি দান ॥

---

* "পেয়ারের অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ তুষ্টিলাভ করিয়াছেন।"—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।

† এই ভূমিকা প্রথমে দানিবাবুকে দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি ক্লাসিক ত্যাগ করায় হীরালালবাবু ঐ অংশ অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচিত হন ও দানিবাবু চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে, এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

২। পেয়ারের গান—

পীত পীত করি সারা দুনিয়া ভরি
আকুল রব এক উঠিছে—
পীত পীত করি ব্যাকুল নরনারী
পরাণে পিয়াসা ধরি ছুটিছে।
পীত পীত করি নয়ানে ঝুরিছে বারি
নাগরী নাগর পায়ে লুটিছে—
পীত পীত করি লুকায়ে তীখন ছুরি
নিরাশা সাগর বুকে হানিছে।
পীত পীত করি বিরহ সাগর উরি
রমণী জনম কাঁদি কাটিছে—
পীত পীত করি জীবন মমতা ভুরি
গরল ভখিয়ে নারী চিঁড়িছে।
পীত পীত করি ওই ওই গায় হরি
প্রীত লহরী তুলি নাচিছে—
পীত পীত করি ব্যাকুল নরনারী
আকুল রব এক তুলিছে।

১০ই জুলাই রবিবার, অমরেন্দ্রনাথের বাল্যরচনা "মানকুঞ্জ"—"শ্রীরাধা" নামে অভিহিত হইয়া, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি :—

শ্রীকৃষ্ণ—কুসুমকুমারী, শ্রীরাধা—কিরণবালা, চন্দ্রাবলী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), পৌর্ণমাসী—রাণীসুন্দরী, বৃন্দা—হরিদাসী (গুলফম), ললিতা—বিনোদিনী (হাঁদি)।

ইহার ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—"যাহার যাহাতে ধারণা, সেই তাহার পরমার্থ ও সুখ। তপস্বীর তপস্যায়, ধার্ম্মিকের নিষ্কামতায়, প্রেমিকের নিঃস্বার্থতায়, বীরের বীরত্বে, কবির কবিত্বে

দাতার দানে, সংসারীর সংসারে পরমার্থ ও সুখ। সেইরূপ আমারও এ বাল্য চপলতায় পরমার্থ ও সুখের ছায়া বর্ত্তমান!

"নির্ম্মল সুখের কায়া, ধর্ম্মের স্বচ্ছ উপাদানে গঠিত, সন্দেহ নাই! সুতরাং আমারও এ বাল্য চপলতায় ধর্ম্ম আছে। বলিতে পারি না, আমার "ধর্ম্ম" সাধারণের বিরক্তির সীমার অন্তর্গত থাকিবে কিনা?"

অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানি তাঁহার আবাল্য-সুহৃদ্ বরেন্দ্রনাথ ঘোষকে উৎসর্গ করেন।

অতঃপর, ক্লাসিকে রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "তরণী সেন" অভিনীত হয়। অমরেন্দ্রনাথ নাটকখানিকে নূতনরূপ দিয়া, বহু নূতন গীত সংযোজনা করিয়া, ২৩শে জুলাই, ১৯০৪ খৃঃ, ইহার পুনরভিনয় করান। সে রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

রাম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, লক্ষ্মণ—অহীন্দ্রনাথ দে, রাবণ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিভীষণ—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সারণ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, ইন্দ্রজিৎ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, তরণী—কুসুমকুমারী, সীতা—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), সরমা—রাণীসুন্দরী।

২০শে আগষ্ট, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "বিক্রমাদিত্যে"র ভূমিকালিপি এই :—

বিক্রমাদিত্য—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, উদয়েশ্বর—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, আশানন্দ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শঙ্কু—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভানুমতী—কুসুমকুমারী, দুর্গা—জগত্তারিণী, চামুণ্ডা—পান্নারাণী।

ইতিমধ্যে ২৭শে জুলাই, মিনার্ভার 'লিজ' হস্তান্তর করার ব্যাপার পাঠকগণের অবগত. সুতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। শুধু একটা কথার আমরা উল্লেখ করিব। 'লিজ' পাইয়া মনোমোহন বাবুর বহুদিনের চেষ্টা ও আশা ফলবতী হইল,* তিনি মিনার্ভার

---

* প্রথম স্বাগত আলাপ আপ্যায়নের পর মনোমোহন বাবু বলিলেন, "এতদিনের আশা ও চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে; তোমাদের জন্যই আমি থিয়েটার লইয়াছি।"—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, পৃঃ ৫৬।

বাবদ ১০০০০৲ দেনা হইতে অমরেন্দ্রনাথকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু ক্লাসিকের স্বত্ব বিক্রয় কোবালা বলবৎ রহিল। অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু জানিলেন, তিনি সমুদয় ঋণ মুক্ত হইয়াছেন। তাহার পর জুলাই পর্য্যন্ত মিনার্ভার বাড়ী ভাড়া ১৫০০৲, চা-ওয়ালা (মিনার্ভার ষ্টেজে অভিনয় হইয়াছিল মাত্র আড়াই মাস, কিন্তু খুচরা চা ও চপ কাটলেটের বিল হইয়াছিল ৮৫০৲), পানওয়ালা প্রভৃতির টাকা মিটাইয়া দিয়া যখন তিনি হিসাব করিলেন, দেখিলেন মিনার্ভা বাবদ তাঁহার প্রায় ৭০০০০৲ লোকসান হইয়াছে। যে লোকের এক বৎসর আগে ব্যাঙ্কে ৪০০০০৲ মজুত ছিল, আজ মিনার্ভা ও "রঙ্গালয়" বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা লোকসান দিয়া, বাজারে তাঁহার প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেনা—তাহাও শতকরা ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা হারে স্থদে।

তা' হউক, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র দমিলেন না। আর ত' দেনা করিবার কারণ রহিল না। "তখনও ক্লাসিক অক্ষুণ্ণ প্রতাপে চলিতেছে।" * ৪।৫ মাসের মধ্যেই তিনি সমস্ত দেনা মিটাইয়া দিবেন। তিনি মহোৎসাহে অভিনয়কার্য্যে লাগিয়া গেলেন ও নূতন নাটকের জন্য গিরিশচন্দ্রকে তাগাদা করিয়া, তাঁহাকে দিয়া "সিরাজদ্দৌলা" রচনা আরম্ভ করাইলেন। †

এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার কিছুতেই জমিতেছে না দেখিয়া, চুণিবাবু হতাশ হইয়া উঠিলেন। মতীন্দ্রনাথ সরকার বলেন,—"তখনও প্রবল প্রতাপে ক্লাসিক চলিতেছিল, ক্লাসিকের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিবার সাধ্য বা সামর্থ্য তখন ক্ষুদ্র মিনার্ভার ছিল না। এখন থেস্‌পিয়ান টেম্পলের যে অবস্থা, মিনার্ভার অবস্থাও তখন সেই প্রকার ছিল।

---

* অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৫২১।

† সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩১১ দ্রষ্টব্য।

চুণিবাবু এই সময়ে মিনার্ভাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ "বসুমতী"র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের সহিত পুস্তক উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।"

অনেকের ধারণা থিয়েটারে পুস্তক উপহার এই প্রথম, কিন্তু তাহা যথার্থ নয়। ইহারও পথপ্রদর্শক অমরেন্দ্রনাথ। "রঙ্গালয়ে"র উপহারের জন্য মুদ্রিত "অমর গ্রন্থাবলী", "গিরিশ গ্রন্থাবলী"র উদ্বৃত্ত খণ্ডগুলি, তিনি মধ্যে মধ্যে দর্শকদের উপহার দিতেন, এমন কি হালফিল্ ৮ই জুন তারিখে, "শ্রীরাধা" অভিনয়ের পূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া দর্শকগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন তিনি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়িলেন।

বসুমতীর উপেন্দ্রবাবু তিন সহস্র 'অতুল গ্রন্থাবলী' ছাপাইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এত বই গুদামবন্দী করিয়া ফেলিয়া রাখিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না। তখন বসুমতীর বৌবাজারস্থ বর্ত্তমান বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় নাই। গ্রে ষ্ট্রীটস্থ আপিসে স্থানের অকুলান। নানা ভাবিয়া চিন্তিয়া, উপেন্দ্র বাবু অমরেন্দ্রনাথের পন্থা অবলম্বন করিবেন, স্থির করিলেন। থিয়েটার ভাড়া লইয়া প্রত্যেক দর্শককে এক খণ্ড করিয়া অতুল গ্রন্থাবলী উপহার দিলে, বিক্রয়ও সম্ভবতঃ বৰ্দ্ধিত হইবে, বইও কাটিয়া যাইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের মধ্যে থিয়েটার ভাড়ার টাকা বাদে সমস্তই তাঁহার লাভ। তিনি অমরেন্দ্রনাথের নিকট এই প্রস্তাব লইয়া সংবাদবহ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ নানা কারণের অজুহাতে তাহাতে অসম্মত হইলেন। পরন্তু চুণিবাবুর কাছে এ প্রস্তাব লইয়া লোক পাঠাইলে, তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। থিয়েটারে তো বিক্রয়ই নাই, এই উপায়ে

যদি বিক্রয় বাড়ান যায়, মন্দ কি! দায়িত্ব ত' তাঁহার বেশী নাই! সুতরাং সেই কথাই রহিল,—বন্দোবস্ত হইল যে, পুস্তক যোগাইবার ও হ্যাণ্ডবিল ছাপিবার ভার উপেন্দ্রবাবুর, চুণিবাবু শুধু প্ল্যাকার্ড ছাপাইয়া খালাস। কিন্তু 'সেলে'র উপর উভয়ের সমান অধিকার, অর্থাৎ চুণিবাবু ও উপেন্দ্রবাবু অর্দ্ধেক করিয়া পাইবেন।

বুধবার, ২৩শে আগষ্ট (১৯০৪), এই বন্দোবস্তানুযায়ী মিনার্ভায় নন্দবিদায়, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন এবং কুঞ্জ ও দরজী অভিনয়ের আয়োজন হইল,—বিজ্ঞাপিত হইল যে, প্রত্যেক টিকিট ক্রেতা এক খণ্ড 'অতুল গ্রন্থাবলী' উপহার পাইবেন। উপহার-গ্রহণেচ্ছু দর্শকের প্রাচুর্য্যে থিয়েটার বাড়ী গম্‌গম্ করিতে লাগিল। যাঁহারা স্থান পাইলেন না, তাঁহাদের জন্য পরদিন বৃহস্পতিবারে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল এবং দুই রাত্রিতে দেড় হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। উভয় পক্ষই খুব পরিতুষ্ট—চুণিবাবু ত' বেশী, কেন না, ৫০৲ টাকার স্থানে ৭৫০৲ টাকা প্রাপ্তি ঘটিল।

এই বিক্রয়ের তোড়ে ক্লাসিকের বিক্রয় যে কিছু কমিয়া গেল, তাহা না লিখিলেও চলে। আবার পরের সপ্তাহে মিনার্ভা 'মাইকেল গ্রন্থাবলী' উপহার দিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলে, অমরেন্দ্রনাথ অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ক্লাসিকের রবিবারের সেল হস্তান্তর (assign)-পূর্ব্বক, 'পাল এণ্ড ফ্রেণ্ডস্' নামক পোষাকের দোকানের অধিকারী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, ৪।৫ দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে 'মাইকেল গ্রন্থাবলী' ছাপাইয়া, উপহারের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই উপহারের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া তাঁহার দেনা আরও বাড়িয়া গেল। তাহাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না; বেশী টাকা লাগে

লাগুক, কিন্তু তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়া কেহ যে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল হইবে, জীবন থাকিতে তাহা তিনি হইতে দিবেন না।

দুই থিয়েটারে একই উপহার—সেই উপহারের লোভে অপরাহ্ণ হইতে সারা বিডন ষ্ট্রীটে কি জনসমুদ্রের স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহা কেহ সহজে কল্পনা করিতে পারিবেন না। হেদুয়া হইতে বিডন স্কোয়ার পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক, গাড়ী ঘোড়া দূরের কথা, পথচারী ব্যক্তিবর্গেরও সে জনতা ভেদ করিয়া এক পদ অগ্রসর হওয়া ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর দুই মাস ধরিয়া ক্লাসিক ও মিনার্ভায় উপহারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। আসল নাটকাভিনয় শিকায় উঠিল—কে কত উপহার দিতে পারেন, তাহারই প্রতিযোগিতা চলিল। অমরেন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'র শরণাপন্ন হইলেন। দর্শকেরা অতুল গ্রন্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত—এমন কি শব্দকল্পদ্রুম পর্য্যন্ত উপহার পাইলেন।

ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথের আর এক বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গজগতে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না—বিশেষ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিত্বের কালে তাঁহার শত্রু সংখ্যা পূর্ব্বাধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, উপহারের তরঙ্গেই অমরেন্দ্রনাথ ভাসিয়া যাইবেন, কিন্তু যখন তিনি সমান তালে তাল ঠুকিয়া, প্রতিযোগিতায় বুঝিয়া চলিলেন, তাহারা প্রমাদ গণিল। এ দুরন্ত শত্রুকে তো সমূলে না বিনাশ করিলে নিস্তার নাই, ইহাকে তো রঙ্গজগৎ হইতে না তাড়াইলে নিজেদের প্রতিষ্ঠার কোন আশা নাই! তখন তাঁহার জনপ্রিয়তা খর্ব্ব করিবার জন্য, ক্লাসিক থিয়েটার তাঁহার

হস্তচ্যুত করিবার জন্য,—এক কথায় তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য, তাহারা এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল। সেকথা থিয়েটারের ভিতরকার অনেক ব্যক্তিও জানিতেন না বা জানেন না, সাধারণ দর্শকের কোন কথা! চক্রান্তকারীদের প্রথম প্রচেষ্টা হইল—মনোমোহন বাবুকে শিখণ্ডী করিয়া।

সেপ্টেম্বরের গোড়াগুড়ি অমরেন্দ্রনাথ একদিন সংবাদপত্রে দেখিলেন যে, মনোমোহনবাবু নিজেকে ক্লাসিক ও মিনার্ভা, উভয় থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা যে ক্লাসিকের স্বত্ব বিক্রয় কোবালার ব্যাপার চুকিয়া গিয়াছে। তিনি মনোমোহনবাবুকে ডাকাইয়া এরূপ বিজ্ঞাপনের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি যখন কোবালার কথা তুলিলেন, অমরেন্দ্রনাথের চক্ষু 'ছানাবড়া' হইয়া গেল। অযথা বাক্য ব্যয় না করিয়া তিনি বলিলেন যে, "বেশ, আমি এইক্ষণে আপনার সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিতেছি, আপনি কোবালা প্রত্যর্পণ করুন।" মনোমোহনবাবু ইচ্ছা করিলে হয়ত আইনের সাহায্যে ও কোবালা-বলে ক্লাসিক থিয়েটারে নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন*, কিন্তু তিনি আপোষ মীমাংসায় সম্মত হইয়া, কোবালা আনিতে গেলেন। এদিকে অমরেন্দ্রনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—এখন তিনি সুদে আসলে ২৫০০৲ টাকা পান কোথায়? রবিবারের বিক্রয় assign করা, বুধবার ও বৃহস্পতিবারের বিক্রয়ের উপর তাঁহার ও হিতবাদীর আধাআধি অধিকার; শেষে কি শনিবারের বিক্রয় বন্ধক দিতে হইবে? তাহা হইলে তাঁহার আর রহিল কি? সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় দৃক্‌পাত না করিয়া

* কেহ কেহ বলেন, মনোমোহনবাবু নাকি আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন

নিজ বক্ষোরক্ত অভিসিঞ্চনে তিনি যে থিয়েটারের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছেন, শেষে কি তাহার মায়া ত্যাগ করিতে হইবে? কিন্তু এই সময়ে তাঁহাকে বাঁচাইলেন—গিরিশচন্দ্র। তিনি তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে ২৫০০৲ টাকা ধার দিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন।

বিপক্ষদল ভাবিয়াছিল যে অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুবাণ হানা হইয়াছে, এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হওয়ায়, তাহাদের বৈঠক বসিল। সভায় স্থির হইল যে সামনেই পূজা, অভিনেতৃবর্গের মাহিনা দিবার জন্য অবশ্যই অমরেন্দ্রনাথের অর্থের প্রয়োজন হইবে, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ মহাজন হইয়া, মনোমোহন বাবুর মত বিক্রয় কোবালা লিখাইয়া লইয়া অমরেন্দ্রনাথকে টাকা কর্জ্জ দিবে, কিন্তু তিন মাসের পরিবর্ত্তে পনর দিনের কড়ারে। অমরেন্দ্রনাথ কখনই টাকা ফেরৎ দিতে পারিবেন না, ফলে ক্লাসিক হইতে তিনি বিতাড়িত হইবেন। সকলে ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে অক্টোবর মাসের শেষাশেষি থিয়েটারে উপহারের হুজুগ একটু কমিলে, অমরেন্দ্রনাথ নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, আর কিছু খোয়া যাক কি না-ই যাক, ক্লাসিক থিয়েটারের অমূল্য আত্মমর্য্যাদা অনেকটা নষ্ট হইয়াছে। বিক্রয়ও পূর্ব্বের অধিক বাড়ে নাই, অথচ সেই বিক্রয়ের অর্দ্ধাংশ হিতবাদীকে দিয়া থিয়েটারের লোকসানই হইয়াছে। অনেকে বলেন যে, এই উপহারের স্রোতেই ক্লাসিকের পতন ও মিনার্ভার উত্থান হইল। ক্লাসিকের পতনের ইহা অন্যতম কারণ হইলেও, অমরেন্দ্রনাথ যে সময় পাইলে এ ধাক্কা অচিরে সামলাইয়া উঠিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহাকে সে সুযোগ দেওয়া হইল না, চক্রান্ত করিয়া তাঁহার হাত হইতে ক্লাসিক ছিনাইয়া লওয়া হইল। যাহা হউক, সে পরের কথা পরে বলিব। বর্ত্তমানে—এই উপহারের প্রাবল্যে ক্লাসিকের আংশিক ক্ষতি করিতে, বা অন্য কথায়, অমরেন্দ্রনাথের দেনা বাড়াইতে সমর্থ হইলেও, মিনার্ভার যে কোন লাভ হয় নাই বা সে যে সত্যই প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে নাই, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন ঘনিষ্টভাবে মিনার্ভার সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং মিনার্ভার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশেষ শ্রদ্ধেয়। তিনি কি বলেন, শুনুন ঃ—

"উপহারের হুজুগ ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৩১১—তিন মাস উপহার দিয়া থিয়েটারের আসর কোন রকমে সরগরম রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বন্যার জল সরিয়া গেলে মিনার্ভার আবার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। * * "ঐন্দ্রিলা" জমিল না। ইহার প্রথম রাত্রির বিক্রয় মাত্র দুইশত আশী টাকা। থিয়েটারে একখানি বই না জমার অর্থ,—থিয়েটার কোম্পানীর দেউলিয়া আদালতের ফটকে পা বাড়াইয়া দেওয়া! বাইশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া এই ঐন্দ্রিলা নাটকের গঠন করা হইয়াছিল। নাটক শুইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ও শুইবার উপক্রম করিল। * * থিয়েটারের অবস্থা খারাপ। অর্দ্ধেন্দু-শেখর * * মিনার্ভায় প্রতাপাদিত্য খুলিবার পরামর্শ দিলেন। * * প্রথম রাত্রির বিক্রয় মাত্র ২২৭৲ টাকা হইলেও ক্রমশঃ হাজারের উপর উঠিয়াছিল।"

এইত' মিনার্ভার অবস্থা, অথচ কাহারও কাহারও মতে এই মিনার্ভা, ক্লাসিকের মত প্রবল-প্রতাপান্বিত থিয়েটারের গর্ব্ব খর্ব্ব

করিলেন। তাঁহাদের বিচারশক্তি তাঁহাদেরই থাক্, সাধারণ পাঠকগণের বুদ্ধির অমর্য্যাদা করিয়া আমরা আর এ বিষয়ের বিস্তার করিব না।

আগষ্ট হইতে যতদিন উপহারের যুগ চলিয়াছিল, ততদিন অমরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ঐ ব্যাপার ছাড়া আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফলে থিয়েটারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। দানিবাবু ষ্টারে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকের মাহিনা বাকী পড়িয়াছিল। গিরিশচন্দ্রও ভাদ্র ও আশ্বিনের বেতন পান নাই। অমরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, 'আপাততঃ তাঁহার নিকট দেনাটা শোধ করিয়া দি ও যে সকল অভিনেতৃর জীবনযাত্রা বেতনের উপর নির্ভর করে, তাহাদের পাওনা আগে চুকাইয়া দি, গিরিশচন্দ্রের বেতন কিছুদিন পরেও না হয় দিলে চলিবে। তাঁহার ত' আর মাহিনার টাকার অভাবে সংসার অচল হইবে না!' এই ভাবিয়া তিনি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ সমস্ত পাওনা ও গিরিশচন্দ্রের নিকট ধার ২৫০০৲ মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু মাস কাবারের সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের বেতন বাবদ ৯০০৲ পাওনা হওয়ায়, গিরিশচন্দ্র আর ক্লাসিকে রহিলেন না,—চুণিবাবু তাঁহাকে ভাঙ্গাইয়া মিনার্ভায় লইয়া গেলেন। যাইবার কালে তিনি সিরাজদ্দৌলার পাণ্ডুলিপি ও দুর্গেশনন্দিনীর নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত পাণ্ডুলিপি সঙ্গে লইয়া গেলেন।

এদিকে চক্রান্তকারীরা মহা ফাঁপরে পড়িল। তাহাদের সমস্ত জল্পনা কল্পনা অমরেন্দ্রনাথ বিফল করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ধার লওয়াতেই হইবে। তাহাদের সকলের সঙ্গেই অমরেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। শেষে একজন অমরেন্দ্রনাথের মহাহিতৈষী সাজিয়া,

উপরপড়া হইয়া, তাঁহাকে টাকা ধার দিতে চাহিল। অমরেন্দ্রনাথের টানাটানির সময়, তিনি প্রস্তাব লুফিয়া লইলেন, কিন্তু ক্লাসিকের বিক্রয় কোবালায় সহি দিতে অসম্মত হইয়া, থিয়েটার বন্ধক দিয়া ঋণগ্রহণ করিলেন।

টাকাটা কিছুদিন আগে পাইলে, তিনি গিরিশচন্দ্রের বেতন চুকাইয়া দিতে পারিতেন। যাক্, 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস, অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বেই মহলায় পড়িয়াছিল। এখন তিনি টাকা হাতে পাইয়া, ২৭শে নভেম্বর, ১৯০৪, তাহা মহাসমারোহে অভিনীত করাইলেন। প্রথমাভিনয় রজনীর পরিচয়লিপি :—

মহেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেহারী—মনোমোহন গোস্বামী, বিনোদিনী—কুসুমকুমারী, আশা—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), অন্নপূর্ণা—জগত্তারিণী, রাজলক্ষ্মী—পান্নারাণী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপহারের হুজুকে ক্লাসিক নিজের ইজ্জৎ অনেকটা হারাইয়াছিল। চোখের বালির অভিনয়ে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস,—অমরেন্দ্রনাথের নাটক, —ক্লাসিক সম্প্রদায় অভিনয় করিতেছেন,—তৎসত্ত্বেও, বহি তেমন জমিল না।

তখন অমরেন্দ্রনাথ ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিনের দিন, নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত 'প্রেমের পাথার' অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

শাআলম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোসাফের—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, দানিশমন্দ—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, তোরাব—মনোমোহন গোস্বামী, জলিল—অহীন্দ্রনাথ দে, জেলে—পান্নালাল সরকার, মণ্ডলা—তিনকড়ি (ছোট), কাকু—পান্নারাণী (ছোট), মহাতাব—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), দিলজান—কুসুমকুমারী, জেলেনী—পুঁটুরাণী।

ক্লাসিকের পূর্ব্ববিক্রয়ের সহিত তুলনীয় না হইলেও, প্রেমের পাথারে 'সেল' ভালই হইত, তবে একদিনও ফুল হাউস্ হয় নাই, হাজার বারশ' পর্য্যন্ত বিক্রয় উঠিয়াছিল। অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ও দর্শকসংখ্যা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল।

একমাত্র প্রেমের পাথারের উপর নির্ভর করিয়াই অমরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত রহিলেন না, তিনি স্বয়ং মিঃ মুর সাজিয়া ক্লাসিকে 'সংসার' অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। আবার ২১শে জানুয়ারী, ১৯০৫, প্রেমের পাথারের সঙ্গে নূতন কৌতুক-নাট্য "কোনটা কে ?" যোগ করিয়া দিলেন। 'কোনটা কে' Shakespeareএর Comedy of Errors অবলম্বনে রচিত। ইহাতে অমরেন্দ্রনাথ বড় Dromio সাজিলেন।

ক্লাসিক আবার নাট্যজগতে মাথা চাড়া দিতে সুরু করিল। অমরেন্দ্রনাথের শত্রুমহল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা মাতব্বর, সে বেলচেম্বার সাহেবকে হাত (influence) করিয়া, তাঁহার কাছে অমরেন্দ্রনাথের অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা নানাভাবে লাগাইয়া, তাঁহাকে দিয়া অমরেন্দ্রনাথের উপর উচ্ছেদের নোটিস দেওয়াইল। অমরেন্দ্রনাথ চুক্তিমত মাস মাস ক্লাসিকের ভাড়া দিতে পারেন নাই, বাড়ী ভাড়া বাকী ছিল, সুতরাং বেলচেম্বার সাহেব অমরেন্দ্রনাথের বিপক্ষদলের কথা সহজেই বিশ্বাস করিলেন।

এ দিকে মিনার্ভার অবস্থা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। থিয়েটারের অসাফল্যবশতঃ দলের মধ্যে খিটিমিটি সুরু হইল। শেষে মালদহে অভিনয়ার্থ গিয়া, চুণিবাবুর সঙ্গে মনোমোহন বাবুর বিচ্ছেদ ঘটিল। তিনি মাত্র ১০০০৲ টাকা পাইয়া নিজের হাতে সাজান হাট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ হইতে অপরেশবাবু মিনার্ভার ম্যানেজার হইলেন ও চুণিবাবু ঐ দিন হইতে ক্লাসিকে আসিয়া

অমরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি আসিয়াই অমরেন্দ্রনাথকে তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা সমস্ত অবগত করাইলেন। অমরেন্দ্রনাথ এ সকল ব্যাপার এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না। তিনি পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দিয়া সমুদয় বাড়ী ভাড়া শোধ করিয়া দেওয়াইলেন। কিন্তু বেলচেম্বার সাহেব ইতিপূর্ব্বেই চুক্তিভঙ্গ, বাকী বাড়ী ভাড়া ও খাসদখলের জন্য হাইকোর্টে অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিলেন, তিনি টাকা পাইয়াও মামলা তুলিয়া লইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, 'বাড়ী ভাড়ার এক পয়সাও বাকী নাই, আমার ভয় কি ? আমিও আদালতে দরখাস্ত করিব।' মামলা কাঁচিয়া যায় দেখিয়া, ক্লাসিক বন্ধক দিয়া যিনি অমরেন্দ্রনাথকে টাকা ধার দিয়াছিলেন, তিনি তখন আসরে নামিলেন ও পূর্ণবাবুকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার পাওনা ডিক্রী করাইয়া লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার 'সেলে' তুলিবেন। পূর্ণবাবু যদি নিজের মঙ্গল চান, তো এই বেলা যেন টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। পূর্ণবাবুও ভয় পাইয়া নালিশ করিলেন।

এদিকে চুণিবাবুকে পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ নূতন উৎসাহে থিয়েটার চালাইতে লাগিলেন। যেদিন চুণিবাবু আসিলেন, (১৮ই ফেব্রুয়ারী), সেদিন ক্লাসিকে অভিনীত হইল—প্রেমের পাথার ও সংসার। সংসারে চুণিবাবু মিঃ মুর, অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ ও মনোমোহন গোস্বামী রমেন্দ্র সাজিলেন।

৪ঠা মার্চ্চ, মহাসমারোহে অমরেন্দ্রনাথের নূতন গীতিনাট্য 'শিবরাত্রি'র প্রথম অভিনয় হইল। প্রধান ভূমিকাগুলির পরিচয়লিপি এই ঃ—

বিষ্ণু—পান্নারাণী, মহাদেব—সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সুস্বর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধৈবত—রাখালী, নন্দী—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শিবদূত—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, যমদূত—অহীন্দ্রনাথ দে, দুর্গা—কুসুমকুমারী, কাকলী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), লক্ষ্মী—জগত্তারিণী।

ঐ রজনীতেই হারানিধিতে চুণিবাবু হন হরিশ ও অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিরপ্রশংসিত ভূমিকা অঘোরের অংশাভিনয় করেন।

২রা এপ্রিল, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, রবিবার, স্বত্বাধিকারীরূপে ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। সেদিন হরিরাজ, সোনার স্বপন, শ্রীকৃষ্ণ ও বায়স্কোপের আয়োজন ছিল এবং অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরদিন, ৩রা এপ্রিল হাইকোর্টে ক্লাসিক থিয়েটার সম্পর্কীয় দুইটী মামলা উঠে। একটী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বনাম অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিচারপতি মিঃ বডিলি অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন ও তাহার সর্ত্তানুযায়ী পূর্ণবাবু ও অতুলচন্দ্র রায় ক্লাসিক থিয়েটারের রিসিভার নিযুক্ত হন। অপর মামলা সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

CLASSIC THEATRE EJECTMENT SUIT.

This suit was called up for hearing before the Hon'ble Mr. Justice Bodily when Mr. S. R. Das instructed by Messrs. S. D. Dutt & Gupta, appeared for the plaintiff, Mr. R. Belchambers ; Mr. Dunne and Mr. S. P. Sinha instructed by Babu B. S. Ghosha appeared for the mortgagee, Babu Purna Chandra Chakravarty ; Mr. B. C. Mitter and Mr. S. P. Sinha instructed by Babu K. N. Ganguly for the mortgagee Babu Preo Nath Dass.

This suit was instituted by Mr. R. Belchambers, Administrator pendente liti of the estate of Gopal Lal Sil deceased against Amorendra Nath Dutt, Proprietor of the

Classic Theatre for recovery of arrears of rent and for ejectment, for breach of covenant for due payment of rent. On hearing Counsel on both sides, His Lordship the Hon'ble Mr. Justice Bodily made an order that as the mortgagees have paid Rs. 6500/- on account of rent and costs to Mr. Belchambers, the defendants are relieved from forfeiture under Sec. 114 of T. P. Act and the Official Receiver was discharged. At this stage, Mr. S. R. Das instructed by Babu Atul Chandra Ghose asked the permission of the Judge to file a plaint on behalf of one Giris Chandra, formerly an actor under Babu Amorendra Nath Dutt, for recovery of certain damages arising out of his agreement of service. The learned Counsel also asked leave to apply for Rule in the matter. Counsel's application for leave to file plaint and to apply for a Rule was refused.

ক্লাসিকের উচ্ছেদের মামলা ফাঁসিয়া গেলেও, পূর্ণবাবুর ডিক্রী অনুযায়ী ক্লাসিকে রিসিভার বসাতে, অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার বড় সাধের সোনার হাট ভাঙ্গিয়া গেল।

পুত্র সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—ঃ০ঃ—

গ্র্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও পুনরায় ক্লাসিকে

(১৯০৫-৬)

অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছাড়িয়া দিলেন। স্থির করিলেন, আর থিয়েটার করিবেন না। যে রঙ্গজগতের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি এত ক্ষতি সহ্য করিলেন, তাহাদেরই এতাদৃশ কৃতঘ্নতা দর্শনে তিনি পৃথিবীর উপর বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও তিনি নাট্যজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট, তখনও তাঁহার প্রতি দর্শকের ভালবাসা অসীম। এই প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি একদিন গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে লিখিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বাস, আমি যদি বনে গিয়া থিয়েটার খুলি, সেখানেও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।" সুতরাং এমন সর্ব্বজনপ্রিয় অভিনেতা, যখন রঙ্গজগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছাড়িবার কিছুদিন পরেই, অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের মাঝামাঝি. কলিকাতার প্রাচীর গাত্রে এক প্ল্যাকার্ড দেখিয়া, জনসাধারণ বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল :—

গ্র্যাণ্ড থিয়েটার !

রহ প্রতীক্ষায়—কবে ? কোথায় ?

২।১ দিন পরেই গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের বিস্তৃত ব্যাপার সহ হ্যাণ্ডবিল বাহির হইয়া, রাস্তায় রাস্তায় বিতরিত হইতে লাগিল। আমরা পাঠকের অবগতির জন্য সেই হ্যাণ্ডবিলখানি নিম্নে মুদ্রিত করিয়া দিলাম :—

অনুগ্রাহকবর্গের চরণে আমার নিবেদন।

দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ, কতকগুলি অন্তরঙ্গ মিত্রের শুভানুগ্রহে ও শুভদৃষ্টিতে, জড়িত ও অভিভূত হইয়া, আমার বক্ষের শোণিতে নির্ম্মিত, বড় সাধের—ঐকান্তিক যত্নের **"ক্লাসিক রঙ্গভূমি" বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ,** তাঁহাদের পবিত্র পুণ্যময় পাদপদ্মে উপঢৌকন দিয়া, সম্বন্ধসূত্রে ছিন্ন করিয়া, গত বুধবার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, প্রতারিত, বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত নট-জীবনের যবনিকা আর উঠাইব না, পরের মনস্তুষ্টির জন্য রাত্র জাগরণ, প্রাণপাত পরিশ্রম ও আত্মবিসর্জ্জনের পথে আর অগ্রসর হইব না : **নিষ্ঠাবান্, হৃদয়বান্, মূর্ত্তিমান্ করুণাময়, প্রাণময় বন্ধুগণের,** শ্যেনদৃষ্টিপূর্ণ মুখমণ্ডলের পানে আর তাকাইব না ; নিভৃতে, নীরবে, নিশ্চিন্তে বসিয়া, নিজ মূর্খতার ফল মনে মনে বুঝিয়া, দেবধামে পিশাচের তাণ্ডবলীলা দেখিব ; নন্দনকাননে বানরের নৃত্য অবলোকন করিয়া বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিব ; বহু আশার বহু আকাঙ্ক্ষার সুধাভাণ্ড লইয়া, দানবদলের পরস্পর দ্বন্দ দেখিয়া মনে

মনে হাসিব; কিন্তু দেখিলাম,—প্রাণে প্রাণে বুঝিলাম, ইচ্ছাময়ের সে ইচ্ছা নহে; এ কাষ্ঠপুত্তলিকাকে লইয়া, লীলাময় আরও কিছুদিন লীলাখেলা করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; বিশ্বসংসারের জটিল আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া আরও কিছুদিন ওতঃপ্লুত করিবেন ইহাই তাঁহার বাসনা।

যে কারণে আবার আমাকে এ পথের পথিক হইতে হইল, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। যখন "**আমার ক্লাসিক**" আমিই ত্যাগ করিয়া, নূতন পথে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম,—কি দেখিলাম! সে দৃশ্য জীবনে কখন দেখিব না; মৃত্যুর পরও নিমীলিত চক্ষু সজীব হইয়া সে দৃশ্য দেখিতে থাকিবে; দেখিলাম আমার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ—বিগত আট বৎসর ধরিয়া যাহারা ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে ফিরিয়াছে, সুখে সুখী—দুঃখে দুঃখী হইয়া ইহজীবনের সম্বন্ধ অটুট বন্ধনে বাঁধিয়াছে, কর্ম্মজগতের বিস্তৃত পথে যাহারা আমার একমাত্র সহায়, আমার মুখপানে সমবেদনার দৃষ্টিতে চাহিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; তাহাদের করুণ নয়ন যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—"কোথা যাও?" "আমাদের ফেলিয়া কোথা যাও?" আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, রুদ্ধ অশ্রুধার বদ্ধ রহিল না; প্রতিজ্ঞার কঠোর বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। বিধাতার বিচিত্র লীলা!! নাট্যজগতের যথার্থ এক শুভার্থী বন্ধু, সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, মাত্র অধ্যক্ষের পদ আবার আমায় গ্রহণ করিতে হইল। নব উৎসাহে—নব জীবন লইয়া, নববল হৃদয়ে বাঁধিয়া, (তবে সম্প্রদায় নব নহে) সেই পুরাতন অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গ লইয়া, পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। চিরদিন আপনাদের নিকট যে স্নেহ পাইয়াছি, যে

অনুগ্রহে হৃদয় ভরাইয়াছি, যে উৎসাহের বজ্র বর্ম্ম বুকে বাঁধিয়া সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়াছি, সেই স্নেহ, সেই অনুগ্রহ, সেই উৎসাহ যেন আজীবন পাই, অধীনের এই বিনীত প্রার্থনা!

হ্যারিসন রোডস্থিত "কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চ" যাহা এই মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, 'গ্র্যাণ্ড থিয়েটার' নামে অভিহিত করিয়া আপনাদের পদধূলি প্রতীক্ষায় সোৎসুক হৃদয়ে বসিয়া আছি। কি নাটকাভিনয়—কি দৃশ্যপট ও পরিচ্ছদ, কি দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান, কি ভদ্রমহিলাগণের আসন, এবার যাহা দেখাইব, এবার যেরূপ আয়োজন করিব, তাহা অদ্যাবধি কেহ কখনও দেখেন নাই, কেহ কখনও অনুভব করেন নাই, কেহ কখনও উপভোগ করেন নাই। মহাকবি মাইকেল যেমন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন—

'রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহা
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

এবং সে বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিলেন, আমিও জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া দম্ভভরে যাহা বলিলাম, তাহা করিব, দেখাইব, বুঝাইব।

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩১২ সাল, রাত্রি ৯টার সময়।
সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন গোস্বামী বি, এ প্রণীত

হৃদয়োন্মাদকারী দৃশ্যকাব্য

পৃথ্বীরাজ

পৃথ্বীরাজ—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। জয়চাঁদ—শ্রীচুণিলাল দেব।
যোধমল—শ্রীমনোমোহন গোস্বামী B. A. চন্দ্রপতি—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
সূর্য্যসিংহ—শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে। বক্তিয়ার খিলিজি—শ্রীনিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ

দেব। মহম্মদঘোরী—শ্রীগোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী। কল্যাণসিংহ—শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। সমরসিংহ—শ্রীচণ্ডীচরণ দে। কুতব—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বটব্যাল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংযুক্তা—শ্রীমতী কুসুমকুমারী। যমুনা—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। ধাত্রী—শ্রীমতী পান্নাসুন্দরী। বিশালাক্ষী—শ্রীমতী লক্ষীমণি। বিমলা—শ্রীমতী তিনকড়ি (The favourite pupil of our Dancing Master N. C. Bose) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাক্‌চী কর্ত্তৃক নাটকান্তর্গত সঙ্গীতগুলি সুরলয়ে সংযোজিত হইয়াছে। বঙ্গ নাট্যশালা সমূহের প্রধান নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পূর্ণ নূতন, মনোবিমোহন, চিত্তরঞ্জন নৃত্যের অবতারণা করিবেন।

তৎপরে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত নূতন সামাজিক নাটক

ঘুঘু

নাচ, গান, হাসি, ঠাট্টা, রং-তামাসার দেদার অফুরন্ত ভাণ্ডার!

কলিকাতা, ৯১নং হ্যারিসন রোড, ১৮ই এপ্রেল ১৯০৫।	আপনাদের আশ্রিত **শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।**

"সাগর প্রমাণ কার্য্য—এ সপ্তাহে শেষ হইয়াও হইল না। বাধ্য হইয়া, প্রথম অভিনয় রজনী ১৬ই বৈশাখের পরিবর্ত্তে, আগামী ২৩শে বৈশাখ, শনিবার ধার্য্য" করিয়া, সেই তারিখে (ইং ৬ই মে, ১৯০৫) পৃথ্বীরাজ লইয়া গ্র্যাণ্ডের দ্বারোদ্ঘাটন হইল। কিন্তু তখনও ঘুঘু রচনা শেষ হয় নাই। কাজেই তাহার অভিনয় কিছুদিন পিছাইয়া দিয়া ২০শে মে তারিখে গ্র্যাণ্ডে ঘুঘুর প্রথম অভিনয় হইল। যাহাদের

চক্রান্তে তাঁহার বড় সাধের ক্লাসিক থিয়েটার হাতছাড়া হইল, তাহাদের অবিকল চিত্র প্রতিফলিত করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ এই সামাজিক নক্সাখানি রচনা করেন। পাঁচ মাস ধরিয়া প্রতি রজনীতে ঘুঘুর অভিনয় হওয়াই তাহার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। ইহার প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি এই ঃ—

বুদ্‌বুদ্—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রায়বাহাদুর—চণ্ডীচরণ দে, মেনিবাবু—অহীন্দ্রনাথ দে, প্রতুল—সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, কালোমাণিক—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, গদাই—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, চাঁচী—তিনকড়ি (ছোট), মন্দাকিনী—কুসুমকুমারী, হিরণ—পান্নারাণী, বিশ্বতারিণী—লক্ষ্মীমণি।

অমরেন্দ্রনাথ হ্যাণ্ডবিলে গর্ব্ব করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কাজেও তাহা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের ভূমিকাভিনয় করিয়া, তিনি দেশ-ব্যাপী সুনামের অধিকারী হন এবং অন্যান্য ভূমিকাগুলিরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও থিয়েটার তেমন জমিল না। 'ফুল হাউস' হওয়া দূরের কথা, কোন রাত্রেই আশানুরূপ বিক্রয় হইল না। অবশ্য তাহার কারণও ছিল। তখনকার দিনে যানবাহনের তেমন সুবিধা ছিল না, বাসের ত' তখন সৃষ্টিই হয় নাই, ট্রামও রাত দশটার পর বন্ধ হইয়া যাইত। রঙ্গদর্শনেচ্ছু অধিকাংশ লোকের বাস শ্যামবাজারের দিকে। বর্ত্তমান কালে শ্যামবাজার অঞ্চলে থিয়েটার ও বায়স্কোপের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমরা সে কথা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইল এই যে, গ্র্যাণ্ডে থিয়েটার দেখিতে গেলে, হয় টিকিটের মূল্যের উপর ২৲১ টাকা গাড়ীভাড়া খরচ করিতে হয়, নয় থিয়েটার ভাঙ্গিলে সেই গভীর রাত্রে পদব্রজে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী ফিরিতে হয়। কাজেই দর্শকের সংখ্যা তেমন বেশী হইত না। তখন চুণিবাবুর পরামর্শে

অমরেন্দ্রনাথ, বসুমতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, গ্র্যাণ্ডে উপহার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পৃথ্বীরাজ নাটক হইতে সুরু করিয়া অমরেন্দ্রনাথের ঘুঘু, মজা পর্য্যন্ত নানা পুস্তকের অভিনয় ও তৎসঙ্গে উপহারের ব্যবস্থা হইল। তবে এবার আর উপহারের ঝোঁকে অভিনয়ের প্রতি অবহেলা করা হইল না। ফলে অভিনয়গুণে ও উপহারবলে গ্র্যাণ্ড ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

২৯শে জুলাই, ১৯০৫, অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ডে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বাপ্পারাও' খুলিয়া নিজে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। 'বাপ্পারাও' কিন্তু 'পৃথ্বীরাজ' হইল না—তবু তখন গ্র্যাণ্ডের খানিকটা প্রতিপত্তি হইয়াছে বলিয়া মন্দ চলিল না।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় বঙ্গভঙ্গ লইয়া খুব আন্দোলন হইতেছিল। সময়োপযোগী নাট্যরচনায় অমরেন্দ্রনাথ কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তিনি এই উপলক্ষে 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নামে এক রূপক রচনা করিয়া, ১৬ই অক্টোবর—যে দিন লর্ড কর্জ্জন বঙ্গ বিভক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সেই দিনই—তাহা গ্র্যাণ্ডে অভিনীত করাইলেন। বইখানি মুদ্রিত হইয়া দর্শকগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইল। ইহার প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ—

বঙ্গমাতা—কুসুমকুমারী, শান্তি—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), ১ম বঙ্গসন্তান—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় ঐ—সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মুসলমান সন্তান—অহীন্দ্রনাথ দে, হিন্দু সন্তান—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কর্পোরেশনের ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, বাড়নাইওয়ালা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, বিড়িওয়ালা—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল।

এদিকে অতুলচন্দ্র রায় রিসিভার, দুর্গাদাস দে বিজনেস্ ম্যানেজার, ধর্ম্মদাস সুর ষ্টেজ ম্যানেজার, এই তিন নাম বিজ্ঞাপিত হইয়া, ২২শে

এপ্রিল হইতে ক্লাসিকে আবার অভিনয় সুরু হইয়াছিল, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা প্রবোধচন্দ্র ঘোষকে আনিয়া, তাঁহাকে দিয়া নায়কের ভূমিকা অভিনয় করাইতেছিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অভাবে ক্লাসিক অচল হইয়া উঠিল। তখন অতুল বাবু গিয়া অমরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথ তখনও ক্লাসিকের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই অতুলবাবুর জেদাজেদিতে, ৫০০৲ বেতনে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিয়া, ছয় মাস অনুপস্থিতির পর আবার ক্লাসিকে ফিরিয়া আসিলেন। থিয়েটারে চাকুরী গ্রহণ এই তাহার প্রথম, কিন্তু বেতনের পরিমাণ হইতে তৎকালীন নাট্যজগতে অমরেন্দ্রনাথের কিরূপ স্থান ছিল, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। এ যাবৎ থিয়েটারে সর্ব্বাধিক বেতন ছিল গিরিশচন্দ্রের, তিনি মাসিক ৩০০৲ মাহিয়ানা পাইতেন; কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল – ৫০০৲।

অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থিয়েটার তুলিয়া দিয়া, সমস্ত দলবল লইয়া ক্লাসিকে চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চুণিবাবু তাহাতে অসম্মত হওয়াতে, তিনি মনোমোহন গোস্বামী, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, হীরালাল, অহীন্দ্র, দেবকণ্ঠ বাক্চী, কুসুমকুমারী, ব্ল্যাকী প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া, ২১শে অক্টোবর হইতে ক্লাসিকে আসিয়া যোগদান করিলেন। চুণিবাবু নিজের নাম ম্যানেজাররূপে বিঘোষিত করিয়া, তিনকড়ি দাসীকে আনিয়া, ঐ দিন গ্র্যাণ্ডে 'প্রতিফল' নাটক খুলিলেন। তাহাতে তিনকড়ি সাজিলেন জুমেলা। কিন্তু অমরেন্দ্র-বিহনে গ্র্যাণ্ড চলিল না। ৩।৪ মাসের মধ্যেই পাৎতাড়ি গুটাইল।

দ্বিতীয়বার ক্লাসিকে আসিয়া, অমরেন্দ্রনাথ ২১শে অক্টোবরে, পৃথ্বীরাজের ভূমিকায় দর্শকদিগকে অভিবাদন করেন। নবোৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ১৫ দিনের মধ্যে নূতন বহি নির্ব্বাচন করিয়া,

তাহার মহলা দিয়া, প্রস্তাবনার গান বাঁধিয়া দিয়া, ৪ঠা নভেম্বরে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত নূতন নক্সা 'হ'ল কি' অভিনয় করেন। ইহাতে তিনি মিঃ নেলার ও মনোমোহন গোস্বামী মিঃ রেডক্স সাজেন। আমরা তদ্রচিত প্রস্তাবনার গানটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বল ভাই—"বন্দে মাতরম্।"
চার কোটী ভাই—চার কোটী বোন্, আমরা কি কেউ কম॥
দেশ জুড়ে যে ঢেউ উঠেছে,
দেখে সবার তাক্ লেগেছে,
ছেলে বুড়ো সব মেতেছে,—বুঝেছো ব্যাপার কি রকম?
বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গলা মাটী,
এখন মোদের লাগছে খাঁটি,
বাঙ্গলা ধুতি পরিপাটী, বিলাতী চাল দাও খতম॥
বুটের ঠোকর আর কেন খাও,
চাকরীতে ভাই ইস্তফা দাও,
দিন পেয়েছ ঠিক বুঝে নাও, যে যার কাজে রেখ দম॥
সময় গেলে জুড়িয়ে না যায়,
সাহেবগুলো হাস্‌তে না পায়,
এমনি চালে যেন চলে, স্বদেশী ঢেউ রম্ রমারম্॥

'হ'ল কি'র অভিনয়ে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তখন স্বদেশী যুগ—সে সময়ে এই দেশপ্রীতিমূলক গ্রন্থ সকলেরই প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (মৈমনসিং), রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, জে, চৌধুরী, রায় পশুপতি নাথ বসু, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া), কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রমুখ দেশের বহু নেতা ও সমাজের মাথাওয়ালা ব্যক্তিবর্গ

আসিয়া ইহার অভিনয় দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২রা ডিসেম্বর, ভ্রান্তির পুনরভিনয়ে রঙ্গলালের ভূমিকা গ্রহণ করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ ২৩শে ডিসেম্বর, স্বরচিত "প্রণয় না বিষ" নামক পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রথম অভিনয় করেন। এ নাটকের আখ্যান-ভাগ সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "প্রণয় পরিণাম" নামক উপন্যাস হইতে গৃহীত। ইহাতে রমা পাগলার ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনয় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, যে কোন দেশের উৎকৃষ্ট অভিনেতাদেরও গর্ব্বের সামগ্রী। * অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে মনোমোহন গোস্বামী হরদয়াল, কুসুমকুমারী কুসুম ও ব্ল্যাকী সরমা সাজেন।

এই সময়ে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স্‌রূপে কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে অমরেন্দ্রনাথ 'এস যুবরাজ' নামে একখানি সময়োচিত রূপক কয়েক দিনের মধ্যেই রচনা করিয়া, ৩০শে ডিসেম্বর হইতে তাহা ক্লাসিকে অভিনয় করান। তাহার প্রথমাভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ ঃ—

কীর্ত্তিধ্বজ—সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, হেলারাম—নটবর চৌধুরী, খেলারাম—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, প্যালারাম—অহীন্দ্রনাথ দে, ঢ্যালারাম—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, খোট্টা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, চারুশীলা—কিরণবালা, শাঁখাওয়ালী—কুসুমকুমারী, সিন্দুর-ওয়ালী—পুঁটুরাণী, নাপতিনী—পান্নারাণী (ছোট), খোট্টানী—তিনকড়ি (ছোট)।

অতঃপর, ২৭শে জানুয়ারী (১৯০৬), ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হয়। প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বণ্টিত হইয়াছিল ঃ—

---

* 'প্রণয়-পরিণামে'র উৎসর্গপত্রে যোগেন্দ্রবাবু অমরেন্দ্রনাথের 'রমা পাগলা' ভূমিকাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, গ্রন্থখানি তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়াছেন।

সিরাজ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মির্জ্জাফর—নটবর চৌধুরী, মীরণ—রাজেন্দ্রনাথ দাঁ, সওকৎজঙ্গ—অহীন্দ্রনাথ দে, জগৎশেঠ—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, করিমচাচা—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, দানসা ফকির—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ক্লাইব—মনোমোহন গোস্বামী, মোহনলাল—ও মুসালা—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আলিবর্দ্দী বেগম—পান্নারাণী, ঘেসেটী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), জহরা—কুসুমকুমারী, লুৎফউন্নিসা—বিনোদিনী (হাঁদি), উম্মৎজহরা—রাখালী, ইত্যাদি।

ক্লাসিকের প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাও ঐ রাত্রে 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় করেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত সেখানের চরিত্রলিপি এই :—করিম—গিরিশচন্দ্র, মিঃ ড্রেক—অর্দ্ধেন্দুশেখর, ঘেসেটী—তিনকড়ি, জহরা—তারাসুন্দরী, লুৎফন্নেসা—সুশীলাবালা। (পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ সিরাজের অংশে দানিবাবুর নাম বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।)

'সিরাজে'র অংশ যে দানিবাবু জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এই ভূমিকার অভিনয় করিয়াই তিনি রঙ্গজগতে নায়কের অংশে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে সক্ষম হন। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন নাটকে এত উৎকৃষ্ট অভিনয় তিনি কখনও করেন নাই, ও তাঁহাকে দেখিলে বাস্তবিকই সকলের নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা স্বতঃই মনে জাগিত। তিনি সিরাজের অবস্থা ও ভাব, অভিনয়ে অতি সুচারুরূপে ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই এক অংশ অভিনয় করিয়াই যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অমরেন্দ্রনাথও এ অংশে যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা অনিন্দ্যসুন্দর। তাঁহার চেহারা ও কণ্ঠস্বর যে দানিবাবু অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, এ কথা আশা করি দানিবাবুর অতি বড় ভক্তেরাও স্বীকার করিবেন। সিরাজের অসহায়

অবস্থার কথা অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে যেরূপ ফুটিয়া উঠিত, তাহা দানিবাবু অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কিন্তু অপরের নামকরা ভূমিকায় যদি কেহ পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অভিনয়ও করেন, তাহা হইলেও তাঁহার তেমন গৌরব বৃদ্ধি হয় না—দর্শকেরা পূর্ব্বতন অভিনেতাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া থাকেন। তাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সিরাজের ভূমিকাভিনয়ে সমর্থ হইলেও, এ অংশে দানিবাবুর অপেক্ষা অমরেন্দ্রনাথের বেশী সুনাম নাই। আমাদের মনে হয়, দানিবাবুর বদলে অমরেন্দ্রনাথ যদি এ ভূমিকা প্রথমে অভিনয় করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে অভিনয় চাতুর্য্য দেখাইয়াছিলেন, তাহার বলে তিনিই উচ্চতর আসন পাইতেন। কিন্তু যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া আলোচনায় ফল নাই। এ সময়ে অমরেন্দ্রনাথের হারপায়া, তাই সিরাজের ভূমিকাভিনয়ে সুখ্যাতি অর্জ্জনে সমর্থ হইলেও, থিয়েটারের অর্থাগম বাড়িল না। ফলে রিসিভারের সঙ্গে মন কষাকষির সৃষ্টি হইল। তাহার উপর অমরেন্দ্রনাথের উপসর্গ ছুটিল—গৃহিণী রোগ। এ যে কি ভীষণ রোগ, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন। অমরেন্দ্রনাথ রোগের তাড়নার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রয়োজন হইলে প্রতি অভিনয় রাত্রে,—এমন কি বুধবার পর্য্যন্ত—দুইখানি নাটকে নামিতে লাগিলেন। কিন্তু তবু তিনি ক্লাসিকের মৃত কঙ্কালে আর প্রাণসঞ্চার করিতে পারিলেন না। উপহার বৃষ্টি করিয়া শেষ চেষ্টা হইল, তাহাও ফলপ্রসূ হইল না। ইতিমধ্যে রোগাধিক্য হওয়ায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া থিয়েটার হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হইল। ফলে অতুলবাবু ২।৪টা কড়া কড়া কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। একে রোগের যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা, তাহাতে সহানুভূতি দেখান দূরে

থাক্—পরিবর্ত্তে কটূক্তি, তাহার উপর দর্শকের প্রীতির অভাব—১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছাড়িয়া দিলেন।

অতুলবাবু অপরেশবাবু ও তারাসুন্দরীকে আনিয়া, ক্লাসিক চালাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যর্থ হইয়া, থিয়েটার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ক্লাসিক উঠিয়া গেল।

গত অধ্যায়ে ক্লাসিকের পতন আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার জন্য একমাত্র দায়ী অমরেন্দ্রনাথ নিজে,—অপর কেহ স্বীয় কৃতিত্ব-বলে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। যত লোকসানই হউক, যে যতই ঘা দিক, তিনি অবলীলাক্রমে সকল ধাক্কা সামলাইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু শেষে শত্রুবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ক্লাসিক ছাড়িতে হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন তিনি ক্লাসিকে আসিলেন, তখন ত' তাহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, তবু তিনি ক্লাসিকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। কেন? আমাদের মনে হয়, ইহার মূল কারণ—দারুণ রোগগ্রস্ত শরীরবশতঃ অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় করিতে অক্ষমতা ও দ্বিতীয়তঃ সিরাজদ্দৌলা নাটক। অমরেন্দ্রনাথও বোধহয় সে কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি রোগশয্যায় প্রলাপোক্তিতে প্রায়ই চিৎকার করিয়া বলিতেন,—"ও সিরাজদ্দৌলা আমার,—আমার।" ক্লাসিকে অবস্থানকালে গিরিশচন্দ্র ঐ নাটক রচনা করেন, সুতরাং ন্যায়তঃ অমরেন্দ্রনাথেরই ঐ নাটকের উপর প্রথম অধিকার,—এইরূপ চিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত হইত বলিয়াই বোধ হয় অমরেন্দ্রনাথের এ প্রলাপোক্তি। সে যাহা হউক, এই সিরাজদ্দৌলা নাটকই দর্শকদের রুচির পরিবর্ত্তন করিল। তখন স্বদেশীর হুজুগ, দেশের লোকের মন সেই দিকে, সে মনের ক্ষুধা মিটাইল

সিরাজদ্দৌলা ও মিনার্ভা থিয়েটারে সেই সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হইল। সামান্য 'হ'ল কি' খুব জমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, দেশের এ হাওয়া বদল, অমরেন্দ্রনাথ ঠিক ধরিতে পারিলেন না ও তাহার সঙ্গে টাল সামলাইয়া ঠিক চলিতে পারিলেন না। যখন বুঝিলেন, তখন তিনিও সিরাজদ্দৌলা অভিনয় করিলেন, কিন্তু তখন বড্ড দেরী হইয়া গিয়াছে। রোগদীর্ণ দেহে শরীর আর বয় না—সে জীবনীশক্তিও নাই, যাহার বলে তিনি ক্লাসিককে পুনঃসঞ্জীবিত করেন! ফলে ক্লাসিকের লীলা খেলা চির-দিনের জন্য ফুরাইল, চিরতরে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—:০:—

নিউ ক্লাসিকের পত্তন ও রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ (১৯০৬)

রুগ্নদেহ সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথ আবার নূতন থিয়েটার পত্তন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলেন। আবার কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে ফিরিয়া আসিয়া, সেখানে 'নিউ ক্লাসিক' নাম দিয়া এক নূতন রঙ্গালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু এবার সহায় নাই, সম্পদ নাই, শক্তি নাই। পুরাতনের মধ্যে মাত্র পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, কুসুমকুমারী, ব্ল্যাকী, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্রনাথ দে ও দুর্গাদাস দে আছেন। পাঠকবর্গ যেন চমকাইয়া উঠিবেন না। হ্যাঁ, যাহার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ক্লাসিক থিয়েটারের পতনের সূচনা হইল, সেই দুর্গাদাস দে-ই আবার অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গী। তাই বসুমতী যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

"* * এ সব ত গেল মনীষা ও মেধার কথা। কিন্তু হৃদয়ের কথা বলিতে হইলে বলিব, অমরেন্দ্রনাথ কাঁচা সোনার তাল ছিলেন, তাহাতে খাদ ছিল না, ময়লা ছিল না, কপটতা ছিল না, শাঠ্য ছিল না। অমরেন্দ্র দাতা ছিলেন, বন্ধুবৎসল ছিলেন, ক্ষমার আধার, করুণার সাগর ছিলেন। সে পরের দুঃখ দেখিলে স্থির থাকিতে পারিত না, সে দুঃখের প্রতিবিধান চেষ্টা না করিয়া অমর নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। * * অতি বড় বিশ্বাসঘাতক, অতি বড় কৃতঘ্ন তাহার কাছে

আসিয়া, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলে সে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাইত, সে কৃতঘ্নকে আবার কোলের দিকে টানিয়া লইত।"

তাই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছিলেন,—"শত্রুকে ক্ষমা করিতে, নির্য্যাতনের বহু ক্ষমতাসত্ত্বেও ক্ষমা করিতে, অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় কাহাকেও দেখি নাই। যে যত বড়ই শত্রু হউক না কেন, যে যতই তার অনিষ্টসাধন করুক না কেন, একবার অমরেন্দ্রনাথের নিকট অনুতপ্ত-চিত্তে ক্ষমা চাহিলে, সে ক্ষমার অযোগ্য হইলেও, ক্ষমা পাইত। গত-কল্য যে অমরেন্দ্রনাথের মহাশত্রু ছিল, যাহার নাম শুনিলে গতকল্য অবধি অমরেন্দ্রনাথ রাগে জ্বলিয়া যাইতেন, আজ প্রাতে আসিয়া দেখি সে ক্ষমা চাহিয়া অমরেন্দ্রনাথের মহা বন্ধুতে পরিগণিত, অমরেন্দ্রনাথ তাহার সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন, তাহাকে অগাধ বিশ্বাস করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ যাহাকে ক্ষমা করিতেন, তাহাকে মৌখিক ক্ষমা করিতেন না, যথার্থ ই আন্তরিকভাবে করিতেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অমরেন্দ্রনাথ কপট ছিলেন না, কখনও কপটতা করিতেন না এবং কপটতার প্রশ্রয় যে সে আদৌ দিত না, তাহা তার কার্য্যাবলীতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে।"

সে যাহা হউক, অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু এ রুগ্ন শরীর লইয়া নিউ ক্লাসিকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। শেষে 'মরি বাঁচি' করিয়া উঠিয়া পড়িয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিলেন ও তাহার নূতন নামকরণ হইল—কুন্দ। ৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৬, নিউ ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে কুন্দের প্রথম অভিনয় রজনীতে ভূমিকালিপি এইভাবে বণ্টিত হইল :—

নগেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরদেব—মনোমোহন গোস্বামী, ডাক্তার—অহীন্দ্রনাথ দে, শ্রীশ—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী—গোষ্ঠ-

বিহারী চক্রবর্ত্তী, সূর্য্যমুখী—কুসুমকুমারী, কুন্দ—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), কমলমণি—পুঁটুরাণী, হীরা—কুসুমকুমারী (বিষাদ)।

অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল, অমরেন্দ্রনাথের অশেষ সুখ্যাতিতে বসুমতী প্রভৃতি বিবিধ সংবাদপত্রের দীর্ঘ স্তম্ভসকল পরিপূর্ণ হইল। "নাট্যজগতে অমরেন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে 'বঙ্গবাসী' (৯ই ভাদ্র, ১৩১৩) যাহা লিখিয়াছিলেন, এখানে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"কলিকাতার হ্যারিসন রোডে 'কর্জ্জন-রঙ্গমঞ্চে' খ্যাতনামা নাট্যশিল্পী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সাধের 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। **নাট্যজগতে অমরেন্দ্রনাথের অতুল কীর্ত্তি। সত্য সত্যই তাঁহার সুনিপুণ হস্তে নাট্যকলার পরম পুষ্টি। অমরেন্দ্র আর যাহাই হউন, তিনি বাঙ্গলার অতুল অভিনেতা**। যে নাট্যসৌন্দর্য্যের শোভন আকর্ষণে অমরেন্দ্রনাথ 'রেলি ব্রাদার্স কোম্পানী'র বহুবিত্ত-তুচ্ছ চাকরী ছাড়িয়াছিলেন, সেই নাট্য-সৌন্দর্য্যের চরম সাধনায় সেই অমরেন্দ্রনাথ একটী সুকুমার সাহিত্যশিল্পের উচ্চ সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।

"অভিনয়ের উৎকর্ষ-সাধনায় অমরেন্দ্রনাথ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোমুখে সৌভাগ্যবান্। দেখিলাম,—কর্জ্জন থিয়েটারে কত সম্প্রদায় কত ব্যয় করিলেন; কিন্তু কয়টী সম্প্রদায় সফলতালাভে সমর্থ হইয়াছে বল দেখি? কত আইল, কত যাইল; বিদ্যুৎপ্রভায় আলোক উদ্ভাসিত হইল, আবার তখনই সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। এত দিন আশা-নৈরাশ্যের আলোক-আঁধারের ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল। কোন সম্প্রদায়ের স্থায়িত্ব দেখিলাম না; কিন্তু এবার অমরেন্দ্রনাথ কর্জ্জন থিয়েটার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, 'ক্লাসিকে'র গৌরবে 'কর্জ্জনে'র কীর্ত্তি বিকসিত হইয়া উঠিতেছে।

"কুন্দের অভিনয়ে কর্জ্জনের সৌভাগ্য-সূত্রপাত। "কুন্দের" স্মিত-স্নিগ্ধ স্ফুটশুভ্র জ্যোতিঃপ্রভায় ক্লাসিকের যশোবিভা অক্ষুণ্ণ; পরন্তু 'কর্জ্জনে'র প্রতিষ্ঠা-পঙ্কজ উদ্ভিন্ন। এ কুন্দ,—বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিষবৃক্ষের কুন্দ। বিষয়ে কুন্দ বিষবৃক্ষ বটে; কিন্তু অভিনয়ে কুন্দ অমিয়বল্লরী। কেন না হইবে? বঙ্কিমচন্দ্রের 'কুন্দ' উপন্যাসে, অমরেন্দ্রনাথের 'কুন্দ' নাটকে। উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিতে অমরেন্দ্রনাথ সিদ্ধ-হস্ত। উপন্যাসের অস্থিমজ্জায় নাটকের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি মিশিয়া, 'বিষ-বৃক্ষ'কে অভিনয়ে প্রকৃতই অমিয়বল্লরী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা 'কুন্দে'র অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। **আরও ত বিষবৃক্ষের অভিনয় দেখিয়াছি; এমনটী কিন্তু আর দেখি নাই।** প্রত্যেকের অভিনয় স্বাভাবিক সুন্দর।

"বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। অভিনয়ে নগেন্দ্র-নাথের স্বাভাবিকত্ব অমরেন্দ্রে পূর্ণ প্রতিভাত। উচ্চাদর্শ ও অধঃপতনের আলোকচ্ছায়ায় সজীব প্রতিকৃতি। * * কি দৃশ্য, কি অভিনয়, কি বেশবিন্যাস,—সকলই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। পবিত্র বারাণসীধামে ভাগীরথী বারি তরতর তরঙ্গে চলিতেছে;—উপরে শতাশ্বমেধ ঘাট; পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর তরণীমণ্ডলী,—গঙ্গাবক্ষে বজরায় নগেন্দ্রনাথ। সে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিষবৃক্ষের অভিনয়ে বুঝা গেল, কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে ক্লাসিকের কীর্ত্তি বজায় থাকিবে।"

এদিকে কিন্তু কয়েক রাত্রি অভিনয় করিতে না করিতেই, নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ও অত্যধিক পরিশ্রমে অমরেন্দ্রনাথের রোগ এত প্রবল আকার ধারণ করিল যে, শয্যার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। তাঁহার অনুপস্থিতিতে দুর্গাদাসবাবু অমরেন্দ্রনাথের নামই অধ্যক্ষরূপে বিজ্ঞাপিত করিয়া থিয়েটার চালাইবার চেষ্টা করিলেন,

নানা আয়োজন করিয়া ১০ই নভেম্বর, হরনাথ বসু প্রণীত নূতন নাটক 'স্বর্ণহারে'র অভিনয় করাইলেন, কিন্তু তৈলহীন প্রদীপের মত অমরেন্দ্রনাথ বিহনে নিউ ক্লাসিক থিয়েটার দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। তাঁহার সমুদয় বাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

অমরেন্দ্রনাথের নটজীবনের যবনিকা পড়িল। এ যবনিকা আর উঠিবে কিনা, সে চিন্তায় নাট্যজগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।* অনেকেই ভাবিলেন যে, এ যাত্রা আর তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। পাওনাদারেরা সকলে প্রমাদ গণিলেন। প্রথমবার ক্লাসিক ছাড়িবার পর হইতেই তাঁহার নামে একটীর পর একটী নালিশ চলিতেছিল,—এখন নিউ ক্লাসিক ছাড়িবার পর, যে যেখানে ছিলেন, ডিক্রী করাইতে লাগিলেন। এ রোগশয্যা হইতে তাঁহাদের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা অমরেন্দ্রনাথের ছিল না। তিনি 'ইন্‌সল্‌ভেন্সী ফাইল' করিলেন।

এতদিনকার অত্যাচারে, অবহেলায় শরীর একেবারে অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে রোগ এমন আধিপত্য বিস্তার করিল যে, সকলে অমরেন্দ্রনাথের জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। বড় বড় ডাক্তার আসিল, সকলেই জবাব দিয়া গেল। কিন্তু অমরেন্দ্র-নাথের সহধর্ম্মিণী আশা ছাড়িলেন না—আত্মজীবন তুচ্ছ করিয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। প্রায় একমাস ধরিয়া যমে মানুষে টানা-টানির পর ডিসেম্বরের গোড়াগুড়ি অবস্থা একটু ফিরিল। ডাক্তারেরা আবার আশা দিলেন। দুর্ব্বল দেহে ঈষৎ বল পাইবার পরই, অমরেন্দ্রনাথের পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনোদ্দেশ্যে কাশীতে লইয়া গেলেন। তাহার পর মধুপুর, বৈদ্যনাথ, পুরী প্রভৃতি

* ১৪।১২।০৬ তারিখে নবীনচন্দ্রকে গিরিশচন্দ্রের পত্র—"অমরের বড় অসুখ, শুনিয়াছ কি? একটু ভাল আছে—শুনিলাম।"

কয়েক স্থানে কিছুদিন করিয়া অবস্থিতির পর, হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া, তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চের শেষ নাগাদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও বাগানের বাস তুলিয়া দিয়া, এখন হইতে হাতীবাগানের বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অমরেন্দ্রনাথ নাট্যজগতের কৃতঘ্নতা দর্শনে নটজীবনের উপর বীতস্পৃহ হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি অন্য কোন প্রকার চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠদেরও জানাইলেন যে, যদি অন্ততঃ শ'দুই টাকার একটা চাকুরী তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি থিয়েটারকার্য্যে ইস্তফা দেন। কিন্তু চাকুরী অত সুলভ নয়। মাসখানেক ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছিল কিন্তু কোনও সুবিধা হইতেছিল না, এমন সময়ে তিনি তাঁহার পরম বন্ধু বরেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র পাইলেন যে, বোম্বাইতে একটী কাজ খালি আছে, যদি অমরেন্দ্রনাথের পছন্দ হয়, তাহা হইলে বরেন্দ্রবাবু সেটী তাঁহাকে পাওয়াইয়া দিতে পারেন। অমরেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া গেলেন।

পত্নীর সেবায় ও যত্নেই যে অমরেন্দ্রনাথ প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, একথা তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে আঁকা হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি পত্নীর এক পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন ঃ—"আমি যাহা ভাল বুঝিব তাহা করিব বটে, কিন্তু এটা বেশ জেনো, যে তোমাকে আর কখনও কষ্ট দিব না, দিব না, দিব না। যদি দিই, তবে জেনো, আমি মানুষ নই, পশু।"

তাঁহার এক বিশেষ নিকট আত্মীয়ার কাছে অন্য এক পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন,—"সে বেশী দিনের কথা নয়,—এখনও আমার চোখের উপর রয়েছে,—যখন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া, ভীষণ রোগে, মৃত্যুশয্যায়

পড়িয়াছিলাম, তখন একজনের প্রাণপণ সেবায় এবং মেজদাদার প্রভৃত অর্থ সাহায্যে প্রাণ ফিরাইয়া পাই। সে ঋণ আমার প্রত্যেক হাড়খানিতে গাঁথা আছে।”

শুধু ব্যক্তিগত পত্রবিনিময়ে নয়, একথা তিনি ১৩১৮ সালের মাঘের “নাট্যমন্দিরে” ‘রোগশয্যায়’ শীর্ষক কবিতায় সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দেন। আমরা সে কবিতাটী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি ঃ—

(১)

শ্রান্ত ক্লান্ত—অবিশ্রান্ত ব্যাধির তাড়নে,—
শয্যা সনে দেহ যষ্টি লীন !
হয় মনে প্রতিক্ষণে—কাল হুতাশনে
হয় বুঝি হয় বা বিলীন !
মিটি মিটি গৃহ কোণে, জ্বলে দীপ সকরুণে,
প্রেত কায়া সম ছায়া—নেচে নেচে ওঠে।
সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য তাহে আর(ও) যেন ফোটে ॥

(২)

হতভাগ্য যুবা ওই,—বিধির বিধানে—
ঐশ্বর্য্যের ছিল অধিকারী।
শত শত চাটুকার স্তুতিবাদ গানে—
জনে জনে দিত বলিহারি !!
ছিল বারনারী রত, মদ্য পান অবিরত,
দিবানিশি আনন্দের উচ্চ কোলাহল।
মুখরিত রাখিত সে রম্য হর্ম্ম্যতল ॥

(৩)

গিয়াছে সে দিন—মাত্র আছে কল্পনায়,
এবে যুবা কপর্দ্দকহীন !
জীর্ণ গৃহে—শীর্ণ দেহে শায়িত শয্যায়,
সমাগত সমাধির দিন !!
পাত্র মিত্র আত্মজন, করিয়াছে পলায়ন,—
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস দিগন্তে প্রসারি',
কহে যুবা—"বড় তৃষা—এক বিন্দু বারি" ॥

(৪)

আর্দ্র বস্ত্রে ত্রস্তপদে কে তুমি সুন্দরী,
সন্ধ্যার আঁধার লয়ে বুকে !
বারিপাত্র ল'য়ে করে—আহা মরি মরি,
পশ' গৃহে—ধীরে—অধোমুখে !
কে গো তুমি কমলিনী, মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী,
দিব্যকান্তি জ্যোতিহীন মলিনবসনা।
স্বভাবে অভাবে যেন বিরাগে মগনা ॥

(৫)

চিনেছি চিনেছি তুমি পতিব্রতা সতী,
হিন্দুজাতি গৌরবের ধন !
সংসার সাগরে তুমি একমাত্র গতি,
ধ্রুবতারা—অমূল্য রতন !
তোমারি করুণা বলে, পাষাণে অমৃত গলে,
তুমি আছ—আছে তাই চন্দ্রসূর্য্য ভাতি।
গগনে এখনও জলে তারকার বাতি ॥

(৬)

তৃষ্ণা দূর করি যুবা ধীরে ছাড়ে শ্বাস !
দু'নয়নে বহে বারি ধারা !!
মুগ্ধ প্রায় চেয়ে রয়—নাহি সরে ভাষ !
মত্ত চিত্ত সত্য আত্মহারা !!
শুষ্ক কণ্ঠে কহে—"মায়া !* দূর অতীতের ছায়া,
স্মৃতির বৃশ্চিক জ্বালা—করি সহচর !
বিষম দংশনে অঙ্গ—করে জর-জর !!

(৭)

সম্পদের সাথী যত সবে পলাইত !
এ জীবন মরুভূমি প্রায় !
গুপ্ত ছুরী স্বার্থ সনে সযত্নে রক্ষিত,
অসময়ে কে বা মুখ চায় ?
কুহকিনী কুহু স্বরে,—সঁপি' প্রাণ অকাতরে,
বারে বারে সুধাইত—'ভালবাস তুমি ?
তুমি যদি ভালবাস,—স্বর্গ—মর্ত্তভূমি' !!

(৮)

মনে আছে সেই দিন,—দিনান্তে যখন,
কান্তপদ মাগিতে দর্শন।
ভ্রান্ত মদে মুগ্ধ মন—এই অভাজন,
হেলায় ঠেলিত আকিঞ্চন !!
ভাবি নাই একবার, বিষময় এ সংসার,
মূর্ত্তিমান্ ছলনার—রঙ্গ—রঙ্গালয়।
চলিতেছে শুধু সেথা পাপ অভিনয় ॥

---

* অমরেন্দ্রনাথের পত্নী হেমনলিনীর অন্য নাম।

(৯)

ছায়া দেহী সম যত অভিনেতাগণ !
নানা সাজে করে আগমন !
বন্ধুবেশে হেসে হেসে আসে কতজন,
ওঠে শেষে কাতর ক্রন্দন !!
প্রণয়িণী রূপ ধরি, ঢালিত মাধুরী হরি,
কেহ আসি ধীরি ধীরি মালা দেয় গলে।
শিহরি নেহারি ফুলে *—গরল উথলে !!

(১০)

ঘুচিয়াছে ঘুমঘোর—খুলেছে নয়ন,—
সমুদিত তরুণ তপন !
দারিদ্র্যের দুঃখময় নির্দ্দয় পীড়ন,—
দানিয়াছে নবীন জীবন !!
অর্থহীন অতি দীন,—আশার আলোক লীন,
নিরাশা আঁধারে তুমি পূর্ণিমা-রূপিণী !
গুণবতী সাধ্বী সতী—প্রাণ প্রদায়িনী !!

(১১)

মৃতপ্রায় শুয়ে হায় ! এ রোগ শয্যায়—
বুঝিয়াছি মরমে মরমে,
সুখে দুঃখে সমব্যথী কে আছে ধরায় ?
তুমি—'মায়া' !—মায়ার জনমে !!
পত্নীপ্রেম যেইজন, নাহি করে আকিঞ্চন,

---

* পাঠান্তর—কুসুমে নেহারি ছি ছি।

হাহাকার হয় সার তাহার জীবনে।
কোথা শান্তি? ভ্রান্তিময় সংসার—স্বপনে !!”

(১২)

আবেশে কাঁপিল কায়া—কহে 'মায়া' ধীরে,
ধারা বহে কমল নয়নে,—
“বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে সাগরের নীরে,
ধেয়ে যাই তোমার বচনে !
তুমি প্রভু ! আমি দাসী ! শ্রীচরণ অভিলাষী,
ঠেল' পায়—ক্ষতি তায়—নাহি কিছু লেশ !
ইহলোকে পতি তুমি—প্রাণান্তে প্রাণেশ !!”

(১৩)

দেহ প্রাণ করি পণ—শুশ্রূষার ফলে,
ক্রমে যুবা নীরোগ হইল !
পতিব্রতা সাধ্বী সতী—নয়নের জলে
পুণ্যবলে সকলি ফিরিল !!
সম্পদ গৌরব যত, হয়েছিল অপহৃত,
বর্ষ না হইতে গত—আবার মিলিল।
ভগ্ন গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মী—আবার হাসিল ॥

পরিশিষ্ট

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ক্লাসিকের উদ্বোধন হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিউ ক্লাসিকের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ যে সকল ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার এক তালিকা দিলাম :—

নলদময়ন্তীতে নল, বেল্লিকবাজারে দোকড়ি দালাল, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ ও মোহনলাল, লক্ষ্মণবর্জ্জনে লক্ষ্মণ, দক্ষযজ্ঞে মহাদেব ও দক্ষ, তরুবালায় অখিল, হারানিধিতে অঘোর, বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গল, দেবী চৌধুরাণীতে ব্রজেশ্বর, হরিরাজে হরিরাজ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধদেব, রাজা ও রাণীতে বিক্রমদেব, পূর্ণচন্দ্রে পূর্ণচন্দ্র, আলিবাবাতে হুসেন ও আলিবাবা, কাজের খতমে মতিলাল, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলা, ধ্রুবচরিত্রে উত্তানপাদ, মেঘনাদ-বধে মেঘনাদ, মুকুল-মুঞ্জরায় বরুণচাঁদ, প্রফুল্লে ভজহরি ও যোগেশ, ইন্দিরাতে উপেন্দ্র, নির্ম্মলাতে কিশোর, জনায় প্রবীর ও শ্রীকৃষ্ণ, বিষাদে অলর্ক, সীতার বনবাসে লক্ষ্মণ, সিন্ধুবধে দশরথ, দেলদারে গহন, করমেতিবাইতে আলোক, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, ম্যাকবেথে ম্যাকবেথ, মজায় হরিহর, পাণ্ডবগৌরবে ভীম, ছুটীপ্রাণে সুন্দর, সীতারামে সীতারাম, সোনার স্বপনে বিভোর, থিয়েটারে গুণেন, সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ ও অটল, সরলায় বিধুভূষণ, চাবুকে প্রিয়লাল, অশ্রুধারাতে ১ম ভারত-সন্তান, রামনির্ব্বাসনে রাম, মনের মতনে কাউলফ, কপালকুণ্ডলায় নবকুমার, মৃণালিনীতে হেমচন্দ্র, রাবণ-বধে রাবণ, গুপ্তকথায় অর্দ্ধচন্দ্র, চৈতন্যলীলায় মাধাই ও কলি, তোমারিতে আমীরুদ্দিন, বহুৎ আচ্ছাতে মিঃ চম্পটী, শিবজীতে শিবজী, ফটিকজলে প্রভাত, ভ্রান্তিতে নিরঞ্জন ও রঙ্গলাল, নসীরামে নসীরাম ও অনাথনাথ, আয়নায় সৃষ্টিধর, অভিমন্যুবধে অর্জ্জুন, জয়দ্রথ ও

দুর্য্যোধন, নীলদর্পণে নবীনমাধব, সীতাহরণে রাম, কৃষ্ণকুমারীতে জগৎসিংহ ও ভীমসিংহ, প্রতাপাদিত্যে প্রতাপাদিত্য, রঘুবীরে রঘুবীর, আনন্দমঠে জীবানন্দ, হিরণ্ময়ীতে পুরন্দর, সৎনামে রণেন্দ্র, পেয়ারে রূপরাজ, তরণীসেনে রাম, বিক্রমাদিত্যে বিক্রমাদিত্য, চোখের বালিতে মহেন্দ্র, প্রেমের পাথারে সা আলম, সংসারে মিঃ মুর ও প্রিয়নাথ, কোন্‌টা কে-তে ১ম ড্রোমিও, শিবরাত্রিতে সুস্বর, পৃথ্বীরাজে পৃথ্বীরাজ, বাপ্পারাওএ বাপ্পারাও, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে ১ম বঙ্গসন্তান, হোলো কি-তে মিঃ নেলর, প্রণয় না বিষে রমা পাগলা, সিরাজদ্দৌলাতে সিরাজদ্দৌলা, কুন্দে নগেন্দ্রনাথ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাই যে, কি বিয়োগান্ত, কি মিলনান্ত, কি বীররসাত্মক, কি ভক্তিমূলক, কি সিরিও-কমিক, কি হাস্যরসাত্মক, কি চটুল, কি গীতিবহুল, সমস্ত প্রকার ভূমিকাতেই অমরেন্দ্রনাথ অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। শুধু তাই নয়, প্রেমিকের অংশাভিনয়ে আজ পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দী। বাস্তবিক এরূপ সর্ব্বরসসমন্বিত অভিনেতা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, মহেন্দ্রলাল, দানিবাবু, চুণিবাবু প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এ যুগে অমরেন্দ্রনাথ অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বিশ্বকোষ যথার্থই বলিয়াছেন যে,—"তাঁহাকে সেই সময়কার অপ্রতিদ্বন্দী অভিনেতা বলিলেও চলে।"

দানিবাবুর জীবনীকার হেমেন্দ্রবাবুও এ কথা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,—"এখানে (ক্লাসিকে) অমরেন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য serious অভিনেতার স্থানই বা কোথায়? তাই আমরা দেখিতে পাই, দ্বিতীয় স্তরের দানিবাবু অমরেন্দ্রের ছায়ায় পড়িয়া পিতার সাহচর্য্যেও নিজের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেন না।"

তৃতীয় খণ্ড

নির্ব্বাণ

বোম্বাইএ অমরেন্দ্রনাথ।

সঙ্গে বন্ধুবর বনবিহারী দত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

——ঃ*ঃ——

ষ্টারের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজাররূপে অমরেন্দ্রনাথ

(১৯০৭)

বোম্বাইএর কাজ অমরেন্দ্রনাথের পছন্দ হইল না, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া, ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষেরা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও ৪০০৲ টাকা বেতনে তাঁহাকে অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার করিয়া নিজেদের থিয়েটারে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হীরেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এ সময়ে ষ্টারের বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য, পদ্মিনীর ঝোঁক কমিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ প্রধান অভিনেতা ও অন্যতম স্বত্বাধিকারী অমৃতলাল মিত্র দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছেন। ও দিকে অমরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিবশতঃ বিডন ষ্ট্রীটে মনোমোহন পাঁড়ে ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটার একাধিপত্য করিতেছে। ক্লাসিক ষ্টেজ বন্ধ; বেঙ্গল ষ্টেজে নবগঠিত ন্যাশানাল থিয়েটার চুণিবাবু ও তারাসুন্দরীর সাহচর্য্যে মধ্যে মধ্যে ২।১ খানা বই জমাইতেছেন বটে, কিন্তু সে সাময়িক সাফল্যে মিনার্ভার কোন হানি হইতেছে না। গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু, দানি, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, তিনকড়ি, সুশীলা প্রভৃতির সম্মিলনে তখন মিনার্ভা রঙ্গজগতের শীর্ষস্থলে। শুধু

তাই নয়, এতদিন বঙ্গরঙ্গভূমে অমরেন্দ্রনাথ একাকী নায়করূপে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখন—যে দানিবাবু এতদিন হাস্যরসাভিনয়ে নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, সেই দানিবাবুই, গিরিশচন্দ্রের ঐকান্তিক শিক্ষা-বলে, সিরাজদ্দৌলা, ওসমান, মীরকাশিম প্রভৃতি ভূমিকাভিনয় করিয়া, গুরুগম্ভীর অংশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটরূপে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া, আজ অমরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর। ষ্টারে লুপ্তবীর্য্য স্থবির সিংহ অমৃতলাল মধ্যে মধ্যে গর্জ্জাইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু ক্ষণিক উত্তেজনার পর অবসাদে আবার ঝিমাইয়া পড়িতেন। ক্রমশঃ ষ্টার অচল হইয়া উঠিল।

"A happy, happy, thrice happy union. The Life of Classic infused in that of the Star", বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া, ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষ অমরেন্দ্রনাথকে লইয়া গেলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে অমরেন্দ্রনাথ 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের ভূমিকা লইয়া প্রথম ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। সে রজনীতে অমৃতলাল মিত্র চন্দ্রশেখর, অমৃতলাল বসু ফষ্টর, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ্বাস ও মহেন্দ্র চৌধুরী নবাব সাজিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের রঙ্গালয় হইতে অবসর গ্রহণে সারা বঙ্গদেশ দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছিল। এখন তিনি আবার পাদপীঠের আলোকের সম্মুখে দর্শন দিবেন শুনিয়া ষ্টার থিয়েটারে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।*

* জনতা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অমৃতলাল বসু লিখিত পরের সপ্তাহের হ্যাণ্ডবিল হইতেই বুঝা যায়:—"Last Saturday evening, notwithstanding the rain and storm, the theatre was so crowded that over 400 gentlemen, most of them with ladies of their family, went away, to our great regret, disappointed from our box office ; since then we are receiving a number of communications both verbal and written to repeat the performance of Chandrasekhar."

প্রতাপরূপে অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইবামাত্রেই সেই বিরাট্ দর্শকমণ্ডলী প্রায় পাঁচ মিনিট ব্যাপী বিপুল করতালিধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তিনি এমন অপূর্ব্ব প্রাণময় অভিনয় করিলেন যে, যবনিকা পতন পর্য্যন্ত সে করতালিধ্বনি থামিল না, মুহুর্মুহু আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেক্ষাগৃহ কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথকে এ অংশে অবতীর্ণ হইতে দেখিলে, তাঁহাকে জীবন্ত প্রতাপ বলিয়া মনে হইত। এ ভূমিকা যে শুধু তিনি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, বা শুধু যে অন্য বহু খ্যাতনামা নট এ ভূমিকাভিনয়ে তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারেন নাই, তাহা নহে—প্রতাপের ভূমিকাকে তিনি এক নব রূপ, নব প্রাণ দান করিলেন। প্রথম আবির্ভাব হইতে যবনিকাপতন পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর নাটকে এমন কোন দৃশ্য ছিল না, যাহাতে অমরেন্দ্রনাথ দর্শনীয় কিছু না করিতেন। সে অভিনয়ের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র ; সুতরাং আমরা তাহা হইতে বিরত রহিলাম। অন্য স্থানের কথা ছাড়িয়া দি, যাঁহারা তাঁহার মধুর হাসিপূর্ণ "আমার প্রয়োজন আছে", এবং সুপ্ত সিংহ অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার "কি বুঝবে তুমি সন্ন্যাসি!" শুনিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ইহা ছাড়া অমরেন্দ্রনাথের প্রতাপের ভূমিকাভিনয় সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। এতদিন ধরিয়া, নাটকের নায়ক ছিলেন চন্দ্রশেখর, নায়িকা শৈবলিনী, হাসির খোরাক যোগাইতেন বিশ্বাস ও গ্রন্থকে সঞ্জীবিত রাখিতেন দলনী। চন্দ্রশেখরের কথা মনে পড়িলেই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে অমৃতলাল মিত্রের চিত্র। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত সে মর্ম্মভেদী বাণী—"মূর্খ ব্রাহ্মণ! বড় না জ্ঞানের গর্ব্ব করতিস্!—মহাজ্ঞানী বলে বড় না পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতিস্? * * ব্যস্—

একটী নিশ্বাসের ভর সইল না! সব শেষ হ'য়ে গেল!"—এখনও কর্ণে ঝঙ্কার তুলিতেছে। এ অংশে তাঁহার সমতুল্য অভিনয় কেহ করিতে পারেন নাই—গিরিশচন্দ্র না, অমৃতলাল বসু না, এমন কি অমরেন্দ্রনাথও না। (অমরেন্দ্রনাথ পরে চন্দ্রশেখর সাজিয়াছিলেন।)

আর সাজিতেন নরীসুন্দরী—দলনী বেগম। সত্যকারের দলনী বেগমও বুঝি অমন মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করিতে পারিত না। তাঁহার কণ্ঠনিসৃত "আজু কাঁহা মেরি" গান এখনও কর্ণে মধুবর্ষণ করিতেছে। শোনা যায়, বহু দর্শক নাকি মাত্র এই গানখানি শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে আসিতেন। ফুল হাউস বিক্রী, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দলনীর এই গানের পর, পঞ্চমাঙ্কের পটোত্তোলনের সময় দেখা গেল যে রঙ্গগৃহে মাত্র মুষ্টিমেয় দর্শক বিদ্যমান। মিনার্ভায় চন্দ্রশেখর অভিনয়কালে, সুশীলার মত সর্ব্বগুণসমন্বিতা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ও খ্যাতনামা গায়িকাও দলনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নরীসুন্দরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই, শেষে কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত জেদাজেদীতে এ অংশ লইতে বাধ্য হন ও গ্রামোফোনের রেকর্ড হইতে দলনীর গান শিক্ষা করিয়া, তবে রঙ্গমঞ্চে নামেন।

যাহা হউক, চন্দ্রশেখর ও দলনীই চন্দ্রশেখর নাটকের প্রাণ ছিল এবং যদিও একজন বিশিষ্ট অভিনেতা (অক্ষয়কালী কোঙার) প্রতাপ সাজিতেন, তথাপি প্রতাপ নাটকের একটী গৌণচরিত্র মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া এ ভূমিকায় যে অভিনয় করিলেন, তাহাতে এই নাটক সম্বন্ধে সকলের ধারণা পাল্‌টাইয়া গেল। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, দলনী প্রভৃতি সকলেই তলাইয়া গেলেন, প্রতাপ অবিসম্বাদীরূপে নাটকের প্রধান চরিত্র হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে এরূপ ঘটনা এই প্রথম ও এই শেষ। এ ক্ষমতা একমাত্র অমরেন্দ্রনাথেরই

'তরুবালা' নাটকে অখিলের ভূমিকায়

অমরেন্দ্রনাথ।

'কি ফুল সে বল যা'র নাহি হয় মূল—পারুল, পারুল।'

দেখিয়াছিলাম যে স্বীয় অভিনয় প্রতিভায় নাটকের নায়ক বদল হইল—আর তাহাও চন্দ্রশেখরের মত সর্ব্বজনসমাদৃত পুরাতন নাটকের।

যাহা হউক্, ১৮ই মে, ১৯০৭ হইতে অমরেন্দ্রনাথ কুসুমকুমারীকে লইয়া ষ্টারে যোগ দিলেন। পরদিন রবিবার, ষ্টারে সরলা অভিনীত হইল। তাহাতে অমরেন্দ্রনাথ বিধুভূষণ, অমৃতলাল বসু নীলকমল, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় গদাধর ও কুসুমকুমারী সরলা সাজিলেন।

অতঃপর কয়েক রাত্রি অখিল, ভজহরি প্রভৃতি পুরাতন ভূমিকা অভিনয়ের পর, অমরেন্দ্রনাথ ৯ই জুন, রবিবার, প্রতাপাদিত্যে রডার অংশ গ্রহণ করিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, এই দিন প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা গ্রহণই অমৃতলাল মিত্রের শেষ অভিনয়। এই দিন অভিনয়ের ফলে তাঁহার ক্যান্‌সার রোগ এমন বাড়িয়া উঠিল যে, পর সপ্তাহে তিনি স্বরবদ্ধতাবশতঃ লক্ষ্মণসিংহের ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, অশ্রুনিষিক্ত-কণ্ঠে তাহা স্বহস্তে অমরেন্দ্রনাথের হাতে তুলিয়া দিলেন।

তাহার পর ১৫ই জুন, অমরেন্দ্রনাথের নল ও বাবুতে ফটিকচাঁদের ভূমিকাভিনয় দেখিবার জন্য দর্শকের ভিড় দেখিয়া ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ অবাক্ হইয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথের এরূপ জনপ্রিয়তা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই, তিনি নিজেও বোধ হয় আশা করেন নাই। অতঃপর ৩০শে জুন, পদ্মিনীতে লক্ষ্মণসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবার পর, তিনি ৭ই জুলাই বিজয়বসন্তে বলবন্তের অংশ অভিনয় করিলেন। উত্তরোত্তর দর্শক সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

অমরেন্দ্রনাথ যে সময়ে ষ্টারে আসিয়া যোগ দেন, সেই সময়ে নাট্য-জগতে আবার এক হুলুস্থূল কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। গোপাললাল শীল এষ্টেটের ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চ প্রকাশ্য নীলামে উঠিলে, শরৎকুমার রায় একলক্ষ আট হাজার টাকায় উহা ক্রয় করেন এবং ঐখানে কোহিনূর থিয়েটার

স্থাপিত করিয়া, মিনার্ভা হইতে দশ হাজার টাকা বোনাস্ ও ৪০০৲ টাকা মাহিনা দিয়া গিরিশচন্দ্রকে ভাঙ্গাইয়া আনেন। তাঁহার সঙ্গে দানিবাবু ও তিনকড়িও চলিয়া আসেন। এই দুঃসময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখরও থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। ফলে মিনার্ভার যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা না লিখিলেও চলে।

মিনার্ভার স্বত্বাধিকারীগণ চঞ্চল হইয়া উঠেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের কোন এগ্রিমেণ্ট ছিল না, সুতরাং তাঁহার যাওয়া কেহ রোধ করিতে পারিলেন না। তবু মহেন্দ্রবাবু গিয়া গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে ধর্ণা দিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, "এতগুলো টাকার মায়া কিরূপে ত্যাগ করি বল! তোমরা তাহার চেয়ে এক কাজ কর। এ সময় যদি কেহ তোমাদের বাঁচাইতে পারে, তো সে একমাত্র অমর। তোমরা তাহাকে ষ্টার হইতে ভাঙ্গাইয়া আন।" ষ্টারের বিক্রয়াধিক্য দর্শনে, মহেন্দ্রবাবু নিজেও সে কথা বুঝিয়াছিলেন; উপরন্তু গিরিশচন্দ্রের উপদেশ পাইয়া, তাঁহারা আসিয়া অমরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথের যাইতে একটুও ইচ্ছা ছিল না,—একে সবেমাত্র প্রবল রোগের আক্রমণ হইতে উঠিয়াছেন, তাহার উপর যদি প্রবল পরাক্রান্ত কোহিনূরের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে হয়ত' পুনরায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ষ্টার থিয়েটার বাড়ীর কাছে, সেখানে কম দায়িত্বপূর্ণ অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে তিনি অধিষ্ঠিত, সুতরাং খাটুনী কম। সেই জন্যই তিনি ষ্টারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিনার্ভায় গেলে তাহা চলিবে না, থিয়েটারকে খাড়া রাখিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইবে। এই সব ভাবিয়া, তিনি মহেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু শেষে যখন তাঁহাকে ৬০০০৲ বোনাস ও ৫০০৲ বেতনের লোভ দেখাইলেন,

তখন অমরেন্দ্রনাথ নিমরাজী হইয়া, ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষকে সমস্ত কথা জানাইলেন ও বলিলেন যে, তাঁহারা যদি অমরেন্দ্রনাথকে ২০০০৲ বোনাস্ দেন, তাহা হইলে তিনি মহেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে রাজী হইলেন না। ষ্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিপ্রসাদ বসু অন্য সকল অংশীদারদের অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, "যে লোক নলদময়ন্তীর মত নাটকে ৯০০৲ সেল দেখাইয়াছে, তাহাকে সামান্য ২০০০৲ টাকার জন্য হাতছাড়া করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।" (পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, ষ্টারে ফুল হাউস হইলে ৭।৮ শত টাকা বিক্রয় হইত।) কিন্তু হরিবাবুর কথা কেহ শুনিলেন না। ১৪ই জুলাই অভিনয়ের পর অমরেন্দ্রনাথ, কুসুম-কুমারীকে লইয়া মিনার্ভায় চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:*:—

মিনার্ভার অধ্যক্ষতা গ্রহণ

(১৯০৭-৮)

মিনার্ভায় যোগদান করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ ২১শে জুলাই, ১৯০৭, তারিখে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজের অংশ লইয়া দর্শকগণকে অভিবাদন করিলেন। তখনও গিরিশচন্দ্র কাগজে কলমে মিনার্ভা ছাড়েন নাই, তাই তাঁহার নাম ম্যানেজার ও অমরেন্দ্রনাথের নাম অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হইল। ২৭শে জুলাইএর পর গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলে, ৩১শে জুলাই হইতে অমরেন্দ্রনাথের নাম ম্যানেজাররূপে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

২৮শে জুলাই, অমরেন্দ্রনাথ দুর্গাদাস নাটকে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া, সূক্ষ্ম অভিনয়কলার পরিচয় দিলেন। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি' নাটক মহলায় পড়িয়াছিল ও স্বয়ং গিরিশচন্দ্র তাহার তৃতীয়াঙ্ক পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ বাকী দুই অঙ্কের শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়া, ১৭ই আগষ্ট মহাসমারোহে ছত্রপতির অভিনয় করাইলেন। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি এই :—

শিবাজী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দাদোজী কোণ্ডদেব ও সায়েস্তাখাঁ—নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, রামদাস স্বামী—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শম্ভাজী—শশীমুখী ও ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ, তানাজী—

প্রিয়নাথ ঘোষ, গঙ্গাজী—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, ফেরঙ্গজী, গোবান খাঁ ও পোলাদ খাঁ—সত্যেন্দ্রনাথ দে, মোরোপন্থ—রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর্যাজী—সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার, আফজল খাঁ—N. Banerjee, শম্ভাজী মোহিতে, পূজারী ও জমাদার—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মল্লিকজী ও মুলানা আহম্মদ—হরিদাস দত্ত, কৃষ্ণাজীপন্থ—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল (আঙ্গাস), আওরঙ্গজেব—তারকনাথ পালিত, জাফরখাঁ—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলির খাঁ—মহীন্দ্রনাথ দে, রামসিংহ ও উদয়ভানু—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, আবুল ফতেখাঁ—নিৰ্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জিজাবাই—প্রকাশমণি, সইবাই—কুসুমকুমারী, পুতলাবাই—সুশীলাবালা, লক্ষ্মীবাই—হীরাবালা (পটল), বিজাপুর বেগম—পান্নাসুন্দরী, মুলানা আহম্মদের পুত্রবধূ—বাকারাণী।

ইতিমধ্যে ১১ই আগষ্ট রবিবার, 'চাঁদবিবি' নাটক লইয়া, কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে কোহিনূর তখন কলিকাতায় এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, প্রথম অভিনয় রজনীতে ২২৫০৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। তাহার পর, গিরিশচন্দ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর কোহিনূরে 'ছত্রপতি'র অভিনয় করান। সেখানে শিবাজী সাজেন দানিবাবু।

একই ভূমিকা লইয়া দুই থিয়েটারে দুইজন প্রখ্যাতনামা নট প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায়, দর্শকমহলে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অসামান্য অভিনয়কুশলতায় জয়মাল্য পান মিনার্ভা। পরশ্রীকাতর ব্যক্তির কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, অমরেন্দ্রনাথকে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখিলে, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী বলিয়াই দর্শকের ভ্রম হইত। প্রতি হাবভাব, কথাবার্ত্তা ও অঙ্গসঞ্চালনে অমরেন্দ্রনাথ কোথাও সে ভ্রম সংশোধনের অবকাশ দিতেন না। অবশ্য পূর্ব্বেও তিনি মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত শিবজী নাটকে শিবজীর অংশে কিরূপ যশ অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন,

তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। সুতরাং বর্ত্তমান সাফল্যে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

অমরেন্দ্রনাথের এই ভূমিকাভিনয় সম্বন্ধে বঙ্গবাসী (৭ই ভাদ্র, ১৩১৪) লিখিয়াছিলেন :—"প্রথমেই দেখিলাম, দত্তজা বীরবেশে বীরসাজে শিবাজীর অভিনয়ে দর্শকগণকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অভিনয়ের আদ্যন্তে তাঁহার এই ভাব। দৃশ্যে দৃশ্যে জ্বলন্ত দীপক রাগে অভিনয়ের অনলোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বলিত হইয়াছিল। দীন, হীন, জীর্ণ, শীর্ণ বাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দকে দত্তজা প্রকৃতই স্বদেশীয় ভাবে ও স্বধর্ম্মের অনুরাগে যেন ভাবাবতার করিয়া তুলিয়াছেন।"

বসুমতী (১১ই আশ্বিন, ১৩১৪) লিখিয়াছিলেন :—"তাঁহার অভিনয় যে যৎপরোনাস্তি সুন্দর হইয়াছে, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তাঁহার অভিনয় দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীকে আনন্দে ও উদ্দীপনায় আত্মহারা হইতে হয়।"

প্রতিযোগিতায় মিনার্ভার বিজয় দর্শনে অমরেন্দ্রনাথ গর্ব্ব করিয়া হ্যাণ্ডবিলে লিখিয়াছিলেন :—

"Glorious victory! Grand success in competition! The hour of trial is over! We are proud to acknowledge with thanks the unanimous verdict of public opinion, which declared itself unmistakeably in favour of the success of our performance and it is with no small satisfaction that we find that the chorus of acclamation and unbounded admiration with which our reference was hailed by an admiring press was but the precursor of the still more glorious success, which we have achieved in the open

field of competition and that our thrilling performance which has already excited the enthusiasm of our friends and the envy of our enemies is now declared even by the most fastidious critic to be decidedly the Best."

অন্য সংবাদপত্রের কথা ছাড়িয়া দি, ইংরাজ পরিচালিত ও সম্পাদিত "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন (১৭ই নভেম্বর, ১৯০৭)—

"The popularity of * * Chhatrapati, * *, is manifest from the large audiences which are attracted to the Minerva Theatre on every occasion that this thrilling play is billed. Though it has been running for about ten weeks now, the large auditorium was crammed in every part and early in the evening the sale of tickets had to be stopped, the large overflow helping to fill the adjacent play-houses. Babu Amarendro Nath Dutt was in excellent form and the entire company played up to his high standard."

পূজার ঠিক পূর্ব্বেই (২৯শে সেপ্টেম্বর), শিরী ফরহাদে, ফরহাদের অংশ সুচারুরূপে অভিনয় করিবার পর, অমরেন্দ্র-অর্দ্ধেন্দু মিলন সংঘটিত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া, বাড়ীতেই বসিয়া ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যোগ্য সমাদর সহকারে শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহাকে ২৬শে অক্টোবর হইতে মিনার্ভায় লইয়া আসেন। ৩রা নভেম্বর, দুর্গাদাস নাটকে অমরেন্দ্রনাথ দুর্গাদাস, অর্দ্ধেন্দুশেখর রাজসিংহ, প্রিয়নাথ ঘোষ ঔরংজেব, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু তায়বর খাঁ, মিঃ পালিত দিলীর খাঁ ও কুসুমকুমারী রাজিয়া

সাজেন। ১৬ই নভেম্বর সিরাজদ্দৌলা নাটকেও উভয়ে একসঙ্গে অভিনয় করেন—সেদিন অমরেন্দ্রনাথ হন সিরাজ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মীরজাফর।

কিরূপে এই অমরেন্দ্র-অর্দ্ধেন্দু মিলন সংঘটিত হয়, সে সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি-সভায় এক বক্তৃতা দেন। আমরা সে বক্তৃতার সমুদয় অংশ নিম্নে মুদ্রিত করিলাম :—

"সমগ্র বঙ্গ সংসারকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের বুকে বজ্রাঘাত করিয়া, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে চিরজন্মের মত কাঁদাইয়া গত ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে, নটকুলশেখর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের জীবনলীলার অবসান হইয়াছে। তাঁহার বিয়োগে, বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের যে পরিমাণ ক্ষতি ও অভাব সংঘটিত হইল, তাহা যে দুই এক যুগের মধ্যে পূর্ণ হইবে, এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে উচ্চ আদর্শ ও প্রতিভার জীবন্ত প্রতিকৃতি এ নশ্বর ধরায় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুছিবার নয়, তাহা লুপ্ত হইবার নয়। তাঁহার অস্তিত্ব যতদিন না যুগ পরিবর্ত্তন হয়, ততদিন আগ্নেয় অক্ষরে প্রত্যেক নাট্যানুরাগীর স্মৃতিমন্দিরে অঙ্কিত থাকিবে, একথা দৃঢ়তা-সহকারে বলিতে পারি। অধুনা যে সকল উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা ও অভিনেত্রী, আপনার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই, যাঁহারা অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্য বা শিষ্যা বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত বিবেচনা না করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের গুণগ্রাম বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র সাধ্যের অতীত। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের শৈশবের সাথী ছিলেন, যৌবনের সঙ্গী ছিলেন, প্রৌঢ়ের অন্তরঙ্গ

মিত্র ছিলেন। তাঁহাদের মুখে মুস্তফী মহাশয়ের অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় আপনারা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন এবং পাইবেন। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার শক্তি এত ক্ষুদ্র, আমার সামর্থ্য এত অল্প, যে সেই মৃত মহাত্মার তুঙ্গ-শৃঙ্গ-স্পর্শী, অসামান্য বিভূতির এক বিন্দু অঙ্গে ধারণ করিতে পারি, এরূপ স্পর্দ্ধা আমার নাই। এই মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে যখন প্রথম 'ম্যাকবেথ' অভিনীত হয়, তখন আমি দর্শকরূপে অর্দ্ধেন্দুবাবুর জীবন্ত শক্তির প্রথম পরিচয় পাই। সাতটী বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়া, প্রত্যেক চরিত্রে কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনে তিনি যে অননুকরণীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমি চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার অল্পদিন পরেই অর্দ্ধেন্দু-বাবুকে, বরুণচাঁদ ও আবুহোসেনরূপে দেখিলাম; সে ছবি এখনও আমার চক্ষের উপর প্রতিফলিত রহিয়াছে। কেবলমাত্র দেখিলাম ও মোহিত হইলাম, তাহা নহে, ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিয়া সেই মহাপুরুষের চরণতলে বার বার প্রণত হইলাম। উপযাচক হইয়া, তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম; বঙ্গরঙ্গভূমি সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ করিলাম, বহুবিধ নূতন কথা, নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব তাঁহার মুখে শুনিলাম। তাঁহার একটী কথা এখনও আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—"গিরিশ ঘোষের মত নাট্যকার আমিও কখন পাইব না এবং তাঁহার নাটক উজ্জ্বল করিতে আমার মত অভিনেতা গিরিশ ঘোষও কখনও পাইবে না।"

"অর্দ্ধেন্দুবাবুর একথা যে অতি সত্য, বিন্দুমাত্র ভ্রমশূন্য, একথা বোধ হয় কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। তারপর নিজের মনের পাপ সম্বন্ধে একটী কথা স্বীকার করিতে বাধ্য।

আত্মীয়-স্বজনের উপরোধ অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া, আপনার উন্নতি অবনতির প্রতি একেবারে অমনোযোগী হইয়া, ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল পথ কণ্টকাবৃত করিয়া যখন নাট্যভূমির উন্নতিকল্পে আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন একে একে প্রায় সকল নাট্যরথীর সহায়তা আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। কেবলমাত্র অর্দ্ধেন্দুবাবুর সংস্রবে আমি আসি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল—তিনিও আমার চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটী ভুল ধারণা প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। গত বৎসর মিনার্ভার বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী সুহৃদপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের সাদর আহ্বানে আহূত হইয়া যেদিন মিনার্ভার অধ্যক্ষের পদ, আসিয়া গ্রহণ করিলাম, সেইদিন শুনিলাম অর্দ্ধেন্দুবাবু মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাটীতে বসিয়া আছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, তিনি নাকি আমার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মিনার্ভার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একথা শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলাম; একটা অবসাদের ছায়া আসিয়া সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার কিছুদিন পরেই বন্ধুবর মনোমোহন বাবুকে সঙ্গে লইয়া, আমি অর্দ্ধেন্দুবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম; সেদিনের কথা আমি সারা জীবনেও ভুলিতে পারিব না। তিনি তখন স্নান করিতেছিলেন, আমি কলের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—"সাহেব! আমি এসেছি।" তিনি আমার দিকে চাহিলেন, একটু হাসিলেন, পরে বলিলেন,—"কে অমর! আজ আমার কি ভাগ্যি!" তারপর সকলে আসিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে একত্রিত হইলাম। মনোমোহনবাবু বলিলেন,—"সাহেব! অমরবাবু আপনাকে নিতে এসেছেন, আজ থেকে আপনাকে থিয়েটারে যেতে হবে।" আর

কথা নাই, আর তর্ক নাই, আর বাদানুবাদ নাই, সরলতার আধার, শিশু-হৃদয়ের পরিচায়ক অর্দ্ধেন্দুশেখর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনি বলিলেন,—"তার আর কথা কি? অমর যখন এসেছে, তখন নিশ্চয় যাব।" সেইদিন হইতে অর্দ্ধেন্দুবাবুর সহিত আমার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ হইল। যে কয় মাস উভয়ে একত্র ছিলাম, কখনও একদিনের জন্য বিন্দুমাত্র মনোমালিন্য ঘটে নাই, চিত্তে কোনওরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই, পরস্পরের সহানুভূতির একটুকুও ব্যতিক্রম হয় নাই। আমিও মুক্তকণ্ঠে বারবার তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি,—"সাহেব! আপনার মত সরলপ্রাণ খুব অল্পই দেখিয়াছি।" তিনিও বহুবার আমায় বলিয়াছেন,—"অমর! তোমার মত বন্ধুর সংস্রবে কখনও আসি নাই।"

"সেই প্রীতি, সেই আদর, সেই অনুরাগ, সেই স্নেহ, সেই মমতা, আমার জীবনের একটী মহা সৌভাগ্যযোগ বলিয়া স্বীকার করিতে আমি বাধ্য। যাহা গেল—তাহা আর হইবে না। নিষ্ঠুর কাল, যাহা কাড়িয়া লইল, সে ক্ষতিপূরণ অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আর হইবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গীয় রঙ্গালয় যে অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিল, তাহা পুনরায় ফিরাইয়া পাইবার আর আশা নাই। হে নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর! তুমি যে উচ্চলোকে গিয়াছ, তথায় তোমার অনাদর হইবে না। তোমার স্মৃতির আদর সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে। ইহলোকে তুমি যে পূজা পাইয়া গিয়াছ, পরলোকেও সেই নির্ম্মাল্যের ডালি তোমার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। তোমার মত গুণধর মহাপুরুষের দেবলোকে বহু প্রয়োজন। দেবতার আশ্রয়ে থাকিয়া, দেবদেবীর জীবন্ত প্রতিভা মার্জ্জিত করিয়া, তথায় নূতন রঙ্গালয় স্থাপিত কর। তোমার সোদরপ্রতিম বড় স্নেহের, বড় আদরের,

বড় ভালবাসার, বড় আশার মহেন্দ্রলাল ও অমৃতলালকে সহযোগীরূপে বরণ করিয়া, স্বর্গীয় বেলবাবু ও মতিলাল সুরের আন্তরিক সহায়তা গ্রহণ করিয়া, সেই পবিত্র প্রতিভাশালিনী কিরণকুমারী ও আত্মত্যাগ-পরায়ণা, শ্রান্তা, ক্লান্তা, সংসারক্লিষ্টা প্রমদাসুন্দরীর ভক্তিরসে মথিত হইয়া, আবার তথায় "নীলদর্পণে"র অভিনয় কর। আবার "জলধর"-রূপে দেবকুলকে হাসাইয়া, গন্ধর্ব্বলোকে অক্ষয় যশ ও কীর্ত্তি স্থাপিত কর। আমরাও যেন তোমার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, তোমার চরণরেণু মাথায় লইয়া, আবার 'সাহেব' বলিয়া ডাকিয়া, নূতন রঙ্গে—নূতন ভঙ্গে—নূতন নটজীবন আরম্ভ করিতে পারি।"

৩০শে নভেম্বর, ১৯০৭, মিনার্ভায় অমরেন্দ্রনাথ প্রণীত নূতন নাটিকা 'দলিতা-ফণিনী' অভিনীত হয়। স্বাস্থ্য-সঞ্চয় মানসে অমরেন্দ্রনাথ যখন কাশীধামে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে ইহা রচিত হয়। ইহার আখ্যানভাগও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'রমাবাঈ' নামক উপন্যাস হইতে গৃহীত। অমরেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানি যোগেন্দ্রবাবুকেই উৎসর্গ করিয়া, উৎসর্গপত্রে একথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দলিতা ফণিনীর প্রথমাভিনয় রজনীতে ভূমিকাগুলি বণ্টিত হয় এইরূপ :—

বিশ্বনাথ রাও—তারকনাথ পালিত, নরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সোরাবজী—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মোহন—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, রমাবাঈ—কুসুমকুমারী, বিলাসবতী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী), মোহিনী—তিনকড়ি (ছোট)।

দলিতা-ফণিনীর গানগুলি ভাষার পারিপাট্যে, ছন্দের উৎকর্ষে ও সুরের লালিত্যে এত মধুর, যে সেগুলি সহজেই দর্শকের মন অধিকার করে। তৎব্যতীত নাটিকার অভিনয়ও হইত অতি সুন্দর। নরেন্দ্রনাথের অংশে অমরেন্দ্রনাথ যখন বলিতেন, "এ প্রণয় না

কৃতজ্ঞতা', তখন সমুদয় দর্শকবৃন্দের গাত্র পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। এই ভূমিকাতে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেন যে, অন্য কোন অভিনেতা কর্ত্তৃক তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, অমরেন্দ্রনাথের অবর্ত্তমানে মিনার্ভা কর্ত্তৃপক্ষ এ নাটিকার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

মিনার্ভায় যখন মহাসমারোহে দলিতাফণিনীর অভিনয় চলিতেছিল, তখন কোহিনূর থিয়েটারের মালিক শরৎকুমার রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার অসুস্থতার সময়েই থিয়েটারে নানা বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল, এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে দল ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। সংবাদ পাইয়া মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ আবার গিরিশচন্দ্র ও দানিবাবুকে নিজেদের থিয়েটারে আনয়নে চেষ্টিত হন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাহা শুনিয়া বলেন, "হিরো সাজিবার জন্য আপনাদের দুইজন অভিনেতার প্রয়োজন আছে কি? আপনারা যদি দানিকে আনা প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমাকে বিদায় দিন। আমি ও দানি এক থিয়েটারে থাকিলে, শেষে পার্ট লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। সেরূপ দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করা আমি আমার মর্য্যাদা-বহির্ভূত বলিয়া মনে করি। অনর্থক তেমন অবস্থায় আমি পড়িতে চাহি না। চাকুরী করিতে আসিয়াছি বলিয়া মান খোয়াইতে আসি নাই ত!"

কিন্তু মনোমোহনবাবু অমরেন্দ্রনাথকে ছাড়িতে অসম্মত হন। মিনার্ভার সহিত অমরেন্দ্রনাথের পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট ছিল। অমরেন্দ্রনাথ বোনাস্ স্বরূপ প্রাপ্ত ৬০০০৲ প্রত্যর্পণের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেন কিন্তু মনোমোহন বাবু কিছুতেই রাজী হন না। শেষে অমরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া থিয়েটার যাওয়া বন্ধ করেন। তখন মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটকের মহলা চলিতেছিল ও

তাহাতে অমরেন্দ্রনাথের জাহাঙ্গীরের ভূমিকা ছিল। তিনি সে ভূমিকাটী ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, ২৫শে জানুয়ারী দলিতাফণিনীতে 'নরেন্দ্রনাথ' ও মজায় 'হরিহর' অমরেন্দ্রনাথের মিনার্ভায় শেষ অভিনয়।

রঙ্গজগতে অমরেন্দ্রনাথের যে কতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল, তাহা তাঁহার মিনার্ভায় অবস্থিতিকাল হইতেই জানা যায়। তাঁহার প্রতাপে অত বড় শক্তিশালী কোহিনূর ত' পরাজিত হয়ই, উপরন্তু তাঁহার অভাবে ষ্টারের লালবাতি জ্বালিবার উপক্রম হয়। ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'নন্দকুমার' অভিনয় করিয়া, তাঁহারা থিয়েটার খাড়া রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অমরেন্দ্র-নাথের এ শক্তির কথা তৎকালীন মিনার্ভার অন্যতম স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিত্রের পুত্র শ্রীশিশিরকুমার মিত্র প্রকাশিত অমরেন্দ্রনাথের জীবনীতে স্বীকৃত আছে। গ্রন্থকার বলেন, 'অমরেন্দ্রনাথের শক্তি যে কতদূর ছিল, তাহা উপরি লিখিত ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কোহিনূর থিয়েটারের প্রবল আক্রমণ হইতে অমরেন্দ্রনাথ একাই মিনার্ভা থিয়েটারকে খাড়া রাখিয়াছিলেন।" আবার এই অমরেন্দ্রনাথের অভাবে মিনার্ভার অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, দ্বিজেন্দ্রলাল হেন নাট্যকারের 'নূরজাহান' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে ২৫০৲ টাকার বেশী বিক্রয় হইল না, ও এই বিক্রয় কমিতে কমিতে শেষে ৮ম রজনীতে ১৩৬৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইল।

অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা ছাড়িয়াছেন শুনিয়া, ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাঁহার বাটীতে আসিয়া ধর্ণা দেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে এগ্রিমেণ্টের কথা জানান। ইতিমধ্যে মনোমোহন বাবু ও অমরেন্দ্র-নাথ—উভয়েরই এক অন্তরঙ্গ সুহৃদের মধ্যস্থতায় মিনার্ভা বোনাসের

টাকা ফেরৎ পাইলে অমরেন্দ্রনাথকে ছাড়িতে সম্মত হন। তখন ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ সেই টাকা মিনার্ভাকে দিয়া, অমরেন্দ্রনাথকে নিজেদের থিয়েটারে আনেন। তাঁহার ষ্টার পরিত্যাগকালে তাঁহারা ২০০০৲ টাকা দিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু এখন থিয়েটার বাঁচাইবার জন্য তাহার তিনগুণ অর্থ দেওয়া ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর রহিল না। অমরেন্দ্রনাথ কুসুমকুমারীকে লইয়া আবার ষ্টারে ফিরিয়া আসিলেন।

২২শে এপ্রিল, ১৯০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের নাম মিনার্ভার ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সেখানে অবস্থানকালে তিনি নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলি অভিনয় করেন ঃ—

সিরাজদ্দৌলায় সিরাজ, পাণ্ডবগৌরবে ভীম, দুর্গাদাসে দুর্গাদাস, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, ছত্রপতিতে শিবাজী, আলিবাবাতে হুসেন, হিরণ্ময়ীতে পুরন্দর, শিরীফরহাদে ফরহাদ, পৃথ্বীরাজে পৃথ্বীরাজ, হারানিধিতে অঘোর, দলিতাফণিনীতে নরেন্দ্রনাথ, প্রায়শ্চিত্ত বা বহুৎ আচ্ছাতে মিঃ চম্পটী ও মজায় হরিহর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:০:—

পুনরায় ষ্টারে চাকুরী গ্রহণ

(১৯০৮-১১)

"Babu Amarendra Nath Dutt has come to stay with us. Chastened by chastisement from Heaven, we have wiped off our tears, shaken off our lethargy and stand ready for action," বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া, ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল, ১৯০৮ খৃঃ আবার যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও সরলা অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। এবার চন্দ্রশেখর অমৃতলাল বসু, প্রতাপ অমরেন্দ্রনাথ, নবাব উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশ্বাস কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফষ্টর হীরালাল দত্ত, শৈবলিনী কুসুমকুমারী ও দলনী নরীসুন্দরী।

অমরেন্দ্রনাথকে পাইয়া, ষ্টার থিয়েটার বিবিধ পুরাতন ও প্রসিদ্ধ নাটকের পুনরভিনয় আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে ১৬ই মে, ক্ষীরোদ-প্রসাদের প্রতাপাদিত্য ও চোরের উপর বাটপাড়ির অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ ঐদিন অমরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রতাপাদিত্য ও নারাণের অংশে অবতীর্ণ হন। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় তিনি পূর্ব্বেও যেরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছিলেন, এবারও এ নাটকে

তাহার যোগ্য মর্য্যাদা রাখেন। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ অংশটী তাঁহার দ্বারা কিরূপ সুষ্ঠুভাবে অভিনীত হইয়াছিল।

অতঃপর ২০শে জুন, ১৯০৮ খৃঃ, ষ্টারে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'যৎকিঞ্চিৎ' নামক ব্যঙ্গনাট্যের অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ :—

নন্দলাল মিত্র—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমন্ত দত্ত—হীরালাল দত্ত, সুকুমার—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হারু—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, লাবণ্য—বসন্তকুমারী, উষা—কুসুমকুমারী, সুষমা—মৃণালিনী।

সুকুমারের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অসামান্য শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া অমৃতলাল বসু লিখিয়াছিলেন,—"The character of Sukumar as performed by Mr. A. N. Dutt is quite a new creation in parody playing."

২৭শে জুন, রবিবার, অমৃতলাল মিত্র দেহরক্ষা করিলে, সমস্ত নাট্যজগৎ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। তৎপরে ১১ই জুলাই ও ১লা আগষ্ট, রাজসিংহ ও পদ্মিনী নাটকে যথাক্রমে রাজসিংহ ও আলাউদ্দিনের ভূমিকায় নিজস্ব গৌরব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত "কামিনী ও কাঞ্চন" নামক উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করেন ও ২২শে আগষ্ট ষ্টারে তাহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীতে যাঁহারা যে ভূমিকায় নামিয়াছিলেন, আমরা তাহার তালিকা দিলাম :—

প্রতুল—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুল—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, রামপ্রসাদ—মনোমোহন গোস্বামী, মাধব—ননীলাল দত্ত, সিদ্ধেশ্বর—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ—হীরালাল দত্ত, ডাক্তার—রাধাকিশোর কর, তিনকড়ি—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুন্দরী—কুসুমকুমারী, অমিয়া—বসন্তকুমারী, ইত্যাদি।

প্রতুলের অংশে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যান। অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হয়—

"Amarendra Babu has really surpassed himself in the last act of the play, where he leads to exhibit by his looks, gait, voice, and intensity of feeling one of the most difficult phases of a Tragedian's task."

২১শে নভেম্বর, ১৯০৮ খৃঃ, রমেশচন্দ্র দত্তের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "জীবন সন্ধ্যা" অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ষ্টারে অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ :—

তেজসিংহ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্জ্জয়সিংহ—মনোমোহন গোস্বামী, রাণা প্রতাপসিংহ—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, চারণ দেব—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানসিংহ—হীরালাল দত্ত, ফরিদ খাঁ—ধীরেন্দ্রনাথ পালিত, ঐ অনুচর—ঘনশ্যাম দাস, ভীল সর্দ্দার—অক্ষয়কালী কোঙার, গোকুল দাস—ননীলাল দত্ত, চন্দন সিংহ—হেমন্তকুমারী, ডালিয়া—কুসুমকুমারী, পুষ্পকুমারী—বসন্তকুমারী, প্রতাপ মহিষী—মৃণালিনী, চন্দনের মাতা—সরযুবালা।

তেজসিংহরূপে অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনয় করেন, তাহা শুধু অসামান্য নয়, অবিশ্বাস্য। পর পর প্রতুল ও তেজসিংহের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন রসাত্মক দুইটী ভূমিকায় তাঁহার নিখুঁত অভিনয় দেখিয়া, সমস্ত সংবাদপত্র ও দর্শকমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করেন যে তিনি যে কেবল অদ্ভুত রূপদক্ষ সূক্ষ্মকলাজ্ঞানবিশিষ্ট অভিনেতা তাহা নহেন, তিনি রঙ্গজগতে অতুলনীয় ও অপরাজেয়।

জীবন সন্ধ্যার অভিনয়ে ষ্টারের সুনাম এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অমৃতবাজার পত্রিকা (৫ই ডিসেম্বর) লিখিয়াছিলেন,—"It is not too much to say that the Star continues to be

the Star of Calcutta theatres in spite of its recent heavy loss in eminent artists."

যাহারই সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহারই মুখে এ নাটকের অজস্র সুখ্যাতি শুনিয়া, মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় একদিন দলবল সহ জীবনসন্ধ্যা দেখিতে আসেন। রঙ্গগৃহে তিল ধারণের স্থান নাই, তিনি তাঁহার বসিবার আসনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া রয়েল বক্সের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই অভিনয় দেখিতে থাকেন। বোধ হয় ইচ্ছা ছিল যে, এক অঙ্ক দেখিয়াই চলিয়া যাইবেন। কিন্তু অভিনয় দেখিতে দেখিতে তিনি এতদূর তন্ময় হইয়া পড়েন যে, কোথা দিয়া যে পাঁচ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাটিয়া যায়, তাহা তাঁহার খেয়ালও থাকে না। ইহার পর এক আধ রাত্রি নহে, উপর্য্যুপরি সাত রাত্রি তিনি আসিয়া, কখনও দণ্ডায়মান অবস্থায়, কখনও বা বসিয়া, একাধিক্রমে এই নাটকের অভিনয় দেখেন ও শেষ দিন যাইবার সময় অমরেন্দ্রনাথকে বলিয়া যান যে, "এরূপ জমজমাট নাটক বঙ্গীয় নাট্যশালায় অতি অল্পই অভিনীত হইয়াছে। পুরুষের কোরাস গানে যে দর্শকগণ এত মাতিয়া উঠিতে পারেন, ইহা আমি স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।" জীবনসন্ধ্যায় সেরূপ গান দুইখানি ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে, গান শুনিতে শুনিতে দর্শকগণ বস্তুতঃ ক্ষেপিয়া উঠিতেন ও এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন যে কত সময়ে নিজেরাই অভিনেতাদের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিতে সুরু করিয়া দিতেন। গান শেষ হইবামাত্র, পুনঃ পুনঃ "এন্‌কোর" শব্দে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইত। আমরা গান দুইখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মুক্ত প্রাণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বক্ষোরক্ত করিতে দান।
লক্ষ লক্ষ বীর পুত্র বাগ্রচিত্তে আগুয়ান॥

পুত্র কন্যা জননী জায়া,
তুচ্ছ সকলি মিথ্যা মায়া,
ঘোর সমরে ত্যজিব কায়া, রাখিব জন্মভূমির মান।
আর্য্যকীর্ত্তি করিব না কভু শত্রু চরণে বলিদান॥
কিসের মমতা কিসের শঙ্কা,
স্বর্গে বাজিবে বিজয় ডঙ্কা,
উল্কা ছুটিবে শাণিত অসিতে ম্লেচ্ছশোণিত করিতে পান।
জয় জয় জয় ভারত জননী, উচ্চকণ্ঠে উঠিবে তান॥

আজি ঘোর সমর অবসান।
শত্রুশূন্য পুণ্যভূমি কোটীকণ্ঠে উঠিছে তান॥
বিজয় পতাকা দুর্গ উপরে,
'পত পত' উড়ে গৌরব ভরে,
অরাতি গর্ব্ব করিয়া খর্ব্ব, আর্য্য বীর্য্য দীপ্তিমান।
পুষ্প বৃষ্টি স্বর্গ হইতে অপ্সরাগণ গাহিছে গান॥
ভারত ভূমে ভারতবাসী,
শৌর্য্য প্রকাশি রাজ্য শাসি,
সমরক্ষেত্রে হাসি হাসি, করিবে আপন জীবন দান।
বিদেশী চরণে সঁপিবে না কভু গর্ব্ব মান অভিমান॥

অতঃপর ২৫শে ডিসেম্বর, বড়দিন, অমরেন্দ্রনাথের নূতন গীতিনাট্য 'কেয়া মজাদার' প্রথম অভিনীত হয়। সেদিন বিল্বমঙ্গল ও কেয়া মজাদার অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। প্রথমোক্ত নাটকে অমরেন্দ্রনাথ বিল্বমঙ্গল, পাগলিনী নরীসুন্দরী, চিন্তামণি কুসুমকুমারী ও অহল্যা বসন্তকুমারী। কেয়া মজাদারের প্রথমাভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ এই :—

চন্দ্রধ্বজ—রাধাকিশোর কর, প্রদোষ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, লহর—মনোমোহন

গোস্বামী, সত্যসখা—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মায়াবতী—বসন্তকুমারী, কালাপরী—কুসুমকুমারী, লালপরী—মৃণালিনী, নীলপরী—হেমন্তকুমারী, সবুজপরী—বেদানাবালা।

তৎপরে ২৪শে জানুয়ারী, ১৯০৯ খৃঃ রঙ্গাবতীতে দলু সর্দ্দারের অংশ গ্রহণ করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' দ্বিতীয়বার নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাহার প্রথম অভিনয় করান। সে রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

উপেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রমণ—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, রামরাম—ননীলাল দত্ত, লবদা—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কালু সর্দ্দার—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, ভেলো—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা—কুসুমকুমারী, সুভাষিণী—মৃণালিনী, গৃহিণী—কামিনী, কামিনী—বেদানাবালা, হারাণী—হেমন্তকুমারী, কুন্তলা—বসন্তকুমারী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহার পর ১৯শে মে তারিখে অমরেন্দ্রনাথ সাবিত্রীতে সত্যবান্ সাজিবার পর, ষ্টারে ভ্রমর (২২।৫।০৯) ও হরিরাজের (১২।৬।০৯) পুনরভিনয় হয়। শেষোক্ত দিবসে তৎকর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিণত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে'র প্রথম অভিনয় হয় ও তাহাতে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় কমলাকান্ত ও কুসুমকুমারী প্রসন্ন গোয়ালিনী সাজেন। এ সমস্ত নাটকের জনপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২১শে আগষ্ট, মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত 'কর্ম্মফল' প্রথম অভিনীত হয়। প্রধান ভূমিকাগুলির পরিচয় :—

সুকুমার—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধনঞ্জয়—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, নগেন—মনোমোহন গোস্বামী, কালোমাণিক—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, আপেল—কুসুমকুমারী, বিজলী—বসন্তকুমারী।

সুকুমারের অংশে অবতীর্ণ হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ যখন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, "এস ব্রতধারিণি! এস শুদ্ধচারিণি! এস মা জননি! তোমার পদার্পণে আমাদের শান্তিময় কুটীর পবিত্র করবে এস!" বলিতেন, তখনকার সে ছবি আশা করি অদ্যাবধি কোন দর্শক ভোলেন

নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ত্রুটীহীন অভিনয় কৌশলে সমস্ত নাটক-খানিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। পুলিস কর্ত্তৃক ইহার অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করা হইতেই এ নাটক যে কতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

ইহার পর, ২০শে নভেম্বর, ষ্টারে নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত 'কুসুমে কীটে'র অভিনয় হয়। এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে অমরেন্দ্রনাথ কতখানি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

স্তর তাতা—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, কায়রো—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নারোজী—হীরালাল দত্ত, সোরাবজী—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, দাদুয়া—বেদানাবালা, আরডেসর—রাধাকিশোর কর, ব্যাঙ্কো—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, দরিয়া—কুসুমকুমারী, চিত্রা—বসন্তকুমারী, রঙ্গো—হেমন্তকুমারী।

কুসুমে কীট একখানি ত্রয়াঙ্ক নাটিকা, ইহাতে নাটকীয় সৌন্দর্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাই, কিন্তু একমাত্র অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় গুণে ইহা জমিয়া উঠে। নাটিকার ক্ষুদ্রাবয়ববশতঃ, ১১ই ডিসেম্বর হইতে ইহার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত প্রহসন 'কনেবদল' জুড়িয়া দেওয়া হয়। উহাতে অমরেন্দ্রনাথ শ্রীধর সাজেন ও অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ভোলাদাদা, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী শশীনাথ, কুসুম-কুমারী ললিতা, বসন্তকুমারী চন্দ্রা ও রাধারাণী ক্ষেপির অংশ গ্রহণ করেন। কনেবদল বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

ইহার প্রথমাভিনয়ের পরদিন, অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর, অমরেন্দ্র-নাথ চন্দ্রশেখর নাটকে চন্দ্রশেখররূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তখন তাঁহার নামে দর্শকমণ্ডলী পাগল, তিনি যাহাই করেন, তাহাতেই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। তাই এ চরিত্র তিনি বহুবার খুব

সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্রের তুলনা ছিল না।

২৫শে ডিসেম্বর, অমরেন্দ্রনাথের নূতন নাটিকা 'আশা কুহকিনী'র প্রথম অভিনয় হয়। সে দিন যাদুকরীরও অভিনয় ছিল এবং এই গীতি-নাট্যে অমরেন্দ্রনাথ 'অবলা সিং' সাজেন। আবার বড়দিনের আসর মাতাইবার জন্য, তৎপরদিন, ২৬শে ডিসেম্বর, তিনি বাবুতে 'তিনকড়ি মামার' অংশ (অমৃতলাল বসুর ভূমিকা) গ্রহণ করেন। এই দুই ভূমিকাতেই এই তাঁহার প্রথম অভিনয়। আশা কুহকিনীর প্রথম রজনীর পাত্রপাত্রীগণ এই :—

অজয়সিংহ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, আফ্রিদী সর্দ্দার—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, হোসেন আলি—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, মহাবৎ খাঁ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রোহিম শা—হীরালাল দত্ত, মমতাজ—কুসুমকুমারী, জুলিয়া—বসন্তকুমারী, ইত্যাদি।

যতদূর স্মরণ আছে, আশা কুহকিনীর ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে, এ নাটিকাখানি অনায়াসে একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক করা যাইত। কিন্তু অমৃতলাল বসুর অনুরোধে, একাঙ্ক বা দুই অঙ্কের নাটক সাধারণের মনোমত হয় কি না দেখিবার জন্য, ইহা দুই অঙ্কে সমাপ্ত করা হইল। গ্রন্থখানি জাতীয়তামূলক বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ-পুস্তক-তালিকাভুক্ত। সুতরাং আমরা ইহার আলোচনা করিব না। তবে জীবনসন্ধ্যায় জাতীয় সমর সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দর্শনে, অমরেন্দ্রনাথ ইহাতেও "মাতৃভূমি আজি শত্রু করে" শীর্ষক একখানি সমবেত সমর সঙ্গীত সংযোজিত করেন। অভিনয়ের উৎকর্ষে ও সঙ্গীত মাধুর্য্যে—বিশেষতঃ ঐ গানখানির জন্য—আশা কুহকিনী ২।১ রজনীর মধ্যেই দর্শকের মন অধিকারে সমর্থ হয়। অমরেন্দ্রনাথের

অনন্যসুলভ কলাকৌশল ও কুসুমকুমারীর মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়, ইহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ষ্টারে প্রথম নূতন পুস্তক অভিনীত হয়, ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত দশচক্র নামক প্রহসন। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ ঃ—

ফকিরচাঁদ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাখমলাল—হীরালাল দত্ত, ষষ্ঠীচরণ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, চাকর—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হৈমবতী—নরীসুন্দরী, সুবালা—বসন্তকুমারী, মুরলা—কুসুমকুমারী, কামিনী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।

এ সময়ে ষ্টার থিয়েটারের এত পসার প্রতিপত্তি যে, কিছুকাল ধরিয়া কোন নূতন নাটক অভিনয় করিবার প্রয়োজন কেহ অনুভব করেন নাই। পুরাতন নাটকের সাহায্যে আসর মাৎ করিয়া রাখিবার পর, ৬ই আগষ্ট, দুর্গাদাস লাহিড়ীর উপন্যাস হইতে অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিণত 'রাণী ভবানী'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রাত্রির ভূমিকার পরিচয়লিপি ঃ—

রাজা রামকান্ত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবীপ্রসাদ—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, দয়ারাম—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, বেণীভূষণ—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কৃতান্ত—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কীর্ত্তিবাস ও আলিবর্দ্দী—রাধাকিশোর কর, সিরাজদ্দৌলা—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল—হীরালাল দত্ত, সদানন্দ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, রাণী ভবানী—কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী—বসন্তকুমারী, সবিতা—নরীসুন্দরী, কামিনী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী)।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে রাণী ভবানী অভিনীত হয় এবং প্রত্যেক অভিনেতাই স্বীয় ভূমিকার মর্য্যাদানুযায়ী অভিনয় করেন। তন্মধ্যে দয়ারামের ভূমিকায় কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তীর অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর রামকান্তের অংশে অমরেন্দ্রনাথ যে অবর্ণনীয় চিত্র দর্শকসমক্ষে উপস্থাপিত করেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তেমন উচ্চস্তরের অভিনয় অন্য কোন অভিনেতার নিকট হইতে আশা করাও বাতুলতা মাত্র।

অতঃপর, ১১ই সেপ্টেম্বর, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'গুরুঠাকুর' অভিনয়ের পর, ২৭শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবারে ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথের 'বেনিফিট নাইট' হয়। অভিনয়ের আয়োজন হয়,—প্রফুল্ল, বিবাহবিভ্রাট ও নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী। এই রজনীতে তিনকড়ি দাসী জ্ঞানদার অংশে অবতীর্ণ হন ও অমরেন্দ্রনাথ প্রফুল্লে যোগেশ ও বিবাহবিভ্রাটে ঘটকরূপে দর্শকদিগের সবিশেষ মনোরঞ্জন করেন।

তৎপরে অমরেন্দ্রনাথ ১২ই নভেম্বর বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ, ১৬ই নভেম্বর সরলায় গদাধর, ৩রা ডিসেম্বর রাজাবাহাদুরে কালাচাঁদ ও বেল্লিকবাজারে পুঁটিরাম সাজেন। সমস্ত ভূমিকাগুলিতে এই তাঁহার প্রথম অভিনয়। নগেন্দ্রনাথের ভূমিকায় যে দৃশ্যে তিনি প্রথম সূর্য্যমুখীকে কুন্দের প্রতি আসক্তি জানাইয়া বলেন,—"মনে মনে ভেবো তুমি বিধবা। * * আমি অন্যাগত প্রাণ হয়েছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলবো ; এখন আমি দেশত্যাগ করে চল্লাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলতে পারি, তবে আবার আসবো, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ।" সে দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীরূপী নরীসুন্দরীর অভিনয় দেখিয়া এমন দর্শক ছিল না, যে না ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। আবার প্রদোষে বাপীতটে বিহ্বল কুন্দের মুখে শুধু 'না' শুনিয়া, নগেন্দ্ররূপী অমরেন্দ্রনাথ যে চিত্তবিভ্রমকারী অভিনয় করিতেন, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তেমন অভিনয় ক্বচিৎ দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের নায়করূপে অমরেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। বঙ্কিমের এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহার প্রধান চরিত্র লইয়া তিনি অসামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় না দিয়াছেন। ভ্রমরে গোবিন্দলাল, কপালকুণ্ডলায় নবকুমার, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ, মৃণালিনীতে হেমচন্দ্র, সীতারামে সীতারাম, দেবী চৌধুরাণীতে ব্রজেশ্বর, আনন্দমঠে জীবানন্দ, রাজসিংহে রাজসিংহ, ইন্দিরায় উপেন্দ্রনাথ, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র,

হিরণ্ময়ীতে পুরন্দর—প্রত্যেক ভূমিকাতেই তিনি যে অভিনয় করিয়াছেন, অন্য কোন অভিনেতা তাহার নাগাল পর্য্যন্ত পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের নায়করূপে অভিনয় সম্বন্ধে রঙ্গজগতে প্রচলিত জনপ্রবাদের কথা আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি। তাহা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে অমরেন্দ্রনাথের শিল্প-চাতুর্য্যকে যে কোন শ্রেণীতে ফেলা উচিত, তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম।

১০ই ডিসেম্বর ষ্টারে হরনাথ বসু প্রণীত 'বেহুলা'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

চন্দ্রধর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, লখিন্দর—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, নেড়া—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, আস্তিক—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, বেহুলা—বসন্তকুমারী, মণিভদ্রা—নরীসুন্দরী, বিন্দি—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), মনসা—পান্নারাণী, সনকা—মৃণালিনী।

'বেহুলা' অভিনয় দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন যে, "এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ আমি অতি অল্পই পড়িয়াছি। আমার মতে ইহা গিরিশচন্দ্রের শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট নাটক।" সুতরাং সেই নাটকের কিরূপ অভিনয় হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। মাত্র একটা কথার উল্লেখ করিব ;—অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়া 'বঙ্গবাসী' লিখিয়াছিলেন, এ নাটকের নাম বেহুলা না রাখিয়া চন্দ্রধর রাখা উচিত ছিল।

১৯১১ খৃঃ নববর্ষের সূচনায়, ৮ই জানুয়ারীতে 'বেল্লিকবাজারে' দোকড়ি দালালের অংশে অবতীর্ণ হইবার পর, ২২শে জানুয়ারী, 'রাণী ভবানী'তে রাজা রামকান্তের ভূমিকা অভিনয় করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দেন। ষ্টারে অবস্থানকালে তাঁহার আর একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয়—হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায়। অমৃতলাল মিত্র এই অংশ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথও শ্মশানদৃশ্যে যে চমকপ্রদ অভিনয় করিতেন, তাহা নগণ্য নহে। পত্নীপুত্রহারা হরিশ্চন্দ্র-

রূপী অমরেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎপ্রকাশের ফলে অকস্মাৎ শৈব্যাকে চিনিতে পারিয়া যখন বলিতেন, "কি কি কি এ! না! না! আর একবার! আর একবার দেখি! ভগবান্! আর একবার! ইহলোকে আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমার পরলোক নাও, একটী বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও; তার পর যা ভেবেছি—যদি তাই হয়, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত কর।" তখন দর্শকগণ চক্ষের সম্মুখে দেখিতেন, হরিশ্চন্দ্রের কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, দেখিতে দেখিতে কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কণ্ঠস্বর আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। যাঁহারা সে অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অপূর্ব্বতা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—আর যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আপশোষ রাখিবার আর স্থান নাই।

অমরেন্দ্রনাথ যখন বিবিধ ভূমিকায় এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করিয়া আবার নাট্যজগতের শীর্ষদেশে উপনীত হইয়াছেন, তখন দানিবাবুও মিনার্ভায় অদ্ভুত অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছিলেন। তন্মধ্যে শাস্তি কি শান্তিতে প্রসন্নকুমার, মেবারপতনে অমরসিংহ, সাজাহানে ঔরংজেব, শঙ্করাচার্য্যে শঙ্কর ও রাজা অশোকে অশোক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শঙ্করের ভূমিকাভিনয় সম্বন্ধে তিনি একদিন অমরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—"আমি আর কি অভিনয় করেছি আর কি-ই বা কৃতিত্ব দেখিয়েছি? বাপি আমাকে যা করে শিখিয়েছিল, যদি কেউ সে শিক্ষা রাস্তার ধার থেকে দাঁড়িয়ে শুনতো, তা হলে সেও একজন বড় অভিনেতা হয়ে যেত।" সে যাহা হউক, ১২ই জানুয়ারী, ১৯১১ খৃঃ, বৃহস্পতিবার, তাঁহার বেনিফিট নাইট উপলক্ষে বিল্বমঙ্গল ও পাণ্ডবগৌরব অভিনয়ের আয়োজন হয়। দানিবাবুর অনুরোধে অমরেন্দ্রনাথ সে দিন মিনার্ভায় গিয়া, সাধক ও ভীমের ভূমিকা অভিনয় করিয়া

দিয়া আসেন। তাঁহাদের দুইজনের মত স্বনামপ্রসিদ্ধ নট মাত্র একরাত্রির জন্য একসঙ্গে অভিনয় করিতেছেন, সুতরাং আসনের মূল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও কিরূপ ভিড় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আর অমরেন্দ্রনাথও সেদিন যে অভিনয়-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা হইতে দর্শকমাত্রেরই বুঝিতে বাকী ছিল না যে, নাট্যজগতে তদানীন্তন সম্রাট্ কে? বস্তুতঃ সাধকের অংশে তিনি যে অপূর্ব্ব হাস্যরসের সৃষ্টি করিলেন, তাহা দেখিয়া দর্শকগণের হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিয়া চক্ষু হইতে অনর্গল জল পড়িতে লাগিল,—কত দৃশ্যে তাঁহার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পূর্ব্বেই, উইংসের পার্শ্ব হইতে মাত্র তাঁহার উঁকি মারা দেখিয়া, প্রেক্ষাগৃহে এক তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। ভীমের অংশে তাঁহার অভিনয় চাতুর্য্যের পুনরুল্লেখ করিব না;—তবে এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, এইদিনকার অভিনয়ে তাঁহার ভীম ও দানিবাবুর ভীষ্ম দেখিয়া দর্শকগণের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলে, দানিবাবু, নাম খারাপ হওয়ার ভয়ে, গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি ভাণ্ডার সাহায্য কল্পে, উত্তরকালে কোহিনূর থিয়েটারে যে অভিনয় আয়োজন হয়, তাহাতে ভীষ্মরূপে নিজের নাম বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও, দুলালচাঁদরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও, ভীষ্ম সাজেন নাই।

ষ্টার থিয়েটারে অবস্থানকালে অমরেন্দ্রনাথ আরও একটী স্মরণীয় কীর্ত্তি করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাধ্য হইয়া 'রঙ্গালয়' তুলিয়া দেওয়ার পর হইতেই, অমরেন্দ্রনাথ সে ধরণের একখানি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। তাই, তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে, বঙ্গীয় নাট্যশালা সমূহের একমাত্র মুখপত্র স্বরূপ 'নাট্যমন্দির' নামে একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। স্বয়ং অমরেন্দ্র-

নাথ ইহার সম্পাদক ছিলেন ও গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন গোস্বামী, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকারগণ ও কতিপয় বিখ্যাত সাহিত্যরথী নিয়মিতরূপে ইহাতে লিখিতেন; এবং ইহাতেও বিখ্যাত অভিনেতৃবর্গের নানারূপ অভিনয়ভঙ্গীর ছবি বাহির হইত। এইরূপ রচনা ও চিত্রসম্ভারে সুশোভিত হইয়া, ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসে, নাট্যমন্দিরের প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, অচিরে প্রথম দুই সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইবার প্রয়োজন হয়। এই মাসিকপত্র যে শুধু বঙ্গদেশে চাঞ্চল্য আনয়ন করে, তাহা নহে। সুদূর প্রতীচ্যে বসিয়া, দেশগৌরব বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও সে তরঙ্গের মৃদুকম্পন অনুভব করিয়াছিলেন। ২৬শে আগষ্ট, ১৯১০ খৃঃ তিনি লণ্ডন হইতে অমরেন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন:—"সংবাদপত্রে দেখিলাম, আপনারা নাট্যকলা সম্বন্ধে একখানা বিশেষ মাসিকপত্র প্রকাশিত করিতেছেন। এখানকার নাট্যকলার সমালোচনা করিয়া, প্রতি মাসে এক একটী প্রবন্ধ, যদি ইচ্ছা করেন, আমি পাঠাইবার ভার লইতে পারি", ইত্যাদি।

১৯১১ খৃঃ ১লা জানুয়ারী হইতে শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যমন্দিরের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে "রঙ্গমঞ্চ" নামে একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদনাভার লইয়া তাহা চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নাট্যমন্দিরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমর্থ না হওয়াতে, মাত্র কয়েকসংখ্যা বাহির হইয়া তাহা উঠিয়া যায়। তখন তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মারফৎ অমরেন্দ্রনাথকে জানান যে, তিনি

নাট্যমন্দিরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক। অমরেন্দ্রনাথ বিবেচনা করিয়া দেখেন যে তিনি যেরূপ নানাকার্য্যে ব্যস্ত, তাহাতে নাট্যমন্দিরের ন্যায় একখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় গুরুতর দায়িত্ব যথাযথ বহন করিতে হইলে, একজন সুযোগ্য সহকারীর আবশ্যক। তাই তিনি মণিবাবুকে আনাইয়া সযত্নে ও সাগ্রহে তাঁহার উপর সহকারী সম্পাদকের ভার অর্পণ করেন। ১৩১৭ মাঘ হইতে মণিবাবুর নাম সহকারী সম্পাদক-রূপে মুদ্রিত হইতে থাকে। অমরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ' ধারাবাহিকরূপে নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন বৎসরাধিক কাল নিজ সম্পাদনায় 'নাট্যমন্দির' সগৌরবে চালাইয়া, অমরেন্দ্রনাথ নিজের থিয়েটারের কার্য্যাধিক্য ও স্বাস্থ্য-হীনতাবশতঃ ইহার সম্পাদনা ছাড়িয়া দেন। পরিত্যাগকালে তিনি যে নিবেদনপত্র নাট্যমন্দিরে ছাপাইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"হে নাট্যামোদী সদাশয় সাহিত্যসেবী গ্রাহক !

যাহারা দশের অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহাদের কষ্টের কথা বোধ হয় আমাকে আর বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে সমস্ত রজনী জাগরণ করিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিমাণে অর্থব্যয়ও আছে ; ব্যয়াধিক্যপ্রযুক্ত এই নিদ্রা-নিমীলিত-প্রায় আঁখি দিবাভাগেও আবার স্বভাবতঃ সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, মুক্তি নাই। এতদ্বিধায়, এবং আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শনের বলবতী ইচ্ছাবেগ, যে সকল কর্ম্মচারীর হস্তে নাট্যমন্দিরের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল, আমার আত্মার স্বরূপ গ্রাহকমণ্ডলীর পত্রমর্ম্ম মত, তাহাদের সেই প্রমাণিত কার্য্যকরী শক্তির প্রভাবে প্রত্যাহত হওয়ায়, ১৩২০ সালের আশ্বিনের ও

কার্ত্তিকের সংখ্যা প্রকাশিত করিয়া আমি সম্পাদকীয় দায়িত্বভার পরিত্যাগ করিয়াছি ; তবে এ বৎসরের 'নাট্যমন্দির' গ্রাহকবর্গ যাহাতে মাসে মাসে প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমার অনুজসমান স্নেহভাজন শ্রীমান্ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি ; অতঃপর তিনিই 'নাট্যমন্দিরে'র উপর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিবেন, তাহাও জানিবেন। অগ্রহায়ণের সংখ্যায় ভ্রমক্রমে আমার নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া, সহৃদয় গ্রাহকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অদ্য ইহা বিজ্ঞাপিত হইল।

"যদি সময় পাই, রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে মনোমন্দিরে যে চির-আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, নিত্য নবশিক্ষালাভের দূরদর্শিতা ফলে যাহাতে তাহা ফলবতী হয়, কালে যদি সেই শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি, শৃঙ্খলা সংরক্ষণে সমর্থ হই ; আবার এই রূপে, সম্পাদক স্বরূপে, নবপ্রীতি উপহার হস্তে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব ; বিদায়—বিদায় !"

অমরেন্দ্রনাথের নিঃস্বার্থপরতায়, বিনামূল্যে নাট্যমন্দিরের স্বত্ব ও তাহার উপহার পুস্তকাবলী পাইয়াও, মণিবাবু ভাল করিয়া পত্রিকা চালাইতে সমর্থ হইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ যখন 'রঙ্গালয়' প্রকাশিত করেন, তখন তাহার জন্য, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর বিজয়েন্দ্রনাথের নামের স্মৃতিরক্ষা উদ্দেশ্যে 'বিজু প্রেস' নামে এক প্রেসও স্থাপন করিয়াছিলেন। এবার নাট্যমন্দিরের সময়েও 'রামকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্' নামে অভিহিত করিয়া, আর একটী ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। মণি বাবু ঠিকমত 'নাট্যমন্দির' প্রকাশে অসমর্থ দেখিয়া, তাঁহার সাগ্রহ প্রার্থনামাত্র অমরেন্দ্রনাথ বিনা অর্থে, একরূপ বিনা মূল্যে (মাত্র তিন খানি পুস্তকের কপিরাইট স্বত্বের বিনিময়ে) এই ছাপাখানাটী তাঁহাকে

প্রদান করেন। কিন্তু তৎসত্বেও, মণিবাবু অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পর পর্য্যন্ত অনিয়মিতভাবে কোন রকমে 'নাট্যমন্দির' রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আশা করি, উপরোক্ত প্রসঙ্গ হইতে পাঠকবর্গ—অমরেন্দ্রনাথ কিরূপভাবে লোককে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেন এবং বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি কিরূপ অমানুষিক স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন,—তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাইলেন।

এইবার আমরা অমরেন্দ্রনাথের ষ্টার পরিত্যাগ করার কারণ বিবৃত করিব। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মিনার্ভা ছাড়িয়া ষ্টারে আসিলেন, তখন অমৃতলাল মিত্র মৃত্যু শয্যায়। তিনি ষ্টার থিয়েটারকে কতখানি ভালবাসিতেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অমৃতলাল ষ্টারকে বাঁচাইবার জন্য ও অমরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত শক্তি দর্শনে তাঁহাকে স্থায়ীভাবে ষ্টারে রাখিবার জন্য, এই প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার অংশে স্বত্ববান্ হইবেন, অর্থাৎ ষ্টার থিয়েটারের এক-চতুর্থাংশের মালিক হইবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার ফলেই অমরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ষ্টারে আসেন ও আপ্রাণ চেষ্টায় তাহাকে আবার রঙ্গজগতের শীর্ষদেশে টানিয়া তোলেন। অমৃতলাল মিত্রের মৃত্যুর পর, যখনই প্রস্তাবমত অংশ দিবার কথা উঠে, তখনই ষ্টারের বাকী তিন জন স্বত্বাধিকারী স্তোকবাক্যে অমরেন্দ্রনাথকে ভুলাইয়া রাখেন এবং তাঁহার পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও, তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য অংশে স্বত্ববান্ করিতে ইতস্ততঃ করেন। এইরূপে প্রায় আড়াই বছর কাটিয়া যায়। ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষদের কোনরকম উচ্চবাচ্য না দেখিয়া, শেষে অমরেন্দ্রনাথ স্পষ্টাস্পষ্টি বলেন যে, যদি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাকা লেখাপড়া করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিমত বখরা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি

থিয়েটার ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু তখন পুনরায় সুদিন আসায়, ষ্টারের স্বত্বাধিকারীগণ খুব গরম ; তাই অমরেন্দ্রনাথের কথা তাঁহারা কানেও তোলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি ২২শে জানুয়ারী ষ্টার ছাড়িয়া দেন। ষ্টার কর্তৃপক্ষ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহার নাম অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত করিয়া, তাহার পর হইতে সেরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন।

ষ্টারে অবস্থানকালে অমরেন্দ্রনাথ যে সকল ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম :—

চন্দ্রশেখরে প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর, সরলায় বিধুভূষণ ও গদাধর, তরুবালায় অখিল, প্রফুল্লে ভজহরি ও যোগেশ, প্রতাপাদিত্যে রডা ও প্রতাপাদিত্য, নল দময়ন্তীতে নল, বাবুতে ফটিকচাঁদ ও তিনকড়ি মামা, পদ্মিনীতে লক্ষ্মণসিংহ ও আলাউদ্দিন, বিজয়-বসন্তে বলবন্ত, ফটিকজলে প্রভাত, নীলদর্পণে নবীনমাধব, চোরের উপর বাটপাড়িতে নারান, নসীরামে অনাথনাথ, যৎকিঞ্চিতে সুকুমার, রাজসিংহে রাজসিংহ, কামিনী ও কাঞ্চনে প্রতুল, বুদ্ধদেবে বুদ্ধদেব, জীবনসন্ধ্যায় তেজসিংহ, বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গল ও সাধক, কেয়ামতাদারে প্রদোষ, রঞ্জাবতীতে দলু সর্দ্দার, ইন্দিরাতে উপেন্দ্র, সাবিত্রীতে সত্যবান্, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, হরিরাজে হরিরাজ, কর্ম্মফলে সুকুমার, হরিশ্চন্দ্রে হরিশ্চন্দ্র, কুসুমে কীটে কায়রো, কনে বদলে শ্রীধর, আশা কুহকিনীতে অজয়সিংহ, যাদুকরীতে অবলা সিং, দশচক্রে ফটিকচাঁদ, শিবরাত্রিতে ব্যাধ, দক্ষযজ্ঞে মহাদেব, চৈতন্যলীলায় মাধাই, হারানিধিতে অঘোর, রাণীভবানীতে রামকান্ত, বিবাহ বিভ্রাটে ঘটক, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র, রাজাবাহাদুরে কালাচাঁদ, বেল্লিকবাজারে পুঁটিরাম ও দোকড়ি, বেহুলাতে চন্দ্রধর এবং পাণ্ডব গৌরবে ভীম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:০:—

গ্রেট ন্যাশানালের প্রতিষ্ঠা

(১৯১১)

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'ন্যাশানালে অমরেন্দ্রনাথ' বলিয়া এক প্ল্যাকার্ড দেখিয়া কলিকাতাবাসী পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইল। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ন্যাশানালে যোগ দিলেন না। তিনি বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী বিখ্যাত জমিদার অনাথনাথ দেবকে দিয়া, পুরাতন বেঙ্গল ষ্টেজ ভাঙ্গাইয়া, এক নূতন থিয়েটার বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন ও সেখানে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপিত করিয়া ১৭ই জুন হইতে অভিনয় আরম্ভ করিলেন। উদ্বোধনের দিন অমরেন্দ্রনাথ রচিত দুইখানি পুস্তক—'জীবনে মরণে' নামক গীতিনাট্য ও 'আহা মরি' নামক প্রহসন—একসঙ্গে অভিনীত হইল। আমরা নিম্নে প্রথমাভিনয় রজনী। ভূমিকার পরিচয়লিপি দিলাম :—

জীবনে মরণে :—সাহজেনান—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাহের—সুশীলাবালা, রহমৎআলি—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলনাশা—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, মেসরু—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, জুলিয়া—বসন্তকুমারী, আমিনা—রাণীসুন্দরী, রঙ্গিলা—চারুবালা।

আহা মরি :—কামিনীবান্ধব—মনোমোহন গোস্বামী, হলধর—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, কেদার—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মোহিনা—বসন্তকুমারী, বিদ্যুৎবরণী—পুঁটুরাণী, চমৎকার—ভূষণকুমারী, পদ্মমুখী—পান্নারাণী, রোসি—কোহিনুরবালা।

মধ্য যৌবনে অমরেন্দ্রনাথ।

'জীবনে মরণে' সম্বন্ধে বঙ্গবাসী (৬ই শ্রাবণ, ১৩১৮) লিখিয়া-ছেন :—

"নাট্যকবি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এখন কলিকাতার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। তিনি এ থিয়েটারের ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটার। তাঁহার উদ্যোগে, অর্থে, যত্নে, শ্রমে ও অধ্যবসায়ে থিয়েটারের নূতন সংগঠন হইয়াছে। এ সংগঠনে থিয়েটার নূতন জীবন পাইয়াছে।

"অমরেন্দ্রনাথের অসাধারণ শক্তি। এক দিকে সুষ্ঠু নাট্য-রচনা, অন্যদিকে অভিনয়ের গুণপণা; ইহার উপর আবার নাট্যমন্দিরের উন্নোৎকর্ষের গবেষণা। সাহিত্যের একটী কান্ত-কলার সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যসাধনে সকল দিকের সাধনা-শক্তি একাধারে অসাধারণ নহে কি?

"আজ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে "জীবনে মরণে" নামক একখানি নূতন নাটিকার অভিনয় হইতেছে। এ নাটিকা-খানি অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত। একটী ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্রমাত্রে নাট্যপারিজাতের পরিমলময় মালা। ইতিহাসের কাষ্ঠ-কাঠামোতে অপূর্ব্ব রত্নময়ী প্রতিমা।

"মোগল সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র সা সুজার পরিণাম-তথ্য ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সা সুজা আরাকানরাজ কর্ত্তৃক হত হন। তাঁহার তিনটী কন্যার মধ্যে দুইটী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া পড়েন। একটীকে তাঁহার অনিচ্ছায় আরাকানরাজ বিবাহ করেন; কিন্তু বিবাহিত হইবার কিছুদিন পরে সে কন্যাটীর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

"ইতিহাসের এইটুকুমাত্র তথ্য লইয়া, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'দালিয়া' নামক একটী গল্প রচনা করেন। সে গল্পে কবি-কল্পনার সৌন্দর্য্যের স্পষ্টরাগ দেখিতে পাই। কবির গল্পে চরিত্রের চারুতায় কবি-কৃতিত্বের পরিচয় প্রস্ফুটিত। সা-সুজার দুই কন্যা জুলিয়া ও আমিনা পিতার মৃত্যুর পর একটী বৃদ্ধ ধীবর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। যে আরাকানরাজ সা-সুজাকে হত্যা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি 'দালিয়া' নাম ধারণ করিয়া ছদ্ম-বেশে ধীবরগৃহে যাতায়াত করিতেন। আমিনা ও জুলিয়ার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। এ আলাপ পরিচয়ের শেষ পরিণতি প্রেম। শেষে রাজা আমিনা ও জুলিয়াকে নিজ প্রাসাদে লইয়া যান। আমিনা ও জুলিয়াকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের এই ভাব। গল্পটী ছোটখাট ; বিষয়চরিত্র বিস্তৃত নহে ; কিন্তু কাব্যমাধুর্য্যে এ গল্পের পরিপুষ্টিতে পাঠকমাত্রেরই পরিপুষ্টি।

"অমরেন্দ্রনাথের রচিত নাটিকার ভিত্তি রবীন্দ্রনাথের গল্পটী। নাটকের নায়ক,—আরাকানের সম্রাট্ সাহজেনান। নায়িকা,—সেই জুলিয়া ও আমিনা। জুলিয়া সা-সুজার জ্যেষ্ঠা ও আমিনা কনিষ্ঠা কন্যা। তাহের আরাকানরাজের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ। রঙ্গিলা আরাকান সম্রাটের প্রধানা বাঁদি ; পরন্তু সে সম্রাটের নিত্যবিশ্বস্তা। বাঁদি বটে, কিন্তু সে তাহেরের ন্যায় সম্রাটের মৈত্র-সম্পদের সৌভাগ্যশালিনী। এ চরিত্র দুইটী রবীন্দ্রনাথের গল্পে নাই। ইহা অমরেন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রসূত অনিন্দ্যসুন্দর যথাযোগ্য-আলোকচ্ছায়াঙ্কিত দিব্য চিত্র। বৃদ্ধ ধীবরপুত্র —সেও এক চরিত্র,—সৌন্দর্য্যের নিপুণ নিদর্শন।

"আমিনা বৃদ্ধ ধীবর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। আমিনার উপর ধীবরের পূর্ণ অপত্যবাৎসল্য ; আবার ধীবরের প্রতি আমিনার পূর্ণ পিতৃভক্তি। আমিনা রমণীয় কমনীয়। সে কমকান্তি আমিনা ;

কমকণ্ঠে ভক্তিভরে ধীবরকে বলিলেন,—“বাবা” ; আর বৃদ্ধ ধীবর গদগদ কণ্ঠে আমিনাকে বলিলেন,—“মা” : অভিনয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন বিশ্বব্যোম ভক্তিবাৎসল্যের গঙ্গা-মন্দাকিনীধারায় ভরিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ‘দালিয়া’ গল্পে যে আমিনাকে দেখি, অমরেন্দ্রনাথের ‘জীবনে মরণে’ নাটকে সে আমিনা দেখিলাম না। রবীন্দ্রের আমিনা ধীবরকে ডাকে, “বুড্ঢা” বলিয়া ; আর অমরেন্দ্র-নাথের আমিনা ডাকে ‘বাবা’ বলিয়া। রবীন্দ্রের আমিনা যেন মহাভারত-পদ্মপুরাণের শকুন্তলা, অমরেন্দ্রের আমিনা যেন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের শকুন্তলা। মহাভারত পুরাণের শকুন্তলা দুষ্মন্তকে মুখ ফুটিয়া আত্মপুত্রের ভবিষ্যৎ রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা জানাইয়াছিলেন ; অভিজ্ঞানশকুন্তলের শকুন্তলা কিন্তু তাহা পারেন নাই। অমরেন্দ্রের আমিনা মূর্ত্তিমতী মধুরিমা।

“সা সুজার জ্যেষ্ঠা কন্যা জুলিয়া কোনক্রমে ধীবরালয়ে আমিনার সহিত মিলিত হন। ইহার পূর্ব্বে আরাকান সম্রাট ‘দালিয়া’ নামে ছদ্ম-বেশে ধীবরালয়ে যাতায়াত করিতেন। ফলে আমিনা ও দালিয়ার প্রাণে প্রাণে প্রেম প্রবাহ ছুটে। প্রেমের অনন্ত প্রবাহ বটে ; কিন্তু অন্তঃসলিলা। আমিনা জানিতেন না, দালিয়া আরাকান সম্রাট্। সে প্রেমের বিকাশ নিশ্চিতই কবির কল্পনা-কৃতিত্বের চরম পরিচয়-স্থল।

“জুলিয়া ধীবরালয়ে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জুলিয়ার সহিত দালিয়ারও পরিচয় হয়। সে পরিচয়ের শেষ পরিণতিও প্রেম। জুলিয়া আমিনার প্রেমের অংশিনী। সে প্রেমের অংশ বিদ্বেষের সীমাবহির্ভূত। প্রেম বটে ; সেও অন্তঃসলিলা। জুলিয়া অবশ্য জানিতেন না যে, দালিয়া ছদ্মবেশী আরাকান সম্রাট্ ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রতিহিংসাপূর্ণ। তিনি চাহেন, শাণিত ছুরিকায় পিতৃশত্রু আরাকান-

সম্রাটের বক্ষ বিদারণ করিতে। দালিয়ার কাছে অবশ্য এ রহস্যবাণী অপ্রকটিত হয় নাই। দালিয়া বুঝিতেন, প্রেমের কাছে প্রতিহিংসার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ ভাবের নীরব অভিব্যক্তি নাটকে; পরন্তু অভিনয়ে সুন্দর ফুটিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা বুঝাইয়া লেখা দুঃসাধ্য।

"আরাকান সম্রাট্ জানিতেন না, আমিনা ও জুলিয়া সা সুজার কন্যা। সা সুজার রহমৎ নামে এক পুরাতন কর্ম্মচারী সম্রাট্‌কে সা সুজার কন্যাদ্বয়ের সন্ধান লইবার প্রার্থনা জানায়। সম্রাট্‌বন্ধু তাহের সন্ধান করিয়া জানিয়া আসেন, ধীবরকুটীরবাসিনী আমিনা ও জুলিয়া সা সুজার কন্যা। বন্ধুর মুখে প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সম্রাট্ আমিনা ও জুলিয়াকে প্রাসাদে লইয়া আসেন। তিনি উভয়ের পাণিগ্রহণ করেন। প্রেমে ও পরিণয়ে জুলিয়ার প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হয়। জুলিয়া ভানুকরোদ্দীপ্তা; আর আমিনা শশি-রশ্মি-উদ্ভাসিতা। জুলিয়া সম্রাটের রাজ্যশাসন-ভাগিনী; আমিনা নবাবের প্রমোদ-প্রমুদিনী।

"তাহের আদর্শ বান্ধবের চরিত্র-চিত্র। ধীবরকুটীরে আমিনা ও জুলিয়ার সহিত সম্রাটের যে প্রেম সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; সম্রাট্ প্রথমতঃ বিশ্বস্ত বন্ধু তাহেরকেও তাহা জানিতে দেন নাই; কিন্তু চির-রসিক, চির-চতুর তাহের সে তথ্য না জানিলেও সম্রাটের হৃদয়ে যে অন্তঃসলিলা প্রেম-প্রবাহিণী বহিতেছে, তাহা সে বুঝিয়াছিল। শেষে সম্রাট্ সকল কথাই খুলিয়া বলেন। এইখানে সেক্সপিয়ারের রোমিও-বন্ধু বেনভোলিওর ছবি ফুটে; আর তাহারই ধ্বনি "of love" যেন তাহেরের বাণীতে "প্রেমে"র প্রতিধ্বনি তুলে। যেমন তাহের, তেমনি রঙ্গিলা। উভয়ের কাছে সম্রাটের কিছু গোপন ছিল না। তাহের রঙ্গিলাকে ভালবাসিত, রঙ্গিলাও তাহেরকে ভালবাসিত; কিন্তু কেহ কাহারও কাছে মুখ ফুটিত না। এই প্রেম-গভীরতায়

রঙ্গ-রসের মাধুর্য্যে কবি অফুটন্তকে যেমন ফুটন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সত্য সত্য তেমনটী বাঙ্গালা কাব্যে বিরল। এইখানে কবির কল্পনা প্রেমানন্দের কি তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছেন, তাহা কি বুঝাইব? তাহের প্রেমিক, রসিক; তাহের বিশ্বাসী কর্ম্মী বন্ধু; তাহের গাম্ভীর্য্যে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, রস-রহস্যে অমরেন্দ্রের চরিত্র-কীর্ত্তি-মেখলা। রঙ্গিলা সম্বন্ধে অন্য কথা বলিবার নহে।

"ধীবরপুত্র সারল্যের সাকার চিত্র। সারল্যে কাম-লালসার চিত্র অপূর্ব্ব। আমিনা জুলিয়া ঘনিষ্ঠতায় তাহাকে দাতৃভাবে দেখিত; সে কিন্তু অবোধ,—লালসায় সম্বন্ধের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। ধীবর এবং আমিনা ও জুলিয়ার ধমক খাইয়াও সে সারল্যে লালসার আভাস-বিকাশ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সারল্যের সঙ্গে লালসার ভঙ্গী নাটিকায় বিচিত্র রসে উদ্ভাসিত। ধীবরপুত্র গৃহে যেমন সরল, সম্রাটের দরবারেও তেমনই সরল।

"বুঝিলে পাঠক ইতিহাসের কাঠের ঠাটে কি রত্নময়ী প্রতিমা! সেক্সপিয়ারের সহিত অবশ্য রবীন্দ্র-অমরেন্দ্রে তুলনা করিতেছি না; কিন্তু সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে একদিন ল্যাণ্ডোর যা বলিয়াছিলেন, এখানে রবীন্দ্র-অমরেন্দ্র সম্বন্ধে তাহা কি বলা যায় না? ল্যাণ্ডোর বলিয়াছিলেন,—"He was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life."

"সেক্সপিয়ার রচিত নাটকের যাহা মূল, তাহা অপেক্ষা সেক্সপিয়ারের রচনা অধিকতর মৌলিক। সেক্সপিয়ার মৃতদেহে যে শ্বাসপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করিয়াছিলেন। ইংরাজ লেখক "স" সাহেব বলিয়াছিলেন,—"অতি অপরিচ্ছন্ন খনিজ স্বর্ণখণ্ড হইতে সুন্দর সুষমাসম্পন্ন নানাকৃতিশালী অলঙ্কার

গঠিত হয় ; এবং মালিন্যময় আদর্শ হইতে অসীম সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।"

"পাঠক, 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে' 'জীবনে মরণে' নাটিকার অভিনয় দেখিলে এ কথার সার্থকতা অনুভব করিবেন। আমাদের একটা কথা বলিবার আছে ; ধীবরের যেমন মহান্, উন্নত, উচ্চ উদার চরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাতে জুলিয়ার নিকট হইতে টাকা লইয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার স্বীকারবাণী সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না।

"আমরা জীবনে মরণে নাটিকার অভিনয় দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। নাটকে দুইটি মাত্র অঙ্ক আছে ; কিন্তু এই দুইটী অঙ্ক ষড়রসে পূর্ণ। নাটিকার আদ্যন্তে প্রেমকাহিনী ; কিন্তু পীড়িত পীড়ার ধক্‌ধকানি কট্‌কটানি নাই। প্রেম আছে, পঙ্কিলতা নাই। স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ আরাকানসম্রাট্ সাজিয়া থাকেন। দালিয়ার পাগলামীতে যে প্রেমের বিকাশ, অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে তাহা অক্ষুণ্ণ। যিনি তাহের সাজিয়া থাকেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী। এমন অভিনয় পুরুষেও কি করিতে পারে? কি সুন্দর! কি স্বাভাবিক! রঙ্গিলা যে কি রঙ্গময়ী কি বলিব? সে রসরঙ্গময়ী স্বাভাবিক অভিনয়ের সাকার মূর্ত্তি! সে যেন চিরবসন্তের ফুরফুরে মলয়ানিলে নিত্য নৃত্যময়ী। ধীবর, ধীবরপুত্র, আমিনা, জুলিয়া প্রভৃতি সকলের অভিনয় স্বাভাবিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। বহুদিন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখি নাই এবং এমন আমোদ পাই নাই। প্রাসঙ্গিক নৃত্য-গীত, হাস্যকৌতুক সবই মনোমদ মধুর। দৃশ্যপটাবলীও স্বাভাবিক সুন্দর।"

গ্রেট ন্যাশানালের উদ্বোধন সম্পর্কে শিশির পাবলিশিং হাউস

কর্ত্তৃক প্রকাশিত ‘অমরেন্দ্রনাথে’র জীবনীকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

“যেদিন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খোলা হয়, সেইদিন বেলা পাঁচটা না বাজিতেই থিয়েটারের যাবতীয় আসন বিক্রয় হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় থিয়েটারে এরূপ জনতা হয় যে সেরূপ জনতা বহুকাল কোন থিয়েটারের ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরাও সেদিন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সকালেই একখানি সম্মুখের আসন চারি টাকা দিয়া কিনিয়া আনাইয়াছিলাম। কিন্তু থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব,—লোকের উপর লোক প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি মারামারি করিতেছে। টিকিট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি লোকের ভীড় টিকিট ঘরের সম্মুখ হইতে কিছুতেই কমিতেছে না। সকলেই চীৎকার করিতেছে, “মশাই একখানা টিকিট দিতেই হইবে। আমরা বসিতে চাহি না, শুদ্ধ একটু দাঁড়াইয়া দেখিয়া যাইব।”

“আমরা বহুকষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিলাম, ভিতরে গিয়া দেখিলাম, একখানি চেয়ারও খালি নাই। আমরা একখানি আসনের জন্য দ্বার-রক্ষককে ক্রমাগত তাগাদা করিতে লাগিলাম। অনেকেরই আমাদের মত অবস্থা,—সকলেই আমাদের মত দ্বাররক্ষককে আসনের জন্য তাগাদা করিতেছেন। সে বেচারি একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে যে কি বলিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, চেয়ার ভাড়া করিতে গিয়াছে, এখনই আসিবে।”

“আমরা সেই চেয়ারের আশায় আকুল হইয়া এক পার্শ্বে গিয়া

দাঁড়াইলাম। প্রথম কন্‌সার্ট বাজিয়া গেল, আমরা ঠিক দাঁড়াইয়াই আছি। দ্বিতীয়বার কন্‌সার্ট আরম্ভ হইতে যাইতেছে, ঠিক সেই সময় চেয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মত অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিলেন, কাজেই চেয়ার আসিবামাত্র রীতিমত কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়া গেল। আমরাও বহুকষ্টে কাড়াকাড়ি করিয়া একখানা চেয়ার পাইয়াছিলাম। নূতন থিয়েটার, প্রথম অভিনয় রজনী,—বন্দোবস্তের ক্রটী অনেকই, তথাপি যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন ঐ ভীড় একেবারেই নিস্তব্ধ। অভিনয়ও যাহা হইল,—তাহাও চরম। অমরেন্দ্রনাথ 'জীবনে মরণে' পুস্তকে যে ভূমিকাটী লইয়াছিলেন,—সে ভূমিকার কিরূপ অভিনয় হইল, তাহা লেখাই বাহুল্য। এমন সুন্দর অভিনয় সত্যই আমরা বহুকাল দেখি নাই। থিয়েটার যখন ভাঙ্গিল তখন সকলেই আশাতীত প্রীত,—সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "না, বেশ নূতন বটে।"

অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খোলাতে, আবার তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পাইয়া, বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটার মহলে বিষম ত্রাসের সৃষ্টি হইল। মনোমোহনবাবু থিয়েটারের ব্যবসায় করিতে নামিয়াছিলেন,—লোকসান দিবার জন্য নহে। মাত্র ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা থিয়েটারে আসাতে বিডন ষ্ট্রীটের অন্যান্য থিয়েটারগুলির কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা তিনি ভোলেন নাই। সেই অমরেন্দ্রনাথের পুনরাগমন দর্শনে তিনি, যদিও মিনার্ভার জন্য তাঁহার ছেষট্টী হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল, তবু মাত্র তাহার এক-তৃতীয়াংশ দরে অর্থাৎ বাইশ হাজার টাকায় মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে থিয়েটারের বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলেন। মহেন্দ্রবাবু মিনার্ভার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়া, ১৭ই জুন—যেদিন গ্রেট ন্যাশানালের উদ্বোধন হয়, সেই দিন—অতুলকৃষ্ণ

মিত্রের 'রকমফের' লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। শনিবার অভিনয়, শুক্রবার দিন হঠাৎ এক প্ল্যাকার্ড বাহির হইল—'রকমফেরে জালিম—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।' গিরিশচন্দ্রের অকস্মাৎ এরূপভাবে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার নিশ্চয়ই অন্য কোন বিশেষ কারণ ছিল, কিন্তু অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথের বিডন ষ্ট্রীটে আগমনই গিরিশ-চন্দ্রের পুনরাবির্ভাবের একমাত্র হেতু। অন্ততঃ অমরেন্দ্রনাথের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনর্থক অগ্রসর হইয়াই যে গিরিশচন্দ্র কালের কবলে পতিত হইলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার 'বলিদান' নাটক খোলাতে, মিনার্ভাও প্রতিযোগিতায় বলিদানের অভিনয়ায়োজন করিলেন। সেই উপলক্ষে ১৫ই জুলাই করুণাময়ের ভূমিকাগ্রহণই গিরিশচন্দ্রের শেষ অভিনয়। মাত্র ৪০০৲ টাকার টিকিট-ক্রেতা দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্য (সেই জন্যই আমরা 'অনর্থক' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি), আমরা চিরজীবনের জন্য নাট্যজগতের পিতাকে হারাইলাম। বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অর্দ্ধেন্দুশেখর পূর্ব্বেই (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। এখন কয়েকমাস রোগভোগের পর গিরিশচন্দ্রও সমগ্র নাট্যজগৎকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

যাহা হউক, অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিডন ষ্ট্রীটে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শনি, রবি, বুধ,—প্রতি অভিনয় রাত্রেই অসংখ্য দর্শক স্থানাভাবে ফিরিতে লাগিলেন। ২৪শে জুন, অভিনয়ের পর, 'আহা মরি' বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এ সম্বন্ধে নাট্যমন্দির লিখিয়াছিলেন :—

"আহা মরি নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে "আহা মরি"র প্রচার বন্ধ করিবার ঘোষণা

করিয়াছেন। প্রকাশ,—"আহা মরি" নাকি কোন কোন বকধার্ম্মিকের মানে খোঁচা দিয়াছিল,—তাই তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, 'আহা মরি' বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের ক্ষত মানের গোড়ায় ছাই চাপা দিয়াছেন!"

অতঃপর নূতন ভূমিকার মধ্যে, ২৮শে জুন বিবাহ বিভ্রাটে মিঃ সিং সাজিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশানালে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রহসন "বেজায় রগড়ে"র অভিনয় করেন। ১লা জুলাই, ১৯১১ খৃঃ, তাহার প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ ঃ—

রামকমল—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, পান্নালাল—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ষোড়শীকান্ত—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, ভট্টাচার্য্য—হীরালাল দত্ত, জীবনধন—নীহারবালা, মাতঙ্গিনী—বসন্তকুমারী, বিমলা—পান্নারাণী, ক্ষান্তপিসি—কুমুদিনী।

৮ই জুলাই, গ্রেট ন্যাশানালে বলিদানের প্রথম পুনরভিনয় হয়। সে রজনীর ভূমিকার পরিচয়লিপি ঃ—

করুণাময়—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রূপচাঁদ—সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মন্টু বাবু), মোহিত—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, রমানাথ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, কিশোর—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, দুলালচাঁদ—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, কালী ঘটক—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ইন্‌স্পেক্টর—হীরালাল দত্ত, উকিল—গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী, জোবি—সুশীলাবালা, সরস্বতী—বসন্তকুমারী, রাজলক্ষ্মী—রাণীসুন্দরী, কিরণময়ী—ভূষণকুমারী, হিরণ্ময়ী—চারুবালা, ভাবিনী—নলিনীসুন্দরী, মাতঙ্গিনী—পান্নারাণী, ঝি—কুমুদিনী, নলিনী—হরিপ্রিয়া, যশোমতী—পুঁটুরাণী।

গ্রেট ন্যাশানালে বলিদানের অভিনয়ে দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া যায়। বহু লোকের মতে, করুণাময়ের অংশে অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনয় করেন, তাহার স্থান গিরিশচন্দ্রের করুণাময় ভূমিকাভিনয়ের ঠিক নীচেই হওয়া উচিত। সে যাহা হউক, এ ভূমিকার অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

২৩শে জুলাই, মেঘনাদ বধে খুব সুখ্যাতির সহিত মেঘনাদ ও রাম,

যুগ্ম অংশ অভিনয় করিয়া, ২৯শে জুলাই অমরেন্দ্রনাথ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাজীরাও' নাটক খোলেন। প্রথমাভিনয় রজনীর পাত্রপাত্রীগণ :—

বাজীরাও—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মলহর রাও—মনোমোহন গোস্বামী, রণজী—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, চন্দ্রসেন—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সাহু—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, নিজাম—হীরালাল দত্ত, গিরিধর—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ স্বামী—কাৰ্ত্তিকচন্দ্র দে, শঙ্কর—অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল, বলদেব—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, সদাশিব—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তোরাব—সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী, গৌতমা—সুশীলাবালা, মস্তানী—বসন্তকুমারী, রঙ্গিনী—ভূষণকুমারী, লক্ষ্মী—চারুবালা।

'বাজীরাও' খোলার দিন, ফুটবল মাঠে শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান-বনাম-ইষ্ট ইয়র্কস্ খেলা ছিল। রাত্রি ৮৷৷০টার সময় অভিনয় আরম্ভ, কিন্তু ৭৷৷০টা বাজিয়া গেল; অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং টিকিট ঘরে বসিয়া আছেন, মাত্র মুষ্টিমেয় দর্শক দর্শনে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাকী এক ঘণ্টার মধ্যে যে কি বিপুল দর্শক সমাগম হইল, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সকলের মুখে এক কথা, 'মোহনবাগান শীল্ড জিতিয়াছে।' তাই অমরেন্দ্রনাথ পরের শনিবার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন—"Mohun Bagan has won the Shield, Baji Rao has gained the victory."

বস্তুতঃ বাজীরাও* অভিনয় দর্শক-সমাজে যেরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, বহুদিন সেরূপ দেখা যায় নাই। বাজীরাওএর ভূমিকা অমরেন্দ্রনাথ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন; সে অভূতপূর্ব্ব অভিনয়

---

* 'বাজীরাও' গ্রন্থখানি অমরেন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল; অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর হইতে দেখি, গ্রন্থ হইতে সে উৎসর্গপত্র অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। নাট্যজগতের কি অসীম কৃতজ্ঞতা!

না দেখিলে বোঝান যায় না। গৌতমার অংশে সুশীলাবালাও অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছিলেন এবং ক্ষেত্রমোহন মিত্রের রণজী ও বসন্তকুমারীর মস্তানীও ভাল হইয়াছিল। এ সময়ে গ্রেট ন্যাশানালের জনপ্রিয়তা দর্শনে অমৃতবাজার পত্রিকা (১৯।৮।১১) লিখিয়াছিলেন :—

"Within the short time of its existence, Babu Amarendranath Dutt has succeeded in making his theatre an object of great attraction to the people of the metropolis. The popularity of the Great National Theatre was fully in evidence by the patronage it received by the public both on Wednesday and Thursday last. On both the dates the house was packed to suffocation. Today will be staged the new drama Baji Rao, which has already made a sensation in the city."

'বঙ্গবাসী' (২রা ভাদ্র, ১৩১৮) লিখিয়াছিলেন :—

"সুন্দরে সুন্দরে সামঞ্জস্য রাখা বড় সোজা কথা নহে। সে সামঞ্জস্য রাখিতে শক্তিশালিনী প্রতিভার প্রয়োজন। যেখানে সে সামঞ্জস্য দেখি, সেইখানে ভোরপুর আশা ও ভরসা। আজকাল কলিকাতার গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনয় সম্বন্ধে কথা উঠিলে, ঐ কথার সার্থকতার প্রমাণ পাই।

"এ থিয়েটারে আজকাল সত্যসত্যই সকল দিকেই সৌন্দর্য্যের সমীকরণ। তাহা না হইলে প্রতি সপ্তাহে এই রঙ্গমঞ্চের দর্শকসংখ্যা নিরূপণে হার মানিতে হয় কেন? টিকিট না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, এমন নৈরাশ্যের নিদর্শন প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক অভিনয়ের দিন প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে হয় না কি, ধন্য অমরেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য

সমীকরণ শক্তি? * * অমরেন্দ্রনাথের প্রত্যেক আবির্ভাবে দর্শক-মণ্ডলীর বিপুল করতালি অভিনেতার পূর্ব্বসঞ্চিত কৃতিত্বের বিজয় ঘোষণা করিয়া থাকে। ঘন করতালি অভিনয়ের উৎকর্ষ-পরিচায়ক; তবে করতালির ঘনতা কিছু বিরক্তিকর হইলেও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।"

অতঃপর ১০ই সেপ্টেম্বর 'কল্যাণী'তে সাঁওতাল সর্দ্দার ও ২৮শে অক্টোবর 'রাণাপ্রতাপে' রাণাপ্রতাপের ভূমিকা অভিনয় করিয়া, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার অনন্যসুলভ কলাজ্ঞান ও অপরাজেয়ত্বের পরিচয় দেন।

বাজীরাও অভিনয়ের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে (২২শে জুলাই) মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রথম অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশানালের সহিত প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা এতদূর ঘাল হইয়া গিয়াছিল যে, চন্দ্রগুপ্তের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটকও ভাসিয়া যায়। প্রথম ৬।৭ রজনীর বিক্রয় দেখিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়া বসেন। কিন্তু এ নাটক বাঁচান দানিবাবু। চাণক্যের ভূমিকায় তাঁহার অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া নাট্যজগৎ স্তম্ভিত হইয়া যান। সত্য মিথ্যা জানি না, শোনা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে এ অংশ দানিবাবুকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ শুনিবার পর, দানিবাবু সে শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বলিয়াছিলেন,—"রায় সাহেব! আপনি যেমন বলছেন, আমার দ্বারা তেমন হবে না। তার চেয়ে আমি আমার শক্তিমত যা করতে পারি, দেখুন, তা আপনার মনোমত হয় কি না?" এই বলিয়া তিনি রিহার্সালেই চাণক্যের যে চিত্র ফুটাইয়া তুলেন, তাহা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অবাক হইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ দানিবাবু, ভেবেছিলুম যে আমি তোমাকে কিছু শেখাতে পারি। কিন্তু তোমার যে পরিচয় পেলুম, তাতে এইমাত্র

বলতে পারি যে, তুমি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কোরো।” নাট্যামোদী সুধীবৃন্দেরও দানিবাবুর এ শক্তির পরিচয় পাইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। তাই ৭।৮ রজনী অভিনয়ের পর হইতে দর্শকসংখ্যা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হইতেই অমরেন্দ্রনাথ সারা-রাত্রিব্যাপী অভিনয় আয়োজন করেন। এ সম্বন্ধে অনেকে তাঁহার প্রতি অযথা ইঙ্গিত করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু কেন যে অমরেন্দ্রনাথ এ রীতির প্রবর্ত্তন করেন, তাহা কোন সমালোচক একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই। পূর্ব্বে যাহা হউক্ না হউক্, অমরেন্দ্রনাথের রঙ্গজগতে আবির্ভাবের পর হইতে, শুধু কলিকাতায় নয়, সমস্ত বঙ্গদেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই বহু মফঃস্বলবাসী দর্শক, মাত্র অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার জন্য, শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় আগমন সুরু করেন। রবিবার কোন হোটেলে খাইয়া, দিনমানে এদিক ওদিক ঘুরিয়া, শনি ও রবি দুই রাত্রি অভিনয় দেখিয়া, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যাইতেন। যাহাদের কলিকাতায় থাকিবার কোন স্থান ছিল না, এরূপ দর্শকের সংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এত বর্দ্ধিত হয়, যে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনয়কালে, যে রাত্রে শীঘ্র অভিনয় ভাঙ্গিয়া যাইত, সে রাত্রে তাঁহারা অমরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিতেন যে, তিনি যেন দয়া করিয়া তাহাদের থিয়েটারেই রাতটুকু কাটাইবার অনুমতি দেন। উপর্য্যুপরি এইভাবে কয়েকরাত্রি অনুরুদ্ধ হইয়া, মাত্র দর্শকগণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য, নিজের ক্ষতি সত্ত্বেও (প্রতি রজনীতে ১টার পর অভিনয়ের জন্য ২৫৲ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত) তিনি সারা রজনীব্যাপী অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। হয়ত অন্য কোন থিয়েটারের সেরূপ জনপ্রিয়তা ছিল না, হয়ত অন্য রঙ্গালয়ে এরূপ দর্শকের

প্রাদুর্ভাব হইত না, তাই অপরে অমরেন্দ্রনাথের কার্য্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ যে একমাত্র দর্শকগণের সুবিধার জন্যই এ রীতি প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলেন, মাত্র এইটুকু বলিয়াই এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার যখন এইরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চলিতেছে, তখন ষ্টার "Hamlet without the Prince of Denmark"-এর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তত্রস্থ কর্ত্তৃপক্ষ একই রাত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সুলতানা' ও 'নাগেশ্বর' নামে যুগ্ম পুস্তক খুলিয়াও থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না; ষ্টারের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। তখন তাঁহারা বহু ব্যাপার ও আড়ম্বর করিয়া অমরেন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে, ষ্টার থিয়েটার একটা বহুদিনের প্রতিষ্ঠান। বহুদিন পূর্ণ গৌরবে চলিয়া আজ ইহা বন্ধ হইয়া গেল। ষ্টারকে রক্ষা করিতে, ইহার লুপ্ত গৌরব পুনঃ সংস্থাপিত করিতে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। অতএব তাঁহার যদি যথার্থই নাট্যানুরাগ থাকে, সত্যই যদি তিনি নাট্যজগতের উন্নতিকামী হন, তাহা হইলে তাঁহার উচিত, ষ্টার থিয়েটারের সম্পূর্ণ ভার লইয়া তাহাকে রক্ষা করা, ইত্যাদি। তৎপরে বহু গমনাগমন ও উপাসনা আরাধনার পর, অমরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ষ্টার থিয়েটারকে রক্ষা করার মানসে, তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার ছয় মাসও না চালাইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সদলবলে ষ্টারে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয় যে, ঐ দিন হইতে অমরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে ষ্টার পরিচালিত হইবে; ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারীগণের কোনও অধিকার বা হস্তক্ষেপ চলিবে না। তাঁহারা বাড়ীভাড়া স্বরূপ প্রতি রজনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাইবেন। বক্রী সমস্তের মালিক ও অধিকারী অমরেন্দ্র-

নাথ। এইরূপে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারের বার আনা অংশীদার হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে চার আনা বখরা হইতে বঞ্চিত করিয়া, নিজেদের এমন অবস্থায় ফেলিলেন যে, শেষে অমরেন্দ্রনাথকে বার আনার মালিক করা ব্যতীত থিয়েটার রক্ষার অন্য কোন উপায় রহিল না।

অবশ্য অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারে আসিবার অন্য একটী কারণও ছিল। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রত্যহ 'ফুল হাউস' বিক্রী হইলেও, বিক্রয়-লব্ধ অর্থের পরিমাণ তেরশত টাকার বেশী উঠিত না ও প্রতি রজনীতে অসংখ্য দর্শককে স্থানাভাববশতঃ মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় ফিরিতে হইত। ষ্টার থিয়েটারের মত বড় বাড়ীতে দর্শকের স্থানের অকুলান হইবে না। নিজেরও আয় বাড়িবে, দর্শকমণ্ডলীরও পরিতৃপ্তি হইবে, আবার ষ্টার থিয়েটারও রক্ষা পাইবে,—এই ত্রিবিধ কারণে অমরেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশানাল ছাড়িয়া দিলেন।

৮ই নভেম্বর, বুধবার, সুশীলাবালার বেনিফিট উপলক্ষে বলিদান ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ই গ্রেট ন্যাশানালে শেষ অভিনয়। ঐ রাত্রে অমরেন্দ্রনাথ করুণাময় ও বিল্বমঙ্গল এবং সুশীলাবালা জোবি ও পাগলিনী সাজিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের গ্রেট ন্যাশানাল অকস্মাৎ ছাড়িয়া দেওয়াতে থিয়েটার বাড়ীর মালিক কি করিলেন, তাহা আমরা "অমরেন্দ্রনাথ" হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি :—

"অমরেন্দ্রনাথ সহসা গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার পরিত্যাগ করায় অনাথবাবু বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার পুরাতন ক্ষুদ্রকায় বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেবল অমরেন্দ্রনাথের জন্যই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন থিয়েটার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর অমরেন্দ্রনাথ

কিনা যেমন একটু সুবিধা পাইলেন আর অমনি ষ্টার থিয়েটারে চলিয়া গেলেন! অমরেন্দ্রনাথের শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিয়া এই ব্যাপার লইয়া অনাথবাবুকে নানাভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রমাগত উত্তেজনায় অনাথবাবুও রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথের নামে আদালতে মামলা রুজু করিবেন স্থির করিলেন। অনাথবাবু যে মামলা রুজু করিতে যাইতেছেন, অমরেন্দ্রনাথের নিকট এ সংবাদ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার সবে গ্রহণ করিয়াছেন,—নূতন ভাবে, নূতন ছাঁদে তিনি ষ্টার থিয়েটার চালাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। কাজেই তিনি এ সময়ে অনাথবাবুর সহিত মামলা মোকদ্দমা করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্রই অনাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন স্থির করিলেন।

"অ্যাটর্নী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অনাথবাবুও মামলার কাগজপত্র অ্যাটর্নীকে বুঝাইয়া দিতেছেন ঠিক সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অনাথবাবু নিজেকে একটু গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের এমনি একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল যে তাঁহার সম্মুখে শত্রু মিত্র যেই হউক, কাহারও গম্ভীর হইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। অনাথবাবুও গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারিলেন না, অমরেন্দ্রনাথ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে বলিলেন, "এস ভায়া এস,—বোস।"

"অমরেন্দ্রনাথ বসিতে বসিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুনিলাম নাকি আপনি আমার নামে নালিশ করিতেছেন?"

"অনাথবাবুর প্রাণ বলিতে চাহিল, 'হ্যাঁ, সেটা কি বিশেষ অন্যায়

করিতেছি?' কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে সে কথা বাহির হইল না,—তিনি বার দুই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "না, না,—ও,—মিথ্যা,—আমি কি তোমার নামে নালিশ করিতে পারি! তবে কথা হইতেছে কি জান ভায়া,—কাজটা কি তোমার ভাল হইয়াছে?"

"অমরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি আপনার ছেলের সমান; ছেলের অপরাধ পদে পদেই হইতে পারে। আপনার তো কিছুই অজানা নাই? এখানে থিয়েটার খুলিয়া পর্য্যন্ত আমি কেবল লোকসান দিয়াই আসিতেছি। এমন একদিনও দেখিলাম না যে সবাইকে স্থান দিতে পারিলাম। আপনার থিয়েটারে লোক বসিবার যত স্থান আছে, তাহাতে আমার থিয়েটার কিছুতেই চলিতে পারে না। ক্রমাগতই আমায় লোকসান খাইতে হয়। এ অবস্থায় আপনি যদি বলেন,—লোকসান হইলেও তোমাকে এই থিয়েটারে থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমি নাচার। আমাকে থাকিতেই হইবে। বলুন আমার কি করা উচিত? আর—তা ছাড়া আপনার দশ বিশ হাজার টাকা এখন গেলেই বা কি থাকলেই বা কি? কিন্তু আমাকে একেবারে মারা যাইতে হয়।"

"অমরেন্দ্রনাথের এই লম্বা বক্তৃতার সম্মুখে অনাথবাবুকে পরাস্ত হইতে হইল। তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হইল, "না—না, আমি এমন কথা তোমায় বলিতে পারি না,—যে তুমি এইখানে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হও। আমার বাড়ী পড়িয়া থাকিবে না। তোমার যাহাতে সুবিধা হয় তুমি তাই কর। তবে এটা তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যাও যে আমি তোমার নামে নালিশ করিব না।"

"এরূপ ঘটনা অমরেন্দ্রনাথের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে, তাঁহার বচনে, এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে শত্রু মিত্র

যিনিই হউন্—একবার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিতেই হইত।"

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অধিষ্ঠান-কালে, অমরেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভূমিকাগুলি অভিনয় করিয়াছিলেন :—

জীবনে মরণেতে সাহজেনান, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, প্রফুল্লে যোগেশ, বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গল, হরিরাজে হরিরাজ, সীতার বনবাসে রাম, বিবাহ বিভ্রাটে মিঃ সিং, বেজায় রগড়ে পদ্মলাল, আবুহোসেনে ১টা পাগল, সধবার একাদশীতে অটল, বলিদানে করুণাময়, মেঘনাদ বধে মেঘনাদ ও রাম (একসঙ্গে), বাজীরাওতে বাজীরাও, রাণীভবানীতে রাজা রামকান্ত, আলিবাবাতে হুসেন, কল্যাণীতে সাঁওতাল সর্দ্দার, সরলায় বিধুভূষণ, সংসারে মিঃ মুর, দক্ষযজ্ঞে মহাদেব ও রাণাপ্রতাপে রাণাপ্রতাপ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

——:০:——

ষ্টারের স্বত্বাধিকারীরূপে অমরেন্দ্রনাথ

(১৯১১-১৯১৩)

অমরেন্দ্রনাথের অধীনে আসার পর ষ্টার থিয়েটারে যেদিন প্রথম অভিনয় হইল, সেই রজনীতে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে প্রথম ঐক্যতান বাদনের পর, অমৃতলাল বসু মহাশয় রঙ্গমঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, "আমি এখন বুড়ো হয়েছি, আমার মরবার বয়স হয়েছে; যদি বলেন যে, 'মর নাই কেন?' তা হলে তার উত্তরে বলবো, 'সেটা আমার বজ্জাতী।' আমি আর এখন থিয়েটার চালাতে অক্ষম। সেই জন্য শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করলাম। আর অমরবাবুর মতন যোগ্য ব্যক্তি কোথায় পাব, যার হাতে আমাদের বড় আদরের, বড় সাধের ষ্টার থিয়েটারের ভার দিয়ে যাই। বঙ্গীয় নাট্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কেরা একে একে নিভে গিয়েছে। এখন একমাত্র গিরিশবাবু আর আমি আছি। তা গিরিশবাবু ত' রোগশয্যায় আর আমি বার্দ্ধক্যে অশক্ত। সুতরাং অমরবাবুই এখন নাট্যজগতের যোগ্য ও যথার্থ উপযুক্ত পরিচালক। তাঁহার মত থিয়েটার পরিচালনের শক্তি আর কারও নেই। আর তার মত উদার, সৎবংশজাত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লাভ করে নাট্যজগৎ ধন্য। আমরাও তাঁর মতন লোকের হাতে ষ্টার থিয়েটারের ভার দিতে পেরে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ

দিচ্ছি এবং ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমি তা হলে এখন বিদায় হলুম, মধ্যে মধ্যে দেখা পাবেন। একেবারে আপনাদের সেবা ছাড়বো না।”

সেই দিন, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর হইতে ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী পরিবর্ত্তন হইল। অমৃতলাল বসু ম্যানেজারের পদ হইতে নাট্যাচার্য্যের পদে গেলেন এবং যে রাত্রিতে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, সেই রাত্রি ২৫৲ পাইবেন, এইরূপ ঠিকা বন্দোবস্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ষ্টার থিয়েটার উদ্বোধনের দিন, সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ‘সৎসঙ্গে’র প্রথম অভিনয় হইল। আমরা নিম্নে প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গের নাম দিলাম :—

প্রবোধ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ধরণীধর—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কেশব—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, বিপিন—হীরালাল দত্ত, বৈদ্যনাথ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেশ—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, সুকুমার—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, নিমাই—রাধাকিশোর কর, সদানন্দ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, পতিতপাবন—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, যোগমায়া—পান্নারাণী, নির্ম্মলা—বসন্তকুমারী, রাসমণি—মৃণালিনী, মৃণালিনী—নলিনীসুন্দরী, হেমাঙ্গিনী—সুশীলাবালা, চপলা—হেমন্তকুমারী, চন্দ্রকুমারী—নীহারবালা, সরমা—কোহিনুরবালা, গুলজার—রাণীসুন্দরী, গৌরী—কুমুদিনী, পদার মা—কিরণবালা।

যে ষ্টার থিয়েটার দর্শক অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সেই ষ্টার থিয়েটারই অমরেন্দ্রনাথের আগমনে মহাসমারোহে চলিতে লাগিল। লোকের মুখে, হাটে, বাজারে তখন কেবল ষ্টার থিয়েটার ও অমরেন্দ্রনাথের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। নূতন, পুরাতন বিবিধ পুস্তকের অভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারকে পুনরায় নাট্যজগতের শীর্ষদেশে টানিয়া তুলিলেন। ষ্টার কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান থিয়েটার বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য, মিনার্ভা অভিনেতৃ-

গণের চিত্রসহ একখানি ইংরাজী পুস্তিকা বাহির করিলেন; হ্যাণ্ডবিলে বীরদম্ভে লিখিলেন,—"বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)।" পরের সপ্তাহে তাহার উত্তরে ষ্টারের হ্যাণ্ডবিলে বাহির হইল,—"বঙ্গের সর্ব্ব-নিকৃষ্ট অভিনেতা শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।" ইহার পর, আর মিনার্ভা হ্যাণ্ডবিলদ্বন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

২৫শে নভেম্বর, অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং হরিনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুকনাট্য "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" ষ্টারে অভিনয় করাইলেন। অতঃপর, তিনি ৩রা ডিসেম্বর, রাজাবাহাদুরে মিঃ ফিসের অংশ অভিনয় করিবার পর, ২৩শে ডিসেম্বর, মিনার্ভার ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী নরেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "জীবন সংগ্রামে"র অভিনয় হইল। প্রথম রজনীর প্রধান ভূমিকাগুলির অভিনেতৃবর্গ ঃ—

মির্জ্জান—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, আলি ইব্রাহিম—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, দেলদার—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ফকির—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, রহমান—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, নুরমহাল মৃণালিনী, জিন্নৎ—বসন্তকুমারী, মমতাজ—সুশীলাবালা, মিনার—রাণীসুন্দরী, নমসেল-নিহার—কোহিনুরবালা।

অতঃপর অমরেন্দ্রনাথ ৯ই মার্চ্চ, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ ও জগৎশেঠ (একসঙ্গে) ও ২৩শে মার্চ্চ, নরমেধ যজ্ঞে যযাতির ভূমিকা অভিনয় করিলে পর, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯১২ খৃঃ, ষ্টারে অমৃতলাল বসুর 'খাস দখল' নামক অভিনব সামাজিক নাট্যলীলা অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি ঃ—

নিতাই—অমৃতলাল বসু, মোহিত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাইতি—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ঠাকুরদা—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, লোকেন—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, রমেশ—হীরালাল দত্ত, সারদা—শশীভূষণ বসু (অমৃতলালের পুত্র), আনন্দ কবিরাজ—রাধাকিশোর কর, ডাঃ মিত্র—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বানার্জ্জী—

ঘনশ্যাম বিশ্বাস, ডাঃ মল্লিক—জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, গুণধর ঘোষ—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পাকড়াশী ও কলিরাজ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, তপস্বীরাম—বিষ্ণুচরণ দে, রতি—রাণী-সুন্দরী, মোক্ষদা—বসন্তকুমারী, গিরিবালা—সুশীলাবালা, বিধু—মৃণালিনী, আহ্লাদী—কুমুদিনী, দ্রাবণা—কোহিনুরবালা, মহালক্ষ্মী—পান্নারাণী, বিভাষ—হেমন্তকুমারী, মৃণাল—নলিনীবালা।

খাস দখলের মত যুগযুগান্তকারী পুস্তক পূর্ব্বে কখন কোন থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে কিনা সন্দেহ! রচনা, অভিনয়, পোষাকপরিচ্ছদ, দৃশ্যপট, হাণ্ডবিল, এমন কি প্রোগ্রাম পর্য্যন্ত, সর্ব্ববিষয়ে খাস দখল রঙ্গ-রাজ্যে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। অন্য কোন নাটক যে খাস দখলের মত অভিজাত দর্শকসমাজে আন্দোলন আনয়ন করিতে পারে নাই, একথা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি। এমন কোন সংবাদপত্র ছিল না, যাহাতে এ পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা না প্রকাশিত হইয়াছিল। নিতাই, মোহিত, ঠাকুদ্দা, মোক্ষদা ও গিরিবালা—এমন কি বিধু ঝি পর্য্যন্ত—যে অভিনয় করেন, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া দুর্ঘট। তাহার মধ্যে আবার বাজী জিতিয়াছিলেন—নিতাই, মোহিত ও গিরিবালা। তিনজনের অভিনয়ই এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তুলনায় সমালোচনা করিলে কাহাকে যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে আমরা অক্ষম। নিতাইএর মুখের 'is the' বাংলা ভাষায় প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গিরিবালার অভিনয় ত' অতুল্য হইয়াছিলই, তাহার উপর যখন সুশীলা কোকিলকণ্ঠে গান ধরিতেন, 'ওগো কেউ বলনা গো ভাতার কেমন মিষ্টি!' তখন দর্শকগণ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতেন। আমরা দেখিয়াছি, প্রতি রজনীতে উপর্য্যুপরি 'এন্‌কোর' রবে ছাদ ফাটিয়া যাইতেছে, তবু এন্‌কোরের বিরাম নাই। এইরূপ একরাত্রে ৭।৮ বার গানখানি গাহিবার পর, ক্লান্তা সুশীলাবালা পুনরায় গাহিতে অস্বীকৃতা হইলে, স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ

তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া, তাঁহাকে দর্শকসমক্ষে হাজির করিয়া দেন। অকস্মাৎ এরূপভাবে অমরেন্দ্রনাথের দর্শন পাইয়া দর্শকগণের সে কি উল্লাস! তিনিও মোহিতের অংশে যে অভিনয় করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি অন্য কোন নট—দানিবাবু পর্য্যন্ত—সে চিত্র দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করা দূরে থাক্—তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত –

'লুকায়ে চোরের প্রায়, নিশীথে ঝরিয়ে হায়,
নলিনী মলিনী কেন করিস্ শিশির?
ভূমিগতা পদ্মলতা, তার প্রাণে দিলি ব্যথা,
কি লাভ হইল ইথে তোমার পিসীর?'

তেমন প্রাণস্পর্শীভাবে উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। কত—কত যুগ পূর্ব্বে সে আবৃত্তি শুনিয়াছি, তবু এখনও তাহা আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল ঝঙ্কার তুলিতেছে।

খাসদখল অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন (২১।৮।১২):—

"On Sunday last, 'Khas Dakhal' and 'Haranidhi' were put on the boards of the Star Theatre before an overwhelming crowded house. It will be simply unnecessary on our part to pass any remark at present on 'Khas Dakhal', which has been drawing bumper house though staged week after week for the last four months, on every occasion. * * Babu Amarendranath Dutt appeared in the role of 'Mohit' and acquitted his part most creditably and elicited the loudest applause from the audience."

২৮শে মে, মঙ্গলবার, অমরেন্দ্রনাথের বেনিফিট নাইট উপলক্ষে

এক বিরাট্ অভিনয় আয়োজন হয়। এদিন দানিবাবু আসিয়া ষ্টারে বলিদানে দুলালচাঁদ ও বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গল সাজেন, অমৃতলাল বসু হন রূপচাঁদ, অমরেন্দ্রনাথ করুণাময় ও বণিক, সুশীলাবালা জোবি ও ভিক্ষুক এবং নরীসুন্দরী পাগলিনী। অভিনয় বা বিক্রয়ের কথা বলিয়া অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

৮ই জুন, অমরেন্দ্রনাথ ক্ষেত্রমোহন মিত্রকে ষ্টার হইতে ডিস্‌মিস করেন। সে রাত্রে রাজা ও রাণীতে অমরেন্দ্রনাথের বিক্রমদেব ও ক্ষেত্রবাবুর কুমারসেনের অংশ অভিনয় করার কথা ছিল। পূর্ব্বে কখনও কুমারসেনের অংশে অভিনয় না করিলেও, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সে ভূমিকা অভিনয় করিবার ভার লন এবং একসঙ্গে বিক্রমদেব ও কুমারসেন উভয় ভূমিকাই নিজে অভিনয় করিয়া, যে অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভা প্রদর্শন করান, নাট্যজগতে তাহা অতীব দুর্লভ। শুধু তাই নয়, কুমারসেনের অংশে তিনি এত হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেন ও তাঁহার সে অভিনয় এত জনপ্রিয় হয় যে, উত্তরকালে তিনি কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তীকে দিয়া বিক্রমদেব সাজাইয়া নিজে শুধু কুমারসেনই অভিনয় করিয়াছিলেন। এ অংশ অভিনয় তাঁহার একটী মহতী কীর্ত্তি।

এ সময়ে কিন্তু এই যুগ্ম ভূমিকা অভিনয় করার জন্য, অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ অমরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। সে সময় ই, আই, রেলওয়ের তদানীন্তন এজেণ্ট স্যার উইলিয়ম ড্রিং অমরেন্দ্রনাথকে কালকা পর্য্যন্ত ভ্রমণের জন্য সাতখানি প্রথম শ্রেণীর 'সম্মানকার্ড' দেন। অমরেন্দ্রনাথ তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া মাসখানেক ধরিয়া সিমলা ও বোম্বাই ঘুরিয়া স্বাস্থ্যসঞ্চয় করিয়া আসেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নরীসুন্দরী 'মোহিতের' ভূমিকা অভিনয় করেন।

১৫ই জুন ষ্টারে, মনোজমোহন বসু প্রণীত 'রূপকথা' অভিনীত হয়। তাহাতে সুশীলাবালা, মৃণালিনী, পুঁটুরাণী, কোহিনুরবালা, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরীসুন্দরী, বসন্তকুমারী, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ও আজবসুন্দরী যথাক্রমে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগরপুত্র, বুকুশ, বুকুশী, রাজকন্যা, ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমী সাজেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অমরেন্দ্রনাথ ১৩ই জুলাই, পুনরায় 'মোহিত' এবং 'বিক্রমদেব ও কুমারসেন' সাজেন। তাহার পর, বহু চেষ্টা করিয়া, তিনি আবার 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় করিবার জন্য পুলিস হইতে অনুমতি পান। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর *,

---

* দানিবাবুর জীবনীতে হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—"এই সময়ে মিনার্ভায় চন্দ্রশেখর অভিনয় হয় (১৯১০, মে)। * * ষ্টারেও অমরেন্দ্রনাথ সেখানকার চন্দ্রশেখর অভিনয় করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুমতি না পাইয়া পশ্চাৎপদ হইয়া যান।"

চন্দ্রশেখর অভিনয় নিষিদ্ধ হয়, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের পর যে কোন সময়ে—সম্ভবতঃ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়। কারণ এটা আমরা খুব ভাল রকমেই জানি যে, ১৯১০, জুন পর্য্যন্ত ষ্টারে চন্দ্রশেখর প্রায় প্রতিমাসেই অভিনীত হইত, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে উহা নিষিদ্ধ হইতেই পারে না। অনিষিদ্ধ পুস্তক পাস করা বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব ও অমরেন্দ্রনাথের অসাফল্য দেখাইবার চেষ্টা হেমেন্দ্রবাবু কেন যে করিলেন, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝি না। সাদা কথায় আমরা এইটুকুমাত্র বুঝি যে, ১৯১০ খৃঃ মে মাসে যখন চন্দ্রশেখর মিনার্ভায় অভিনীত হয়, তখনও গ্রন্থখানি নিষিদ্ধ নাটকের তালিকাভুক্ত হয় নাই। তখন ষ্টারে চন্দ্রশেখর সগৌরবে চলিতেছিল ; সুতরাং তাহা পাস করান লইয়া একের সাফল্য ও অন্যের নিষ্ফল চেষ্টার কথা উঠে কিরূপে ?

তাহা ছাড়া পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বহুগুণ অধিক ছিল ; কেন না, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়া যখন ধরপাকড় সুরু হয়, তখন অমরেন্দ্রনাথই গিয়া গিরিশচন্দ্রকে পুলিসের হাত হইতে রক্ষা করেন।

মৃণালিনী ও আনন্দমঠ, গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম ও ছত্রপতি, অমরেন্দ্রনাথের আশা-কুহকিনী ও আহা-মরি, ক্ষীরোদ-প্রসাদের প্রতাপাদিত্য, বাংলার মসনদ, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার ও দাদা ও দিদি এবং মনোমোহন গোস্বামীর শিবাজী, কর্ম্মফল ও সংসারের অভিনয় পুলিস কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সত্বর নিষিদ্ধ হয়। এখন অমরেন্দ্রনাথের বহু চেষ্টায় মাত্র চন্দ্রশেখরখানি পাস হয়। তিনি ১০ই আগষ্ট ষ্টারে তাহার পুনরভিনয় করেন।

১৪ই আগষ্ট, বুধবারও ষ্টারে চন্দ্রশেখরের অভিনয় হয়। সেদিন অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন :—"In the immediate presence of the Commissioner of Police, who will deliver his verdict whether Chandrasekhar can be allowed to be staged in future or it will see its Doomsday for good." সৌভাগ্যবশতঃ, অমরেন্দ্রনাথের স্বপক্ষেই রায় প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে পুনর্ব্বার নিষিদ্ধ হইলেও, সে সময়ে অমরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর অভিনয় করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

১৭ই আগষ্ট, ষ্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সামাজিক নাটক 'পরপারে'র অভিনয় হয়। সে রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

বিশ্বেশ্বর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দয়াল—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পার্ব্বতী—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, মহিম—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, কালীচরণ—মনোমোহন গোস্বামী, পরেশ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, চারু—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ভুবনজী—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, সরযূ—বসন্তকুমারী, শান্তা—সুশীলাবালা, হিরন্ময়ী—নরীসুন্দরী, করুণাময়ী—পান্নারাণী।

পরপারের নায়ক বিশ্বেশ্বর একজন ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। অমরেন্দ্রনাথ এতদিন যুবাজনোচিত ভূমিকাই অভিনয় করিয়া আসিতেছিলেন, তাই বৃদ্ধের ভূমিকায় তিনি কতখানি সাফল্য

[illegible] ছিল। কিন্তু তাঁহাকে এই [illegible] অবাক হইয়া গেলেন। এই ধরণের ভূমিকায় তিনি যে এমন নিখুঁত অভিনয় করিতে পারেন, ইহা কাহারও কল্পনায় ছিল না। এক দিকে নাতনীর সহিত রসালাপে তিনি যেমন দর্শকগণকে হাসাইতেছেন, অন্যদিকে আবার তাঁহার শোকসন্তপ্ত চিত্তের মর্ম্মন্তুদ অভিনয় এবং তদনুযায়ী হাবভাব ও পাংশু মুখমণ্ডল দেখিয়া, তাঁহারা চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। সে অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বোঝান অসম্ভব। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই ভূমিকায় তেমন অভিনয় হইবার আর যে কোন আশা নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

২৭শে আগষ্ট, মঙ্গলবার, কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-ভাণ্ডার উপলক্ষে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রায় সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতৃবর্গের সমাবেশে একটী বিশেষ অভিনয় আয়োজন হয়। আসনের মূল্য বৃদ্ধিবশতঃ, সেদিন ৩৬১৬৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে, অমৃতলাল বসু রচিত "স্মৃতির সম্মান" শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন, 'বহুৎ আচ্ছা' হইতে 'আমরা বিলেত ফেরতা ক' ভাই' শীর্ষক গানে অংশ গ্রহণ করেন ও পাণ্ডব-গৌরবে ভীমের ভূমিকা অভিনয় করেন। তাঁহারই একান্ত উৎসাহ ও উদ্যোগে এই অভিনয় রজনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার পরে, আবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ষ্টারে গিরিশচন্দ্রের যে স্মৃতিসভা হয়, তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সে উপলক্ষে তিনি বলেন ঃ—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! কলঙ্কের হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ঘৃণাগঞ্জনা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, নাট্যশালার কার্য্যে

আমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছি। এজন্য আমি আপনাদের বিচারে যাহাই সাব্যস্ত হই না কেন, আমি কখনও দোষ গোপন করি নাই, বরং বরাবরই নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া আসিয়াছি এবং তজ্জন্য মনে যথেষ্ট শান্তি এবং আপনাদের স্নেহানুগ্রহও লাভ করিয়াছি। নিজের দোষ নিজে ব্যক্ত করিলে, মনে স্বতঃই শান্তির উদয় হয়—সান্ত্বনা পাওয়া যায়। এই অভিনেত্রীদের সভাপতিত্ব করা রুচি-বাগীশগণের নিকট দোষনীয় হইলেও, যাহাদিগকে লইয়া আমাকে এই ব্যবসায় পরিচালন করিতে হয়—প্রতিপদক্ষেপে আমাকে যাহাদের মুখাপেক্ষী হইতে হয়—যাহাদের অভাবে এই রঙ্গালয়ের ব্যবসায় পরিচালনা সম্পূর্ণ অসম্ভব—তাহাদিগকে ঘৃণা করা, বর্জ্জন করা, পরিহার করা—আমার পক্ষে যে কোনক্রমেই সঙ্গত নহে, এ বলাই বাহুল্য! সুতরাং প্রতি পদক্ষেপেই আমাকে ইহাদের অভাব অভিযোগে কর্ণপাত করিতে হয়। সেদিন টাউনহলে বিরাট সভা* হইয়া গেলে, আমরা যখন রঙ্গালয়ে বসিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, তখন এই থিয়েটারের অভিনেত্রীগণ আমার নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করে যে,—"টাউনহলে বা অন্য কোন প্রকাশ্য সভায় প্রবেশাধিকার আমাদের নাই; কিন্তু আশা করি যে আপনার ন্যায় নাট্যৈকব্রত অধ্যক্ষ এই হতভাগিনীদিগকে ঘরে বসিয়া কাঁদিবার, নিজ রঙ্গমঞ্চে নতজানু হইয়া আমাদের গুরু ও দেবতা গিরিশবাবুর উদ্দেশে প্রণাম করিবার অবসরদানে বঞ্চিত করিবেন না।"—এই আবেদনপত্র পাইয়া প্রথমে আমাকে একটু বিব্রত হইতে হয়; অবশেষে অনেক গবেষণার পর অদ্য তাহাদের আবেদন অনুসারে

* ইহার কিছু পূর্ব্বে টাউনহলে গিরিশচন্দ্রের এক বিরাট স্মৃতিসভা হইয়াছিল।

এই সভার অধিবেশন করিয়াছি, এবং আমি স্বেচ্ছায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছি। এজন্য যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আশা করি, নাট্যানুরাগী সুধীবৃন্দ নিজগুণে আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন,—ইহাই প্রার্থনা।"

এই সভায়, সুশীলাবালা, রাণীসুন্দরী, বসন্তকুমারী, নরীসুন্দরী ও নরেন্দ্রনাথ সরকার স্বলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

অতঃপর, অমৃতলালের অসুস্থতাবশতঃ ২১শে সেপ্টেম্বর স্বয়ং খাসদখলে নিতাইএর ভূমিকা গ্রহণ করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ ২রা নভেম্বর, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ ও ফষ্টর উভয় ভূমিকা একসঙ্গে অভিনয় করেন। অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ একই নাটকে দুইটী বিভিন্ন রসসমন্বিত ভূমিকার অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ তো দূরের কথা, সমগ্র নাট্যজগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া, সচকিত হইয়া উঠেন। আবার বুঝি ষ্টারে ক্লাসিকের যুগ আসিল! আবার বুঝি অন্য সমস্ত থিয়েটার কানা হইয়া গেল! বস্তুতঃ হইলও তাই। অন্যের কথা ছাড়িয়া দি—১৯১২ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত তিন বৎসরাধিক কাল ধরিয়া, কোন রকমে তুকুড়ি সাতের খেলা বজায় রাখিতে পারিলেও, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গৃহলক্ষ্মীতে উপেন ও ভীষ্মে ভীষ্ম ব্যতীত দানিবাবুও অন্য কোন অংশে প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ দেখাইতে পারেন নাই। ষ্টারের বিক্রয়ের প্লাবনে অন্য সমস্ত নাটক ভাসিয়া যায়।

১৬ই নভেম্বর ষ্টারে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রণীত ব্যঙ্গনাট্য "আনন্দবিদায়" অভিনীত হয়। দর্শকের অপ্রীতিনিবন্ধন, এই রাত্রির পরই অমরেন্দ্রনাথ ইহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। ৩০শে নভেম্বর, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ষ্টারে যোগদান করেন ও সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া বর্ম্মায় বেড়াইতে যান। ফিরিয়া আসিয়া, তিনি ২৫শে ডিসেম্বর, ষ্টারে রামলাল বন্দ্যো-

পাধ্যায় প্রণীত 'কালপরিণয়ে'র পুনরভিনয় করেন। সে রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ :—

মণীন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সারদা—প্রবোধচন্দ্র বসু (২য় রজনী হইতে অমৃতলাল বসু), জগদীশ—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, তারক ঘোষ—মনোমোহন গোস্বামী, শম্ভু—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, অন্নদা—হীরালাল দত্ত, ব্রজ—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি—হরিপদ সরকার, মনু—সুশীলাবালা (ছোট), মোক্ষদা—বসন্তকুমারী, কিশোরী—নলিনীবালা, কালী—সুশীলাবালা।

ষ্টারে কালপরিণয় অভিনয় সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ও অমরেন্দ্রনাথের মণীন্দ্র বিষয়েও একই সুখ্যাতির পুনরুল্লেখে কোন লাভ নাই। মাত্র একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। ষ্টারের প্রতিযোগিতায় মিনার্ভাও কালপরিণয় খোলেন। স্বয়ং গ্রন্থকার রামলাল বাবু তুলনায় ষ্টারের অভিনয়ের অজস্র সুখ্যাতি করাতে, স্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী (তিনি মোক্ষদা সাজিতেন) বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি হিসাবে আপনি ষ্টারের সুখ্যাতি করিতেছেন?" রামলাল বাবু জবাব দেন,—"এ বিষয় লইয়া আমি তর্ক করিতে অনিচ্ছুক। আমার যাহা মত তাহা জানাইলাম; তোমাদের অপ্রিয় হইলেও উপায় নাই। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক ভূমিকার অভিনয়ই ষ্টারে মিনার্ভা অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

২৯শে মার্চ্চ, ১৯১৩ খৃঃ ষ্টারে মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত 'ধর্ম্ম-বিপ্লবে'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

কালাচাঁদ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিরঞ্জন—মনোমোহন গোস্বামী, বামাচরণ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সোলেমান—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, চাঁদ খাঁ—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, গোলাম আলি—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, হোসেন আলি—হীরালাল দত্ত, দুলারী—বসন্তকুমারী, দুর্গাবতী—নরীসুন্দরী, সুরমা—সুশীলাবালা। (নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুকে এ সময় পদচ্যুত করা হয় বলিয়া, এ তালিকায় তাঁহার নাম নাই)।

অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা (৩।৬।১৩) লিখিয়াছিলেন ঃ—"The part played by Kalachand was simply soul elevating".

অতঃপর, ৩রা মে, ১৯১৩ খৃঃ, ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথের অভিনব রঙ্গনাট্য কিস্‌মিস্‌ অভিনয় হয়। প্রথম রজনীর পাত্রপাত্রীগণ ঃ—

স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দ—হীরালাল দত্ত, লভচাঁদ—সুশীলাবালা (পরে কুসুমকুমারী), উড়ে বেহারা—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রামা চাকর—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, ঘটক—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, বিলাসবতী—নরীসুন্দরী, কিস্‌মিস্‌—বসন্তকুমারী, লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—পান্নারাণী, গৃহিণী—মৃণালিনী, ঝি—কুমুদিনী।

কিসমিসের মত চাঞ্চল্যকর রঙ্গনাট্য বঙ্গীয় নাট্যশালায় অতি অল্পই অভিনীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিখিয়া, অমরেন্দ্রনাথ একদল লোকের নিকট হইতে যেমন বাহবা পান, তেমনি আর একদল লোক অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া তাঁহার নিন্দা করেন। এই লইয়া সংবাদপত্রেও প্রবন্ধ রচিত হয়। এই আন্দোলনের সুযোগ লইয়া, ও কিস্‌মিস্‌কে কাবুলী মেওয়া কিশমিশ মনে করিয়া, চুণিলাল দেব ঝাঁ করিয়া 'ওতোরের হিসাবে' 'আলুবকরা' নামক এক চাট্‌নী রচনা করেন। তিনি তখন অমরেন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত গ্রেট ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল নাম দিয়া এক থিয়েটার পরিচালনা করিতেছিলেন।

ওদিকে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ মিত্রের অকাল মৃত্যুর পর হইতে মনোমোহন বাবু আবার মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। কিসমিসের প্রথমাভিনয়ের কয়েকদিন পরেই, অমরেন্দ্রনাথের সহিত মনোমালিন্যবশতঃ, অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য্য-পদে বৃত হইয়া, মিনার্ভায় চলিয়া যান ও তথায় খাস দখল অভিনয়ের আয়োজন করেন। বলা বাহুল্য, সে খাস দখল জমে নাই ও চলে নাই।

পত্নীসহ অমরেন্দ্রনাথ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—:*:—

পত্নী বিয়োগ (১৯১৩)

অমরেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনায় আমরা স্থানে স্থানে তাঁহার পত্নী হেমনলিনীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। আশা করি তাহা হইতে পাঠক তাঁহার চরিত্রের কথঞ্চিৎ আভাষ পাইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, বিবাহের পর বৎসরাধিক কাল পত্নীকে খুব আদর-যত্নে রাখিলেও, পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে ক্লাসিক পর্ব্বের অবসান পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অবহেলাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে স্বামীর উপর বিরাগ পোষণ করা দূরের কথা, হেমনলিনী চিরকালই স্বামীকে নশ্বর জগতের সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, ঘনীভূত বিপদরাশি স্বামীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, স্বীয় ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন ও শেষে স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, যমের সহিত লড়াই করিয়া তাঁহাকে তাহার মুখ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছেন। যৌবনের উদ্দামতায় অমরেন্দ্রনাথ সাধ্বীর এ পতিভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইলেও, রোগশয্যা ত্যাগ করিবার পর বুঝিয়াছিলেন যে, সম্মুখীন পর্ব্বতপ্রমাণ বিপদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, যখন তিনি আত্মহত্যার আশ্রয় লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন একমাত্র সহধর্ম্মিণীর পুণ্যবলই তাঁহাকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। যে পত্নী তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে

যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য ভাবিও না—তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ, তোমার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি। তোমায় কেহ পর করিতে পারিবে না। আমি তোমার পদসেবার দাসী, চিরদিন দাসীই থাকিব। শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর; আমার কোন দুঃখ নাই।"—সে পত্নীকে যে প্রাক্তনোর্জ্জিত বহু পুণ্য-বলেই লাভ করা যায়, এ কথা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। তাই 'অভিনেত্রীর রূপে' লিখিয়াছিলেন ঃ—

"হিন্দুর সর্ব্বস্ব গিয়াছে বটে, হিন্দু আজ দীনহীন পথের ভিখারী বটে, হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম কালমাহাত্ম্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের গর্ব্ব করিবার যাহা আছে,—আজ পর্য্যন্ত যে অমূল্য রত্নের তাহারা অধিকারী, তাহার তুলনায়—শত সহস্র সাম্রাজ্য তুচ্ছ—নগণ্য—তৃণাদপি ক্ষুদ্র!! সে সামগ্রী আর কিছুই নহে—দুর্গার (হেমনলিনীর) মত পতিপ্রাণা—আত্মত্যাগপরায়ণা—সতীকুলরাণী—হিন্দুরমণী!!"

কিন্তু কথাটা তিনি বুঝিলেন বড় দেরীতে। হেমনলিনী রক্তমাংস-গঠিতা মানবী তো বটে! বাহিক প্রফুল্লতার ভাব দেখাইলেও, মুখের হাসিটী মুখে লাগিয়া থাকিলেও, অহর্নিশি তুষের আগুনে পুড়িয়া, তাঁহার শরীর অন্তঃসারশূন্য হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর স্বামীর রোগে, নিজের-জীবন-তুচ্ছ-করা সেবায়, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাছে সদ্যঃ-সুস্থ স্বামীর দুশ্চিন্তা হয়, এই ভয়ে তিনি নিজের কথা কাহাকেও জানাইলেন না;—বিনা চিকিৎসায় দিন দিন শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আবার এ সময় পূর্ব্ব-হতাদরের জন্য অনুশোচনা-সন্তপ্ত স্বামীর নিকট হইতে বিগত স্ফুটনোন্মুখী যৌবনকালের মত আদর তাঁহার দুর্ব্বল দেহে ও মনে সহ্য হইল না। 'আমার কপালে ভগবান্ এত সুখ লিখিয়াছেন!' শেষে

স্বামীকে ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীরূপে পুনরায় সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার পর, তাঁহার শরীর আর বহিল না,—আর পারিলেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অমরেন্দ্রনাথ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ, সাধু, সন্ন্যাসী, ওঝা, বুজরুক, তুকতাক—জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া কত চিকিৎসাই হইল, কিন্তু সে কাল গ্রহিণী রোগ সারিল না। আত্মীয়-স্বজন, পুত্র, পরিবার সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, হেমনলিনী সুরধামে প্রয়াণ করিলেন।

সেদিন ১৩ই মে, মঙ্গলবার, ১৯১৩ খৃঃ (বাংলা ৩০শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল)। প্রত্যূষেই হেমনলিনীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল—মুমূর্ষুর শেষ দশা উপস্থিত। তাহার পর কি হইল, পাঠকবর্গ অমরেন্দ্রনাথের ভাষাতেই শুনুন :—

"প্রলয়ের প্লাবন বুকে পুরিয়া, টলিতে টলিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে অমরেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়া পঁহুছিলেন। তিনি বহির্ব্বাটীতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, একেবারে রোগিনীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে পবিত্র, উদার, মহান্, অলৌকিক, মর্ম্মস্পর্শী, হৃদিতন্ত্রী-কম্পিতকারী স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন, মানবজন্ম ধারণ করিয়া খুব কম লোকেরই বোধ হয়, সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে!

"মৃত্যুশয্যায় হেমনলিনী শায়িতা, দৃগ্যনেত্র নির্মীলিত,—সন্ধ্যার মন্দ পবন আসিয়া গৃহের দীপশিখাকে যেমন ধীরে ধীরে কম্পিত করে, সেই সতী সাবিত্রীর কমললোচনদ্বয় এক একবার অতি সন্তর্পণে সেইরূপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; মহিমার দর্পণ সুগঠিত ললাটে চন্দন-খচিত 'রামকৃষ্ণ' নাম,—জীর্ণ, ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, আশাহীন, আলোকহীন, সুখহীন, শান্তিহীন বক্ষের উপর অমরেন্দ্রনাথের একখানি প্রতিমূর্ত্তি;—তাহার

উভয় শীর্ণ, লাবণ্যহীন, দুইখানি বাহু পরস্পর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, যেন এ অবস্থাতেও সেই শাপভ্রষ্টা দেবী অমরেন্দ্রনাথের সেই ফটোগ্রাফখানি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে! শিয়রে রোরুদ্যমান অমরেন্দ্রনাথের মাতা, পদতলে ভাগ্যহীন সন্তান! চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে আর 'মা' 'মা' করিয়া বুকের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে! সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য অবলোকন করিলে পাষাণও গলিয়া যায়।

"মন্ত্রমুগ্ধবৎ, যন্ত্রপুত্তলীর ন্যায় অমরেন্দ্রনাথ পত্নীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মাতা প্রাণপণ আগ্রহে ডাকিতে লাগিলেন— "বউ মা! বউ মা! একবার চেয়ে দেখ—কালু এসেছে!"

"মরা গাঙ্গে বহুকাল পরে হঠাৎ বান আসিলে ক্ষুদ্র বেলাভূমি যেমন প্রাণের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারে না, চির অন্ধকারময় কারাগৃহে পূর্ণিমার কিরণ পড়িলে সে যেমন উল্লাসে উছলিয়া উঠে, চিরদরিদ্র লক্ষপতি হইলে সে যেমন হৃদয়ের অধীরতায় অধৈর্য্য হইয়া পড়ে,—হেমনলিনীর ম্রিয়মান, মলিন, শ্রীহীন, সংজ্ঞাহীন প্রাণটুকুও যেন সেইরূপ ফুলিয়া ফুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, উঠিয়া বসিতে চাহিল,—কিন্তু হায়! পারিল কই? কথা আর ফুটিল না, চোখ আর মেলিল না, ঘুম আর ভাঙ্গিল না, স্বপ্ন আর টুটিল না! নশ্বর দীপশিখা কালের ফুৎকারে চিরজন্মের মত নিভিয়া গেল! সৃষ্টির অঙ্কুর মুকুলেই বিনষ্ট হইল! মঙ্গলময় জগদীশ্বর আপনার বড় যত্নের সামগ্রী কোল পাতিয়া তুলিয়া লইলেন। এই শোকাবহ চিত্র অঙ্কিত করিতে লেখকের অকিঞ্চিৎকর লেখনীর সামর্থ্যে আর কুলাইতেছে না। পাঠক! কল্পনার চক্ষে স্পন্দিত বক্ষে মহানাটকের শেষ পটক্ষেপণ অবলোকন করুন। এই পুণ্যবতী সতীর কণামাত্র চিতাভস্ম যিনি স্বুবর্ণকৌটায় রক্ষা করিতে পারিবেন, সংসারের তাপ ও দাপ তাঁহাকে কখনও ব্যথিত করিতে পারিবে না।

"যাও সাধ্বি! তোমার কর্ম্মের অবসান! শাপাবসানে নিজের ঘরে হাসিমুখে ফিরিয়া যাও। এই জটিল, কুটিল, স্বার্থপূর্ণ সংসার কি তোমার আবাসস্থল, দেবি? সাবিত্রী পারিজাতমালা লইয়া তোমার জন্য স্বর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, সীতা স্বর্ণসিংহাসন ছাড়িয়া তোমার আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, শৈব্যা তোমার পবিত্র অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য আকুল-অন্তরে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, ত্রিদিবের দেবদেবীগণ মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া তোমার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন; যাও দেবি! তোমার আসন তুমি গিয়া অধিকার কর,—আমরা দূর হইতে তোমার অমর স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, করযোড়ে তোমায় বার বার প্রণাম করি!"

"অমরেন্দ্রনাথের বুকে ঝড় বহিতে লাগিল, কিন্তু টলিলেন না; নয়নে সমুদ্র উছলিয়া উঠিল, কিন্তু একবিন্দুও অশ্রু ফেলিলেন না; দেবতার উপর অভিমান করিয়া দুটো কথা বলিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া গেল কিন্তু একটা কথাও বলিলেন না। শেষে বড় জ্বালায়, বড় যন্ত্রণায় মর্ম্মান্তিক বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া", কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ফিরিয়া, শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

বৈকালে, পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ যখন জননীর শেষ কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিলেন, তখন দরজা খুলিয়া বাহিরে আসার পর তাঁহার চেহারা দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রকে দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথের শোকের রুদ্ধ প্রস্রবণ মুক্ত হইল। তাঁহার মত বয়স্ক লোকের মুখে বালসুলভ করুণ বিলাপে আত্মীয়স্বজন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। শেষে, তাঁহার মধ্যমাগ্রজ* হীরেন্দ্রনাথ গিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার পর, শোকের বেগ প্রশমিত হইল। তাঁহার তৎকালীন মনোভাব বুঝাইবার জন্য, তিনি যে পত্রখানি ১৫ই মে তারিখে তাঁহার

সহপাঠী ও আবাল্যের সঙ্গী শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

সতীশ!

তোমার পত্র পাইয়াছি। পত্র পড়িয়া খুব খানিকটা কাঁদিলাম। একটু উপকারও হইল। গুম্‌রে গুম্‌রে মরিতেছিলাম,—অনেক সাধনাতেও প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিতেছিলাম না,—মনে হয়, বুঝি উন্মাদ হইব!—কিন্তু তোমার প্রত্যেক অক্ষর, আমার অজস্র অশ্রুধারায় বুক ভাসাইয়া দিয়াছে। আঃ—একটু শান্তি যেন এল!!

ভাইরে! কি সামগ্রী হারালুম, কি অমূল্য কোহিনূর নিষ্ঠুর কাল ছিনাইয়া লইল, ওঃ—কাকে বল্‌বো? কে বুঝবে? জীবনের কৈশোর হইতে, তুমি আমার সব জানো। এত কথা, কেউ জানে না।—বুক ভেঙ্গে গেছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই প্রত্যক্ষ জগদ্ধাত্রীরূপিণী, পুণ্যপ্রতিমা, সতী-সাধ্বীর কিঙ্করের কিঙ্কর হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি। সে পুণ্যবতী দেবী! যেখান হইতে দুই দিনের জন্য খেলা করিতে আসিয়াছিল, সেইখানে চলিয়া গিয়াছে। আমার বড় সাধ,—একমাত্র সাধ,—সেই মহিমাময়ী মূর্ত্তি আজ যে লোকে গিয়া—সগর্ব্বে, সহাস্যবদনে, সংসারের শোকতাপ পদদলিত করিয়া, শতদলশোভিতা, সিংহাসনারূঢ়া হইয়া, দেবদেবীবেষ্টিত আসনে বিরাজমানা, আমি যেন এক দিনের জন্যও তাহার চামরব্যজনকারী হইয়া, এ পাপজীবন সফল করিতে পারি।

বিবাহের কথা, 'হেমনলিনী' কবিতার কথা, আপিস হইতে আসিয়া উপরে যাইবার জন্য আগ্রহ,—এ সমস্ত কথা আজ ঠিক সময়ে—ঠিক মুহূর্ত্তে তুমি উল্লেখ করিয়াছ! তাই আজ প্রাণ ভ'রে কেঁদেছি। তেমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারি নাই বলিয়া—বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাল্যের মধুর স্মৃতির মধুর কাহিনী বাল্যবন্ধুর নিকট হইতে যথাসময়ে আসিয়া, আজ রুদ্ধ প্রস্রবণ ছুটাইয়া দিয়াছে। * * কিন্তু আমি যে যাই,—এ চোট বরদাস্ত করিতে পারিতেছি না!! যে সতী-সাধ্বীর চিতা এখনও সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, পার্থিব জগতে স্বার্থের তাড়নে, যাহাই হউক, কিন্তু প্রাণের প্রাণের ভিতর তুমি আছ।

অভাগা

অমর—

পূর্ব্ব ব্যবহারজনিত অনুশোচনা ও পত্নী বিয়োগের এই দাবাগ্নি জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে অমরেন্দ্রনাথ 'অভিনেত্রীর রূপে'র উৎসর্গপত্রে লিখিলেন :—

"দেবি!

যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী ক'রে! ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব,—তাহারো দিলে না অবকাশ?

দেবতার মত তুমি নিশ্চল—নিষ্ঠুর !
অমোঘ তোমার দণ্ড—কঠোর বিধান।"

রত্ন-হারা

ভ্রান্ত পথিক ।

কিন্তু তাহাতে তো জ্বালার অবসান হয় না। কি উপায়ে স্মৃতির এ বৃশ্চিক দংশন হইতে আত্মরক্ষা করা যায়? অমরেন্দ্রনাথ কর্ম্মসাগরে ডুব দিলেন। রঙ্গালয়ে নিত্য নূতন ভূমিকা অভিনয় করিয়া, বঙ্গদেশকে অন্তহীন নবরঙ্গে ভাসাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে সুরার মাত্রাও বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। জীবনের উপর বীতস্পৃহ হইয়া তিনি তিলে তিলে আত্মহত্যায় উদ্যত হইলেন। কিন্তু বিধাতার বিরুদ্ধে অভিমান ও অভিযোগ তাঁহার মন হইতে মুছিল না। পত্নীর মৃত্যুর দেড় বৎসর পরে, তিনি ১৩২১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা নাট্যমন্দিরে 'অনুতাপ' শীর্ষক কবিতায় লিখিলেন :—

১

সত্য বল—মত্ত মন ! সুধাই তোমায়।
জীবন প্রবাহ মোর কোন্ পথে ধায় ?
সুখ অন্বেষণে রত, আছিলাম অবিরত,
আত্মতৃপ্তি হেতু বল কোন্ কার্য্য আছে।
সাধিবারে—শতবার ছুটি নাই পাছে ?

২

শৈশবে মায়ের কোলে কেটে গেছে দিন।
মলিন না ছিল প্রাণ, যবে সঙ্গীহীন ॥

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে, চাহিয়া সংসার পানে,
দেখিনু চলেছে স্রোত—'আমার—আমার'।
স্বর্ণ লয়ে সহোদরে করে মহামার ॥

৩

কামিনী কাঞ্চন ল'য়ে খেলিনু যৌবনে।
ভাবিলাম—কত সুখ পাব মনে মনে ॥
প্রেমের ছলনা করি, ঘোরে যত নিশাচরী,
বিষধরী বারে বারে করিল দংশন।
নিদ্রা অবসানে পুন লভিনু চেতন ॥

৫

মিষ্টভাষে তুষ্ট করি যত বন্ধুগণ।
বাল্যের সে দাবী লয়ে—পাতিল আসন ॥
যা কিছু আমার ছিল, দুই হাতে লুটে নিল,
পলাইল,—আর নাহি আসিল আবাসে।
বিচিত্র সে মিত্র প্রেম! ভেবে হাসি আসে ॥

৫

ভ্রান্ত হয়ে শ্রান্ত চিত্তে চাহি চারিধার।
কণামাত্র আলো নাই, সকলি আঁধার ॥
আঁকড়িয়া ধরিবার, কিছু নাহি পাই আর,
কানে কানে কে যেন রে কহিল আমার।
'পায়ে ঠেলে—দেছ ফেলে—যে ছিল তোমার ॥'

৬

চমকিয়া চাহিলাম বুকের ভিতর।
দেখিলাম, পড়ে আছে শুধু শূন্য ঘর ॥

আমার যে সুখে সুখী, আমার যে দুখে দুখী,
জীবনে জীবন—মোর মরণে মরণ,—
ছিল যেই—গেছে সেই—পেয়ে অযতন ॥

৭

চিনি নি তখন তারে—দেবী সে আমার।
'সোনার কমল'* সেই—পারিজাত হার ॥
ফিরিবার নহে দিন, ছি-ছি—আমি অতি হীন,
ক্ষণেকের তরে যদি তুষিতাম তারে।
স্বর্গসুখ আনিতাম স্বার্থের সংসারে ॥

৮

তুমি দিয়েছিলে বিধি! তুমিই লয়েছ।
অনাদরে ছিল পড়ে—যতনে রেখেছ ॥
শুনি তুমি অন্তর্য্যামী, কি দোষ করেছি আমি,
কেন না ঘুচালে মোর মোহ আবরণ।
কেন না চিনিনু আমি—আমার সে ধন ॥

---

* হেম=সোনার, নলিনী=কমল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—:০:—

জীবন-নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয়

(১৯১৩-১৯১৫)

পত্নীবিয়োগের জ্বালা ভুলিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ অসীম কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়া দর্শকসমাজে কি হুলুস্থূল উপস্থিত করিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্য আমরা ষ্টার থিয়েটারের সে সময়কার একখানি হ্যাণ্ডবিল হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি :—

"নাট্যজগতে এমন সৌভাগ্য কবে—কাহার হইয়াছে? প্রতিদিন—দলে দলে ভদ্রমহোদয়গণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছেন,—'ষ্টারে আগামী শনিবার ও রবিবারে কি কি নাটকাভিনয় ধার্য্য হইল?' জানিবার জন্য সকলেই মহাব্যস্ত—মহাউৎসুক—মহাউৎকণ্ঠিত!! সকলেই আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন—'এই শনিবার ও রবিবারে আবার একটা কি নূতন রকম ব্যাপার দেখিব!!' হে শুভানুধ্যায়ী সহৃদয় সুহৃদবর্গ! সে কথা অতি সত্য বটে! এবার আপনাদের জন্য নূতনের উপর—এমন কিছু একটা নূতন রকমের ব্যবস্থা করিব—যাহা আজীবন আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণে প্রাণে গাঁথা থাকিবে!!"

এ দম্ভোক্তি যে কতখানি সত্য, তাহা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বাকী মাত্র সাত মাসের মধ্যে ষ্টারে প্রথম পুনরভিনীত নাটকের সংখ্যা হইতে

সহজেই বোঝা যায়। আমরা নিম্নে সেই সকল নাটকের নাম, প্রথম পুনরভিনয় রজনীর তারিখ ও প্রধান ভূমিকাগুলির পরিচয়লিপি দিলাম :—

(১) মাধবী-কঙ্কণ :—২৪শে মে ;—নরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নবকুমার—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, সাজাহান—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ঔরংজেব—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, হরেন্দ্র খুড়ো—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মসরুর—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, গজপতি—হীরালাল দত্ত, জেলেখা—সুশীলাবালা, হেমলতা—বসন্তকুমারী, শৈবলিনী—নরীসুন্দরী, জাহানারা—রাণীসুন্দরী, মহামায়া—মৃণালিনী।

এই সময় ক্ষেত্রমোহন মিত্র ষ্টারে পুনর্নিযুক্ত হন।

(২) কপালকুণ্ডলা :—১লা জুন ;—নবকুমার—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাপালিক—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, জাহাঙ্গির—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মতিবিবি—কুসুমকুমারী, কপালকুণ্ডলা—বসন্তকুমারী, পেশমান—সুশীলাবালা, মেহেরউন্নিসা—নরীসুন্দরী।

এই সময় কুসুমকুমারী গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল ছাড়িয়া, ষ্টার থিয়েটারে যোগ দেন।

(৩) চাঁদবিবি :—১৪ই জুন ;—রঘুজী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, (পরে সুশীলা), আদিল শা—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, ইব্রাহিম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মল্লজী—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, দেলওয়ার খাঁ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হামিদ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, এখলাস খাঁ—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, নেহাঙ খাঁ—হীরালাল দত্ত, মুরাদ—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মিয়ানমঞ্জু—অটলবিহারী দাস, বাহাদুর—হেমন্তকুমারী, চাঁদবিবি—কুসুমকুমারী, যোশীবাই—সুশীলাবালা (পরে তিনকড়ি), মরিয়ম—বসন্তকুমারী, ফয়জান—নরীসুন্দরী, তাজ বেগম—চারুবালা।

(৪) পূর্ণচন্দ্র :—১৪ই জুন ;—পূর্ণচন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গোরক্ষনাথ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, দামোদর—মনোমোহন গোস্বামী, শালিবাহন—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, লুনা—কুসুমকুমারী, সুন্দরা—বসন্তকুমারী, সারী—বিষাদ কুসুম (পরে নরীসুন্দরী)।

এই সময় মিনার্ভা হইতে হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য আসিয়া অমরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া, শিক্ষকতার ভার হইতে তাঁহাকে কতকাংশে নিষ্কৃতি দেন।

(৫) দুর্গেশনন্দিনী :—২৮শে জুন ;—ওসমান—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগৎসিংহ—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্রসিংহ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাদিগ্‌গজ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রহিমশেখ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, অভিরাম স্বামী—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, কৎলু—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, আয়েষা—কুসুমকুমারী, বিমলা—সুশীলাবালা, তিলোত্তমা—নলিনীবালা।

(৬) নবীন তপস্বিনী :—৫ই জুলাই ;—রতিকান্ত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জলধর—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনায়ক—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মালতী—কুসুমকুমারী, মল্লিকা—সুশীলাবালা, কামিনী—বসন্তকুমারী, রাণী—নরীসুন্দরী, জগদম্বা—পান্নারাণী।

(৭) দেবী চৌধুরাণী :—১২ই জুলাই ;—ব্রজেশ্বর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরবল্লভ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ভবানী পাঠক—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, রঙ্গরাজ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বেনাম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, দেবীরাণী—কুসুমকুমারী (পরে তিনকড়ি), নিশি—সুশীলাবালা, দিবা—হেমন্তকুমারী, নয়ানবৌ—নরীসুন্দরী, সাগরবৌ—বসন্তকুমারী, গোবরার মা—কুমুদিনী।

(৮) বিষাদ :—১৯শে জুলাই ;—অলর্ক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত,

শিবরাম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মাধব—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, জিৎসিং—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী—কুসুমকুমারী, উজ্জ্বলা—সুশীলাবালা, সোহাগী—বসন্তকুমারী।

(৯) বঙ্গবিজেতা :—২রা আগষ্ট ;—ইন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ—সুশীলাবালা, টোডরমল—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, সতীশচন্দ্র—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, শকুনি—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, বিমলা—কুসুমকুমারী, মহাশ্বেতা—নরীসুন্দরী, কমলা—বসন্তকুমারী, বিশু পাগলী—রাণীসুন্দরী।

(১০) মুকুলমুঞ্জরা :—৯ই আগষ্ট ;—বরুণচাঁদ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জয়ধ্বজ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রধ্বজ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ভজনরাম—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মুকুল—কুসুমকুমারী, তারা—সুশীলাবালা, মুঞ্জরা—বসন্তকুমারী, চামেলী—নরীসুন্দরী।

(১১) জনা :—১৬ই আগষ্ট ;—নীলধ্বজ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, প্রবীর—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিদূষক—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অর্জ্জুন—মনোমোহন গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, অগ্নি—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, গঙ্গারক্ষক—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, জনা—তিনকড়ি, নায়িকা—সুশীলাবালা, মদনমঞ্জরী—কুসুমকুমারী, স্বাহা—বসন্তকুমারী, ব্রাহ্মণী—নরীসুন্দরী।

এই দিন হইতে তিনকড়ি ষ্টারে যোগদান করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর, অমরেন্দ্রনাথ জনায় বিদূষক সাজিয়া দর্শকগণকে এক আশ্চর্য্য ছবি দেখান।

(১২) সীতারাম :—৩০শে আগষ্ট ;—সীতারাম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, গঙ্গারাম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, চাঁদশা—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রচূড়—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, ফৌজদার শ্যালক—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নায়েব

জমাদার—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রী—তিনকড়ি, জয়ন্তী—সুশীলাবালা, রমা—কুসুমকুমারী, নন্দা—রাণীসুন্দরী।

এই রজনীতে অমরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলায়ও প্রতিবেশীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

(১৩) শঙ্করাচার্য্য :—২০শে সেপ্টেম্বর ;—শঙ্কর—কুসুমকুমারী, (১ম ও ২য় অঙ্ক), সুশীলাবালা (৩য় ও ৪র্থ অঙ্ক) ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (৫ম অঙ্ক), অমরক—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মণ্ডন মিশ্র—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শিউলী—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বৌদ্ধ কাপালিক—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, রামদাস—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, সনন্দন—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ—অটলবিহারী দাস, শান্তিরাম—হীরালাল দত্ত, গণপতি—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, উগ্রভৈরব—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, মহামায়া—নরীসুন্দরী, সরমা—বসন্তকুমারী, বিশিষ্টা—পান্নারাণী, উভয়ভারতী—চারুবালা, শিউলিনী—পুঁটুরাণী।

অতঃপর, ২রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, অমরেন্দ্রনাথের বেনিফিট নাইট উপলক্ষে দুর্গেশনন্দিনী, আবুহোসেন ও মৃণালিনী অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এ রজনীতে দানিবাবু পুনরায় ষ্টারে আসিয়া অভিনয় করেন। দুর্গেশনন্দিনীতে দানিবাবু ওসমান, অমরেন্দ্রনাথ জগৎসিংহ, তিনকড়ি বিমলা, সুশীলাবালা তিলোত্তমা ও নরীসুন্দরী আশমানী সাজেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি পূর্ব্ববৎ অভিনীত হয়।

(১৪) মৃণালিনীর ভূমিকালিপি এই :—হেমচন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, পশুপতি—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), মাধবাচার্য্য—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ব্যোমকেশ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হৃষিকেশ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, দিগ্বিজয়—হীরালাল দত্ত, গিরিজায়া—সুশীলাবালা, মৃণালিনী—বসন্তকুমারী, মনোরমা—কুসুমকুমারী, রত্নময়ী—চারুবালা, মণিমালিনী—হেমন্তকুমারী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ সময়ে ভাল নূতন ভূমিকার অভাবে দানিবাবুর নাম কিছু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই রজনীতে ওসমানের ভূমিকায় তিনি যে অসামান্য কলানৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তাহা যথার্থই অতুলনীয়। অমরেন্দ্রনাথের অভিনীত ওসমানের অপেক্ষা তিনি ত' উৎকৃষ্টতর অভিনয় করেনই, উপরন্তু অমরেন্দ্রনাথ যে তাঁহার বেনিফিট উপলক্ষে মিনার্ভায় গিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহার প্রতিশোধ লন। কারাগারে কথোপকথনরত আয়েষা ও জগৎসিংহকে দেখিয়া, ওসমান-রূপী দানিবাবুর মুখে 'নয়ন অন্ধ হও!' শুনিয়া, দর্শকগণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া যান। আবার জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানকল্পে তিনি যখন বলেন,—"আসুন, আসুন, আমার প্রয়োজন আছে;" তখনকার তাঁহার মুখ ও অঙ্গভঙ্গী দর্শনে প্রেক্ষাগৃহে যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠে, তাহা এখনও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। তাহা শুনিয়াই বোধ হয়, পরের দৃশ্যে, জগৎসিংহরূপী অমরেন্দ্রনাথ যে অভিনয় করিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। বঙ্কিমের ভাষায়, ওসমান কর্ত্তৃক পদাহত জগৎ-সিংহের "আর ধৈর্য্য রহিল না। শীঘ্রহস্তে ত্যক্ত প্রহরণ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া শৃগালদংশিত সিংহবৎ প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া রাজপুত্র যবনকে আক্রমণ করিলেন।" তাহাকে পরাজিত করিয়া, "নিজ-করস্থ প্রহরণ তাহার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "কেমন সমর সাধ মিটিয়াছে ত?" যিনি সে অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি অবশ্যই মানিবেন যে, বঙ্কিমের কল্পিত ও অমরেন্দ্রনাথের প্রদর্শিত জগৎসিংহে কোন পার্থক্য ছিল না।

অমরেন্দ্রনাথ ও দানিবাবুর এই অভিনয় প্রতিযোগিতা শুনিয়া, কেহ যেন না মনে করেন যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা বা দ্বেষ

পোষণ করিতেন। অবস্থা বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীতই ছিল। বাল্য-সুহৃদ হিসাবে উভয়েই উভয়কে ভালবাসিতেন এবং পরস্পরের মঙ্গলের জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট ছিলেন। দানিবাবু প্রায়ই আসিয়া মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত অভাব অভিযোগ অমরেন্দ্রনাথকে জানাইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, ইহার প্রায় বছর খানেক পূর্ব্বে মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর পর মনোমোহন বাবু একাকী মিনার্ভা চালাইতেছিলেন। তিনি স্বত্বাধিকারী হইয়া প্রথমে দানিবাবুকে ম্যানেজার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু শেষে দানিবাবু ব্যতীত তাঁহার থিয়েটার চলিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তাঁহাকেই অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত করিয়াই মনোমোহন বাবু ক্ষান্ত হইলেন—দানিবাবুর বিষয়ে আর কোন বিবেচনা করা প্রয়োজন বোধ করিলেন না। শেষে এই পূজার সময়ে, দানিবাবুর পত্নীর ব্যাধি উপলক্ষে, তিনি বাহিরে যাইতে চাহিলে, মনোমোহন বাবু তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করিলেন, তাহাতে দানিবাবু ভীষণ বিরক্ত হইয়া, অমরেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন ও তাঁহাকে ষ্টার থিয়েটারে লইতে অনুরোধ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সমস্ত কথা অবগত হইয়া, নিজে খরচ দিয়া দানিবাবুকে কাশীতে চেঞ্জে পাঠাইয়া দিলেন ও তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, পত্নীর রোগ মুক্তির পর দানিবাবু কলিকাতায় ফিরিলে তিনি ষ্টারে নিযুক্ত হইবেন,—মাহিনা ৫০০৲ ও বোনাস ৫০০০৲। অমরেন্দ্রনাথ মাত্র শনিবার সাজিবেন—বুধ ও রবিবার দানিবাবু। ইহার কয়েক দিন পরে, পাকা লেখাপড়া করিবার জন্য, অমরেন্দ্রনাথ বোনাসের ৫০০০৲ টাকা লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। এমন সময়ে এ সংবাদ মনোমোহন বাবুর নিকট পঁহুছিল। শোনা যায় তিনি স্পেশাল ট্রেণ ভাড়া করিয়া, দিলদারনগরে গিয়া অমরেন্দ্রনাথকে ধরেন,—বলেন,

"আপনার একার নামেই আপনার থিয়েটারে প্রতি অভিনয় রাত্রে ফুল হাউস সেল হইতেছে—ইহার চেয়ে অধিক বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা আছে কি? অনর্থক আপনি দানিবাবুকে লইয়া, আমার ব্যবসায়ের হন্তারক হইতেছেন কেন? দানিবাবু না থাকিলে, আমাকে থিয়েটার তুলিয়া দিতে হইবে। আপনি আমার বন্ধু, আমার এরূপ সর্ব্বনাশ করা আপনার উচিত কি? এতদিনের বন্ধুত্ব এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন করাই কি যুক্তিসঙ্গত? আপনার এ কাজে কোন লাভ নাই, অথচ আমার সমূহ ক্ষতি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনি কাজ করুন।"

উত্তরে অমরেন্দ্রনাথ মনোমোহনবাবুকে দানিবাবুর সমস্ত অভিযোগ জানান ও বলেন যে, "আমি দানিকে তাহারই অনুরোধে কথা দিয়াছি যে তাহাকে আমার থিয়েটারে লইব; সুতরাং আপনি তাহার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা না করিলে, আমি আমার বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারি না।" শেষে মনোমোহনবাবু দানিবাবুকে লাভের তিন আনা অংশ দিতে স্বীকৃত হইলে, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। তখন মনোমোহনবাবু অমরেন্দ্রনাথকে দিয়া, তাঁহার পৈতা ছোঁয়াইয়া শপথ করাইয়া লন যে শুধু এখন নয়, ভবিষ্যতেও কখন অমরেন্দ্রনাথ এরূপ সঙ্কল্পকে মনে স্থান দিবেন না। এইরূপে দানিবাবুর ষ্টারে আসা পণ্ড হইয়া যায়। তা যাউক্—প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা সত্ত্বেও বিদ্বেষ পোষণ করা দূরের কথা, বাল্যসুহৃদের প্রতি অমরেন্দ্রনাথের ভালবাসা ও শুভার্থে প্রচেষ্টা প্রদর্শন করানই আমাদের এ ঘটনা উল্লেখের কারণ। আশা করি, তাহাতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে আবার ষ্টারের কথাই চলুক।

অতঃপর ১লা নভেম্বর, ষ্টারে, অমরেন্দ্রনাথের নবরচিত রঙ্গ-

নাট্য 'রোকশোধ' প্রথম অভিনীত হয়। সে রজনীর অভিনেতৃ-বৃন্দ :—

নৃত্যগোপাল—হীরালাল দত্ত, শিবহরি—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, রামদাস—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রাধানাথ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিলাস—সুশীলাবালা, শেফালী—কুসুমকুমারী, রমাসুন্দরী—নরীসুন্দরী।

ইহার পর, ৮ই নভেম্বর (১৫) প্রণয় পরীক্ষা ও ১৫ই নভেম্বর (১৬) রাণী দুর্গাবতীর অভিনয় হয়। অক্টোবরের শেষ হইতে দানিবাবু সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ও অসুস্থতানিবন্ধন অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া, এই দুই নাটকে তিনি কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, তবে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ২২শে নভেম্বর তিনি 'প্রণয় পরীক্ষা'য় শান্তবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে মানসিক অশান্তি ও অত্যধিক পরিশ্রম-বশতঃ এই যে অমরেন্দ্রনাথকে স্বাস্থ্যোন্নতিমানসে ঘন ঘন কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইত, ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে হইলেও, এতদ্ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন সংবাদে যেখানে ২১০০৲।২২০০৲ টাকার সেল হইত, সেখানে হাণ্ডবিলে তাঁহার নামের অভাবে বিক্রয় কমিয়া গিয়া ৬০০৲।৭০০৲ টাকায় দাঁড়াইত। যাহাতে সেল না কমে, তজ্জন্য তিনি সকলকে কি করা উচিত—সে বিষয়ে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়া যাইতেন, কিন্তু থিয়েটারে দলাদলির প্রাবল্যে প্রত্যেকেই নিজের প্রাধান্য স্থাপনে সমুৎসুক হইতেন বলিয়া, আসল কাজের কিছু করিতেন না। শেষে অমরেন্দ্রনাথ ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত নীতি "Divide and Rule"-এর আশ্রয় লইলেন। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মনোমোহন গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যেককেই

আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া যান, "দেখো, একমাত্র তোমারই উপর আমি নির্ভর করিতেছি। আর কাহারও দ্বারা কিছু হইবে না। আমার অনুপস্থিতিকালে যাহাতে থিয়েটারের কোন ক্ষতি বা গণ্ডগোল না হয়,—সে ভার তোমার!" প্রত্যেকেই স্ফীতবক্ষে ভাবেন,—"ওঃ, তাহা হইলে আমিই ত' কর্ত্তা!" পরস্পরে টক্কাটক্কি বাধে, তবে প্রত্যেকেই অমরেন্দ্রনাথ একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছেন ভাবিয়া, গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে, এ উহার নামে অভিযোগ করিয়া, অমরেন্দ্রনাথের নিকট পত্র লেখেন। সকলের মিলিত পত্র হইতে যথার্থ অবস্থা বুঝিয়া লইতে তাঁহার কষ্ট হয় না; ভেদনীতির সার্থকতা দেখিয়া মনে মনে খুব হাসেন ও প্রত্যেককে তাহার মন রাখিয়া পত্রের উত্তর দেন। শেষে কাহারও অত্যধিক কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শনবশতঃ অবস্থা অচল হইবার উপক্রম হইলে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। অদ্যাবধিও এমন লোক আছেন, যিনি স্বীয় স্ফীত মস্তিষ্ক ও আত্মগরিমা-বশতঃ মনে করেন যে, অমরেন্দ্রনাথ যখন স্থানান্তরে থাকিতেন, তখন ষ্টার থিয়েটার পরিচালিত হইত তাঁহারই বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতায়। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের থিয়েটারই বা চালাইতে পারিলেন না কেন ও অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ ষ্টারের স্বত্বাধিকারী পরিবর্ত্তন হইলই বা কেন? যথার্থ ই যদি অন্য কাহারও মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের মত কার্য্যকরী বুদ্ধির কণামাত্রও থাকিত বা যথার্থ ই যদি কেহ সে ভেদনীতির মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য রাখিতেন, তাহা হইলে আজ তিনিও নাট্যজগতে একজন 'কেওকেটা' হইতে পারিতেন। যাহা হউক্, এ বিষয়ে বিস্তার করা বাহুল্য মাত্র।

কলিকাতায় ফিরিয়া অমরেন্দ্রনাথ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক 'জয় পতাকা' রিহার্সালে ফেলেন ও ২৪শে ডিসেম্বর, উহা মহাসমারোহে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি :—

প্রিয়লাল রায়—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দর্পনারায়ণ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, কেশব—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, জগা—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচাঁদ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, পাগলা ঠাকুর—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, কিশোরী—হীরালাল দত্ত, সরমা—কুসুমকুমারী, বামুনদিদি—সুশীলাবালা, যমুনা—নরীসুন্দরী।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, রামলালবাবুর আর একখানি নূতন গীতিনাট্য 'মায়াপুরী' অভিনীত হইবার পর, আবার ষ্টারে পুনরভিনয়ের স্রোত চলে। আমরা নিম্নে তাহার তালিকা দিতেছি :—

(১) পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস :—১৮ই জানুয়ারী ;—কীচক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভীম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বৃহন্নলা—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, দ্রৌপদী—তিনকড়ি।

(২) শরৎ সরোজিনী :—৩১শে জানুয়ারী ;—শরৎ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মতিলাল—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, সরোজিনী—কুসুমকুমারী, ভুবনমোহিনী—নরীসুন্দরী।

(৩) সীতাহরণ :—৩১শে জানুয়ারী ;—রাম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, লক্ষ্মণ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, বালি—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মা—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাবণ—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, জটায়ু—হীরালাল দত্ত, সীতা—কুসুমকুমারী, তারা—সুশীলাবালা।

(৪) অশ্রুমতী :—১৪ই মার্চ্চ ;—সেলিম—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতাপসিংহ—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, আকবর—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ফরিদ

—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অশ্রুমতী—কুসুমকুমারী, মলিনা—সুশীলাবালা, প্রতাপ মহিষী—নরীসুন্দরী।

এই সময়ে প্রকাশমণি ষ্টারে যোগদান করিয়াছিলেন।

(৫) লীলাবতী ঃ—৪ঠা এপ্রিল।

(৬) রাবণ বধ ঃ— ঐ।

(৭) দলিতা ফণিনী ঃ—১৮ই এপ্রিল ;—নরেন্দ্রনাথ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ্বনাথ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মোহন—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী (২য় রজনী হইতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু) সোরাবজী—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, রমাবাঈ—সুশীলাবালা, বিলাসবতী—কুসুমকুমারী।

এই সময়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) ষ্টারে যোগ দেন।

অতঃপর ৩০শে মে, ষ্টারে, অমরেন্দ্রনাথের নূতন গীতিনাট্য 'বড় ভালবাসি' প্রথম অভিনীত হয়। ইহার প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ ঃ—

পিয়ার—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেলোয়ার—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), আব্বাস—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সায়েদ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, রৌশন—হীরালাল দত্ত, হোসেন খাঁ—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, দেল্লেরা—সুশীলাবালা, বেলা—কুসুমকুমারী, সোফিয়া—নরীসুন্দরী।

আবার, ১৩ই জুন, রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে অমরেন্দ্রনাথ ও রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অভিমানিনী' নামক একখানি নাটিকার প্রথম অভিনয় হয়। তাহাতে হাঁদুবাবু ছিদাম, ক্ষেত্রবাবু দুখীরাম, কাশীবাবু রামলোচন, ধীরেনবাবু সিভিল সার্জ্জেন, কুসুমকুমারী চন্দরা, নরীসুন্দরী ললিতা ও মৃণালিনী রাধা সাজেন।

অভিমানিনীর দ্বিতীয়াভিনয় রজনী হইতে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং

ছিদামের অংশ গ্রহণ করেন। এই দিন (২০শে জুন) হইতে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মিনার্ভা হইতে ষ্টার থিয়েটারে ফিরিয়া আসেন ও বসন্তকুমারীও, কর্ম্মচ্যুতা হইয়া কিছুকাল গ্র্যাণ্ড ন্যাশানালে অভিনয় করিবার পর, ষ্টারে পুনর্নিযুক্তা হন।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না, এ সময়ে ষ্টারে কিরূপ অভিনেতৃ-সমাবেশ হইয়াছিল। দানিবাবু ও তারাসুন্দরী ব্যতীত তদানীন্তন রঙ্গজগতের সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই তখন ষ্টারে নিযুক্ত ছিলেন;—বোধ হয়, ক্লাসিকের আমলেও সেখানে এমন অপূর্ব্ব নটনটী-সমন্বয় হয় নাই। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, নৃত্যাচার্য্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, হাস্যার্ণব অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (যাঁহাদের মধ্যে একজনই হাস্যরসাভিনয়ে একটা থিয়েটার বজায় রাখিতে সক্ষম), পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), মনোমোহন গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন মিত্র, গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, হীরালাল দত্ত, কার্ত্তিকচন্দ্র দে, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নাট্যসম্রাজ্ঞী তিনকড়ি, নটকুলরাণী সুশীলাবালা, গায়িকাশ্রেষ্ঠা নরীসুন্দরী, নৃত্যগীতপটিয়সী কুসুমকুমারী, বসন্তকুমারী, রাণীসুন্দরী, পান্নারাণী, পুঁটুরাণী, চারুবালা প্রভৃতি সকলকে লইয়া অমরেন্দ্রনাথ তখন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, ইহার উপর আবার মিঃ পালিত, চুণিলাল দেব, আশ্চর্য্যময়ী প্রভৃতি জনকয়েক নটনটী আসিয়া ষ্টারে যোগদান করেন। সুতরাং তখন ষ্টারের প্রতাপ কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন প্রবল অভিনেতৃ-সম্মিলন সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথের নাম হাণ্ডবিলে না থাকিলে, বিক্রয় অসম্ভব রকম কমিয়া যাইত। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বিজয়রত্ন মজুমদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বাঙলা' অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দশ বৎসরাধিক কাল

পরে (১০ই আষাঢ়, ১৩৩৩; ইং ২৫।৫।২৬) যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

"৺অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি নটের শক্তির অভাব আদৌ ছিল না সত্য; কিন্তু ভাগ্য তাঁহাদের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই। **অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট—যাঁহার নামে দর্শক আকৃষ্ট হইত;** সম্প্রদায়ে অন্য অভিনেতা অভিনেত্রী যাহাই কেন করুক না, দর্শক একা অমরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেই 'ষোল আনা' পাইতেন। 'সব দোষ গুণ হৈল, বিদ্যার বিদ্যায়।' রঙ্গজগৎ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অমরেন্দ্রনাথের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি চাহিয়া থাকিত। এ সৌভাগ্য তখনকার কালে আর কাহার ছিল বলিয়া শুনা যায় না।"

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে অমরেন্দ্রনাথ যে নাট্যমন্দিরের সম্পাদকীয় ভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবিদিত নহে। এখন ১৯১৪ খৃঃ জুলাই মাসে তিনি 'থিয়েটার' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ষ্টার থিয়েটারের শনি ও রবিবারের হ্যাণ্ডবিল তুলিয়া দিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে 'থিয়েটার' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাহা মুদ্রিত করিয়া, ১৯১৪ খৃঃ ১০ই জুলাই, ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। এই ভাবে ৩।৪ মাস চলিবার পর, ইহার প্রচার ভয়ঙ্কর রকম বাড়িয়া যাওয়ায় ও ইহাতে বিজ্ঞাপনপ্রদানেচ্ছুর সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায়, অমরেন্দ্রনাথ 'থিয়েটারে'র প্রথম পৃষ্ঠায়, ষ্টারের অভিনয়-লিপির বদলে, সেই বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া, পুনরায় হ্যাণ্ডবিলের প্রচলন করেন ও পত্রিকার এক পয়সা মূল্য ধার্য্য হয়। কিন্তু তাহাতেও ইহার খরচ উঠিত না। তাই ৭।৮ মাস চালাইবার পর কিছু

টাকা লোকসান দিয়া ও অসুস্থতানিবন্ধন ঝামেলা কমাইবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ 'থিয়েটার তুলিয়া দেন ; এই 'থিয়েটার' পত্রিকায় তাঁহার 'মন' নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

২৫শে জুলাই, ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথের চিরনূতন নক্সা 'কাজের খতম' পুনরভিনীত হয়। তাহাতে অমরেন্দ্রনাথ মতিলাল, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য রমাকান্ত, মনোমোহন গোস্বামী মিঃ ভোস্, অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী কুলচন্দ্র, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু সিগার মার্চ্চেন্ট, কুসুমকুমারী মনি হ্যাণ্ড-বিলওয়ালী ও রঙ্গিনী, চারুবালা শশীকলা, ভূষণকুমারী সুশীলা ও বসন্তকুমারী স্থাকরাণী সাজেন।

অতঃপর, ১৫ই আগষ্ট, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অহল্যাবাঈএর প্রথম অভিনয় হয়। সে রজনীর পরিচয়লিপি :—

মলহররাও—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, চক্রুজী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মালিরাও—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, গোবিন্দপন্থ—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, সোমনাথ—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), লক্ষ্মীকান্ত—হীরালাল দত্ত, নন্দজী—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, গন্দরাও—বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তুকাজী—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, জয়মল—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, মাধবরাও—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নিজাম—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাধর—হরিপদ সরকার, অহল্যাবাঈ কুসুমকুমারী, গঙ্গাবাঈ—নরীসুন্দরী, তুলসী—বসন্তকুমারী, নারায়ণী—রাণীসুন্দরী, কৃষ্ণা—পুঁটুরাণী।

মলহররাওএর অংশে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"যেভাবে সেদিন তিনি অভিনয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহা দেখিয়া মনে হইল—অনেক দিন তাঁহার 'এমন প্রাণের সহিত অভিনয়' দেখি নাই।" মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও মলহররাও গোবিন্দপন্থকে বলিতেছেন, 'সোমনাথকে কিছু বলিও না! সে আমার হত্যাকারী হলেও তোমার জামাতা। আক্রান্ত অবস্থাতেও আমি সিংহবিক্রমে তার উপর পড়ে তার কণ্ঠনালি চেপে ধরেছিলুম, কিন্তু

তোমার কন্যার কাছে আমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।—হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি।'—এ দৃশ্যে পাষাণ ভেদ করিয়াও অশ্রু-প্রবাহ ছুটিয়াছিল। বস্তুতঃ অমরেন্দ্রনাথের সে অভিনয় দেখিয়া সকলে একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, অভিনয়জগতে তিনি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

শুক্রবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খৃঃ, অমরেন্দ্রনাথের 'বেনিফিট নাইট' হয়। নিত্য নবরঙ্গ প্রদর্শনে অমরেন্দ্রনাথের পটুত্ব সর্ব্বজনবিদিত, তবু এইদিনকার অভিনয়-লিপিতে একটু বেশী অভিনবত্ব ছিল। তাহা আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি :—

(ক) হাউইট ফিলিপ কোং কর্ত্তৃক ইংরাজীতে 'ইষ্টলীন' হইতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী অভিনয়।

(খ) ষ্টার ও গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত অভিনয় 'আলিবাবা'।

হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, আবদালা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, কাসিম—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মুস্তাফা—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মর্জ্জিনা—কুসুমকুমারী, সাকিনা—বসন্তকুমারী ও হরিমতি। রঙ্গমঞ্চে ৫০ জন সখীর আবির্ভাব।

(গ) পলাশীর যুদ্ধ।

সিরাজ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগৎশেঠ ও মোহনলাল—চুণিলাল দেব, ক্লাইভ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, গজল গায়ক—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সিরাজ মহিষী—কুসুমকুমারী, বৃটেনিয়া—ভূষণকুমারী, উদাসিনী—নরীসুন্দরী।

(ঘ) কমলাকান্ত।

কমলাকান্ত—অমৃতলাল বসু, প্রসন্ন গোয়ালিনী—নরীসুন্দরী।

(ঙ) জয়দেব।

জয়দেব—চুণিলাল দেব, লক্ষ্মণসেন—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, দিগম্বর—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নিরঞ্জন—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), পরাশর—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ—হরিমতি, রাধা—রাজলক্ষ্মী, পদ্মা—হরিমতি (২), অরুণা—কুসুমকুমারী।

আসনের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায়, এ রাত্রে তিন হাজার টাকার অধিক টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

৩১শে অক্টোবর ষ্টারে, রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পাবলম্বনে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অকলঙ্ক শশী'র প্রথম অভিনয় হয়। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে মিঃ পালিত ষ্টারে যোগ দিয়াছিলেন। 'অকলঙ্ক শশী'র প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :

জয়গোপাল দত্ত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভুল ভ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদার—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, মধু ডাক্তার—হীরালাল দত্ত, ম্যাজিষ্ট্রেট—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারিণীবাবু—মিঃ পালিত, ইন্‌স্পেক্টর হারাণবাবু—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), হরিশ ডাক্তার—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, শশী—কুসুমকুমারী, তারা—বসন্তকুমারী, প্রবাসিনী—মৃণালিনী।

অসুস্থতাবশতঃ কয়েকমাস অনুপস্থিতির পর, ২১শে নভেম্বর তারিখে রঙ্গরাণী সুশীলাবালা গৌতমার অংশ লইয়া আবার পাদপীঠের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে, দর্শকমহলে একটা আনন্দের তরঙ্গ বহিয়া যায়। ইহার কয়েকদিন পরেই, ৫ই ডিসেম্বর, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'ক্ষত্রবীর' প্রথম অভিনীত হয়। সে রজনীর ভূমিকালিপি :—

ধৃতরাষ্ট্র—অমৃতলাল বসু, দ্রুপদ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্য্যোধন—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, যুধিষ্ঠির—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ভীম—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, কর্ণ—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), কৃষ্ণ—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শকুনি—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, সঞ্জয়—হীরালাল দত্ত, অভিমন্যু—কুসুমকুমারী, রোহিণী—বসন্তকুমারী, উত্তরা—চারুবালা, কুন্তী—পান্নারাণী।

অতঃপর ২৬শে ডিসেম্বর, অমরেন্দ্রনাথ স্বরচিত উপন্যাস 'অভিনেত্রীর রূপ' স্বয়ং নাটকাকারে পরিণত করিয়া, উহা ষ্টারে অভিনীত করান। প্রথমাভিনয় রজনীতে যিনি যাহা সাজিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম :—

নলিনী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, যামিনী—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), সজনী—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, অনঙ্গমোহন—অমৃতলাল বসু, ক্ষিতীশ—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, বিমলানন্দ—মিঃ পালিত, নিতাই—হীরালাল দত্ত, রামদুলাল—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা—কুসুমকুমারী, নিরুপমা—বসন্তকুমারী, অপরাজিতা—নরীসুন্দরী, বড় বধূ—মৃণালিনী, দুর্গা—সুশীলাবালা (পরে চারুবালা)।

২রা জানুয়ারী, ১৯১৫ খৃঃ, অভিনেত্রীর রূপে দুর্গার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াই সুশীলাবালার শেষ অভিনয়। অমরেন্দ্রনাথের পরিচালিত ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চেই সুশীলার নাট্যজীবনের পটোত্তোলিত হইয়াছিল, আবার তাঁহার পরিচালিত ষ্টারেই তাহার যবনিকা পড়িল। ক্লাসিকে নাট্যজগতের সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠা অভিনেত্রীর সমাবেশবশতঃ, সেখানে সুশীলার মত নবীনা অভিনেত্রী প্রতিভাবিকাশের কোন সুযোগ না পাইয়া, নরেন্দ্রনাথ সরকারের মিনার্ভায় গিয়া, সীতারামে জয়ন্তীর ভূমিকায় প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাহার পর নানা ভূমিকা অভিনয়ের পর, জোবিরূপে তিনি প্রভূত যশের অধিকারিণী হন। তৎপরে মিনার্ভায়, জেলেখা, মেহের, রাজিয়া, পিয়ারা প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়ে তিনি গায়িকারূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার অভিনেত্রীজীবনের পূর্ণবিকাশ হয়, অমরেন্দ্রনাথের গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার হইতে। এই থিয়েটারে তাহের, প্রফুল্ল, সীতা, প্রমীলা, গৌতমা প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি যে অভিনয়চাতুর্য্য দেখান, তাহাতে কেবলমাত্র গায়িকা নহে, একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসাবেও তাঁহার

খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর হইতে ষ্টারে, যতই দিন গিয়াছে, ততই তাঁহার অভিনয় উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিয়াছে, ততই তিনি অধিকতর জনপ্রিয়া হইয়াছেন। যে ভূমিকাই তিনি অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতেই দর্শকগণ কিছু না কিছু নূতন ছবি দেখিয়াছেন, তাই তাঁহারা সাদরে তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'The Divine Sushila'। যাঁহারা সুশীলাকে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা যে কি দৃশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা বুঝিবেন না। চিরান্ধ যে, সে কি সূর্য্য ও খদ্যোতের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারে? কিন্তু আমাদেরই দুঃখ যে সকলকে সে অপূর্ব্ব রসাস্বাদনের অংশ দিতে পারিলাম না। অভিনেত্রীজীবনের শেষ রজনীতেও, রোগতাপক্লিষ্টা সুশীলা, দুর্গার ভূমিকায় যে সকল দর্শককে অঝোরে কাঁদাইয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও তাঁহাকে ভুলিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর, কতিপয় নাট্যামোদী ভদ্রমহোদয় কর্ত্তৃক রচিত একটী কবিতা মুদ্রিত হইয়া থিয়েটারে বিতরিত হইয়াছিল। অন্য কোন অভিনেত্রীর পক্ষে অদ্যাবধি এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়, সুশীলার মহাপ্রয়াণে ষ্টারের বিক্রয়ের কোন তারতম্য হইল না; যেমন 'ফুল হাউস সেল' হইত, তেমনি বজায় রহিল। তাই আমাদের একজন বন্ধু খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সুশীলার অভাবে ক্ষতি আর কাহারও হইল না—স্বত্বাধিকারীর তহবিলে যথাপূর্ব্ব অর্থই আসিতে লাগিল,—ক্ষতি হইল একমাত্র দর্শকমণ্ডলীর। তাঁহারাই সে অতুল্য অভিনয় দর্শনে বঞ্চিত হইলেন।" কথাটা খুবই ঠিক বলিয়া আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম।

সুশীলার ব্যক্তিগত চরিত্রের বিষয়েও দু' একটা কথা না বলিয়া এ প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করা উচিত নহে। তাহার দুর্ভাগ্য যে সে নিষিদ্ধ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, নচেৎ তাহার একনিষ্ঠ পবিত্রতা কোন

ভদ্র গৃহের মর্য্যাদাহানি করিত না। অসংখ্য প্রলোভন তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, অজস্র ব্যঙ্গোক্তি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তবুও সে কখনও সতীনারীর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। অভিনেত্রীজীবনের পক্ষে এ যে একটা কত বড় কথা, তাহা বোধ হয় অনেকেই বোঝেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে (বাংলা ১৩১৯ সালের ৩রা চৈত্র, রবিবার), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসবদিবসে, অমরেন্দ্রনাথ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনী অবলম্বনে 'নেপোলিয়ন' নামে একখানি নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটকের রচনাকার্য্য আরম্ভ করেন। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হইলে, ইহার কয়েকটী প্রধান ভূমিকার অভিনেতাও নির্ব্বাচন করা হয়। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য আমরা সে নির্ব্বাচনের তালিকা নিম্নে দিলাম ঃ—

নেপোলিয়ন—অমরেন্দ্রনাথ, কাউণ্ট—অমৃতলাল বসু (অভাবে কাশীবাবু), মার্শেল কারটো—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, সায়ান—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, ইউজিন—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, জোসেফাইন—কুসুমকুমারী, রোহেন—সুশীলাবালা।

কিন্তু সুশীলার অসুস্থতা ও পরে তাহার অকালমৃত্যু-নিবন্ধন, নাটকের রিহার্সাল বন্ধ থাকে। কালের বিচিত্র গতিতে, যখন অমরেন্দ্রনাথকেও এপারের লীলাখেলা সাঙ্গ করিতে হয়, তখনও বইখানি অভিনীত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, পঁচিশ বৎসরাধিক কাল গত হইয়াছে, কিন্তু নাটকখানি অদ্যাবধি পাদপীঠের আলোক দর্শন করে নাই, অথবা মুদ্রিত হইয়া লোকলোচনের সম্মুখে আবির্ভূত হয় নাই।

যাহা হউক, ১৯১৫ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারী, ষ্টারে হরিশ্চন্দ্র সান্যাল প্রণীত 'বিশ্বামিত্রে'র পুনরভিনয় হয়। তাহাতে অমরেন্দ্রনাথ মন্দানীল, হরিভূষণ বাবু বশিষ্ঠ, মিঃ পালিত বিশ্বামিত্র, কুসুমকুমারী শতক্রমী ও নরীসুন্দরী যোগমাতা সাজেন।

'সাইন্ অফ্ দি ক্রস্' নাটকে মার্কাসের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

মার্সিয়া—কুসুমকুমারী, টিজেলিনাস্—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), লিসিনিয়াস্—প্রবোধচন্দ্র বসু।

মার্কাস্।—খবরদার!—অস্ত্র পরিত্যাগ কর—

অতঃপর, ৬ই ফেব্রুয়ারী, অমরেন্দ্রনাথের নূতন রঙ্গনাট্য ‘প্রেমের জেপলিন’ ও রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গীতিনাট্য ‘বেলোয়ারী’—একসঙ্গে দুই পুস্তকের প্রথম অভিনয় হয়। বেলোয়ারীতে অমরেন্দ্রনাথ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। আমরা নিম্নে ‘প্রেমের জেপলিনে’র প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের তালিকা দিলাম :—

হরিমিত্র—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, ভবানী—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), অবনী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎ—প্রবোধচন্দ্র বসু, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য—হীরালাল দত্ত, ভেবল—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, গদা—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মেধো—নগেন্দ্রনাথ দাস, নিমু—চুনিবালা, প্রমদা—কুসুমকুমারী, সুভাষিণী—চারুবালা, সুহাসিনী—সুশীলাবালা (ছোট), বিন্দি—পান্নারাণী।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ‘সাইন অফ দি ক্রসে’র প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

মার্কাস—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিরো—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, টিগেলিনাস—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), ফ্যাবিয়াস্—হীরালাল দত্ত, লিসিনিয়াস—প্রবোধচন্দ্র বসু, গ্লাবিও—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, মার্সিলাস্—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, টিটাস—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ষ্ট্রাবো—অটলবিহারী দাস, ফিলোডিমাস্—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মেলস্—শশিপদ সরকার, ভিটুরিয়াস্—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ষ্টিফেনাস্—চারুবালা, মার্সিয়া—কুসুমকুমারী, বেরিনিস্—বসন্তকুমারী, পপিয়া—মৃণালিনী, ডাসিয়া—ভূষণকুমারী।

‘সাইন্ অফ্ দি ক্রস’ অভিনয়ে ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় যে অসামান্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত কেহ বুঝিবেন না। অমৃতবাজার পত্রিকা (১৩।৩।১৪) লিখিয়াছিলেন :—“The Sign of the Cross on the whole, as produced by this company, marks a distinct epoch in dramatic production.” নিরো ও গ্লাবরিওর ভূমিকাদ্বয়ে

কুঞ্জবাবু ও গোপাল বাবুর অভিনয় দেখিয়া এই নাটকের ইংরাজী অভিনেতৃগণ স্বীকার করিয়াছিলেন যে,—"আমাদের গ্রাবরিও ও নিরো-ও এত ভাল হয় না!"

আর অমরেন্দ্রনাথ!—তাঁহাকে দেখিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—"Mr Dutt as Marcus Superbus has one of the best parts yet assigned to him. His conception of the part of the Prefect of Rome is traditionally correct and he carries it out with dignity. Every dramatic situation in the meeting of Mercia and Marcus Superbus is brought home to the audience with telling effect, and the final scene, in which the doomed Christians pass from the dungeon to the amphitheatre, has been given with much dramatic power." স্বয়ং গ্রন্থকার ভূপেন্দ্রবাবু 'সাইন অফ দি ক্রসে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"সাইন অফ্ দি ক্রস্ ষ্টারে অভিনয় করাইতে—ইহার মহলা দেওয়াইতে এবং আগাগোড়া ইহার প্রত্যেক ভূমিকা শিখাইতে অমরবাবু যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার নাট্যজীবন আরম্ভ হইতে অদ্যাবধি তিনি আর কখন কোন নাটক লইয়া সেরূপ করেন নাই। স্বয়ং মার্কাসের ভূমিকা অভিনয় করিয়া এরূপ একটা নূতন ছবি দেখাইলেন—বাঙ্গালাদেশে কোনও অভিনেতা অথবা কোনও দর্শক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ দর্শক মহোদয় সেদিন মার্কাসের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গেলেন—"Mr. Dutt—you are Garrick of all nations!" কথাটা খুব বড়—কিন্তু মিথ্যা নয়!"

বস্তুতঃ প্রথমাবির্ভাবে তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত "ভিটুরিয়াস্! এ লোকটাকে কথা কইতে মানা কর।'—হইতে শেষ দৃশ্যে, "যাও টিজেলিনাস্—সিজারের কাছে তোমরা ফিরে যাও! তাকে বলগে—মহাত্মা খৃষ্টেরই জয়লাভ হয়েছে! আজ থেকে মার্কাসও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ক্রিশ্চান! এস মার্সিয়া—এস আমার ধর্ম্মপত্নী—এস, এই রকম বুকে বুকে—প্রাণে প্রাণে—হাতে হাতে—মিলিত হয়ে নবীন দম্পতি আমরা—বিবাহ বাসরে যাই! ওই শোন—ক্ষুধিত সিংহের বিকট গর্জ্জন! * * এস! ঐ পরপারের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দিব্যালোকে আমাদের দাম্পত্যপ্রেম আলোকিত করি!"—পর্য্যন্ত, প্রতি দৃশ্যে, প্রতি বাক্যে অমরেন্দ্রনাথ যে অতুলনীয় চিত্র পরিস্ফুট করিতেন, তাহা কোন দর্শক আজীবন ভুলিবেন না।

ষ্টারে এই নাটকের আশাতীত সাফল্য দর্শনে, মিনার্ভায় অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'আহুতি' অভিনীত হয় ও তাহাতে দানিবাবু চন্দ্রপীট বা মার্কাস সাজেন। অমরেন্দ্রনাথের তুলনায় সে অভিনয় যে কত নিকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীমাত্রেই জানেন। অনর্থক সে বিষয়ে বিস্তার করিব না।

কয়েক রজনী মার্কাসের ভূমিকা অভিনয় করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাই, বাধ্য হইয়া, সে নাটক বন্ধ করিয়া দিয়া, ১৭ই এপ্রিল, ষ্টারে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মাধবরাও'এর প্রথম অভিনয় হয়। উহার প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

মাধবরাও—কুঞ্জবাবু, নারায়ণরাও—ধীরেনবাবু, রঘুনাথ রাও—হাঁড়বাবু, আপাজী-রাও—নেপেনবাবু, সখারাম—গোপালবাবু, জানোজী আংগ্রে—লক্ষ্মীবাবু, মহাদেও—বিষ্ণুবাবু, হায়দার আলি—কার্ত্তিকবাবু, টিপু—প্রবোধবাবু, গোলাম কাদের—হীরালাল বাবু, রমাবাঈ—কুসুমকুমারী, আনন্দীবাঈ—বসন্তকুমারী, জোবেদী—চারুবালা।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অভাবে ষ্টারের বিক্রয়ের কি অবস্থা হইত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নূতন নাটক সত্ত্বেও, অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, এমন কি ১লা মে তারিখে, ঐ নাটকের সঙ্গে সর্ব্বজনপ্রিয় গীতিনাট্য 'শ্রীকৃষ্ণে'র প্রথম পুনরভিনয়েও বিক্রয়ের বিশেষ পার্থক্য ঘটিল না। ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, ৮ই মে তারিখে পুনরায় মার্কাসরূপে দর্শকগণকে দেখা দিলেন এবং ১৫ই তারিখে 'মাধবরাও'এ নারায়ণরাওএর অংশ লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। যাঁহারা ১৭ই এপ্রিল ও ১৫ই মে তারিখে একই নাটকে ষ্টারের বিক্রয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে আর অমরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার কথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শেষোক্ত দিবসে মাধবরাওএর সঙ্গে হিরন্ময়ীর ষ্টারে প্রথম পুনরভিনয় হয়।

অতঃপর, ৫ই জুন, ষ্টার থিয়েটারে 'সাজাহান' প্রথম পুনরভিনীত হয়। সে রজনীর ভূমিকালিপি ঃ—

সাজাহান—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, দারা—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), সুজা—গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, ঔরংজেব—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোরাদ—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সোলেমান—অটলবিহারী দাস, সিপার—সুশীলাবালা (ছোট), মহম্মদ—হীরালাল দত্ত, জয়সিংহ—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, যশোবন্ত সিংহ—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, দিলদার—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, জাহানারা—কুসুমকুমারী, নাদিরা—আজবসুন্দরী, পিয়ারা—বসন্তকুমারী, জহরৎ—চারুবালা, মহামায়া—মৃণালিনী।

সাজাহান নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভায় ও তাহাতে ঔরংজেব সাজিয়া দানিবাবু বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু এখন অমরেন্দ্রনাথ সেই ঔরংজেবের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণকে এক সম্পূর্ণ নূতন ছবি দেখান। দানিবাবুর ঔরংজেব ছিল ক্রুর, ভণ্ড, কুটিল, চক্রী। সে বিবেককে চোখ ঠারিয়া বুঝায়। সে যখন বলে,—"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ঝড় উঠবে।" তখন দর্শকগণ দেখে ও

বোঝে যে, এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ নহে। ঔরংজেবের সিংহাসন লাভের পথে নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত, তাই তাহার হৃদয়াকাশ চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন, ইত্যাদি। সে যাহা করে, সমস্তের পিছনেই একটা policy আছে। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের ঔরংজেব হইতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যথার্থ ই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পর্য্যুদস্ত, নদীপারের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। সে বিবেককে চোখ ঠারে না, কেন না সে যথার্থই ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। সে নিজে সুযোগ তৈয়ারী করে না, বরঞ্চ সে-ই অবস্থার দাস। সে যখন বলে,—"আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জান।"—তখন প্রত্যেক বর্ণই তাহার মর্ম্মতন্ত্রী হইতে নির্গত হইয়া আসে। দারার মৃত্যুদণ্ড দৃশ্যে, দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যর্পণকালে তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে, কম্পিত শ্লথ হস্ত হইতে স্খলিত দণ্ডাজ্ঞা লইয়া জিহন খাঁ চলিয়া গেলে, পুনঃ-পুনঃ আর্ত্তনাদ-তুল্য চীৎকারেও তাহার সাড়া না পাইয়া, সে হতাশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়ে। গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সে সিংহাসন ত্যাগ বা পিতার মার্জ্জনা ভিক্ষা করে না, যথার্থ অনুতপ্ত চিত্তেই সে এই সকল কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয়। তাই অমরেন্দ্র-চিত্রিত ভাগ্যবিপর্য্যস্ত ঔরংজেবকে দেখিয়া, দর্শকগণ অনেক সময়ে চোখের কোণ হইতে জল মুছিয়া ফেলেন।

৩রা জুলাই, ষ্টারে, জয়দেবের পুনরভিনয় হয়। প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ :–

জয়দেব—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুদেব—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পরাশর—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিগম্বর—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, নিরঞ্জন—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), লক্ষ্মণ সেন—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, রাজগুরু—কার্ত্তিকচন্দ্র দে, পীতাম্বর—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী,

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ—প্রবোধচন্দ্র বসু, শ্রীকৃষ্ণ—হরিমতি, শ্রীরাধা—লীলাবতী, বিমলা—কুসুমকুমারী, পদ্মা—বসন্তকুমারী, অরুণা—নারায়ণী।

(অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রখানি—'পরিবার মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ'—জয়দেব প্রথমাভিনয় রজনীর পরদিন সকালে তোলা হয়। পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন, অমরেন্দ্রনাথ তাই মুণ্ডিত-গুম্ফ। ইহাই তাঁহার জীবিত-কালের শেষ চিত্র।)

অমরেন্দ্রনাথ জীবনে মাত্র একটী ভূমিকার অভিনয়ে কোন গৌরবের অধিকারী হন নাই ;—তাহা ক্লাসিক থিয়েটারের আমলে ভক্তিরসপূর্ণ নসীরাম ভূমিকায়। তাই সেই হইতে তিনি তাদৃশ কোন ভূমিকা অভিনয় করিতে অগ্রসর হন নাই। এবারও জয়দেবের অংশকে তিনি কেমন রূপ দিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সকলে কৌতূহলী ছিলেন, বিশেষতঃ এ ভূমিকায় চুণিবাবুর সুনাম ছিল। কিন্তু জয়দেবরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া, অমরেন্দ্রনাথ সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে কি প্রকার ভক্তিসাগরে ভাসাইয়াছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহাকে দেখিয়া চুণিবাবু পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন,—"হ্যাঁ, নূতন একটা কিছু দেখিলাম বটে।" ষ্টারে জয়দেব অভিনয়ে মাত্র ফিমেল সিটের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"আমাদের সমস্ত আসন মিলাইয়াও এত বিক্রয় হইত না।" তাই 'অমরেন্দ্রনাথে'র জীবনীকার লিখিয়াছিলেন ঃ—

"পরপারে নাটকে বিশ্বেশ্বরের ভূমিকাটী অমরেন্দ্রনাথের একটী বিশেষ অভিনয়। এই ভূমিকাটী অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা তাঁহার মত হওয়া সম্ভব কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার লইয়া বহু নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর বাজীরাও নাটকে 'বাজীরাও'এর ভূমিকা, অহল্যাবাঈ নাটকে

'মলহররাও'এর ভূমিকা, সাজাহানে 'ঔরংজেবে'র ভূমিকা, সাইন অফ্ দি ক্রসে 'মার্কাসে'র ভূমিকা, জয়দেব নাটকে 'জয়দেবে'র ভূমিকা এবং সওদাগর নাটকে 'কুলীরকে'র ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরি-লিখিত ভূমিকাগুলির তিনি যেরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ স্বাভাবিক অভিনয় অদ্যাবধি কোন অন্য অভিনেতার দ্বারা হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবারও বড় একটা আশা আমরা করিতে পারি না। আমরা তাঁহার উপরিলিখিত নাটকগুলির সব কয়টী ভূমিকারই অভিনয় দেখিয়াছি এবং শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। সওদাগর নাটকে কুলীরকের ভূমিকা, কাল যেন অভিনয় দেখিয়াছি ঠিক এইভাবে আমাদের চক্ষের উপর আজিও ভাসিতেছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:০:—

"পঞ্চম অঙ্ক—শেষ দৃশ্য"

(১৯১৫)

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ যখন গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার ছাড়িয়া দেন, তখন তিনি তিন বৎসরের 'লিজে' ষ্টার থিয়েটার ভাড়া লইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সে 'লিজ' ফুরাইয়া গেলে, অমরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বানুযায়ী সর্ত্তমত ঐ লিজের পুনরাবর্ত্তনে অসম্মত হইয়া বলেন, "ভাড়া হিসাবে থিয়েটার লইলে না হয় বড় জোর ২০০০৲ টাকাই মাসিক ভাড়া দিতাম, কিন্তু বর্ত্তমানে যে সর্ত্ত আছে, তাহাতে বিক্রয়ের উপর শতকরা ২৫৲ হিসাবে কমিশন দিলে, ভাড়াস্বরূপ সাড়ে চার হইতে পাঁচ হাজার টাকা বাহির হইয়া যায় ; সুতরাং সে হার না কমাইলে আমি নূতন লিজ' করিব না।' স্বত্বাধিকারীগণ কিন্তু তাহাতে রাজী হন না, ফলে দুই দলে একটু মনোমালিন্য চলে,—বিনা লিজেই পূর্ব্ব চুক্তিমত অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার চালাইতে থাকেন। একে অত ভাড়া পাওয়া যাইতেছে, কোথাও তত পাইবার সম্ভাবনা নাই, তায় নূতন ভাড়াটিয়ার অভাব, সুতরাং মালিকরাও তাঁহাকে তুলিয়া দিবার নামগন্ধ করেন না,—অমরেন্দ্রনাথও অন্য কোন থিয়েটার বাড়ীর সুবিধা না দেখিয়া, ষ্টারেই থাকিয়া যান। এই ভাবে ৭।৮ মাস কাটিয়া যায়।

ইতিমধ্যে বিডন ষ্ট্রীটে থিয়েটার মহলেও গণ্ডগোল চলিতেছিল। মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর, মনোমোহন বাবু জোর করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার দখল লওয়াতে, মহেন্দ্রবাবুর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসাবে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোমোহন বাবুর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করেন। তাহা দেখিয়া, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন বাবু হাইকোর্টের শেরিফ সেলে এক লক্ষ এগার হাজার টাকা দিয়া কোহিনূর থিয়েটার ক্রয় করেন। যতদিন মামলা চলিতেছিল, ততদিন সে বাড়ী খালি পড়িয়া থাকে। কিন্তু মামলার অবস্থা খারাপ দাঁড়াইলে, তিনি মিনার্ভা সম্প্রদায় তুলিয়া আনিয়া, কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার মনস্থ করেন। তাহাতে কিন্তু সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বাকিয়া বসেন,—ফলে দুইটি দল হইয়া যায়, একটী মনোমোহন বাবুর, একটী উপেন্দ্রবাবুর। উপেন্দ্রবাবু, মিনার্ভা থিয়েটার প্রাপ্তি নিশ্চিত বুঝিয়া, অমরেন্দ্রনাথকে দশ হাজার টাকা বোনাস দিয়া, সেখানে ম্যানেজাররূপে লইয়া যাইতে চান। তখন ষ্টারের 'লিজ' [illegible] অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তবু অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানান যে, তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, এ অবস্থায় তিনি মিনার্ভার জন্য কতখানি পরিশ্রম করিতে পারিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। তৎসত্ত্বেও উপেন্দ্রবাবু যদি তাঁহাকে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। উপেন্দ্রবাবু প্রায় হতাশ হইয়া, কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করিয়া, বিদায় লন।

এদিকে মনোমোহনবাবু এ সংবাদ শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথের নিকট ছুটিয়া আসেন ও তাঁহাকে অর্দ্ধেক অংশীদার করিয়া, নিজের থিয়েটারে লইয়া যাইতে চান। ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণের উচ্চবাচ্য না দেখিয়া,

অমরেন্দ্রনাথ সে প্রস্তাবে সম্মত হন ও কথার এতদূর পাকাপাকি হয় যে, তিনি জিনিষপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হন; তবে তখনও অবধি কাগজে কলমে কোন লেখাপড়া হয় নাই। অভিনয় বিষয়েও স্থির হয় যে, শরীর যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না সারে, ততদিন তিনি সপ্তাহে একদিন মাত্র অভিনয় করিবেন—বাকী দিনগুলির ভার দানিবাবুর। সমস্ত ব্যাপার ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসিতে দেরী হয় না, তাঁহারা হন্তদন্ত হইয়া অমরেন্দ্রনাথের কাছে আসিয়া বলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ একি বিষম কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তাঁহারা শুধু অমরেন্দ্রনাথের উপর নির্ভর করিয়াই বসিয়া আছেন, অথচ তিনি কি না থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার মতলব করিতেছেন! একি কথা! ভাড়া কমাইতে তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, শুধু ত' অমরেন্দ্রনাথের কথারই অপেক্ষা। শেষে অনেক দর দস্তরের পর স্থির হয় যে, ফিমেল সিট বাদে মাত্র মেল সিটের টিকিট বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০৲ কমিশনে এবার বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে ও সেই সর্ত্তমত যতশীঘ্র সম্ভব পাকাপাকি লেখাপড়া করা হয়। ইতি-মধ্যে, গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটার চালাইতে অসমর্থ হইয়া, চুণিলাল দেব সে থিয়েটার তুলিয়া দেন ও ১৭ই জুলাই হইতে আসিয়া ষ্টারে যোগদান করেন।

মনোমোহন বাবু ও উপেন্দ্র বাবু কেহই অমরেন্দ্রনাথকে না পাইয়া, তাঁহার বিনা সাহায্যেই থিয়েটার খুলিবার বন্দোবস্ত করেন। মনোমোহন বাবু, ১৯১৫ খৃঃ ৭ই আগষ্ট কালাপাহাড় লইয়া, কোহিনূর ষ্টেজে মিনার্ভা নাম দিয়া নূতন থিয়েটারের পত্তন করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন। দানিবাবু, প্রিয়নাথ ঘোষ ও তারাসুন্দরী প্রভৃতি অনেকে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসেন। কিন্তু উপেন্দ্র বাবু হাইকোর্টের সাহায্যে

'মিনার্ভা' নাম কাড়িয়া লন ও তাহার ফলে মনোমোহন বাবু নিজের থিয়েটারের নাম রাখেন—মনোমোহন থিয়েটার। কিছুদিন পরে তারাসুন্দরী ও প্রিয়বাবু পুরাতন মিনার্ভায় ফিরিয়া যান।

যেদিন মনোমোহন থিয়েটারের উদ্বোধন হয় (৭ই আগষ্ট), সেইদিন গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল রঙ্গমঞ্চে থেস্পিয়ান 'টেম্পল নাম দিয়া, ক্ষেত্রমোহন মিত্র এক নূতন থিয়েটারের উদ্বোধন করেন। ১৯১৮ খৃঃ জুনের শেষে অমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক ষ্টার হইতে ডিস্‌মিস্ হইবার পর, ক্ষেত্রবাবুর থিয়েটারের পরিচালকরূপে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। ইতিমধ্যে উপেন্দ্রবাবু মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী হইয়া, অপরেশ বাবুকে থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন এবং ১৯১৫ খৃঃ ২রা অক্টোবর, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, মিঃ পালিত প্রভৃতি সমভিব্যাহারে 'সিংহল-বিজয়' লইয়া, মিনার্ভার উদ্বোধন হয়।

এ দিকে, ষ্টারে, ১৭ই জুলাই, 'কল্যাণী'র প্রথম পুনরভিনয়ের পর (সাঁওতাল সর্দ্দার—অমরেন্দ্রনাথ), ২১শে আগষ্ট রায় বাহাদুর জগৎচন্দ্র সেন প্রণীত 'রাজা চন্দ্রধ্বজে'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গ :—

রাজা চন্দ্রধ্বজ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, লক্ষ্মণসেন—চুণিলাল দেব, ভোলা—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র—হীরালাল দত্ত, কেশব—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), বিশুদ্ধানন্দ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রধ্বজ—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, নীলধ্বজ—প্রবোধচন্দ্র বসু, কেনা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, সাহ হোসেন—অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলাল—অটলবিহারী দাস, আমেদ শা—হরিপদ সরকার, জলিল—হরিপ্রিয়া, মুকুট রায়—শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পূজারী—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, অলকা—কুসুমকুমারী, কমলা—নারায়ণী, সাহানা—চারুবালা।

'রাজা চন্দ্রধ্বজ' সম্বন্ধে দেশগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"This play is calculated to raise the dignity

of the stage, whose true function is not merely to entertain but to instruct as well."

অতঃপর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, 'বঙ্গবিক্রমে'র প্রথম পুনরভিনয় হয়। সে রজনীতে কোন অংশ গ্রহণ না করিলেও, ইহার দ্বিতীয়াভিনয় রজনী, ১১ই সেপ্টেম্বরে অমরেন্দ্রনাথ 'আলি নিয়ামত' সাজেন। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে চুণিবাবু কেদার রায়, কুসুমকুমারী অনিতা ও আশ্চর্য্যময়ী মজনু বেগম সাজেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ষ্টারে, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'ব্রত-উদ্যাপন' প্রথম অভিনীত হয়। সে রজনীর ভূমিকালিপি :—

চন্দ্রকেতু—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মণ্ডনমিন—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, দুলালচাঁদ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মজালিন্দ—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), মামুক—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, মাকু—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দগিরি—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, নাতালী—হরিপ্রিয়া, মণিমালা—কুসুমকুমারী।

৯ই অক্টোবর, আবার ষ্টারে নূতন নাটকের অভিনয় হইল—এবার হরনাথ বসু প্রণীত 'রত্নমঞ্জরী'। এই গ্রন্থের প্রথমাভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ :—

সনাতন—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগন্নাথ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধনপতি—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), শিবরাম—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, সদানন্দ—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, বসন্তসেন—হীরালাল দত্ত, কুমারসেন—প্রবোধচন্দ্র বসু, রত্নমঞ্জরী—কুসুমকুমারী, দিগম্বরী—মৃণালিনী, নির্ম্মলা—হরিপ্রিয়া, ভানুমতী—পান্নারাণী, সোনার মা—কুমুদিনী।

১৯১৫ খৃঃ, ১২ই অক্টোবর, অমরেন্দ্রনাথের বেনিফিট নাইট উপলক্ষে এ বৎসরেও এক অভিনব অভিনয়োৎসব হয়। অসুস্থতানিবন্ধন অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহাতে অতি সামান্য অংশ গ্রহণ করিলেও, অসাধারণ অভিনয়লিপিবশতঃ সেদিন ষ্টারে বিরাট্ জনসমাগম হইয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে সে 'প্রোগ্রাম' পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি :—

(১) এলফিন্‌ষ্টোন বায়স্কোপ কর্ত্তৃক 'ইষ্টলীন' প্রভৃতি চিত্র প্রদর্শন।

(২) ইংরাজীতে 'সাইন অফ দি ক্রস' হইতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী অভিনয়।

(৩) বাংলায় ঐ নাটকের সেই সেই দৃশ্য অভিনয়।

মার্কাস—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(৪) হিন্দিতে 'মেরা বিবি কা কাটা' অভিনয়।

(৫) মহাভারতীয় যুদ্ধ প্রণালী (মর্তসজ্জা)।

(৬) বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এণ্টারটেনার্স কর্ত্তৃক বিবিধ আমোদপ্রমোদ।

(৭) জয়দেব অভিনয়।

জয়দেব—চুনিলাল দেব।

১৬ই অক্টোবর, শাজাহানে ঔরংজেবের ভূমিকা অভিনয় করিবার পর, অমরেন্দ্রনাথ চুনিবাবুকে থিয়েটার দেখাশুনার ভার দিয়া, স্বাস্থ্যোন্নতিমানসে বারাণসীধামে চলিয়া যান। ২৩শে অক্টোবর, ষ্টারে 'রাজলক্ষ্মীর' পুনরভিনয়ের পর, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি চুনিবাবু ষ্টার ছাড়িয়া দেওয়ায়, অমরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ২০শে নভেম্বর, তিনি 'রাজলক্ষ্মী'তে ম্যাজিষ্ট্রেটের ভূমিকা গ্রহণ করিবার পর, ৪ঠা ডিসেম্বর, ষ্টারে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সওদাগরে'র প্রথম অভিনয় হয়। সে নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

কলীরক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অনিলকুমার—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, নিরঞ্জন—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), নটবর—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ পিতা—অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, আহ্লাদে—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, বিজয়সিংহ—লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়, অর্ঘকুমার—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মোহনলাল—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,

কুবলয়—হীরালাল দত্ত, মন্ত্রী—হরিপদ সরকার, প্রতিভা—কুসুমকুমারী, নীরজা—নারায়ণী, যুথিকা—আশ্চর্য্যময়ী, মেন্তা—হেমন্তকুমারী।

অমরেন্দ্রনাথের কুলীরক সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা (৭ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃঃ) লিখিয়াছিলেন :—"Babu Amarendra Nath Dutt took up the difficult role of Shylock, the Jew, and his dress, postures and actings were true to the histrionic art practised by the most consummate of European actors. Those who could not yet avail themselves of the chance of witnessing the play on an European stage may well be satisfied with the role of Babu Amarendra as approaching the best of actors assuming the character."

এ বিষয়ে, স্বয়ং গ্রন্থকার ভূপেনবাবু তাঁহার 'অভিনয় শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"অমরেন্দ্রনাথ যখন যে ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতেন, তখনই তাহাতে দর্শকবৃন্দ নূতন একটা কিছু দেখিবার জিনিষ পাইতেন। ইদানীং পাশ্চাত্য-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অনুকরণে তাঁহার অভিনয় করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—এবং 'সাইন অফ দি ক্রস' নাটকে মার্কাসের ভূমিকায় এবং 'সওদাগর' নাটকে কুলীরকের ভূমিকায় এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এমন কোন অভিনেতা নাই,—ছিল না এবং হইবে না—যিনি সে রকম ভাবে মার্কাস ও কুলীরকের ভূমিকা অভিনয় করিতে সক্ষম।"

আবার তিনি অমরেন্দ্র-স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন,—"আমারই লিখিত 'সওদাগর' নাটক অভিনয় করা নাট্যজগতে তাঁহার শেষ কীর্ত্তি! তিনি সওদাগরে কুলীরকের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন! বলা বাহুল্য, সওদাগর নাটক জগৎবরেণ্য সেক্সপীর প্রণীত 'Merchant of Venice'

নাটকের রূপান্তর মাত্র! অমরেন্দ্রনাথ হইলেন তাহাতে Shylock! সে Shylock যে কিরূপ Shylock হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা ৩।৪ রাত্রি অভিনয় দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন। সে অভিনয়ে বিলাতী থিয়েটারে পর্য্যন্ত সাড়া পড়িয়াছিল! সে অভিনয় দেখিয়া ইউরোপবাসী (যাঁহারা দেখিয়াছিলেন) অথবা ইউরোপ প্রত্যাগত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী যাঁহারা দেখিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—বাংলায় এরূপ অভিনেতা আছে, তাহা জানিতাম না।"

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত দানিবাবুর জীবনীতে লিখিয়াছেন, "নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আমরাও তাঁহার জীবনের অপরাহ্নকালে আবার গগনমণ্ডলে উজ্জ্বল রক্তিমাভা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেক্সপীয়রের Merchant of Venice নাটকের রূপান্তর হয় সওদাগরে, আর তাহাতে ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌লীন্, কীন্, আর্ভিং অভিনীত সাইলকের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন এবং অভিনয়ে তিনি অতি উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন।"

এই সমস্ত অভিমতের পর, আমাদের নিজেদের কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই কুলীরকের ভূমিকা গ্রহণই অমরেন্দ্রনাথের নূতন নাটকে শেষ অভিনয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্বত্বাধিকারীরূপে ষ্টারে আগমন হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অবসান পর্য্যন্ত তিনি যে সমস্ত ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম:—

সৎসঙ্গে প্রবোধ, প্রফুল্লে যোগেশ ও ভজহরি, জীবনে মরণেতে সাহজেনান, ভ্রমরে গোবিন্দলাল, জীবনসন্ধ্যায় তেজসিংহ, রাণী ভবানীতে রামকান্ত, বেল্লিকবাজারে পুঁটিরাম, বাজীরাওএ বাজীরাও, হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রায় হরিনাথ, মেঘনাদ বধে মেঘনাদ, রাজা-

বাহাদুরে মিঃ ফিস, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ, রাণাপ্রতাপে রাণাপ্রতাপ, জীবনসংগ্রামে মির্জ্জান, হরিরাজে হরিরাজ, বলিদানে করুণাময়, বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গল ও বণিক, সরলায় বিধুভূষণ, রাজসিংহে রাজসিংহ, তরুবালায় অখিল, দুটীপ্রাণে সুন্দর, দক্ষযজ্ঞে মহাদেব, নসীরামে অনাথনাথ, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ ও জগৎশেঠ (একত্রে), নরমেধযজ্ঞে যযাতি, খাসদখলে মোহিত ও নিতাই, সীতারামে সীতারাম, আলিবাবাতে আলিবাবা ও হুসেন, সধবার একাদশীতে অটল ও নিমচাঁদ, রাজা ও রাণীতে বিক্রমদেব ও কুমারসেন (একত্রে ও পৃথক্‌ভাবে), চৈতন্যলীলায় মাধাই ও প্রতিবেশী, হারানিধিতে অঘোর, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ ও ফষ্টর (এক সঙ্গে), পরপারেতে বিশ্বেশ্বর, পাণ্ডবগৌরবে ভীম, কাল পরিণয়ে মণীন্দ্র, মজায় হরিহর, কামিনী ও কাঞ্চনে প্রতুল, ধর্ম্মবিপ্লবে কালাচাঁদ, বুদ্ধদেবে বুদ্ধ, কিসমিসে স্কুল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মাধবীকঙ্কণে নরেন্দ্রনাথ, কপালকুণ্ডলায় নবকুমার, চাঁদবিবিতে রঘুজী, পূর্ণচন্দ্রে পূর্ণচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীতে ওসমান ও জগৎসিংহ, নবীনতপস্বিনীতে রতিকান্ত, দেবী চৌধুরাণীতে ব্রজেশ্বর, বিষাদে অলর্ক, বঙ্গবিজেতাতে ইন্দ্রনাথ, মুকুলমুঞ্জরায় বরুণচাঁদ, জনায় প্রবীর ও বিদূষক, শঙ্করাচার্য্যে শঙ্কর, বিবাহবিভ্রাটে মিঃ সিং, মৃণালিনীতে হেমচন্দ্র, প্রণয়পরীক্ষাতে শান্তবাবু, জয়পতাকাতে প্রিয়লাল, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে কীচক, শরৎ সরোজিনীতে শরৎ, সীতাহরণে রাম, অশ্রুমতীতে সেলিম, দলিতা ফণিনীতে নরেন্দ্রনাথ, বড় ভালবাসিতে পিয়ার, অভিমানিনীতে ছিদাম, কাজের খতমে মতিলাল, অহল্যাবাঈতে মলহররাও, অকলঙ্ক শশীতে জয়গোপাল দত্ত, ক্ষত্রবীরে প্রবর, অভিনেত্রীর রূপে নলিনী, বিশ্বামিত্রে মন্দানীল, প্রেমের জেপলিনে অবনী, সাইন অফ্ দি ক্রসে

মার্কাস, ম্যাকবেথে ম্যাকবেথ, মাধবরাওএ নারায়ণরাও, সাজাহানে ঔরংজেব, জয়দেবে জয়দেব, কল্যাণীতে সাঁওতাল সর্দ্দার, রাজা চন্দ্রধ্বজে চন্দ্রধ্বজ, বঙ্গবিক্রমে আলি নিয়ামৎ, ব্রত উদ্‌যাপনে চন্দ্রকেতু, রত্নমঞ্জরীতে সনাতন, রাজলক্ষ্মীতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও সওদাগরে কুলীরক।

নবম পরিচ্ছেদ

——ঃ০ঃ——

অকালে দীপ নির্ব্বাণ *

নাট্যজগতের যত উন্নতি হৌক—সমাজ সংসারের কথা ধরিয়া বলিতে হইলে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে—অমরেন্দ্রনাথের যে মেধা, যে ধীশক্তি, যে কার্য্যপরিচালনবুদ্ধি ও বিদ্যা ছিল, তাহাতে তিনি নটকার্য্য না করিয়া অন্য কোনও কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলে আজ নিঃসঙ্কোচে লোকে তাঁহার নাম জপমালা করিত। অন্যে যে যাহা বলেন বলুন—অনেকে তাঁহার নিজের মুখে বলিতে শুনিয়াছেন, "এ গর্হিত কার্য্য যেন কোন ভদ্রসন্তানে না করেন!" এই নট কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি শান্তিহারা হইয়াছিলেন, তিনি স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিলেন, এমন কি কতবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, শেষে অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। শারীরিক দুর্ব্বলতার সহিত তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতা যথেষ্ট আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি যেন বাধ্য হইয়া শেষে আপনাকে স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়

---

* এই অধ্যায় প্রণয়নে আমরা প্রসিদ্ধ নাট্যকারদ্বয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমালোচকপ্রবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রচনা হইতে ও 'অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে যদিচ্ছা উদ্ধৃত করিতেছি। কোনটুকু কাহার লেখা, তাহা ঘটনার বর্ণনার মধ্যে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিলে রসভঙ্গ ঘটিতে পারে, এই ভয়ে তাহা না করিয়া আমরা অধ্যায়ের সূচনাতেই একথা স্বীকার করিয়া রাখিলাম।

ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। আপনার অন্যায় তিনি প্রাণে প্রাণে যথেষ্ট বুঝিতে পারিতেন, তাহার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিতেন, কিন্তু অদৃষ্টচক্র এবং কুগ্রহ তাঁহাকে ভীষণরূপে পেষিত করিয়া ফেলিল। তিনি পত্নীবিয়োগের পর আর এ পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না; অতি শীঘ্রই সেই সাধ্বী সতীর অনুগামী হইয়া এ ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্যে তিনি সংসারে পত্নীপ্রেম প্রকাশের অবকাশ না পাইলেও, তাঁহার রচিত পূর্ব্বোক্ত "রোগশয্যায়" ও "অনুতাপ" নামক কবিতাদ্বয়ে যে পবিত্র প্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বৎসরাবধি অমরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কখন বা সুস্থ থাকিতেন। এবার পূজার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার রোগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূজার পর তিনি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন। বসুমতীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বনামখ্যাত বহুদর্শী কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্ন মহাশয় অমরেন্দ্রনাথের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় অমরেন্দ্র-নাথকে বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি অন্ততঃ দুইমাসকাল আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন, আমি আপনাকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইব।" এই সময় কাশীধামে প্রচারিত হইয়াছিল, অমরেন্দ্রনাথের ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় কাশীধামে অভিনয় করিতে আসিতেছে। এই সংবাদে কাশীবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সম্প্রদায় আনিয়া কাশীধামে অভিনয় করিবার বাসনা অমরেন্দ্র-নাথেরও প্রবল ছিল, কিন্তু রোগের প্রভাবে তাঁহার বাসনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সময় অমরেন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয়কে

বলিয়াছিলেন,—"কবিরাজ মহাশয়, আপনি আমাকে রোগমুক্ত করিয়া দিন, আরোগ্য হইলে আমি আমার নাট্যসম্প্রদায় কাশীধামে আনিয়া সমগ্র কাশীবাসীকে বিনা টিকিটে থিয়েটার দেখাইব।" কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রোগ চিকিৎসার অতীত নহে। ইহা অপেক্ষাও কঠিন রোগ আমি আরোগ্য করিয়াছি। আপনি কেবল কলিকাতার ভাবনা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন আমার চিকিৎসাধীনে থাকুন।" অমরেন্দ্রনাথ সম্মত হইয়া বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে মণিলালবাবু বারাণসীধামে ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে দুই তিন দিন থাকিবার পরই যেন একটু উপকার দেখা দিল। অমরেন্দ্রনাথ মণিবাবুকে বলিতেন,—"আমার মন বলিতেছে, আমি এই বিচক্ষণ কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিব। আজ কয়দিনে যেন একটু স্ফূর্ত্তি পাইতেছি।" ফলতঃ কবিরাজ মহাশয় বিশেষ যত্ন সহকারে অমরেন্দ্রনাথের চিকিৎসা করিতেছিলেন,—তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সদাসর্ব্বদা অমরেন্দ্রনাথের তত্ত্ব লইতেন; তিনি বলিতেন,—"আপনি বঙ্গবিশ্রুত নাট্যরথী, সুদূর কাশীধামে থাকিয়াও আমরা আপনার নাম শুনিয়া থাকি; আপনাকে আরোগ্য করা আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি; সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।"

অমরেন্দ্রনাথ বারাণসীধামে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে চুণিলাল দেব বিশেষ দক্ষতা সহকারে ষ্টার থিয়েটার পরিচালন করিতেছিলেন। এই সময় মনোমোহন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ চুণিবাবুকে আহ্বান করিলেন—তাঁহাকে উক্ত

রঙ্গালয়ের অন্যতম অংশীরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। চুণিবাবু এ সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ যদি এ সময়ে চুণিবাবুর সম্বন্ধে কিছু একটা বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে চুণিবাবু কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিতেন না। আমরা জানি, প্রথমে অমরেন্দ্রনাথ চুণিবাবুর সহিত একটা নূতন বন্দোবস্ত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের কতকগুলি হিতৈষী (?) সে বাসনার বিষম পরিপন্থী হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর হিতৈষীর সংখ্যা বড় অল্প ছিল না। অমরেন্দ্রনাথ মনে মনে যে সঙ্কল্প করিতেন, এই হিতৈষীর দল যদি দেখিতেন, সে সঙ্কল্প তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল নহে, তাঁহারা তখনই অমনি দল পাকাইয়া বাঁধিমত রিহার্সাল দিয়া—সেই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে বিবিধ যুক্তিতর্ক তুলিয়া তাহা পণ্ড করিয়া দিতেন। কিন্তু চুণিলাল দেব ষ্টার থিয়েটারের পরিচালন ভার প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল হিতৈষীদলের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হইয়া পড়ে, তাঁহারা মনে মনে প্রমাদ গণিতে থাকেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চুণিবাবু তাঁহাদিগের অনেককেই মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বারাণসীধামে অমরেন্দ্রনাথকে স্বতন্ত্রভাবে পত্রযোগে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন, নানাবিধ অলীক প্রসঙ্গ তুলিয়া অমরেন্দ্রনাথের কর্ণ ভারাক্রান্ত করিলেন, বিশেষরূপে অমরেন্দ্রনাথকে মনে করাইয়া দিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে সমগ্র নাট্যজগতের ভাগ্য-বিধাতা, থিয়েটারের অজস্র টিকিট বিক্রয় ও অশেষ প্রতিপত্তি সকলই একমাত্র তাঁহারই ভাগ্য ও নামের নিমিত্ত; সুতরাং তিনি যদি এখন চুণিবাবুর সহিত নূতন কিছু বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আর থিয়েটার না করাই কর্ত্তব্য। অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অধৈর্য্য পুরুষ ছিলেন,

কোন বিষয়েই কোন দিন তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না, তিনি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বিশেষভাবে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"কলিকাতায় গিয়া অতি সত্বর থিয়েটার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া সপ্তাহের মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিব।" কবিরাজ মহাশয় এক সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী ঔষধও সঙ্গে দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় আর ব্যবহৃত হয় নাই।

যাইবার দিন অমরেন্দ্রনাথ মণিবাবুর বাসায় গিয়াছিলেন। তাহার অনতিদূরেই নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বাসা। নাট্যাচার্য্য মহাশয় অসুস্থতানিবন্ধন বহুদিন যাবৎ বারাণসীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা দশটার সময় স্নানাদি করিয়া অমরেন্দ্রনাথ অমৃতবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন,—"অমৃতবাবু আমাকে ডাকিয়াছেন,—চুণিবাবুও যাইতেছেন; একবার তাঁহার সহিত থিয়েটার সম্বন্ধে পরামর্শ করিব।" দুই ঘণ্টা পরে অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন; তখন তাঁহার মুখ বেশ প্রফুল্ল, বোধ হয়, অমৃতবাবুর নিকট হইতে সুপরামর্শ পাইয়াছেন বলিয়া এই আনন্দ। তিনি মণিবাবুকে বলিলেন,—"অমৃতবাবুকে বলিলাম যে, চুণিবাবু চলিয়া যাইতেছে, আমার শরীরেরও এই অবস্থা; এখন আপনার সাহায্য ভিন্ন থিয়েটারটিকে রক্ষা করিবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। এখন যদি আপনি আমাকে সাহস দেন,—আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় গিয়া থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমাকে বাধ্য হইয়া থিয়েটারের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিতে হয়; কারণ আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

মণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কি বলিলেন?" অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি যাহা প্রত্যাশা করি নাই, তিনি তাহা বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—আমি যদিও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই, যদিও কাশীধাম হইতে এখনও কিছুকাল কলিকাতায় ফিরিবার বাসনা আমার ছিল না, কিন্তু তুমি যখন বিপন্ন এবং তোমার শরীর যখন ভগ্ন, তখন তোমার জন্য—তুমি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত আমি সকল প্রকারেই তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।" তাহার পর অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি বলিয়া আসিয়াছি, কলিকাতায় গিয়াই তাঁহাকে পত্র লিখিব,—আমার পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতায় যাইবেন বলিয়াছেন।"

সেইদিনই অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কারণ, চুণিবাবুর প্রভাবে অমরেন্দ্রনাথের যে সকল হিতৈষীর স্বার্থহানি হইতেছিল, তাঁহারা প্রত্যেকেই থিয়েটারের এক একটী 'ঘুঘু',—কোন্ অধ্যক্ষের কি প্রকৃতি—কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা—কোন্ দেবতা কি প্রকার তোষামোদে প্রসন্ন হন—তাহা তাঁহারা বিলক্ষণই জানিত। প্রাচীন নাট্যাচার্য্য, চিরগম্ভীর অমৃতলালের কঠোর শাসনাধীনে স্বার্থ সাধনের আশা নাই, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাই রোগগ্রস্ত অমরেন্দ্রনাথকে প্রলুব্ধ করিয়া, আর কাহাকেও আনাইবার অবকাশ না দিয়া, তাঁহাকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

চুণিবাবু মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তখন সেই পীড়িত অবস্থায় আবার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্রাম বাসনা টুটিয়া গেল, অবলম্বিত চিকিৎসা পরিত্যক্ত হইল। হিতৈষীরা

বলিলেন,—"থিয়েটার যখন করিতে হইবে, রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে, চীৎকার করিতে হইবে,—তখন কবিরাজী ঔষধ কি করিবে? এমন ঔষধ আবশ্যক, যাহাতে এইরূপ কার্য্য করাও চলে, অথচ রোগ আরোগ্য হয়।" তখন তাঁহাদের মতে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

এইবার ষ্টারে 'সওদাগর' ও 'গোঁসাইজী'র মহলা আরম্ভ হইল। নাটকখানি যাহাতে দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে, তজ্জন্য অমরেন্দ্রনাথ প্রভূত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর, সওদাগরের প্রথমাভিনয় রজনীতে তিনি কিরূপ অভিনয় করিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 'গোঁসাইজী'র মহলা দিতেও তাঁহার বিলক্ষণ পরিশ্রম হইল।

এদিকে পরিশ্রম যত বাড়িতেছিল, রোগও তত তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিতেছিল। ১১ই ডিসেম্বর, শনিবার, জ্বরের প্রচণ্ড প্রকোপ সত্ত্বেও তিনি কুলীরকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। ফলে রবিবার, শরীর আরও খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন সাজাহানে ঔরংজেবের ভূমিকা অভিনয় করিবেন বলিয়া তাঁহার নাম পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হইয়া গিয়াছিল। রঙ্গালয়ে অসম্ভব জনসমাগম দেখিয়া, তিনি এত দর্শককে বিফলমনোরথ করিয়া ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইলেন না,—অসুস্থ শরীরেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। তাই নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন ঃ—

হীনজ্যোতিঃ যবে নেত্রে, শমনে শাসায় বেত্রে,
বর্ম্মগাত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে করে গেছে অভিনয়।
সবে বলে ধন্য ধন্য, প্রস্থান বীরের গণ্য,
শূন্য দৈন্য পিতৃপ্রাণে ধন্য বজ্রময়॥

সেই রজনীতে—১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৫ খৃঃ, বাংলা ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল, রবিবার—অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। কিন্তু অভিনয় সম্পূর্ণ করা হইল না ; তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল,—তিনি আর অভিনয় করিতে পারিলেন না।

চিকিৎসকের উপদেশে, পরদিন সোমবার অমরেন্দ্রনাথ ষ্টীমার যোগে সুন্দরবন অঞ্চল দিয়া, গোয়ালন্দ যাত্রা করিলেন। কাশীতে গঙ্গাস্নানে তাঁহার উপকার হইয়াছিল বলিয়া, চিকিৎসকগণ মনে করিলেন যে গঙ্গার হাওয়ায় তাঁহার শরীরের উন্নতি হইবে। কিন্তু ষ্টীমারে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। গোয়ালন্দে নামিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় সুহৃদ অবিনাশচন্দ্র বেলিয়েলের ভবনে একদিন অবস্থান করিবার পর, শুক্রবার প্রবল জ্বর লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার পারিবারিক জীবনে একটী দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে বহুমূত্র ও যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনিও স্বাস্থ্যোন্নতি মানসে কাশীধামে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই তাঁহার পীড়া এমন বৃদ্ধি পায় যে, চিকিৎসকেরা তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দেন। ১৬ই ডিসেম্বর, ডাক্তার জবাব দিয়া গেলে, কলিকাতায় তাঁহার পুত্র শচীন্দ্রনাথকে টেলিগ্রাফ করিয়া কাশীতে যাইতে বলা হয়। হীরেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ ও পরিবারস্থ আরও ২।১ জন লোক সেই রাত্রেই কলিকাতা ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহারা যখন কাশীধামে পঁহুছাইলেন, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তারযোগে এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল।

প্রবল জ্বর লইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে, অমরেন্দ্রনাথ যখন হাতী-

বাগানের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, তখন সবেমাত্র সেখানে এ দুঃসংবাদ পঁহুছিয়াছে। বাড়ীর থম্‌থমে ভাব দেখিয়া, তিনি চমকিয়া গেলেন। মেজদা কোথায় ও কেন কাশী গিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় বাড়ীতে যে ক্রন্দনের রোল উঠিল, তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভ্রাতৃবিয়োগের নিদারুণ শোকে অমরেন্দ্রনাথ মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর সে শোকাচ্ছন্ন আবহাওয়া রুগ্ন শরীরে সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি থিয়েটারে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া রোগ প্রবলতর আকার ধারণ করায় তাঁহাকে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। শনি রবিবারের হ্যাণ্ডবিল প্লাকার্ডে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইয়াছিল। শনিবার রাত্রেই টিকিট ঘরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং অমরেন্দ্রনাথ এ সপ্তাহে অভিনয় করিতে পারিবেন না।—ইহাই শেষ ঘোষণা ;—আর অমরেন্দ্রনাথকে অভিনয় করিতে হয় নাই। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অভাবে থিয়েটারের টিকিট বিক্রয়ের কোন আশা নাই ; তাই 'গোঁসাইজী', 'ভীলেদের ভোমরা' প্রভৃতি অভিনয়ে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে তাঁহার নাম 'শিক্ষক ও প্রধান অভিনেতা' বলিয়া বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কলিকাতাস্থ পরিবারবর্গ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া, কাশীতে তাঁহার সংবাদ পাঠাইলেন। সদ্যঃ-জ্যেষ্ঠ-পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা বৃদ্ধা জননীর নিকট প্রিয় সন্তানের শঙ্কট-জনক রোগের কথা জানান হইল না, কিন্তু তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সেই দিনই কাশী হইতে চলিয়া আসিয়া, অমরেন্দ্রনাথকে থিয়েটার হইতে বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিলেন।

শ্মশানে অমরেন্দ্রনাথ।

পাদদেশে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ, শিয়রে কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী,—বামে ভ্রাতুষ্পুত্র শচীন্দ্রনাথ, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, চুণিলাল দেব, দানিবাবু, মনোমোহন পাণ্ডে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেতনভূষণ বসু (নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের পুত্র), হাঁদুবাবু, প্রবোধচন্দ্র বসু প্রভৃতি ... ম্যানেজার আশুতোষ পালিত ও পশ্চাতে ভক্ত ভৃত্য গিরিধারী।

ইহার পর ৩রা জানুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের অবস্থা প্রায় সমানই ছিল ;—তখন কেহ স্বপ্নেও তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করে নাই। ৪ঠা জানুয়ারী মঙ্গলবার সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, এই দিন প্রভাত হইতে অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। এই দিন যাঁহারা অমরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন, সকলেই বুঝিলেন—জীবন যুদ্ধে বিজয়ী অমরেন্দ্রনাথ এবার মহাকালের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত! চিকিৎসায় যাহা সম্ভব, তাহার ত্রুটী হইল না, কিন্তু কে মহাকালকে পরাজিত করিতে পারে! বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, মানুষের চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইল।—দশ দিন দিবারাত্রি-কাল মৃত্যুর সহিত জীবনযুদ্ধ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করিলেন। মহাকাল বাঙ্গালা নাট্যশালার অমূল্য রত্ন হরণ করিয়া লইলেন—বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল দেউটি নিভিয়া গেল।

সেদিন বৃহস্পতিবার,—অমরেন্দ্রনাথের হাতীবাগান বাটীর দ্বিতল বহিঃপ্রকোষ্ঠে, তাঁহার পরিজনবর্গ ও বন্ধুগণ, তাঁহার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসিয়া আছেন। অমরেন্দ্রনাথের নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, চিকিৎসকে রোগীর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া জবাব দিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। একবার বা নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণভাবে বহিতেছে, একবার বা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ সময়ে, ঐরূপ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে সকলে উৎকণ্ঠিতভাবে কখন কি হয় ভাবিয়া অবস্থান করিতেছেন,—এরূপ সময়ে সেই ভীতিপূর্ণ বিভীষিকাময়ী কালনিশার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা অতি করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। কাহারা যেন খুব ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। হীরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি মহাশয় সেরাত্রে সেখানে ছিলেন। সামান্যক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইল যে ক্রন্দনধ্বনি যেন নীচে সদরদ্বার হইতে আসিতেছে। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সদর দ্বারে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিলেন যে কতকগুলি অন্ধ ও খঞ্জ স্ত্রী পুরুষ ও ভিক্ষুক অমরেন্দ্রনাথের সংবাদ লইতে আসিয়া, তাঁহার জীবনের আশা নাই শুনিয়া, ওইরূপ কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছে। তাহাদের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল যে, অমরেন্দ্রনাথ বহুদিন হইতে তাহাদের প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যে তাহারা অক্ষম ও অশক্ত হইয়া, কেহ বা সুখে পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল,—যাহার কেহ নাই সে নিজের জীবিকা সুখে নির্ব্বাহ করিতেছিল। অমরেন্দ্রনাথের কৃপায় আর তাহাদের নিদাঘের ভীষণ রৌদ্রে পুড়িয়া, বর্ষার প্রবল বারিপাতে ভিজিয়া, মহাকষ্টে অশক্ত শরীরে সহর প্রদক্ষিণ করিয়া বহুদিন যাবৎ ভিক্ষা করিতে হয় নাই। শীতের সময় শীতবস্ত্র পাইয়াছে, রোগে পড়িলে অমরেন্দ্রনাথকে জানাইবামাত্র তিনি চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। এখন সেই দেবতা, মহাত্মা অমরেন্দ্রনাথ তাহাদের অকূলে ফেলিয়া যাইলে, তাহারা কাহার ভরসায় বাঁচিয়া থাকিবে? এইরূপ নানাপ্রকার হৃদয়গ্রাহী উক্তিতে তাহারা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। হায়, কয়জনের মহাযাত্রার পথ এরূপ পবিত্র অশ্রুজলে সিক্ত হয়!*

১৩২২ সালের ২১শে পৌষ বৃহস্পতিবার (ইংরাজী মতে, ৬ই

* অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিবস সমাজপতি মহাশয় 'বাঙ্গালী' পত্রিকায় এ ঘটনার কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন।

জানুয়ারী, ১৯১৬ খৃঃ) শেষ রাত্রে চারিটা দশ মিনিটের সময় ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে বঙ্গরঙ্গভূমির অন্যতম গৌরব অমরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করিলেন। শুক্রবার প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অমরেন্দ্রনাথ নাই' এ সংবাদ সমস্ত সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্তগণ, অমরেন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার ভবনে সমবেত হইতে লাগিলেন। বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতেই অমরেন্দ্রনাথের হাতীবাগানের বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বেলা ১১টার সময়, সুরভি চন্দনে ও সুগন্ধী পুষ্পে ভূষিত অমরেন্দ্রনাথের বরবপু, রাজবেশে সজ্জিত হইয়া হাতীবাগানের বাটী হইতে বাহির হইল। তাঁহার শবদেহ প্রথমে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে নামান হইল। হায়! তখনও থিয়েটারের প্রাচীর গাত্রে প্লাকার্ডে অমরেন্দ্রনাথের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহার পর ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে নামাইয়া, অমরেন্দ্রনাথের প্রাণশূন্য দেহ যখন শ্মশানে নিমতলা ঘাটে নীত হইল—তখন বেলা একটা। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ক্রন্দন রোলে সমস্ত শ্মশানভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। সমবেত জনগণ একবার তাঁহার শেষমূর্ত্তি দেখিয়া লইলেন। মুখে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়া! মৃত্যু যেন সে মুখের সৌম্য ছবি—প্রসন্নভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই! সেই অমিতপ্রতাপ অমরেন্দ্রনাথ যেন ধ্যানে মগ্ন!

গঙ্গাতীরে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় অমরেন্দ্রনাথের বরবপু শায়িত হইল—পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ শেষ কার্য্য সমাধা করিলেন। সর্বভূকের কৃপায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।

যাহা গেল—তাহার আর তুলনা নাই। যাহা হারাইলাম—তাহা আর ফিরিয়া পাইব না। নিয়তির বিচিত্র লীলা কে খণ্ডন করিতে পারে? কিন্তু চিরপ্রার্থিত বাসন্তী পূর্ণিমার রজনী হইতে না

হইতে প্রভাত উপস্থিত হইলে কাহার না প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? প্রতিভার বিকাশ হইতে না হইতেই যদি লুপ্ত হইয়া যায়, তাহাতে কাহার প্রাণ না হাহাকার করে? চল্লিশ বৎসর পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্থিব লীলা শেষ করিয়া চিরতরে চলিয়া গেলেন বটে; কিন্তু তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরদিন ধরার পৃষ্ঠে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালাদেশে থিয়েটার থাকিবে, ততদিন আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, অমরেন্দ্রনাথ কে ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন,—আর দ্বিতীয় অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গরঙ্গালয়ে আসিবে কি না, সে কথার মীমাংসা করিতে পারেন শুদ্ধ অন্তর্য্যামী!

যাও, অমরেন্দ্রনাথ, যাও অমরধামে! কৈশোরে কুসঙ্গীর কুপ্রলোভনে মার্গচ্যুত হইয়া সংসারের অশেষ যন্ত্রণা-পারাবারের মধ্যে তোমাকে অশেষবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সাধ্বী পতিপ্রাণা পত্নীর দক্ষিণে সতীলোকে উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখে অবিরত তোমার চিরারাধ্য নাট্যকলার অধিষ্টাতৃদেবতা উমা-মহেশ্বরের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে অহর্নিশ নাট্যলীলা প্রত্যক্ষ করিবে! এ রাজ্যে বন্ধুর কৃতঘ্নতা নাই, পিশাচীর ছলনা নাই, অর্থের অসচ্ছলতা জন্য মানসিক অশান্তি নাই—আত্মীয় স্বজনের ভ্রান্তিবশতঃ তিরস্কার গঞ্জনা নাই, প্রাণাধিকা প্রিয়তমার বিচ্ছেদ যাতনা নাই—আছে শুধু সুখ—শান্তি—বিরাম—শ্রদ্ধা—সাধনা ও সিদ্ধি!!! এই পবিত্র নিত্যানন্দধাম তুমি তোমার আজীবন সাধনায় ও পতিপ্রাণা সাধ্বীর দিব্য প্রাণান্তকর প্রণয়ে লাভ করিয়াছ! সাংসারিক যন্ত্রণাগুলি কেবল ভ্রান্তমার্গ পথিকের ন্যায় তোমাকে ভুগিতে হইয়াছে,—পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের সঙ্গেই সমুদায় পঙ্কিলতা চিরতরে বিদূরিত হইয়াছে।

উপসংহার

—:*:—

অমরেন্দ্র-প্রতিভা

আমরা নিম্নে প্রথমাভিনয়ের তারিখ সহ অমরেন্দ্রনাথ রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীর তালিকা দিলাম। তারকা চিহ্নিত গ্রন্থগুলি মৌলিক নহে—অপরের উপন্যাস হইতে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত।

১। উষা (গীতিনাট্য)।

২। মানকুঞ্জ (ঐ)।

*৩। দেবী চৌধুরাণী (নাটক)—২৯শে মে, ১৮৯৭।

৪। কাজের খতম (পঞ্চরং)—২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৭।

৫। দোললীলা (গীতিনাট্য)—৮ই মার্চ্চ, ১৮৯৮।

*৬। ইন্দিরা (নাটক)—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮।

৭। নির্ম্মলা (গীতিনাট্য)—২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮।

৮। শ্রীকৃষ্ণ (ঐ)—২৬শে আগষ্ট, ১৮৯৯।

*৯। ভ্রমর (নাটক)—১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯।

১০। মজা (প্রহসন)—১লা জানুয়ারী, ১৯০০।

১১। দুটী প্রাণ (গীতিনাট্য)—২৬শে মে, ১৯০০।

১২। সীতারাম (নাটক)—৩০শে জুন, ১৯০০।

১৩। থিয়েটার (প্রহসন)—২৫শে আগষ্ট, ১৯০০।

১৪। চাবুক (ঐ)—১লা জানুয়ারী, ১৯০১।

১৫। গুপ্তকথা (ঐ)—৩১শে আগষ্ট, ১৯০১।

১৬। ফটিকজল (নাটিকা)—১২ই এপ্রিল, ১৯০২।

১৭। লাটগৌরাঙ্গ বা ভক্তবিটেল (প্রহসন)
—২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯০২।

*১৮। বঙ্গের শেষবীর বা প্রতাপাদিত্য (নাটক)
—২৯শে আগষ্ট, ১৯০৩।

২(ক)। শ্রীরাধা (মানকুঞ্জের নামান্তর)—১০ই জুলাই, ১৯০৪।

*১৯। চোখের বালি (নাটক)—২৬শে নভেম্বর, ১৯০৪।

২০। শিবরাত্রি (গীতিনাট্য)—৪ঠা মার্চ্চ, ১৯০৫।

২১। ঘুঘু (প্রহসন)—২০শে মে, ১৯০৫।

২২। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (রূপক)—১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫।

২৩। প্রণয় না বিষ (নাটক)—২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০৫।

২৪। এস যুবরাজ (রূপক)—৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৫।

*২৫। কুন্দ (নাটক)—৪ঠা আগষ্ট, ১৯০৬।

২৬। দলিতা-ফণিনী (নাটিকা)—৩০শে নভেম্বর, ১৯০৭।

*২৭। কামিনী ও কাঞ্চন (নাটক)—২২শে আগষ্ট, ১৯০৮।

*২৮। জীবন সন্ধ্যা (নাটক)—২১শে নভেম্বর, ১৯০৮।

২৯। কেয়া মজাদার (গীতিনাট্য)—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০৮।

*৬ক। ইন্দিরা (দ্বিতীয়বার নাটকীকৃত)—২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯।

*৩০। কমলাকান্ত (রঙ্গনাট্য)—১২ই জুন, ১৯০৯।

৩১। আশা কুহকিনী (নাটিকা)—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০৯।

*৩২। রাণী ভবানী (নাটক)—৬ই আগষ্ট, ১৯১০।

৩৩। জীবনে মরণে (গীতিনাট্য)—১৭ই জুন, ১৯১১।

৩৪। আহা মরি (প্রহসন)— ঐ

৩৫। কিস্‌কিস্ (রঙ্গনাট্য)—৩রা মে, ১৯১৩।

৩৬। রোকশোধ (রঙ্গনাট্য)—১লা নভেম্বর, ১৯১৩।

৩৭। বড় ভালবাসি (গীতিনাট্য)—৩০শে মে, ১৯১৪।

৩৮। অভিনেত্রীর রূপ (নাটক)—২৬শে ডিসেম্বর, ১৯১৪।

৩৯। প্রেমের জেপলিন (রঙ্গনাট্য)—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫।

৪০। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (নাটক)।

৪১। আদর (উপন্যাস)।

৪২। অভিনেত্রীর রূপ (উপন্যাস)।

এতদ্ব্যতীত সৌরভ, জন্মভূমি, রঙ্গালয়, নাট্যমন্দির প্রভৃতি বিবিধ ামরিক পত্রিকায় অমরেন্দ্রনাথ গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা প্রভৃতি লখিয়াছিলেন।

উপরোক্ত তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সাহিত্যের মন কোন দিক নাই, যাহাতে না অমরেন্দ্রনাথ হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। কন্তু তাঁহার রচনা পাঠ করিলে এটাও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি খনই আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হন নাই। সে রচনার ার রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি আদর্শ লেখক-ণের উপর অর্পণ করিয়া, তিনি রসসৃষ্টি করিতে পারিলেই নিজের য়াস সার্থক জ্ঞান করিতেন। তা' ছাড়া তিনি রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী লেন, সুতরাং শুধু গ্রন্থ রচনা করিলেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইত নাই। গ্রন্থ কতখানি দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে, সে বিষয়ে পূর্ণ লক্ষ্য রাখিলে, রঙ্গালয় পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাই দর্শক-ণের প্রীতির ও রুচির দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি গ্রন্থ রচনা করিতেন, ই জন্য তাঁহার কোন বই কখনও 'মার' খায় নাই। অথচ গিরিশচন্দ্র, ীন্দ্রনাথ আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হইলেও, সর্ব্বদা সাধারণ দর্শকের নারঞ্জনে সমর্থ হন নাই। গিরিশচন্দ্র ত' স্বত্বাধিকারী ছিলেন না,

তাই বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি আদর্শ নাটক লিখিয়াই খালাস। অমরেন্দ্রনাথ বলিতেন যে একমাত্র পাণ্ডব গৌরব ছাড়া গিরিশচন্দ্রের ক্লাসিকে প্রথমাভিনীত কোন পুস্তকেই তিনি আশানুরূপ বিক্রয় পান নাই। অথচ সামান্য আলিবাবা অমরেন্দ্রনাথকে লক্ষপতি করিয়াছে, নগণ্য হিরন্ময়ী তৎকালীন থিয়েটার-রাজ্যে উপর্য্যুপরি অভিনয়ে 'রেকর্ড' সৃষ্টি করিয়াছে. অজ্ঞাত 'সোনার স্বপন' ও 'থিয়েটারে'র বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। দর্শকের রুচি যে দিকে দেখিয়াছেন, অমরেন্দ্রনাথ সেই দিকেই তাঁহার লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার রচনায় সঙ্গীত ও নৃত্যবাহুল্যের দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা তদানীন্তন দর্শকসমাজের রুচির পরিচায়কমাত্র। এই সকল সমালোচক-দিগের উদ্দেশ্যেই নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বলিয়াছিলেন ঃ—

"অমরবাবুর নিজের লেখায় বা তার যদি দুটো একটা দোষ থাকে, (আমি এ কথাটার উল্লেখ করছি এই জন্য যে—এক শ্রেণীর লোক এই রকম ২।১টা সামান্য দোষ দেন) সেটা তার গুণের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কিছুই নয়। আর সেটা আমাদের আলোচনা করা বা বলা কর্ত্তব্য নয়, কেন না, সে যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিল, নাট্য-জগতের জন্য যা করেছিল আর তাতে যে অলৌকিক গুণ বর্ত্তমান ছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলে, তার ঐ সামান্য দোষ কিছুই নয়। যারা আমাদের জাতীয় জীবনে কিছু দান করে যায়, তারা আমাদের জাতির গৌরব-স্বরূপ—তাদের দোষ থাকলে তা চেপে যেতে হয়। উপমা-স্বরূপ সেক্স্পিয়ারের কথা ধরি। Shakespeareএর grammatical mistakes অনেক আছে, কিন্তু তিনি জাতির গৌরবস্বরূপ বলে ইংরেজ জাত তাঁর জন্য অন্য 'গ্রামার' তৈরী করলে, তবু তাঁর লেখার দোষ ধরলে

না।" অতঃপর মহাকবি দাশুরায়ের কোদাল স্থলে 'কোদণ্ড' শব্দের অপপ্রয়োগের ফলে অভিধানে কোদণ্ড অর্থে কোদাল লিখিত হইয়াছে, তবু তাঁহার দোষ ধরা হয় নাই, এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার পর, অমৃতলাল উপসংহারে বলিয়াছিলেন,—"তার লেখায় যদি সামান্য কোনও দোষ থাকে, তা হ'লে তার অপূর্ব্ব মনীষা, অসামান্য প্রতিভা আর অস্বাভাবিক গুণের দিকে চেয়ে দেখে সেগুলো ভুলে যেতে হয়।"

অমরেন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ে আর একটী কথা আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত। তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। যদি আমরা সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের জীবনী আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদের মধ্যে যথার্থই অঙ্গুলী সাহায্যে গণনা করা যায়, এরূপ দুই চারিজন লেখক ছাড়া বাকী সকলেরই রচনার পরিপক্কতা আরম্ভ হইয়াছে, চল্লিশ বৎসর বয়সের পর। অসংখ্য নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে রচিত কয়খানি নাটক আদর্শ সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, তাহা বিবেচনা করিলেই আমরা এ কথার সার্থকতা বুঝিতে পারি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অমরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন :—

"তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তিনি যে বয়সে মারা গেছেন, ঠিক সেই বয়সের পর থেকে বড় বড় লেখকের বিখ্যাত লেখা সকল রচিত হয়েছে। চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে মানুষের রচনা পরিপক্ক হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয়, অমরবাবু চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেই মারা গেলেন। মস্তিষ্ক পরিপক্ক হবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন বটে, কিন্তু তবুও তাঁর লেখায় এমন একটা গুণ

আছে যে যখন আমি তাঁর বই পড়্‌তুম, তখন আমার মনে হত যে আমি সেই পুস্তক বর্ণিত স্থানে রয়েছি। পাঠকের এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি আনাই পুস্তকপ্রণেতার প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়।”

শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত রচনাবৈশিষ্ট্য অমরেন্দ্রনাথের প্রত্যেক পুস্তকেই পরম পরিস্ফুট। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি যে চরিত্র সৃষ্টি করিতেন, তাহা কল্পনার সাহায্যে সৃজন করিতেন না—ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলেই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিত। তাই তাঁহার কাজের খতমে মতিলাল, চাবুকে প্রিয়লাল, মজায় হরিহর ও সর্ব্বোপরি অভিনেত্রীর রূপে নলিনী চরিত্র এত জীবন্ত। ইহার প্রত্যেকটীই তাঁহার স্বীয় জীবনের ছবির সাহায্যে সঞ্জীবিত। নিজ চরিত্রের দুর্ব্বলতা অকপটে ব্যক্ত করিতে তিনি কখনও দ্বিধা বোধ করেন নাই, ইহা বড় কম সৎসাহস ও অন্তরের প্রসারতার পরিচয় নহে। অতি অল্প গ্রন্থকারের রচনার মধ্যেই এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অমরেন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে অধ্যাপক পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন :—“অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চরং ও নাট্যরঙ্গগুলিতে লোকের চোখের ঠুলি খুলিয়া মানবচরিত্রের নারকীয় লীলাগুলি সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সহৃদয় সাহিত্য-সেবিগণ তাঁহার অভিনয়ের তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্র-নাথের নাট্যাভিনয়ে লোকে ঠিক নিজের ভিতরের পুণ্য ও পাপগুলি চাক্ষুষ দেখিতে পাইত বলিয়াই তাঁহার সময় হইতে থিয়েটারে অভিনয়দর্শকের সংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ অন্যান্য নাট্যকার ও অভিনেতৃগণ অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে সমাজচিত্রের বিশ্লেষণ

করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, তাহা কি স্বীয় গ্রন্থে, কি স্বীয় অভিনয়ে কখনও অবিকল বিশ্লেষণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাই তাঁহার রঙ্গনাট্য ও পঞ্চরং এবং উপন্যাসগুলি ভাষাসম্পদে, চরিত্র-বৈচিত্র্যে, গ্রথন-পারিপাট্যে অতি উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, অকপট সত্য বিবৃতিতে, লোকচরিত্রের অবিকল-চিত্র-সংগঠনে এবং ভাববিকাশে তাঁহাকে সমাসীন করিয়া রাখিয়াছে। * * *

"নাট্যকার, রঙ্গনাট্যকার ও গীতিনাট্যকার এদেশে অমরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে অনেক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটক, গীতিনাট্য ও রঙ্গনাট্যগুলি এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর। পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থের সহিত অমরেন্দ্রনাথের গ্রন্থের কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে না। ইহাই ইহাদের বিশেষত্ব। অমরেন্দ্রনাথ উচ্চ সাহিত্য লক্ষ্য করিয়া কিছুই রচনা করেন নাই, তাঁহার গ্রন্থগুলি তৎকালীন সমাজ ও তাঁহার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যের লোকগুলির চরিত্রের অবিকল অনুকরণেই বিরচিত। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের স্বীয় জীবনের সুখ ও দুঃখ, লাভ ও লোকসান, বন্ধুত্ব ও নিমকহারামি এবং তাঁহার প্রিয় দর্শকবৃন্দের চিত্তসুখপ্রদ বিষয় তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য এবং সেগুলি তিনি অকপটে বক্ষঃশোণিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তখন উহারা সকলের অত্যন্ত হৃদ্য ও আদরের হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথের তাঁহার নিজের পরিবেশের অন্তর্গত এক একটী লোকের জীবন্ত চিত্রের অভিনয় দেখিতে দেখিতে সকলেই মূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, কেন না অমরেন্দ্রনাথের নিজের জীবনও যে সম্পূর্ণ নাট্যলীলাময়!

"তিনি যে দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি

অদ্বিতীয়। কাজের খতম, চাবুক ও ঘুঘু বাহ্ন সভ্য কিন্তু অন্তর্ঘুর্ঘু, অর্থাৎ 'পয়োমুখ বিষকুম্ভ' লোকদের মুকুর-প্রতিফলিত অবিকল প্রতিবিম্ব। তাঁহার 'দূতী প্রাণ' গীতিনাট্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন হইলেও, উহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্রে দর্পণে প্রতিফলিত জীবন্ত ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। উহা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের 'কৌতুক সর্ব্বস্বের' জীবনহীন চিত্র নহে। * * সুচালকের হস্তে পড়িলে অমরেন্দ্র-প্রতিভার, শুদ্ধ বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতে, অপূর্ব্ব দিব্য বিভা উচ্ছ্বসিত হইত। অমরেন্দ্রনাথের 'দলিতা ফণিনী' ও 'প্রণয় না বিষ' এই দুইখানি নাটিকার উপাখ্যান-ভাগ সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নাট্যকারের মৌলিক নিজস্বের একটুও অভাব নাই। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও যেমন অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন, তদঙ্কিত চরিত্র মধ্যেও ভাবের বিহ্বলতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। সেই ভাবাধিক্যই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলিকে এক সোনার স্বপনে ঘিরিয়া রাখিয়া দর্শক ও পাঠকবৃন্দের চিত্তকন্দর সর্ব্বদা এক বিচিত্র অভিনব আবেশে বিহ্বল করিয়া রাখিত। উহাই তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের বিশেষত্ব—উহাই তাঁহার অদ্ভুত উন্মাদনা-বিকাশ-ক্ষমতা।"

অপরের উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিতে অমরেন্দ্রনাথ কতখানি সিদ্ধহস্ত, তৎবিষয়ে বিবিধ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের অভিমত পাঠকবর্গ এই গ্রন্থমধ্যেই পাইবেন। এ সম্পর্কে 'বঙ্গবাসী'র স্বনামখ্যাত সম্পাদক রায়সাহেব বিহারীলাল সরকারের উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি 'জীবনে মরণে' নাটিকার সমালোচনাকল্পে লিখিয়াছিলেন :—

'হরিরাজ' নাটকে অসিনিষ্কাসনোদ্যত হরিরাজের ভূমিকায়
অমরেন্দ্রনাথ।

"সেক্সপিয়ার সম্বন্ধে একদিন ল্যাণ্ডোর যা বলিয়াছিলেন, এখানে রবীন্দ্র-অমরেন্দ্র সম্বন্ধে তাহা কি বলা যায় না? ল্যাণ্ডোর বলিয়াছিলেন,—He was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life." *

এত বড় সুখ্যাতির পর আমাদের নিজেদের কোন মন্তব্য বাহুল্য মাত্র।

অভিনয়ই অমরেন্দ্রনাথের জীবনের চরম লক্ষ্য। নাট্যকলা সাধন উদ্দেশ্যেই তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ইহাই তাঁহার কৈশোরের সাধনা, যৌবনের সিদ্ধি, জীবনের নির্ব্বাণ। আত্মীয়-স্বজনের ঘৃণা গঞ্জনা তুচ্ছ করিয়া, সমাজসংস্কারকে পদদলিত করিয়া, তিনি হেয় অভিনেতা-বৃত্তি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সাধনার ঐকান্তিকতায়,—গৃহে পরম প্রেমময়ী পতিব্রতা ভার্য্যা, ভারত-প্রসিদ্ধ জ্ঞানীকুলতিলক পণ্ডিতাগ্রগণ্য আদর্শচরিত্র পিতা—কাহারও দিকে তিনি দৃক্‌পাত করেন নাই,—নিজের সাধনায় নিজেই বিভোর হইয়া থাকিয়াছেন, নিজের সিদ্ধিতে নিজেরই সর্ব্বনাশ করিয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অভিনয় বিদ্যায় তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা আমরা পুনঃপুনঃ করিয়াছি, আরও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, বহু জনপ্রসিদ্ধ লেখকের রচনা উদ্ধৃত করিয়া এ গ্রন্থের পৃষ্ঠাবৰ্দ্ধন করিতে পারি। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক চরিত্রচিত্রণে অমরেন্দ্রনাথ এমন একটী অপূর্ব্ব জীবন্ত ছবি প্রস্ফুটিত করিতেন, যাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত, অনুপমেয়, অনন্যসাধারণ—একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব। উহাই ছিল তাঁহার

* ৪৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। অন্যান্য অভিনেতার অভিনয়কালে চরিত্রানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ, মেক্ আপ্ প্রভৃতি অসংখ্য সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হইত, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথকে ভগবান্ এমন মনোহর আকৃতি, এমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দিয়াছিলেন যে, অন্যের মত তাঁহার কোন আহার্য্য শোভার বিন্দুমাত্র আবশ্যক হইত না। তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলে মনে হইত যেন তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সমস্ত রঙ্গগৃহ আলোকিত করিতেছে, তাঁহার উচ্চারিত প্রত্যেক বর্ণ দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া শুনিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চেহারা, কণ্ঠস্বর ও অভিনয়ে অসামান্য সাত্ত্বিকতা দেখিলে স্বতঃই সকলের ধারণা হইত যে, ঈশ্বর যেন তাঁহাকে অভিনেতা করিয়াই এ জগতে পাঠাইয়াছিলেন।

শুধু তাই নয়, প্রত্যেক রসাভিনয়ে তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কি রাস্তার মুটে মজুর, কি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর—যে ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতেই যথাযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন। হাস্যরসাভিনয়ে যেমন সকলকে হাসাইয়াছেন, গুরু-গম্ভীর ভূমিকায় তেমনি সকলকে মাতাইয়াছেন, আবার করুণ ভূমিকায় তেমনি প্রত্যেককে কাঁদাইয়াছেন। তাঁহার মত ষড়রসসমন্বিত অভিনেতা বঙ্গীয় নাট্যশালায় অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না। আবার এইখানেই তাঁহার অভিনয় প্রতিভার শেষ হয় নাই। আমরা জানি, অভিনয় আরম্ভের মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, অমুক অভিনেতা রঙ্গালয়ে অনুপস্থিত। তিনি হয়ত সে ভূমিকা একদিনও দেখেন পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়—নিজে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া, অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। কতবার যে তাঁহাকে এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই

কত ভূমিকা অভিনয় করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এ বড় কম শক্তির পরিচায়ক নহে। অতি অল্প নটনটীতেই এরূপ দক্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় অধ্যক্ষও রঙ্গজগতে বিরল। নূতন সম্প্রদায় গঠনে তাঁহার কৃতিত্ব কতখানি ছিল—তাহা আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। জনপ্রিয়তায়ও তাঁহার তুলনা পাওয়া যায় না। নটগুরু গিরিশচন্দ্র পর্য্যন্ত একাকী কোন থিয়েটার বজায় রাখিতে পারেন নাই—কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ বিপক্ষ রঙ্গালয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতৃবর্গের সমাবেশ সত্ত্বেও, একাই একটা থিয়েটার সগৌরবে পরিচালনা করিয়াছেন। কোহিনুর থিয়েটারের সময় মিনার্ভা ও শেষ জীবনে ষ্টার থিয়েটারই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা যে কত বড় গৌরব ও শক্তির কথা—তাহা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

অমরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সাপ্তাহিক 'বাঙলা' (১০ই আষাঢ়, ১৩৩৩, ইং ২৫।৫।২৬) যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—"**অতীতকালে অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র নট—যাঁহার নামে দর্শক আকৃষ্ট হইত।**"

এই 'বাঙলা'ই ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে (১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৩) অন্য এক প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—"আজ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নাই ; অর্দ্ধেন্দু-শেখর নাই ; গিরিশচন্দ্র নাই। তাঁহাদের সময়ে কোন কোন দর্শক অভদ্র আচরণ যে না করিত এমন নহে, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের এত বড় প্রভাব ছিল যে তাঁহাদের নাম শুনিলে উচ্ছৃঙ্খলও শান্ত হইয়া যাইত। এই ব্যক্তিত্বের অভাবটা এখন বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। এক আধ জনের সামান্য আছে, তুলনায় কিন্তু খুবই কম।"

অভিনেতৃবর্গের মর্য্যাদাবর্দ্ধনে অমরেন্দ্রনাথের আজীবন চেষ্টার কথা কাহাকেও বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।* এই গ্রন্থে তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। অমরেন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই যে তাঁহার নীতি কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহাও সকলের বিদিত। শেষ জীবনে তিনি ক্রমশঃ রাজসরকারের নজরে পর্য্যন্ত আসিতেছিলেন। ষ্টারের অধ্যক্ষরূপে বহুবার তাঁহার রাজদরবারে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এ দেশের রাজদরবারে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম আমন্ত্রিত দেশীয় অধ্যক্ষ-অভিনেতা—জানি না, শেষও কি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১৩১৯ সালের চৈত্র সংখ্যা ও তাহার পরবর্ত্তী বহু সংখ্যা 'নাট্যমন্দির' দেখিলে এই বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইতে পারেন।

অমরেন্দ্রনাথের আর একটী মহৎ ও দুর্লভ গুণ ছিল—দয়া। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। তাঁহার দয়ার কথা জানাইতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। তিনি কিরূপ দয়াশীল, ক্ষমাশীল ও পরোপকারী ছিলেন ও শত্রুমিত্রনির্ব্বিচারে কিরূপ তাহা বিতরণ করিতেন, তাহা আমরা এ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বলিয়াছি। তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'জনরব' নামক উপন্যাসের উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন—"কেন? সদাসহাস প্রফুল্ল মুখে—সহজাত বিনয়-বিনম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'কেন? কেন, সাহিত্যিক ব্রাহ্মণের পাশ্চাত্য প্রথামতে আমাকে গ্রন্থ উপহার দেওয়া?' এ 'কেন'র উত্তর আমার নিকট নাই। এ কেন'র উত্তর আপনি দিতে পারেন। আপনি আমার প্রাণে অনেক কেন'র সৃষ্টি করিয়াছেন! কেন সম্পূর্ণ

* "অমরেন্দ্রনাথ নটের ব্যবসায় করিতেন বটে, কিন্তু তিনি সে ব্যবসায় স্বীয় প্রতিভাবলে সমুজ্জ্বল ও বিদ্বজ্জনগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।"—সাপ্তাহিক বসুমতীর উক্তি।

অপরিচিত হইয়া, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তত আপনার করিয়া লইলেন ; কেন, তত উচ্চকণ্ঠে 'My good friend' বলিয়া পরিচিত করিলেন ; কেন সারল্যের তত সুষমা বিকাশ করিয়া, অত অনুরাগ অন্ধ করিয়া দিলেন ? এমন অনেক কেন আছে ; সেই সকল কেনই হয়ত এ কেন ডাকিয়া আনিয়াছে ! ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া শীতার্ত্ত সমীরকে অযাচিত আনন্দ দান করিলে, সে কি বনকুসুমের এক বিন্দু সৌরভ লইয়া, তাহার উপকারীর—তাহার বান্ধবের দুয়ারে দাঁড়াইবার অধিকারী হইতে পারে না ? আপনি সুকবি—আপনার এক একটী কবিতা ঝঙ্কারে সাহিত্য-কুঞ্জ মুখরিত ও উল্লসিত।" ইত্যাদি।

অভিনেতাদের আর্থিক উন্নতির জন্য, অমরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বোনাস, বেনিফিট নাইট, মাহিনা বৃদ্ধির কথা সর্ব্বজনবিদিত। এ সমস্ত বিষয়ে বিস্তার না করিয়া, আমরা মাত্র পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেতন বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে আজ বহু দুঃস্থ ভদ্র সন্তান ও অন্যান্যেরা সম্মানের সহিত স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন তিনি যদি এই সকল কার্য্য না করিতেন, তো বহু ব্যক্তি তাহাদের পরিবারের ও নিজের ভরণপোষণ করিতে সক্ষম হইতেন কি না সন্দেহ।"

রঙ্গমঞ্চের আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য অমরেন্দ্রনাথের অসীম অবদানের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার স্মৃতিসভায় রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী বলিয়াছিলেন :—

"বর্ত্তমান নাট্যজগতে যে ধারা চলছে, যে প্রথায় বর্ত্তমান নাট্য জগৎ পরিচালিত হচ্ছে, যে ধারা ও প্রথার অমরেন্দ্রনাথই একমাত্র

প্রতিষ্ঠাতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। পূর্ব্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে পুরানো ধারাটা চলে আসছিল, তা গিরিশবাবুর ও অর্দ্ধেন্দুবাবুর প্রবর্ত্তিত। গিরিশবাবুর একটা, অর্দ্ধেন্দুবাবুর একটা—এই দুটো ধারা এক হয়ে তখন নাট্য-জগৎ পরিচালনা করত। অমরেন্দ্রনাথ সেইটার সংস্কার করে, পাশ্চাত্য জগতে যে ধারায় অভিনয় চলত, সেই ধারাকে বাংলা ছাঁচে ঢেলে, তাকে সেই সংস্কৃত ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, তার সঙ্গে নিজস্ব একটা নূতন ধারা যোগ দিয়ে দিয়ে, সে নাট্যজগতে ত্রিবেণী সঙ্গম করলে। গঙ্গা, যমুনা বা সরস্বতী—তিনটাতে আলাদা আলাদা স্নান করা অপেক্ষা ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করা কত বেশী পুণ্যকর, তা আপনারা জানেনই—সেই রকম এই যে তিনটে ধারা—পুরানো প্রচলিত, পাশ্চাত্য জগতের আর অমরেন্দ্রনাথের নিজের—এই তিনটে পৃথক-ভাবে যত কার্য্যকরী না হত, তাদের মিশ্রণে তার চেয়ে ঢের বেশী কার্য্যকরী হয়েছে। গিরিশবাবু আর অর্দ্ধেন্দুবাবু—কিসে বাংলা নাট্যশালার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়, কিসে সেটা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, সেই চেষ্টায় আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন, আর অমরেন্দ্রনাথ—কিসে সেই নাট্যশালার উন্নতি হয়, কিসে সেই নাট্যশালা সভ্য জগতে জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং সেই সঙ্গে কিসে সেই নাট্যশালা-সংশ্লিষ্ট অভিনেতৃ-বর্গের উন্নতি হয়—এই চেষ্টায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং সে কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়েছিলেন।"

এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রীনরেন্দ্র দেব আনন্দবাজার পত্রিকায় (২১শে চৈত্র, ১৩৪৭) কি লিখিয়াছেন, দেখুন :—

"স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বহু অর্থ ব্যয় করে আমাদের নাট্যশালার দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় নূতনত্ব আনবার জন্য যত্নবান্ হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা চলে তাঁকেই। ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই 'ঠ্যালা সীন,' 'কাটা সীন', 'বক্স সীন', পরিবর্ত্তনীয় 'উইংস' ও 'প্রোসিনিয়ম' এবং 'যবনিকা' হিসাবে প্রথম 'কার্টেন' ব্যবহার হয়। রঙীন্ আলো, 'স্পট লাইট', প্রভৃতিরও প্রচলন হয়।

"আগেই বলেছি 'ষ্টেজে' তখন কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী করা রঙীন্ কাপড় মোড়া নকল আসবাবপত্র ব্যবহার হত। অমরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম ষ্টেজে আসল সরঞ্জামের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আয়না, ছবি ইত্যাদি ষ্টেজের উপর সাজিয়ে এই সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চকে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল। ষ্টার, মিনার্ভা, ন্যাশানাল, প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতা স্নুরু হয়ে গেল। বারুণী পুষ্করিণী থেকে সিক্তবসনা রোহিণীকে তুলে নিয়ে এল গোবিন্দলাল তাঁর জামা কাপড় ভিজিয়ে। শৈবলিনী ও প্রতাপ গঙ্গায় সাঁতার কেটে উঠতে লাগলো ভিজে কাপড় পরে। জলপ্রপাত ও ঝরণার দৃশ্যে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল ষ্টেজের উপর! ভীমা পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দেবার সময় জল ছিটিয়ে পড়তে স্নুরু হল। গোবিন্দলাল ষ্টেজের উপর অশ্বপৃষ্ঠে দেখা দিতে লাগলেন। আকাশে উড়ে যাওয়া, শূন্যমার্গে দেবতার আবির্ভাব, ফোয়ারা থেকে জল ওঠা, সূর্য্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, ঝড় বৃষ্টি, বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎচমক, ট্রেণের শব্দ প্রভৃতি ধ্বনি, রিভলভার ও পিস্তলের সশব্দে অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ, রঙ্গমঞ্চে কুকুর, বিড়াল, পাখী, পায়রা প্রভৃতি জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর আবির্ভাব এই সময় থেকেই স্নুরু হয়েছিল।"

অমরেন্দ্রনাথ অভিনেতাদিগের কিরূপ বন্ধু ছিলেন ও নাট্যশালার

উন্নতির জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এব বাক্যে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, এ সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া, বঙ্গের সমুদয় সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিব ভূরি ভূরি প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—সে সমস্ত উদ্ধ করিবার স্থান আমাদের নাই। তবে তাঁহার বিয়োগে শোকপ্রকা করিয়া, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে অমৃতবাজার পত্রিকা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয় দিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব :—

"Babu Amarendra was barely forty when he breathe his last, but even within this comparatively short compas of his life, he brought about a keen interest in the develop ment of histrionic art in Calcutta and the Bengali stag owes much of its present day tone and vivacity to hi incessant labours in the cause. His great success at th Classic Theatre, Beadon Street, was the forerunner o a mighty run for classical performances on the Bengal Stage for which he wrote volumes of exhilarating dramas that the playgoers so much appreciated. If Babu Girisl Chandra Ghose was the father of the Indian Stage and the master dramatist, **Babu Amarendra Nath Dutt, on whom his mantle fell, was the foster father of the art as applied on the Stage."**

অমরেন্দ্রনাথের অবর্ত্তমানে নাট্যজগতের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখান বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে—সুতরাং তাহা হইতে

আমরা বিরত থাকিব। তাঁহার জীবদ্দশায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কিরূপ ওলোটপালোট হইয়াছিল, তাঁহার প্রভাবে তদানীন্তন নাট্যশালা কতখানি প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তিনি রঙ্গভূমির জন্য কি করিয়াছিলেন, ও সর্ব্বোপরি তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাঁহার দয়ালু স্বভাবের কথা—এই সকল বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে পারিলেই আমাদের মত অকৃতী লেখক নিজেদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবে। সে বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর দিয়া আমরা বিদায় লইতেছি।

অমরেন্দ্রনাথও নশ্বর জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। প্রদীপ্ত তেজে জ্বলিতে জ্বলিতে, জনপ্রিয়তার সর্ব্বোচ্চ শিখরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠভাবে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই, স্বীয় শোণিতে প্রিয় রঙ্গভূমির তর্পণ করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বলিবার কিছু নাই, কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কিছু নাই, হয়ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই। আমরাও কাঁদিব না—বরঞ্চ শুষ্ক নেত্রে বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব—তিনি যেন অমরেন্দ্রনাথের সন্তপ্ত আত্মাকে সেই শোকাতীত লোকে চিরসুখে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন। —যাও অমরেন্দ্রনাথ, রঙ্গমঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া—যাও সেই অমরায়--

ধরা রঙ্গমঞ্চ হ'তে লইয়া বিদায়,
একে একে যত নট গেছে অমরায় ;
তোমারে লইতে তুলে,
এসেছে সকলে মিলে,
আনন্দে অধীর সবে পেয়ে হে তোমায় !

বাণীর বিনোদ কুঞ্জে যথা শত পিক,
সুমধুর কলকণ্ঠে মুখরিছে দিক,
থাক সুখে থাক তথা,
মিলিত হয়েছে যথা,
বঙ্গের গিরিশ সনে বিদেশী গ্যারিক।

আরভিং, অমৃত মিত্র, যথা মতিলাল,
ট্র্যাজেডির মত্ত বীর সে মহেন্দ্রলাল,
বঙ্গের সুধার সিন্ধু,
বেলবাবু, অর্দ্ধ ইন্দু,
মধুর মিলন সুখে বঞ্চ তথা কাল।

কর্ম্ম শেষ, লীলা সাঙ্গ—লভ' অবসর—
বরিষ আশীষ এবে ধরা মঞ্চোপর;
হেথা শুধু নিশিদিন
বাজিবে হৃদয় বীণ—
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্র! তুমি হে অমর!